দিব্যেন্দু পালিত

শ্রেষ্ঠ গল্প

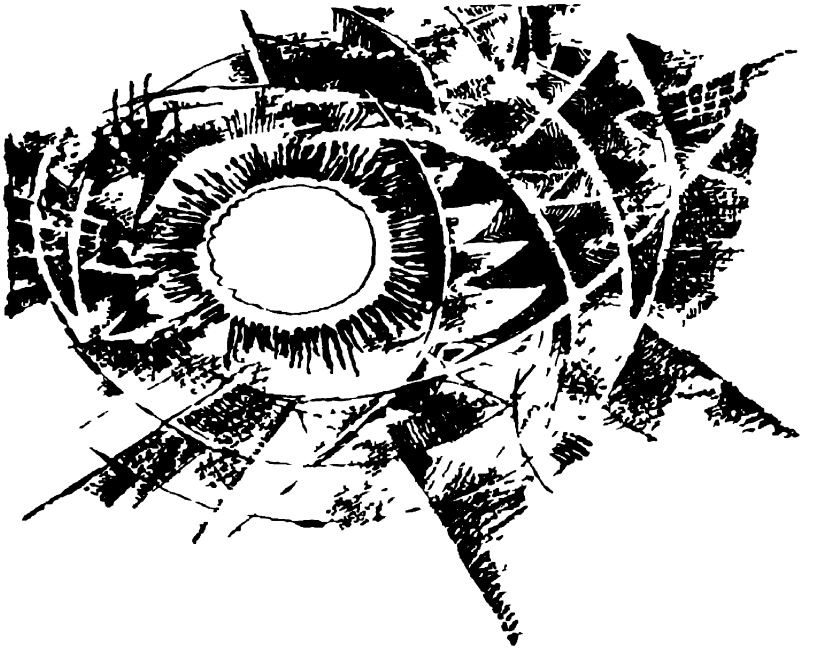

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—১লা জানুয়ারী, ১৯৫৫

মুদ্রাকর
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৩৩/ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

কল্যাণী-কে

B36718

সূচীপত্র

মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ ৯
শোকসভা ১৬
ট্রেসপাসার্স ২২
দাঁত ২৭
মাড়িয়ে যাওয়া ৩৫
একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু ৪১
গন্ধের আবির্ভাব ৪৮
মূকাভিনয় ৫৮
গুপ্ত বিপ্লব ৬৫
সীমানা ৭২
খেলা ৮০
কাচ ৮৭
ছাগল বিষয়ে দু'চার কথা ৯৩
আবির্ভাব ১০১
লীভ ট্রাভেল ১০৭
সাধুচরণ ১১৯
আলমের নিজের বাড়ি ১২৬
বিবেক ১৩৯
পতনজনিত ১৪৭
যে নেই ১৫৭
জাতীয় পতাকা ১৬৩
মুখগুলি ১৭২
গাঢ় নিরুদ্দেশে ১৭৯
ব্রাজিল ১৯০
সোনার ঘড়ি ১৯৬
ত্রাতা ২০৫

মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ

দু'দিন বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর আজ বিকেলে কৃষ্ণা হঠাৎ অফিসে ফোন করল।

নিজের চেম্বারে আমি তখন একটা জরুরি ড্রাফ্‌ট নিয়ে ব্যস্ত। মন ভালো না থাকায় যা ভাবছিলুম ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছিলুম না। সামনে স্টেনো ব'সে ; ওর চুল থেকে শ্যাম্পুর গন্ধ উড়ে এসে নাকে লাগছে, চোখ নামিয়ে নোটবুকে আলতো পেনসিল ঠুকছে মেয়েটি—এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

খুব স্বাভাবিক কারণে আমি বিরক্ত বোধ করলুম। কাজে বসার আগে অপারেটরকে ব'লে দিয়েছিলুম ফোনটোন এলে বিসিভ কোরো না, ব'লে দিও, নেই। তা সত্ত্বেও লাইন দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে একটা ধমক দিতে যাব, ওদিক থেকে মিহি গলায় ক্ষমা চেয়ে অপারেটর বলল, 'ইটস ফ্রম ইওর ওয়াইফ, স্যার !'

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলুম না, 'হ্যালো' বলতে সময় নিলুম। কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা কেন ! দু'দিন কথাবার্তা বন্ধ থাকার পর এমন কি জরুরি দরকার পড়ল ওর, এখনই যে জন্যে ফোন করতে হলো ! তেমন কিছু বলার থাকলে ও বাড়িতেই বলতে পারত। কারণ, খুব ভালো করেই জানে কৃষ্ণা, সব কিছুর পরেও আমি বাড়ি ফিরি ; ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কর্তব্য ও করণীয় যা-কিছু সবই করি ! ও স্বীকার না করুক, আমি তো জানিই আমার মধ্যে একটা ভালো মানুষ আছে, এখনো বেঁচে আছে !

এইসব চিন্তা সত্ত্বেও আমি কেমন কাতর হয়ে পড়লুম। যতো অসময়েই হোক, কৃষ্ণা আমার স্ত্রী, আমাকে ফোন করছে ভেবে খুশিই হলুম আমি। আমার খুব লোভ হলো কৃষ্ণা কী বলে শুনি।

এরপর আমার কথাবার্তার ধরন দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কী-রকম আছি।

'হঠাৎ ফোন করতে বাধ্য হলাম।'

'বলো।'

'তোমার গাড়িটা কি এখন পাওয়া যাবে ? পেলে ভালো হয়।'

'হঠাৎ ?'

'নিজের দরকারে বলছি না। মিসেস নন্দী চাইছিলেন ঘণ্টা তিনেকের জন্যে। ওঁদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'এভাবে বলছ কেন ! তোমাকে কি দিই না !'

'পারবে কি না সেটাই বলো ?'

'আমি তো ফিরবই কিছুক্ষণের মধ্যে। ভেবেছিলুম তোমাকে নিয়ে একবার নার্সিং হোমে যাব। ন'কাকার অপারেশন—'

'তাহ'লে পারবে না ?'

'হ্যাভ পেসেন্স !' আমি প্রায় চিৎকার ক'রে বললুম, 'তুমি কী ভাবো, কৃষ্ণা, আমি একটা '

ওপাশ থেকে বিসিভার নামিয়ে রাখার কঠিন ধাতব শব্দ এলো। শব্দটা কিছুক্ষণ আমার কানের পর্দায় লেগে থাকল, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল আমার মাথায়, আমার শরীরের সর্বত্র। অপমানে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে ফোনটা নামিয়ে রাখলুম আমি।

জুলি তখনো চোখ নিচু ক'রে আমার সামনে ব'সে রয়েছে। কৃষ্ণা নামটি ওর খুব চেনা। একবার অসুখে প'ড়ে আমি ক'দিন শয্যাশায়ী ছিলুম ; সেই সময় অন্যান্যদের মতো জুলিও মাঝে মাঝে আমার খবর নিতে যেত। কৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করত। একদিন ওর মুখে 'কিস্‌নাডি' ডাকটা শুনে মনে মনে খুব হেসেছিলুম আমি। সে প্রায় চার পাঁচ বছর আগেকার কথা।

আপাতত আমার গলার স্বর শুনে জুলি নিশ্চয়ই বুঝেছে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং আমার এই ক্ষোভের কারণ কৃষ্ণা ছাড়া আর কেউই নয়। ফলে লাজুক ও নম্র মেয়েটির মাথা আরো নিচু হয়ে গেল। আমার ব্যাপারে ও খুবই লজ্জিত।

রাগে ও উত্তেজনায় আমার কানের পাশে শিরা দপদপ করছিল। সহজ হবার জন্যে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দেশলাই জ্বাললুম, আগুনের শিখায় অসাবধানে নখ পুড়ে গেল আমার। আমি পারলুম না, চেষ্টা সত্ত্বেও একাগ্রতা আনতে পারলুম না। ড্রাফ্‌টের প্রথম অংশটা ততোক্ষণে ভুলে গেছি, পরবর্তী বিষয় সম্পর্কেও কিছু মনে পড়ছে না। সবই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

আরো বেশি বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্যে ছুটি দিলুম জুলিকে। জুলি চ'লে যাবার পর বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলুম। বেয়ারা এলে স্বাভাবিক অথচ বিরক্ত গলায় বললুম, 'দ্যাখো তো হে, বতন ড্রাইভার আছে কি না। থাকলে বলো আমার গাড়িটা বাড়িতে পৌঁছে দিতে। এই নাও চাবি। আর, হ্যাঁ, শোনো, আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকো।'

আমি জানি, বাধ্য ও বশংবদ বেয়ারা এক্ষুনি আমার হুকুম তামিল করবে। ওরা আমাকে চেনে, ওরা সকলেই আমার কদর বোঝে, তাই আমার কোনো কথাতেই মাথা চুলকোয় না। যতোই দেরি হোক বা ছুটোছুটি করতে হোক, ট্যাক্সির দুর্ভিক্ষের সময়েও ও ঠিক আমার জন্যে ট্যাক্সি ধ'রে আনবে। ঘরে যেমনই থাকি না কেন, বাইরে আমি খুব সুখী। এই বয়সেই আমার কপালে কতগুলো অবাঞ্ছিত ভাঁজ পড়েছে, খুঁটিয়ে দেখলে যে ঠোঁটের পাশে কুঁকড়ে-ওঠা মাংস চোখে পড়ে, বা. চোখের কোলে বিষণ্ণতার ছাপ, ওপরওয়ালারা সেগুলোকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল বলেই জানে। আমাকে খুশি করার জন্যে টপ-টু-বটম এখানে সকলেই সদা তৎপর। ফলে ট্যাক্সি আসবেই ; আমি উঠে বসব। তারপর মন থেকে রাগ ও অপমান সম্পূর্ণ মুছে ফেলার জন্যে প্রায়ই যা ক'রে থাকি, আজও তাই করব।

ভাবতে ভাবতেই ট্যাক্সি এসে গেল। আমি উঠে পড়লুম। ট্যাক্সির পিছনের নরম গদিতে হেলান দিয়ে ব'সে চতুর্দিকের হট্টগোল, ট্রাম কি বাসের শব্দ এবং শশব্যস্ত ছুটোছুটির ওপর চোখ বুলিয়ে এ-সবের মধ্যে আমি কোথায় আছি, আদৌ আছি কি না, বা থাকলেও কেমন আছি—এক মুহূর্তে সব কিছু পরখ ক'রে নিলুম। আমার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা নিঃশ্বাস হৈ-চৈ ক'রে উঠল। ব্যাপারটা ভালো লাগল না। তখন চোখ বন্ধ ক'রে, গতি আগলে, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় আমি ভাবলুম, আমিই নায়ক, আমার দুঃখটা বড়োই আধুনিক, আজকের যে-কোনো লেখক আমাকে নিয়ে দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিকে গল্প লিখতে পারে।

এমন সময় ঝাঁকুনি খেয়ে ন'ড়ে বসলুম আমি। হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েছে। ট্যাক্সিওলা বোধহয় ফাঁকতালে বেরিয়ে যাবার মতলবে ছিল, পারেনি, জেব্রা ক্রশিংয়ের প্রায় আধা-আধি ঢুকে পড়ে থেমে গেছে। আমার সামনে দিয়ে মানুষের অবাধ পারাপার, ট্যাক্সিটার অনধিকার প্রবেশ কেউ কেউ হয়তো তেমন সহ্য করতে পারছে না, ভুরু কুঁচকে দেখে নিচ্ছে আমাদের। আমায় দোষী কোরো না, বললুম মনে মনে, দু'চোখ বন্ধ ক'রে আমি এতোক্ষণ গতি আগলে রাখার চেষ্টা করেছি। খুব ইচ্ছে ছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব, সুখী দম্পতির মতো নার্সিংহোমে দেখতে যাব ন'কাকাকে। হলো না। ফলে এখন আমি খুব আলাদা, সকলের চেয়ে আলাদা। ট্যাক্সিতে ব'সে আছি বলেই দুর্দান্ত সুখী নই। আমি জানি বাড়ি ফেরার চেয়ে বড়ো সুখ এই মুহূর্তে আর কিছুতে নেই। এইসব ভাবনার মধ্যে দেখলুম একটি পুষ্ট যুবতী এক যুবকের গায়ে গা লাগিয়ে রাস্তা পার হতে হতে ঈষৎ ঝুঁকে তাকাল আমার দিকে, আলগোছে হাত তুলে নমস্কার করল যেন। আমিও মাথা নাড়লুম, কিন্তু মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলুম না। ওরা দূরে, ময়দানের ভিড়ে মিশে যেতে মনে পড়ল হঠাৎ, মেয়েটি ক'দিন আগেই ঢুকেছে আমাদের অফিসে। ইন্টারভিউয়ে অত্যন্ত সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে ঘেমে উঠেছিল —কেমন মায়া হওয়ায়, প্রায় জেদের বশেই আমি ওকে পাঁচ জনের একজন মনোনীত করেছিলুম। আমার ইচ্ছে হলো, মানে খেয়াল হলো, ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করি ওকে, তুমি সেদিন মিথ্যে বলেছিলে কেন ?

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতে আমি আবার মেয়েটির কথা ভাবলুম। কে কে আছে এর উত্তরে মেয়েটি বলেছিল বাবা, মা, ভাই, বোন। কিন্তু তোমার যে একজন প্রেমিক আছে, যাকে পেলে

বাবা-মা-ভাই-বোনকে অনায়াসে ভুলে থাকতে পারো, ছুটির পর গায়ে গা লাগিয়ে হেঁটে যাও ময়দানের দিকে, সে-কথা তো বলোনি ! ভয় পেয়েছিলে ? না কি লজ্জা ? পরে মনে হলো কী আবোল-তাবোল ভাবছি, এ-সব কেউ বলে নাকি ! ববং সুযোগ পেলে একদিন মেয়েটিকে ডেকে বলব, প্রেমিক সঙ্গে থাকলে কাউকে নমস্কার করাব দবকার নেই, মাথা উঁচু ক'রে হাঁটবে।

বাধ্য হয়েই নিজেব সঙ্গে এই সব বগড, রসিকতা করছিলুম আমি। আসলে আমি একটা কিছু ধবতে ভুলতে চাইছিলুম। ট্যাক্সিটা বাব বাব বাধা পাচ্ছে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম।

ট্যাক্সি থামল। ভাড়া মিটিয়ে আমি বারের দিকে হাঁটি। আব একটু, আব একটু, আমাব ভিতবেব ব'লে উঠল, ধৈর্য ধবো, আব একটু পবেই ভুলে যাবে বিকেলে কে তোমাকে ফোন কবেছিল, তোমার স্মৃতিতে ফোন-বিসিভার নামিয়ে বাখাব বিশ্রী, ধাতব শব্দ পীড়ন কববে না আব।

ভিড় কাটিয়ে বারের সিঁড়িতে পা দেবো, হঠাৎ আমাব জামাব হাতা ধ'রে কে যেন টানল। দু'দণ্ড চোখকে বিশ্রাম দিলুম আমি।

'আরে, লাট্টুদা ! কোথায় যাচ্ছেন ?'

দেখি মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে, চিমটি কাটার মতো ক'রে ওব ফর্সা নিটোল আঙুল টেনে রেখেছে আমাব শার্টের হাতা। ওব পাশের কিশোবীটিকেও দেখলুম। মুন্নিব চেয়ে বয়সে কিছু বড়োই হবে, যুবতী হতে আব দেরি নেই। ওব পাশে বলেই মুন্নি আমাব চোখে তীব্র হয়ে ধবা দিল।

'মুন্নি যে !' অবাকভাব কাটিয়ে আমি হাসলুম। 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'এই তো, সিনেমা দেখতে।'

দাঁত বের ক'রে হাসল মুন্নি। আমি বুঝতে পারলুম না ওব পাতলা ঠোঁটেব বঙটুকু ওব নিজস্ব, না চারাল কালার ব্যবহার করেছে ও। দ্বিতীয়টি ভাবতে ভালো লাগল না। কতো বড়ো হয়ে গেছে ! মনে করার চেষ্টা কবলুম শেষ কবে দেখেছি ওকে। নীলাব বিয়েব সময় কি ? সেও তো দেড় দু' বছর আগের কথা। না, অতো দিন নয়, অতো দিন নয়।

'গীতশ্রী, আমার বন্ধু।' মুন্নি ওব বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'আব এই, লাট্টুদা।'

লাট্টুদা ! নামটা মনে মনে উচ্চাবণ করলুম, লাট্টুদা, লাট্টুদা। কতোদিন পরে শুনলুম। নামটা পুবনো অথচ মনে হচ্ছে যেন নতুন শুনছি। মুন্নির কণ্ঠ আমার কানে মধু বর্ষণ কবল। হাত বাড়িয়ে আমি ওব ঘাড়ের কাছে চুলের গোছা নেড়ে দিলুম।

'মুন্নি, খুব ফাজিল হয়েছ।'

'দিলেন তো নষ্ট করে !' আদরে কাঁধ ঝাঁকাল মুন্নি, চোখ ফিরিয়ে চুল দেখল। ওব বান্ধবী বোধহয আমার সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল। সত্যিই তো, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা ফুটপাথ। বলল, 'মুন্নি, আমি চলি বে। কাল দেখা হবে।'

'কেন !' মুন্নি প্রথমে বলল, তারপর দূরে তাকিয়ে কী দেখল যেন, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসল। 'আচ্ছা, যা। সোজা বাড়ি যাবি !'

মেয়েটি দাঁড়াল না। মুন্নির দৃষ্টি লক্ষ-ক'রে আমি দেখলুম, দূরে ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে প্যান্ট-পরা টেরিমাথা যে-ছেলেটি এতোক্ষণ আমাদেব দেখছিল, গীতশ্রী তার সঙ্গ ধ'রে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'মুন্নি, তুমি বাড়ি যাবে কি ক'রে ?'

'কেন, বাসে !' মুন্নি অবাক ভাব দেখাল, 'যাবেন আমাদের বাড়ি ? চলুন না ? মা প্রায়ই বলে। আপনি, কৃষ্ণাদি কেউই তো আজকাল যান না !'

'তোমার মা ভালো আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা ?'

পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন ধাক্কা দিল মুন্নিকে। ইচ্ছে করেই। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মুন্নি আমার খুব কাছে সরে এলো। হাত বাড়িয়ে আমি ওকে আমার গায়ের কাছে টেনে নিলুম। ভাগিস

লাগেনি। আমি দেখেছি, শুতোটা জোরেই মেরেছিল, লাগতে পারত।

'চলো।' ফুটপাথে দাঁড়ানো ভালো নয় ব'লে আমি হাঁটার চেষ্টা করলুম, 'তোমাকে কি বাসে তুলে দেবো? বড়ো ভিড় যে এখন! তুমি যাবে কি করে!'

'আপনি কোথায় যাবেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল মুন্নি।

'কেন, তুমি কি একটু থাকতে পারবে আমার সঙ্গে? তোমাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। থাকবে? দেরি হয়ে যাবে না?'

'আপনি আমায় পৌঁছে দেবেন? বলব, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি গেলে মা খুব খুশি হবে!'

'বেশ, পৌঁছে দেবো।'

'তাহ'লে একটা পাইন অ্যাপেল খাওয়ান!'

মুন্নির চোখে চোখ পড়তেই আমার খুব হাসি পেল। হাসি চাপবার কোনো চেষ্টাই করলুম না আমি। মুন্নি যেন খুব অপ্রস্তুত হয়েছে, রাগবে কি হাসবে ভেবে পেল না। ঈষৎ ভুরু তুলে বলল, 'হাসছেন যে বড়ো?'

'এমনি। তুমি আমাকে এতো প্রশ্ন কোরো না।' একটু থেমে আমি বললুম, 'শুধু পাইন অ্যাপেল খাবে? আর কিছু না? চলো, আমার খুব খিদে পাচ্ছে, তুমি খেলে আমিও খাব।'

মুন্নি দু'পা পিছিয়ে পড়েছিল। খুব দ্রুত হেঁটে এসে অনুযোগের গলায় বলল, 'এতো তাড়াতাড়ি হাঁটছেন কেন! বাব্বা, কী তাড়া! আমি পারব না ব'লে দিচ্ছি।'

'এই নাও। আমি আস্তে হলাম।'

মুন্নির সুবিধের জন্যে আমি পা টিপে হাঁটতে লাগলুম। গরম লাগছিল। জুতোটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে হলো। কেউ কেউ তাকিয়ে দেখছিল আমাদের। আমি জানি, এখন আমার পাশে মুন্নিকে খুব বেমানান লাগছে। বয়স যতোই হোক, আমার কপালে পরিশ্রমের ভাঁজ, আমার চোখের কোলে স্পষ্ট বিষণ্ণতা, আমার লম্বা ভারী শরীর আমাকে বয়স্ক ক'রে তুলেছে। মুন্নির কতো হবে! চোদ্দ কি পনেরো, বেশি হ'লে ষোল। যে কেউই ওকে আমার মেয়ে বা ছোট বোন ভাবতে পারে। এই চিন্তায় আমার মনের ভিতর একটা আবেগের আলোড়ন শুরু হলো। এখন আমি খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলুম।

'চলো মুন্নি, এই দোকানটায় ঢুকি। এখানে খুব ভালো আইসক্রীম পাওয়া যায়।'

'ওঃ, আইসক্রীম! মুন্নি হ্যাংলার মতন মুখ ক'রে বলল, 'আপনি কি খাবেন? দো পেঁয়াজি?'

শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠলুম আমি। মুন্নি ভুরু কোঁচকালো, 'হাসছেন কেন! আমাকে খুব হ্যাংলা ভাবছেন নিশ্চয়। তাহলে কিন্তু যাব না আপনার সঙ্গে।'

'না চলো। তোমাকে আমার খুব দরকার এখন।'

'কেন?'

আমি চুপ করে থাকলুম। কেন-র উত্তর আমার জানা নেই।

আইসক্রীম খেতে খেতে মুন্নি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেন দরকার বললেন না তো! কী করবেন আমাকে নিয়ে?'

'অনেকক্ষণ আটকে রাখব। তোমার কি খারাপ লাগছে?'

'নাঃ। খুব ভালো লাগছে।' মুন্নির ঠোঁটের কোণায় আইসক্রীমের দুধ লেগে আছে। খুব আস্তে আঙুল বাড়িয়ে আমি সেটা মুছে দিলুম। ওর নরম শরীরের হালকা সুবাস আমার নাকে লাগল। মনে পড়ল, ওর অন্নপ্রাশনের দিন ওকে কোলে নিয়ে আমি একটা ছবি তুলিয়েছিলুম। ছবিটা এখনো আছে আমার অ্যালবামের মধ্যে। মুন্নি এখন শাড়ি পরে, একা ম্যাটিনি শো'য় সিনেমা দেখতে যায়। ভাবতেই কেমন অবাক লাগে!

'আচ্ছা, লাটুদা—', যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এইভাবে চোখ তুলে আমাকে দেখল মুন্নি, 'আপনি বুঝি মদ খান?'

'কেন!'

'তাহ'লে ওই দোকানটায় ঢুকছিলেন কেন !' হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট মুছল মুন্নি। 'ওটা তো মদের াকান। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাবা একদিন ওখানে ঢুকেছিল। বাবাও তো খায়।'

আমি একটু দ্বিধায় পড়লুম। মনে হলো এই প্রশ্নটা আমার সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আমি নি না, ব্যাপারটা মুন্নি কোন চোখে দেখবে। যদি খারাপ ভাবে ! না, মুন্নিকে আমি আমার সম্পর্কে রাপ কিছু ভাবতে দেবো না। কৌশলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলুম আমি।

'তুমি একা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে কেন ? ভয় করে না ?'

'একা !' অবাক চোখে আমাকে দেখল মুন্নি, 'আহা, একা কেন হবে। ওই তো, গীতু ছিল।'

'ওই ছেলেটাও বুঝি সঙ্গে ছিল ?'

'কোন ছেলেটা !' এক পলক আমার চোখে চোখ রেখে কী ভাবল মুন্নি। তারপর হেসে ফেলল। ঃ, আপনি দেখে ফেলেছেন বুঝি। ও দীপকদা, গীতুর লাভার। বিচ্ছিরি।'

'কে !'

'ওই ছেলেটা। অ্যালবার্ট কাটে, পয়েন্টড শু পরে। ওই তো রোগা, প্যাংলা চেহারা। আমার একদম ালো লাগে না।'

'তোমার কোনো লাভার নেই ?'

'যাঃ !' মুন্নির চোখেমুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। ও কেঁপে উঠল অল্প, একটু ন'ড়ে বসল। ওর গলার ছনে সোনালি রোমগুলো আমার চোখে পড়ে, সদ্য গজিয়ে-ওঠা পাখির রোমের মতো ফুরফুরে, ইচ্ছে লা উড়িয়ে দিই ফুঁ দিয়ে। কিন্তু বুঝতে পারছি এখন এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে ও আরো নুয়ে ড়ে। বড়োই সরল এই মেয়েটা, কেমন অনায়াসে সব কথা বলে ফেলে একটুও দ্বিধা না রেখে।

মুন্নি চোখ তুলল না অনেকক্ষণ, আইসক্রীমের প্লেটে গলা দুধের দিকে তাকিয়ে থাকল। মজা করার ন্যে টেবিলের ওপর রাখা ওর হাত, হাতের বালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমি বললুম, 'মুন্নি, ামি তোমার লাভার হতে পারি না ? দ্যাখো, আমি টেরিও কাটি না, পয়েন্টড শু-ও পরি না। আমাকে ামার পছন্দ হয় না ?'

'যাঃ !' সকৌতুকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক পলক দেখে মুন্নি হেসে ফেলল, 'তা কী করে য় ! আপনি তো লাট্টুদা।'

'দোষ কি !' আমি বললুম, 'দীপকদা লাভার হতে পারে, লাট্টুদা কেন পারে না ?'

'জানি না বাবা !'

হুট করে জবাব দিয়ে খানিক কী ভাবল মুন্নি। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা মুখের ভিতর পুরে দিয়ে, তে নখ কাটতে কাটতে আড়চোখে দেখল আমাকে।

'আপনার তো কৃষ্ণাদি আছে। আপনি কোন দুঃখে আমার লাভার হবেন।'

মুন্নি আমার ঠিক সেই ব্যথার জায়গাটায় ঘা দিল। সেই নাম উচ্চারণ করল, ও জানে না, যে নাম লবার জন্যে আমার মূল্যবান সময়, আমার ভয়ঙ্কর গম্ভীর মন আমি মুন্নির কাছে সমর্পণ করেছি। মুন্নি ানে না এই মুহূর্তে আমি কী ভীষণ অসহায়, আমি যা বলছি সবই বলছি বানিয়ে। বলছি জোর ক'রে। ামার কোনো কথাই কথা নয়।

'কী হলো ? লাট্টুদা, আপনি ঘামছেন কেন ? এবার যাবেন তো ?'

'যাব।' নিঃশ্বাস সামলে আমি বললুম, 'বড্ড গরম লাগছে, মুন্নি। তুমি টাই খুলতে পারো ? দাও না লে ?'

মুন্নি দ্বিধা করল না। আমার বুকের কাছে মাথা নিয়ে এসে টাইয়ের নট্ খোলার জন্যে হাত বাড়াল। পরে চোখ তুলে আমি দেখলুম, সিলিং পাখাটা ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ করে ঘুরে চলেছে অবিরাম। স্টুরেন্টের নানা শব্দ আমার কানে এলো। আমি চোখ বন্ধ করলুম। আমার কানে আমার নিজেরই ঠস্বর গুঞ্জন তুলল, হ্যাভ পেসেন্স, হ্যাভ পেসেন্স। মুন্নির সিল্কের চাদরের মতো নরম চুলসুদ্ধ মাথাটা াটকে আছে আমার চিবুকের কাছে। গলায়, বুকে আমি ওর গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছি। আমি একটা বাস্তব সুখের কথা ভাবলুম।

'মাকে যেন বলবেন না আমি সিনেমায় গিয়েছিলুম।'

'বেশ, বলব না।' টাইটা ভাঁজ করে পকেটে ভরতে ভরতে বললুম, 'বলব তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রাস্তায়, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলুম।'

'ইস্, মা'র সঙ্গে যদি হঠাৎ কৃষ্ণাদির দেখা হয়ে যায়। তাহলে কৃষ্ণাদিকেও শিখিয়ে দেবেন

কৃষ্ণাদি! কৃষ্ণাদি! আমার ইচ্ছে হলো ঠাস্ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিই মুন্নির গালে। মুন্নি, তুমি এতো বাচাল কেন? এখন তুমি আমার সামনে আছ, শুধু কি আমার কথা ভাবতে পারো না? যদি না পারো, চুপ ক'রে থাকো। আমাকে ভাবতে দাও।

নিজেকে গোপন ক'রে আমি বললুম, 'মুন্নি, আজকে যেমন হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তেমনি রোজ হতে পারে না?'

'ওরেব্বাস, তাহ'লেই হয়েছে! রোজ রোজ!' মুন্নি যেন কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারল না, 'রোজ দেখা হয়ে কী হবে?'

'এমনি। আমরা বেড়াব, আইসক্রীম খাব। তারপর ধরো, সিনেমাতেও যেতে পারি। তোমাকে আমার খুব দরকার কিনা।'

চোখ বড়ো ক'রে মুন্নি আমার পাগলামি-মার্কা কথাগুলো শুনল। কী ভাবল একটু। তারপর বলল 'রোজ হবে না। এক-একদিন আসব।'

'ভেরি গুড'।

মুন্নির ফর্সা, নরম হাতটা আমি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলুম। ইচ্ছে হলো গুঁড়িয়ে ফেলি। সেই অবস্থায় দেখলুম মুন্নির চোখে কেমন একটা ছায়া পড়েছে, ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। হাতটা ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টা করল না মুন্নি।

'একটা কথা বলব?' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বললুম আমি, 'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে এখন। একটা চুমু খেতে দেবে?'

'যাঃ, অসভ্য!' মুন্নি সরে গেল একটু, ওর ঠোঁট কাঁপল, 'আমি কিন্তু চ'লে যাব।'

'তাহলে থাক।' আমি বললুম, 'তোমার যখন ইচ্ছে করছে না। তুমি আমাকে একেবারেই পছন্দ করো না দেখছি!'

'আপনার খুব ইচ্ছে করছে? দূর থেকেই হঠাৎ বলল মুন্নি, গলার স্বরে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই তারপর, একটু অপেক্ষা ক'রে, আমি জবাব দিচ্ছি না দেখেই বোধহয় বলল, 'শুধু একবার তো? ঠিক বলছেন?'

'বেশ, একবারই।' লঘু গলায় বললুম আমি। মুন্নির কথা শুনে হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল আমার। কোনোরকমে হাসি চেপে মুন্নিকে দেখলুম আমি। ও কিছু ভাবছে।

পর্দা সরিয়ে কেবিনের বাইরে উঁকি দিয়ে কী দেখল মুন্নি। ক' মুহূর্ত। মুখটা আবার ভিতরে টেনে নিয়ে বলল, 'এখানে নয়। তাহ'লে আপনাকে ট্যাক্সিতে যেতে হবে।'

'কেন, ট্যাক্সি কেন!' মুন্নি আমাকে অবাক ক'রে দিল। 'কেউ বুঝি তোমায় ট্যাক্সিতে নিয়ে গিয়ে চুমু খেয়েছিল?'

'আহা, আমাকে কেন!' হাত দিয়ে আমাকে ঠেলল মুন্নি, 'গীতু বলেছে, দীপকদা একদিন ওকে ট্যাক্সিতে....'

'ও, বুঝেছি, বুঝেছি।' আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'তাহ'লে চলো। ট্যাক্সিতেই না হয় হবে। তারপর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।'

আমি বেয়ারাকে ডাকলুম। সিগারেট ধরিয়ে বিলের টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলুম বাইরে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কতো তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় তার চিন্তা করতে লাগলুম। দেরি হয়ে যাচ্ছে, মুন্নি তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

তখন আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়-মাখানো মৃদু গলায় মুন্নি বলল, 'আপনি কিন্তু কৃষ্ণাদিকে বলবেন না কিছু।'

'দূর, পাগলি ! এ-সব কেউ বলে।'

অলতোভাবে হাতের আড়াল দিয়ে মুন্নিকে আগলে রাখলুম আমি। আর মনে মনে বললুম, ভিতু
যে। অতো ভয়ের কি আছে ! আমি কি সত্যিই সত্যিই তোকে চুমু খাব নাকি ! বরং এখন অনেকক্ষণ
কে নিয়ে ঘুরব। যেখানে ইচ্ছে, যেখানে খুশি। আমি জানি, ঘুরতে ঘুরতে আবার আমি সেই একই
গায় ফিরে আসব। আমার পরিত্রাণ নেই। জানি, আজকের এই দেখা হওয়াটাও মিথ্যে। তোর
ল, নিষ্পাপ জগৎ থেকে আমি যে অনেক দূরে সরে এসেছি, মুন্নি।

শোকসভা

'মণি, তোর হলো ?' বেলা পড়ে আসছে দেখে ঘরের ভিতর থেকে হাঁক দিল রেণুবালা, 'তাড়াতাড়ি কর। আর যে সময় নেই !'

ময়নাব খাঁচাব দরজা খুলে মাটির খুরিতে ছোলা ভরে দিচ্ছিল মণিকা। রেণুবালার গলা শুনে বলল 'অতো ব্যস্ত কেন, মা ! এখনো তো চারটে বাজেনি !'

তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বাইরে তাকাল রেণুবালা। বেলা আন্দাজ করার চেষ্টা করল, দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আকাশ পরিষ্কার থাকলেও আলো তেমন জোরালো নয়, বৈকালিক রোদ্দুরে কেমন ছায়া-মাখানো ভাব। জানলার ওপাশে একটা নারকেল গাছ ; বৃষ্টিভেজা মন্থর হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছিল।

বাড়িতে ঘড়ি না থাকায় সময় কতো হলো বোঝার উপায় নেই। তাতে খুব অসুবিধে হয় না। যতোক্ষণ আকাশে আলো থাকে রোদের ওঠানামা লক্ষ করেই সময় আন্দাজ করতে পারে রেণুবালা। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর এইভাবেই কেটেছে। নিতান্তই আন্দাজের ওপর নির্ভর ক'রে রেণুবালা বুঝেছে কমলাক্ষর অফিসে যাবার সময় হলো কিংবা মণিকার স্কুলে, সেইমতো উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়েছে। কমলাক্ষ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, 'তোমার মতো গিন্নি পেলে অনেক বাবুরই ঘড়ি কেনার পয়সা বেঁচে যায়।'

'আহা !' সলজ্জ হেসে বলত রেণুবালা, 'ঘড়ি ছাড়া আবার পুরুষ মানুষকে মানায় নাকি !'

আসলে ঘড়ি নিয়ে একটা সূক্ষ্ম গর্ব অনুভব করত রেণুবালা। বিয়েতে সোনাদানা আর কিছু দিক না দিক, রেণুবালার বাবা জামাইকে সোনার হাতঘড়ি দিয়েছিল। সন্ধেয় কমলাক্ষ বাড়ি ফেরার পর আকাশে যখন আর আলো বা রোদ কিছুই থাকত না, কমলাক্ষর পুরনো ঘড়িটাই তখন ছিল রেণুবালার সম্বল।

সেই ঘটনা মনে পড়ায় গলা পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো রেণুবালার। চাপ অনুভব করল বুকে আর, এইসব মুহূর্তে যা হয়, কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সায়টিকার ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠল।

কমলাক্ষ গেল, সেই সঙ্গে ঘড়িটাও। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও যে-মানুষটা ছিল জোয়ান, পুরুষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী, হঠাৎ কী ক'রে যে সে বাসের চাকার তলায় চ'লে গেল ভাবা যায় না। মণিকার হাত ধ'রে রেণুবালা যখন কলকাতার হাসপাতালে পৌঁছুল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। শ্মশানে মুখাগ্নি ক'রে ফেরাব পথে ওরা যখন স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করছে, কানের পাশে ফিসফিস ক'রে মণিকা বলেছিল, 'বাবার ঘড়িটা কোথায় গেল, মা ?'

ওসব মনে বাখার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না। অচল ঘড়ির মতো রেণুবালার বুকের শব্দ থেমে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। কেমন সহজে কিছু না জানিয়ে চ'লে গেল মানুষটা। হা রে, যাবার আগে শেষবারেব মতো চোখ খুলে তাদের দেখে যেতে পারত তো !

থানের খুঁটে চোখ মুছল রেণুবালা। কমলাক্ষর মৃত্যুর পর দিন পনেরো গেছে। এখন শুধুই ভবিষ্যতেব ভাবনা। ভরসা বলতে ওই একটি মেয়ে, মণিকা। মণিকার পর একটি ছেলেও হয়েছিল, বছর দশেকের মাথায় ছেলেটাও মারা গেছে নিউমোনিয়ায় ভুগে। এখন সম্বল মণিকা। 'মণির বিয়ে দেবো না,' ছেলে মারা যাবার পর শোকার্ত কমলাক্ষ বলেছিল, 'ওই আমাদের ছেলে, দেখাশোনা করবে বুড়ো বয়সে।'

নিজেকে নিয়ে নয়, রেণুবালার ভাবনা ওই মেয়েকে নিয়ে। সাতকুলে কেউ নেই। বিয়ের কথা থাক ; এখন যদি এমন হয়, রেণুবালাও চোখ বুজল, তখন কে দেখবে ওই আইবুড়ো মেয়েকে !

ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না রেণুবালা। মণিকাকে এই সময় ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসল।
'চারটে পঞ্চান্নর গাড়িটা ধরতে পারলেই আমরা ঠিক সময় পৌঁছুতে পারব।' মণিকা বলল। তারপর
লে চিরুনি চালাতে চালাতে দেখল রেণুবালাকে। 'তোমার আবার শরীর খারাপ লাগছে না কি, মা ?'
'না রে, আমি ঠিক আছি।' অল্প হাসল রেণুবালা, 'আমার ওষুধটা দিবি ?'
ঘরের কোণে টেবিলের ওপর থেকে ট্যাবলেটের ফাইলটা এনে রেণুবালার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কুঁজো
থকে জল গড়িয়ে আনল মণিকা।
'তুমি না হয় না-ই গেলে, মা ? অনেকটা পথ। আমি একাই যাই।'
'পাগল মেয়ে ! একা একা কোথায় যাবি !'
মা তাকে একা ছাড়তে রাজি নয়। রেণুবালার মনের অবস্থা বুঝে মণিকা আর কিছু বলল না।
কমলাক্ষদের অফিসে আজ শোকসভা। কাল ওর অফিসের সহকর্মীরা এসেছিল, যেতে বলেছে।
রেণুবালা যেত না এমনিতে। কিন্তু, যাওয়াটা দরকার, ওরা বলল। কমলাক্ষ গেছেন, রেণুবালা আর
মণিকা তো আছে। ভবিষ্যতের ভাবনাও আছে। মণিকার জন্যে ওই অফিসেই একটা ব্যবস্থা অন্তত
বে। খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তাছাড়া, ওরা বলেছিল, কমলাক্ষর পরিবারের বিপর্যয়ে সাহায্য
রাব জন্যে ওরা কিছু চাঁদাও তুলেছে, টাকাটা হাতে হাতেই দিয়ে দিতে পারবে।
আগে ঠিক ছিল মণিকা যাবে রাধিকাবাবুর সঙ্গে। পুরনো প্রতিবেশী, কমলাক্ষর বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি,
তনিই নিয়ে যাবেন সঙ্গে ক'রে। তা আর হলো না। কাল রাত থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী হয়ে
ড়েছেন রাধিকাবাবু। বেগতিক দেখে রেণুবালা নিজেই যেতে মনস্থ করল। ওই শহর, পথ ও ব্যস্ততা
হনিয়ে নিয়েছে কমলাক্ষকে। মণিকাকে একা ছাড়বে কি ক'রে !
আরো খানিক বাদে তৈরি হয়ে মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রেণুবালা।
কাছেই স্টেশন। পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। বৃষ্টিভেজা পথের খোদলে জল জমে আছে।
কুর পাড় দিয়ে হাঁটবার সময় বাতাসে সোঁদা গন্ধ পেল রেণুবালা। নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এলো।
কমলাক্ষর মৃত্যুর পর এই প্রথম বাইরে পা দিয়ে সে দেখল চরাচরের কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।
বই যথাযথ। চারদিকেব চমৎকার ব্যবস্থা থেকে শুধু একজনই সরিযে নিয়েছে নিজেকে।
আশপাশে দু'একখানা পাকা বাড়ি সদ্য উঠতে শুরু করেছে। আর সবই টিন কি টালির ছাদ। তবু
ভালো, বুদ্ধি ক'রে মানুষটা এই জায়গায় জমি কিনে মাথা গোঁজার মতো দু'খানা ঘর তুলে দিযে
গিয়েছিল। না হ'লে এই দুঃসময়ে পথে দাঁড়াতে হতো। কমলাক্ষর ইচ্ছে ছিল, দোতলা তুলে নিচেটায়
ভাড়াটে বসাবে। এই জমি আর ঘর দু'খানা তুলতেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের অনেকটা গেছে। হিসেবি মানুষ
ছল বলেই সামাল দিত কোনোরকমে।
আজ অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে কিঞ্চিৎ হালকা বোধ করছিল রেণুবালা। কমলাক্ষর সম্পর্কে
চিন্তায় গর্ব বোধ করছিল। মানুষটি কর্তব্যপরায়ণ ছিল—যতোদিন বেঁচেছিল পবিবারের জন্যে যথাসাধ্য
করেছে। সবই হাসিমুখে। ওর সহকর্মী রসময়বাবু সেদিন বলছিলেন, 'বৌদি, আপনি তো সংসারী
মানুষটাকেই শুধু দেখেছেন, আমরা দেখেছি বাইরের মানুষটাকে। অমন লোক হয় না। অনেককাল
পাশাপাশি কাজ করলাম তো ! আহা, কমলদা গিয়ে আমাদের আধমরা করে গেলেন।'
এ-সব যতোই শুনেছে, চোখের জলের সঙ্গেই ততোই বুকের মধ্যে এক ধরনের গর্ব অনুভব করেছে
রেণুবালা। শোনার পর থেকেই সম্পূর্ণ মানুষটিকে জানবার লোভ হচ্ছিল। মণিকার সঙ্গে যাওয়া ছাড়াও
এই লোভ ও ইচ্ছা তাকে টানছিল অনবরত। রেণুবালা থাকতে পারেনি।
'মণি, তোর বাবার আপিসটা ঠিক চিনতে পারবি তো ?' যেতে যেতে আস্তে গলায় মেয়েকে জিজ্ঞেস
করল রেণুবালা।
'পারব না কেন, মা।' মণিকা বলল, 'কতোবার তো গেছি। আগের অফিসটা ছিল দূরে। দু'বছর
হলো নতুন জায়গায় উঠে এসেছে। ভারী সুন্দর বাবাদের নতুন অফিসটা, মা। পাঁচতলার ওপরে ছাদে
উঠলে গঙ্গা দেখা যায়।'
'তোর বাবা বলেছিল আমাকে—', মণিকার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজে কথা জুড়ে দিল

রেণুবালা। আজ তার কথা বলতে ভালো লাগছিল। 'ওদের অফিসের থিয়েটারে একবার নিয়ে যা বলেছিল। তোর বাবা ভালো থিয়েটার করত। কর্ণার্জুনে ভীম সেজেছিল। তা সেবার

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল রেণুবালা। একটু থেমে দম নিল। তারপর বলল, 'আমার অবিশ্যি আ যাওয়া হয়নি। তোর জন্যেই হয়নি। সকাল থেকেই ঘুষঘুষে জ্বর বাঁধিয়ে বসলি। তুই অবিশ্যি তখ অনেক ছোট।'

মা'র কথা শুনে মুখ টিপে হাসল মণিকা। উত্তর দিল না।

'আপিসের সায়েবরাও তোর বাবাকে খুব খাতির করত। নতুন আপিস হবার পর আলাদা ঠাণ্ডা বসতে দিয়েছিল।'

'সে কি, মা! কোথায়!' চোখে বিস্ময় ও সন্দেহ নিয়ে রেণুবালাকে দেখল মণিকা, 'ঠাণ্ডা ঘরে আবা বসল কবে! বাবা বসত হাটের মাঝখানে। বাবার ওপরঅলা ব্যানার্জিবাবুও ওই সঙ্গে বসত।'

'তুই জানিস না ঠিক।' মণিকাকে ছলনাটুকু ধরবার সুযোগ দিল না রেণুবালা। উত্তরটা এইভাবে আসবে বুঝতে পারেনি। ম্লান মুখে বলল, 'বসত রে বসত। তুই কি আমার চেয়ে বেশি জানিস! তো, শুনিস তোর বাবা সম্পর্কে কে কী বলে। মানুষ বড়ো না হ'লে কি আব লোকে এইভাবে ডাকে!'

মণিকা সাড়া দিল না। মা যা বলছে বলুক, এইভাবে বুক থেকে খানিকটা দুঃখের ভার নেমে যাক কিছুটা হাল্‌কা হোক। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তা না হ'লে কমলাক্ষ কী ছিল না ছিল, তা কতোটা খাতির ছিল অফিসে, কতোটা সম্মান, মণিকা কি কম জানে!

একবার, মনে আছে, কী একটা কাজে গিয়েছিল বাবার অফিসে। তার সামনেই একজন অফিসার কমলাক্ষব মুখেব ওপব ফাইল ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না মশাই প্রত্যেকটা কাজে ভুল। না পারলে রিটায়ার করুন।'

লোকটা চ'লে যাবাব পরও অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে বসেছিল কমলাক্ষ। অফিস ছুটির পর পথে স্টেশনে আসতে আসতে উদাস গলায় বলেছিল, 'মণি মা, তুই বড়ো হয়ে চাকরি করলে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিস। এ অপমান আব সহ্য হয না।'

কমলাক্ষর দুঃখ অনুভব করতে পারছিল মণিকা। ধরা গলায় বলেছিল, 'তুমি কেন আরো একটু মন দিয়ে কাজ করো না, বাবা!'

'মন কি আর দিই না, মা।' কমলাক্ষ বলল, 'এই মন দিয়েই তো পঁচিশ বছর চালিয়ে এসেছি। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। নতুন ছেলে ছোকরারা এসেছে। ওদের ধরনধারণ, আদবকাযদা সবই আলাদা। আমাদের কাজ ওদের পছন্দ হবে কেন!

পারতপক্ষে তারপর থেকে আর বাবার অফিসে যেত না মণিকা। অপমানটা সেদিন গায়ে মেখেছিল কমলাক্ষ, কারণ তার মেয়ে মণিকা সামনে ছিল। হয়তো এমন ঘটনা আরো অনেকবার ঘটেছে, সবই হজম ক'রে নিয়েছে কমলাক্ষ। রেণুবালারও এ-সব জানবার কথা নয়।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মা ও মেয়ে নীববে অপেক্ষা করছিল। চারটে পঞ্চান্নয় ট্রেন। অপেক্ষা করতে করতেই পাঁচটা বেজে গেল।

রেণুবালা অধৈর্য হয়ে উঠছিল।

'হ্যাঁ রে মণি, মীটিং ক'টায়?'

'বলেছিল তো সাড়ে পাঁচটায়।' চিন্তিত গলায় বলল মণিকা, 'তুমি একটু দাঁড়াও। আমি ট্রেনের খবরটা নিয়ে আসি।'

মণিকা চ'লে যেতে সময়ের হিসেব করতে লাগল রেণুবালা। ট্রেনে কলকাতা পৌঁছুতে মিনিট কুড়ি, তারপর বাসে আরো পাঁচ সাত মিনিট। সাকুল্যে আধ ঘণ্টা। এখনো যদি ট্রেনটা এসে পড়ে তাহ'লে ঠিক সময়েই পৌঁছুতে পারবে।

মণিকা ফিরে এসে বলল, 'ট্রেনের কোনো খবর নেই, মা। আগের স্টেশনে লাইনের ওপর পিকেটিং করছে, ট্রেন আসতে পারছে না।'

অবাক চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল রেণুবালা।

'পিকেটিং কী রে, মণি ?'

'কী আবার ! লোকে খেতে-পরতে পারছে না, তাই জন্যে ট্রেন আটকাচ্ছে।'

'এই কি ট্রেন আটকানোর সময় !' স্বগতোক্তির গলায় বলল রেণুবালা, 'তোকে তখনই বলেছিলুম, মণি, একটু তাড়াতাড়ি কর। তুই যদি আমার কোনো কথাটা কানে তুলিস !'

'তাড়াতাড়ি এসে কী লাভ হতো। শেষ ট্রেন তো সেই সাড়ে তিনটের সময়েই চ'লে গেছে।'

মণিকার কথা শুনে মুখ ভার হলো রেণুবালার। দূর আকাশে মেঘ জমছিল, সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

ট্রেন এলো সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। মণিকা বুঝতে পারছিল দেরি হয়ে গেছে। বেলা শেষের আলো মলিন থেকে মলিনতর হয়ে পড়ছে ক্রমশ। তার ওপর রেণুবালার স্বাস্থ্য ভালো নয়। এই অবেলায় রওনা না হলেই ভালো হতো। যার যাবার সে চ'লে গেছে। এখন মীটিং শুনে কী লাভ। রেণুবালাকে এ কথা বোঝানো যাবে না।

ইতস্তত ভাব নিয়ে কথাটা বলেই ফেলল মণিকা, 'আর গিয়ে কোনো লাভ আছে, মা ? তোমার শরীরও তো ভালো নেই।'

'না রে, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' অবুঝের মতো বলল রেণুবালা, 'আধঘণ্টা কি আর এমন বেশি দেরি। আমরা না পৌঁছুলে ওরা ঠিক অপেক্ষা করবে, দেখিস।'

মনে কোনো জোর পাচ্ছিল না মণিকা। ট্রেনের কামরায় মা'র পাশে ব'সে অস্বস্তি বোধ করছিল ও রেণুবালার এই যাওয়াটাও সহজ নয়। কমলাক্ষর মৃত্যু হয়েছে মাত্র ক'দিন হলো ; সকলের মনে কমলাক্ষর স্মৃতি টাটকা থাকতে রেণুবালার উপস্থিতি সকলকেই বিব্রত করবে। অসুবিধে হলো মাথায় জেদ চেপেছে, এখন তাকে নিরস্ত করা যাবে না। রেণুবালা আহত বোধ করতে পারে।

যতোক্ষণ ট্রেন চলল, প্রায় ততোক্ষণই জানলার দকে মুখ ক'রে বসে থাকল মণিকা। বাবাকে মনে পড়ছিল। অফিসে অপমানগ্রস্ত কমলাক্ষর কাতর মুখ বার বার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। কেন, কীভাবে, কোন অবস্থায় বাসের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো কমলাক্ষর, এই পনেরো দিনের ভিতর একবারও সে-কথা কেউ জানতে চায়নি। জানলেও অবশ্য কোনো সুবিধে হতো না। মৃত্যুর চেয়ে বড়ো সত্য এ-ক্ষেত্রে আর কিছু নেই। তবু, অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে মণিকার মনে হচ্ছিল, এই মৃত্যুর একটা আলাদা অর্থ আছে। কমলাক্ষর মৃত্যু হয়তো সহজ মৃত্যু নয়। হয়তো এর পিছনে আর কোনো কারণ ছিল। যদি এমন হয়, তারা সভায় পৌঁছুল আর সর্বজনসমক্ষে কেউ ঘোষণা করল, এই মানুষটি, কমলাক্ষ, সারা জীবন দুঃখ, অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছেন ; মৃত্যু তাঁকে শান্তি দিয়েছে। তা হ'লে ! রেণুবালা কি সহ্য করতে পারবে এই ঘোষণা ?

নিরুপায় অস্বস্তির মধ্যে একটার পর একটা স্টেশন পার হয়ে যেতে দেখল মণিকা।

হাওড়া স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছুল তখন ছ'টা বেজে গেছে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। স্টেশনের ঘড়িতে সময় দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রেণুবালা। মণিকার আপত্তি সত্ত্বেও এগিয়ে চলল ভিড় ঠেলে। বাসে উঠেও তার ব্যস্ততা গেল না।

'তুই তোর বাবার স্বভাবের কিছুই পেলি না। কী কাজের মানুষ ছিল বল তো ! রোদ-বৃষ্টি-ঝড় কিছুরই তোয়াক্কা করত না। অফিসে যাবেই যাবে। এমন মানুষটা কি না····'

'আঃ, মা ! তুমি কি একটু চুপ করবে !'

অনেকক্ষণ থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল মণিকা। এখন বাসসুদ্ধ লোক রেণুবালার কথা শুনছে দেখে ধমক দিল।

মণিকার আকস্মিক ব্যবহারে হতচকিত বোধ করল রেণুবালা। চোখেমুখে একটা অসহায় ভাব ফুটিয়ে মেয়েকে দেখল একবার ; তারপর একদম চুপ ক'রে গেল।

জি-পি-ও'র কাছে বাস দাঁড়াতে রেণুবালার হাত ধ'রে বাস থেকে নামল মণিকা। কমলাক্ষর অফিসটা ভিতরের দিকে, এখান থেকে হেঁটেই যেতে হবে। তখনো ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ফুটপাথ প্রায় খালি।

অফিস-ফেরত কিছু লোক এখানে ওখানে, গাড়ি বারান্দার নিচে আশ্রয় নিয়েছে। পিছল ফুটপাথে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে কোনোরকমে মেয়ের হাত ধ'রে নিজেকে সামলালো রেণুবালা। আল্গা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতোটা হাঁটতে হবে রে, মণি ?'

'অনেকটা— ।' বৃষ্টির ছাঁট বাঁচানোর জন্যে আঁচলটা মাথার ওপর ঘোমটার মতো তুলে দিল মণিকা 'কী ভোগান্তি বলো তো। অতো ক'রে বারণ করলাম, শুনলে না। এখন বৃষ্টিতে ভিজে একটা অসুখ বাঁধলে কী হবে !'

'মণি, তুই কি আমাকে যেতে দিতে চাস না?' মুখের রেখায় একটা দুঃখময়, কঠিন ভাব ফুটে উঠল রেণুবালার, 'এই তো শেষ। আর কবে বেরুতে পারব বল ? ইচ্ছে হয়েছিল মানুষটা গেছে, তার সম্পর্কে কে কী বলে শুনি। আমি কি অন্যায় করেছি, মণি ?'

'তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলাম, মা—', মণিকা বলল, 'অন্য কিছু ভেবে বলিনি।'

রেণুবালার শেষের কথাগুলো বিচলিত করল মণিকাকে। ভুল বুঝবে জানলে কখনোই এভাবে কিছু বলত না সে। হতবুদ্ধি রেণুবালা আজ যা করছে সবই ছেলেমানুষী। যুক্তি তর্কের বাইরে নিয়ে গিয়ে মৃত কমলাক্ষ যেন নেশার মতো আকর্ষণ করছে রেণুবালাকে। এই মুহূর্তে মা'র কথা চিন্তা করে মমতা অনুভব করল মণিকা।

বাকি পথটুকু দু'জনের কেউই আর কোনো কথা বলল না। রেণুবালার হাঁটার অভ্যাস নেই ; তার ওপর, মণিকা বুঝতে পারছিল, সায়টিকার ব্যথার দরুন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে মা'র। পায়ের গতি কমিয়ে রেণুবালাকে আগলে রেণুবালার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল সে।

কমলাক্ষর আ-‹‹সর সামনে এসে মণিকা দেখল লিফ্‌ট বন্ধ হয়ে গেছে। অকালবর্ষণের আবছা আলোয় প্রবেশ পথের মুখে বাল্‌বের আলোটা খুব টিমটিমে দেখায়। ক' পা ওপরে উঠে বিভ্রান্ত বোধ করল মণিকা। থেমে দাঁড়াল।

'বাবার অফিস চারতলায়, মা। লিফ্‌ট বন্ধ। তুমি কি উঠতে পারবে চারতলায় ?'

মণিকার কথায় স্পষ্টই বিমূঢ় বোধ করল রেণুবালা। ক'মুহূর্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল যেন। তারপর বলল, 'আস্তে আস্তে উঠি মণি, তুই আমার হাতটা ধর।'

একতলা থেকে দোতলায় উঠেই হাঁপাতে শুরু করেছিল রেণুবালা। সিঁড়ির কোণায় ব'সে পড়ে বলল, 'তোর বাবা কি রোজ এতো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠত ?'

'তা কেন ?' মণিকা বলল, 'বাবা লিফ্‌টে উঠত। অফিস ছুটি হয়ে গেছে, এখন লিফ্‌টও বন্ধ।'

'কী আর করা যাবে। এইভাবেই উঠি।' গাঢ় নিঃশ্বাস ছেড়ে রেণুবালা বলল, 'আমরা খুব দেরি ক'রে ফেললাম।'

মণিকা কী বলবে ভেবে পেল না।

দোতলার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে ওরা দেখল, হাতে চাবির গোছা নিয়ে কে একজন নেমে আসছে। ওদের দেখে লোকটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কোথায় যাবেন আপনারা ?'

রেণুবালা মণিকাকে দেখল। মণিকা বলল, 'চারতলায়। ওখানে মীটিং হচ্ছে না ?'

'মীটিং তো বহুত আগেই শেষ হয়ে গেছে।' আপাদমস্তক মা ও মেয়েকে নিরীক্ষণ ক'রে লোকটি বলল, 'উপ্‌রে এখন কেউ নেই। অফিস বন্ধ হয়ে গেছে।'

রেণুবালা যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। বসে বলল, 'মণি, জিজ্ঞেস কর তো মীটিংয়ে কতো লোক হয়েছিল ?'

'কতো আর লোক হবে, মাঈজী।' মণিকা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই লোকটি বলল, 'বিশ বাইশজন হয়েছিল—'

'মণি, চল, ফিরে যাই।'

রেণুবালাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মণিকা ওর হাত ধরল। মুঠোর ভিতর ও অনুভব করল, রেণুবালার হাত কাঁপছে, ঘামছে। আশ্চর্য দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এসে রেণুবালা বলল, 'কী স্বার্থপর এরা সবাই,

মণি!' লোকটা চ'লে গেল, তার জন্যে কারও মায়াদয়া নেই। তুই শুনলি, মোটে বিশ বাইশজন···

মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে মণিকা দেখল, রেণুবালা কাঁদছে। নাকের পাটা ছুঁয়ে এক ফোঁটা জল কিছুক্ষণ স্থির থেকে টুপ্ ক'রে ঝ'রে পড়ল। হাতের মুঠো শক্ত করল মণিকা।

'পৃথিবীতে কেউ কারও জন্যে ভাবে না, মা।' সান্ত্বনা দেবার গলায় মণিকা বলল, 'শুধু শুধু দুঃখ কোরো না। তোমাকে বলেছিলাম না, এসে কোনো লাভ নেই।'

রেণুবালা উত্তর দিল না। আঁচলের খুঁটে দু'চোখ মুছে কমলাক্ষর অফিসের দরজা পেরিয়ে ফুটপাথে পা দিল।

মণিকা বুঝতে পারছিল, মাকে এখন সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। সমস্ত সংসারের ওপর বিরাট অভিমান নিয়ে মা এখন হাঁটছে, কমলাক্ষ সম্পর্কে যেটুকু জানা ছিল, সেটুকু নিয়েই এখন সে একাত্ম হবার চেষ্টা করবে। আরো অভিমান জমবে, আরো দুঃখ পাবে।

এই ভালো হলো। দুঃখিত, শোকাহত মণিকা অনেকক্ষণ পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আব কিছু না হোক, কমলাক্ষর পরিপূর্ণ স্মৃতি নিয়েই ফিরে যাচ্ছে রেণুবালা। সেখানে অন্তত মা'র কোনো ক্ষোভ নেই।

ট্রেসপাসার্স

আজ নিয়ে পর পর তিন দিন। একই সময়, ঠিক একই জায়গায়, ব্রেকফাস্ট সারতে মিনি আর সোমেশ যখন বারান্দায় এসে বসে। দৃষ্টিকটু কিনা বলা যাবে না ; কিন্তু মিনির পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। ভুরুর ওঠানামায় সে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

'তোমার চায়ে চিনি দিচ্ছি—'

'দাও।'

ঠিকমতন বেলা হবার আগেই রোদ ছড়াতে শুরু করেছে আজ। সোমেশের হাতে কাগজ থাকলেও পড়ছে না বোঝা যায়। হাওয়ার জন্য কাপে চামচ নাড়ার শব্দটা তেমন বোধগম্য হয় না।

'শীত পড়ছে, ভিটামিনের ডোজটা ভাবছি এবার বাড়িয়ে দেবো। আর, শোনো—'

মিনি কথাটা শেষ করল না। যাকে বলা হলো তার চোখ তখন রাস্তায়। দেখে মনে হবে লন, লনের ঘাস বা সদ্য-শীতের ফুলগুলিই অন্যমনস্ক করে রেখেছে সোমেশকে। মিনি এইভাবে ভেবে নেয়। ছোটবেলা থেকে রুচির চর্চা করতে হয়েছে তাকে, ভাবনাগুলো এখন চলে মেশিনের মাপজোকে। সে জানে ঠিক কতো দূর গিয়ে থামতে হয়।

'এই এক ন্যুইসেন্স হয়েছে, উফ্!'

'কি ?'

'এই ভিখিরিগুলো। রোজ জ্বালাতন, রোজ জ্বালাতন ! রাম সিং—'

মিনির গলার স্বর বেশ মোটা আর খসখসে ; সে এটাকে সেক্স ভেবে নেয়। দশ বছর পরে সোমেশের আর তেমন কানে লাগে না।

সোমেশ প্রথমে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারেনি। লোকটির গলা পেয়ে হুঁশ হলো।

'রাম সিং কি করবে !'

'তাড়িয়ে দিয়ে আসুক—'

'তা তুমি পারো না।' চায়ে চুমুক দিল সোমেশ, একটা টোস্ট তুলে নিল বাঁ হাতে। 'ওরা ট্রেসপাস করেনি। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায়। ইউ কান্ট ড্যু দ্যাট।'

লোকটির এক হাতের কনুই পর্যন্ত সরু ফিতের মতো রক্ত, অন্য হাতে মুরগী কাটার ছুরি। মিনি বলল, 'থাক। তুমি যা করছ করো গিয়ে।' বুকের মধ্যে উত্তেজনা টের পেল। সোমেশকে বলল, 'তুমি তোমার রুলস্ অ্যান্ড ডেকোরাম নিয়ে থাকো। এটা তো শুনেছিলাম ভদ্রপাড়া, কোয়ায়েট ! এখানেও সেই উপদ্রব !'

'কি করবে !' সুড়সুড়ি দিয়ে হাসল সোমেশ, 'বরং স্টেটসম্যানে একটা চিঠি লেখো। অনেকদিন তো বেরোয়নি কিছু ! থীম্‌টা কী হবে ভেবে নাও।'

কাগজ হাতে উঠে পড়ল সোমেশ। ক'পা এলোমেলো হেঁটে গেটের দিকে এগুলো। বড়ো গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে ওখানে, পাতার হাওয়া নড়ছে জলের মতো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে সোমেশ, নটা বাজার আগেই বেরিয়ে পড়বে গাড়ি নিয়ে। দশ বছরে সোমেশকে কখনো হিসেবের বাইরে যেতে দেখেনি মিনি।

অম্বলের জন্য মিনি এখন চা খায় না। ডাক্তারের বারণ। পরিবর্তে তিন বেলা ওভালটিন চলে ভিটামিনের পুরু ঢল যখন তিরতির করে গলা বেয়ে নামে—বেশ বুঝতে পারে স্বাস্থ্য ও রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে শরীরে। এইভাবে চলতে থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই সে নধর হবে, পাল্লা দিতে পারবে

সোমেশের সঙ্গে।

সোমেশের আকস্মিক উঠে যাওয়ায় আপাতত ক্ষুণ্ণ হলো মিনি। শরীরের গড়িমসির জন্যই সম্ভবত সোমেশের সান্নিধ্যে আজকাল সে তেমন উত্তাপ বোধ করে না। হয়তো এর গভীরে আছে আর কোনো কারণ, মিনি ঠিক বুঝতে পারে না। এই মুহূর্তে সোমেশের সঙ্গে দূরত্ব তাই আক্ষরিক হয়ে ওঠে।

কিন্তু সোমেশ কি সত্যিই ভিখিরিগুলোর সঙ্গে কথা বলবে! কথা বলা মানেই তো প্রশ্রয় দেওয়া! ও আত্মবোধ একই সঙ্গে দুলিয়ে দিয়ে যায় মিনিকে।

কাপ থেকে ভিটামিন চলকে পড়ে টেবিলে। সোমেশের কাছাকাছি এগিয়ে যেতে যেতে মিনি ভিখিরিদের দ্যাখে। মোটা বা রোগা, নোংরা বা অস্বাস্থ্যকর এ-সব কিছুই তার চোখে পড়ে না; এ-সব সাধারণ মানুষজনের ভিতরেও দেখা যায়। ভিখিরিরা একটা ক্লাশ। এই ভাবনাই বিশেষ করে একা দেয় মিনিকে, কান মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস তার ও ভিখিরিদের মধ্যে লোহার গেটটা ছিল।

'তুমি কী!' সোমেশের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথাটা শেষ করল না মিনি।

'কিছু খুচরো থাকলে ওদের দিয়ে দাও।' সোমেশ বলল, তারপর গেটের দিকে তাকিয়ে, 'এই তোরা কজন আছিস?'

জবাব পাওয়া গেল না। মাথা গুনতে গুনতে মিনি বলল, 'দিলে লাই পেয়ে যাবে। রোজ আসবে। ওদের এনকারেজ করা ঠিক হবে না।'

মিনি সরে দাঁড়ালো। আড়াআড়ি রোদ্দুরে গেটের লোহার শিকের সঙ্গে কয়েকটি মাথা, মুখ ও বাড়ানো হাতের ছায়া তার পা পর্যন্ত চলে আসে— সেজন্য নয়। তাকিয়ে দেখল, রাস্তার ওদিকের ফুটপাথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠেছে একটি মেয়ে, বেশ বড়সড় চেহারা; শীত পড়ছে বলেই কোনোরকমে ময়লা কাপড়টা জড়িয়ে রেখেছে গায়ে। তাহলেও বুক, কোমর, পাছা যেটা যেরকম করে দেখার দিব্যি দেখা যায়। স্বাস্থ্যের এমন অপব্যয় মিনিকে সহজেই বিভ্রান্ত করে ফেলল।

মিনি সোমেশের হাত ধরে টানলো, ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হলো, যার অর্থ, চলে এসো।

সোমেশ আসবে না। ওর শরীরে সেই রকম দৃঢ়তা। মিনিকে বলল, 'স্বাস্থ্য দেখেছো!'

'ন্যুইসেন্স!' মিনি থেমে গেল এবং তারপরেই বলল, 'টেস্টটা যে কোথায় নামিয়ে এনেছো।'

মেয়েটির মুখ এখন গ্রীলের ফাঁকে। সোমেশ তাকিয়ে আছে সামনে, ঠিক মেয়েটিকেই দেখছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বিনবিনে ঘাম ফুটল মিনির কপালে। অল্প উত্তেজনাতেই তার হাতের তেলো ঘেমে ওঠে, বুক জ্বালা করে, বমি পায় কখনো—সমস্ত শরীর জুড়ে তাড়া করে দুর্বলতা। ডাক্তার এর সবগুলিকেই হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কমে যাওয়ার কারণ বলেছেন। অল্প অল্প করে সুস্থ হয়ে উঠছে সে। এইসব ন্যুইসেন্স ও সোমেশের আদিখ্যেতাই যা মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত করে দেয়। যেমন এখন। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে মেয়েটিকে সোমেশের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরতে দেখে ও প্রায় চিৎকার করে উঠল, এই, কি হচ্ছে! পালাও, পালাও সব—'

ধমকটা একটু জোরে হয়েছিল এবং অতর্কিতে। গেট ছেড়ে ভিখিরিগুলো দ্রুত ওদিকের ফুটপাথে দৌড়ে গেল। তারপর এদিকে—মিনি ও সোমেশ যেখানে দাঁড়িয়ে—তাকিয়ে, বিচিত্র সমস্বরে হাসতে লাগল। মেয়েটি শরীর বেঁকালো, যাতে তার বুকের অনেকটাই দেখা যায়, ও বুড়ো আঙুল তুলে দেখালো। একটা বছর পাঁচ-ছয়ের বাচ্চা প্রায় তার কোমর ধরে ঝুলে পড়েছে। কাপড়টা খসে পড়ার মুহূর্তে, হাসতে হাসতেই, কোনোরকমে হাত চেপে ধরল বুকে।

মিনি আর দাঁড়ালো না। তার হাত-পা কাঁপছিল, সোমেশের জন্যই এইসব—ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগল উল্টো, লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠল। জানে, সোমেশ পিছনেই আসছে।

তারপর সোমেশ অফিসে গেল। যেমন যায়। তবে অন্যদিনের চেয়ে একটু তফাত থাকল; মিনি সোমেশকে 'বাই' বলল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। লন পর্যন্ত এগোতে আজ তার গা গুলোচ্ছে। জানলা দিয়ে ভেসে আসছে হট্টগোল—লনের ওপর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রোদ, থেকে থেকে হাওয়া উঠছে শুকনো। শুধু গেটের ওদিকে, ফুটপাথে, ভিখিরিগুলোই যেন ব্যতিক্রম। আজ বেশি করে চোখে পড়লেও গোটা ব্যাপারটা তিনদিন ধরে দেখা। মিনি যেখানে থাকে, সেখানে সূঁচ পড়ার শব্দ হয়।

ছোট বয়সে মিনি ছিল ব্যারাকপুরে, বাবার সাহেবি বাংলোয়। লিচু গাছের শুকনো পাতা খসে পড়া মধ্যে সে শুনতো নৈঃশব্দ্য। টেবিলে পরিবেশন করত বাবুর্চি বেয়ারারা, নিঃশব্দে, এমনকি খুঁজলে। ফল বা মুরগীর রোস্টেও নৈঃশব্দ্য মাখানো থাকত। হট্টগোল ও ঘিঞ্জি তার একেবারে পছন্দ নয়। পর বছর সাতেক কেটেছে আমেদাবাদ ও দিল্লিতে, ডিফেন্স কলোনিতে ধুলো ছাড়া মোটামুটি নিরুপ ছিল। তারপর কলকাতায়। গুডনেস, কী একটা শহর, কী তার মানুষ, কী তাদের বেঁচে থাকার গন্ধ ইংরিজি কাগজে এইসব নিয়ে তার প্রথম চিঠি বেরোয়, ড্রাফটটা দেখিয়ে নিয়েছিল সোমেশকে। এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হলো যে, শব্দ বা নৈঃশব্দ্য নয়—সমস্যা সঙ্গ ও পরিবেশ নিয়ে, ক্লাস নিয়ে। তখনই তার শরীর রীতিমতো খারাপ হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে ; অম্বল এবং সোমেশের সঙ্গে বাড়তে থাকে ক্রমশ।

এখানে বদলির পর অফিস থেকে সোমেশকে টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন দিয়েছিল ভবানীপু দিকে। তিনতলার ওপর ফ্ল্যাট, মন্দ নয়, আলো-হাওয়া খেলত চমৎকার। বাড়িতে নানারকম ফার্নিচারের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল একটি অর্গ্যান। দামি জিনিস, প্রোমোশনের পর এটা সোমেশ কেনে। সোমেশের সঙ্গে পার্টি বা ফিল্‌মে না গেলে মিনি বাজাতো রাত পর্যন্ত। একেই 'বেশ' বলে।

অসুবিধে দেখা দিল পিছনের বস্তিটা নিয়ে। প্রায়ই, বিশেষত সন্ধ্যার পর ও রাতে, ভেসে আসে বিশ্রী চ্যাঁচামেচি, অকথ্য গালাগালি। অসুবিধে হলো, এদের থামাবার কোনো উপায় নেই। এ-সম্পর্কে মিনির কিছু প্রস্তাব ছিল, ভেবেছিল লিখবে। কিন্তু বস্তির লোকেরা ইংরিজি বোঝে না, অর্গ্যান তো বাজায়ই না— সোমেশ বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দেয়। তারপর একদিন সেই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল।

সোমেশকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে, মার্কেট হয়ে, গাড়ি নিয়ে ফিরছিল মিনি। বাড়ির কাছাকাছি একটি শিশু হঠাৎ পড়ে গেল গাড়ির সামনে। মিনি ভালো গাড়ি চালায়, তার রিফ্লেক্স্ রীতিমতো প্রখর। তবু ঠিক চাপা না দিলেও ব্রেক কষার শব্দে হৈ-হৈ পড়ে গেল। খেয়াল হতে দেখল ভিড় গোঁজে উঠেছে চারপাশে। মিনি তখনই কিছু একটা বুঝে ফেলল তা নয়, বরং হালকা সবুজ সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে ভেঙে যেতে লাগল। তাকে কেউ থেমে থাকতে বলল না তারপর নিজেই চলে এলো। আসতে আসতে মনে হলো, তার পিছনে কিছু তাড়া করছে। কী, বুঝতে পারল না মিনি। অকারণ হলেও দুর্বলতা, হাত ঘেমে-ওঠা এ-সব টের পেল স্পষ্ট। আর কোনোদিন সে গাড়ি চালানোর কথা ভাবেনি।

এ-সবের সঙ্গে আজকের ঘটনাব সম্পর্ক নেই কোনো। এটাকে ভিখিরির উৎপাত বলে ভাবা যেতে পারে। আলিপুরে তাদের বাড়ির আশপাশে বস্তি নেই, তবু ভিখিরিরা আছে—প্রায় মাছির মতো তারা লক্ষ্যবস্তু টের পেয়ে যায়! আশ্চর্য ব্যাপার! মিনি ভাবল, কাল বেড়িয়ে ফেরার পথে লক-আউট অফিসের পাশে চালা উঠতে দেখে ভেবেছিল অন্য কিছু ; এখন বোঝা যাচ্ছে ওরা রীতিমতো পাকা আস্তানা গেড়েছে। কাল বা তার আগের দিন বা তারও আগের দিন যতোটা ছাড়া-ছাড়া ছিল, আজ আর তা নেই। আজ সারাক্ষণ কাছেপিঠে ঘুরছে ; প্রায় সারাক্ষণ কানে আসছে ভিখিরিদের যান্ত্রিক ও অনমনা স্বর। তার মানে এখন ওইরকমই চলবে, দিনের পর দিন, দল বাড়বে, যতোদিন না এখানে আর একটা বস্তি খাড়া হয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই অসহ্য মনে হয় মিনির। সোমেশ চলে গেছে অনেকক্ষণ হলো। অন্যদিন এ-সময় সে চান করে নেয়, টুকিটাকি ভাবে, তারপর খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি চলে। লাঞ্চে সোমেশ প্রায় দিনই ফেরে যেদিন না ফেরে জানিয়ে দেয় আগে থেকে। আজ ফিরবে। তাহলেও দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাসটা সে কাটিয়ে উঠেছে। ইট্‌স্ নট্ গুড্ ফর ইওর হেল্‌থ, ডাক্তার বলেছিল, তাতে অম্বল বাড়ে। দুপুর থেকে বিকেল অব্দি সময়টা সে উয়োম্যান অ্যান্ড হোম-এর পাতায় রেসিপি পড়ে বা রেকর্ডে স্যুইট বার্ড অফ ইউথ শুনে বা আর-কিছু করে কাটিয়ে দেয়। ঘুমোয় না। আপাতত বাইরের হট্টগোল শুনে অসহায়ভাবে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

লনে আলো পড়েছে পুরোপুরি। শিশির শুকনো ঘাসগুলো বেশ সজীব। মাত্র রবিবার মোয়ার দিয়ে

াম করানো হয়েছে গোটা লন। এতো স্পষ্ট সবুজ কার্পেট পর্যন্ত পৌঁছয় না—না হলে সে ঘরে এনে ছাতো। ওপারে, ঠিক তাদের গেটের মুখোমুখি টীলার সাহেবের বাড়ি, পাশেরটা খেমকাদেব। এই হূর্তে যে-শব্দ উঠছে, মিনি লক্ষ করল, সেটা আর কিছুই নয়—একটা কুকুরের লেজে ভাঙা টিন বেঁধে াটানো হচ্ছে। চারদিক থেকে ঢিল ছুঁড়ে ও তালি বাজিয়ে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে কুকুরটাকে—বেচারা কুর, ওই দুর্ভেদ্য আড়াল ছিঁড়ে বেরুনো ওর সাধ্য নয়। মিনি ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। ডিফেন্স লোনিতে থাকতে থাকতেই গ্ল্যান্ড পচে মরে যায় তাদের দামি লাবরাডর—খুঁজলে বক্সকমের ঝুড়িতে খনো বিওয়্যার অফ ডগ্ লেখা বোর্ডটা পাওয়া যাবে। টমির স্মৃতি বলতে ওইটুকু। প্রিয় কুকুরের ভাব তাকে অনেকদিন মুহ্যমান করে রেখেছিল—পুরো এক সপ্তাহ আমিষ ছোঁয়নি। কেনেল ক্লাব ্যানুয়ালে প্রাইজ পেয়েছিল টমি—অসম্ভব বাধ্য ছিল তার, ভেবে অল্প জ্বালা শুরু হলো বুকে। কুকুররা াত্যন্ত সেনসিটিভ জীব।

লেজে টিন-বাঁধা কুকুরটা এপাশ থেকে ওপাশে ক্রমাগত ঘুরছে। ওদিকে খেমকাদের দারোয়ান াড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে টের পেয়ে রাগ ও জ্বালা প্রবল হয়ে উঠল মিনির। সে 'রাম সিং' বলে াচাতে যাচ্ছিল—তখনই চোখে পড়ল মেয়েটিকে, তাদের গেটের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ানো। শব্দটা জে এলো গলার মধ্যে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ও মেয়েটিকে দেখতে লাগল—সোমেশ সম্ভবত আরও খব াখে তাকিয়েছিল। 'স্বাস্থ্য দেখেছো!' যেন কানের পাশেই শুনতে পাচ্ছে সোমেশের গলা। হাত-পা শুা হয়ে এলো মিনির।

সোমেশের ওই কথায় কি কোনো ইঙ্গিত ছিল ? হয়তো। মিনি শুধু অনুমানই করতে পারে। এটুকু াঝে, এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া ভালো নয় ; মানে, ওইভাবে তাকানো। আজকাল সোমেশের বিভিন্ন থার মানে ও অ্যাটিচুড সে ঠিক বুঝতে পারে না। সোমেশের জীবন আছে, আর স্বাস্থ্য, অফুরন্ত াজের শক্তি—অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল মিনি। খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে সমস্ত মুড্‌সমেত সে সোমেশকে রে ফেলবে।

সোমেশ লাঞ্চে এলে মিনি জীবন ফিরে পেল। তবে সকালের মতো তীব্রভাবে নয়। অ্যাম্পুল থেকে ষটা এখন তার রক্তে মিশে গেছে ; এখন সে ঢের বেশি বুদ্ধিমতী।

অনুযোগ শুনে হাসল সোমেশ, নিঃশব্দে, যেমন হাসে। খিদের সময় খাদ্য ছাড়া আর কিছুকে সে বস্তু াবতে পারে না। হালকা মেরুন রঙের মুরগীর মাংসে দাঁত বসিয়ে বলল, 'তাহলে তোমার খুব অশান্তি াচ্ছে— !'

মিনি ঘাড় নাড়ল। খাবারে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না সে। রাগ ও জ্বালায়, বিশেষত লেজে ন-বাঁধা অসহায় কুকুরটিকে মনে পড়ায়, হঠাৎ তার এতোক্ষণের চাগিয়ে ওঠা খিদে লোপ পেল , চোখ বরিয়ে এলো কোটর থেকে। গালে মাংস কমে যাওয়ায় এখন স্বভাবতই তার চোখ বড়ো দেখায়।

'ক্রমশ বাড়ছে।' বলল, 'এইভাবে চললে এখানে থাকাও মুশকিল হবে।'

'কোথায় যাবে ?'

'জানি না।' মিনির চোখে তরল আভা। স্যালাডের টুকরো দাঁতে কাটতে কাটতে নুন বেশি লাগে। লল, 'অফ্‌ন আই ফিল লস্ট !'

'তুমি বেশি ভাবছ, আননেসেসারিলি। এটা কি কোনো সমস্যা !'

মিনি আশ্বস্ত হলো কিনা বোঝা গেল না। প্লেটের ওপর চোখ-মুখ নামানো। ওর সাদা কপালের পর শিরার কালচে আভাস বিশেষ কিছু ভাবায় না সোমেশকে। কপাল থেকে স্বাভাবিক নিয়মে চোখ মাসে বুকে, যদি একে বুক বলা যায়। মাঝে মাঝে মিনিকে নিউরোটিক মনে হয় ; মনে হয় অবান্তর। থাটা পরিষ্কার করে বলা যায় না।

চমৎকার রান্না মিনিকে আরো ঠেলে দিল সোমেশের দিকে। সে চাইল এখন অনেকক্ষণ ধরে সোমেশ তার কাছে থাকুক, কথা বলুক। সোমেশের জীবন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিজের শরীরময় অতৃপ্তি অনুভব করে। বেঁচে থাকায় একরকম সুখ আছে—স্বনির্ভর, স্বচ্ছন্দ সুখ। এরকম অনুভূতি আজকাল হঠাৎ-হঠাৎ খুলে দেয় তাকে, মনে হয় শিরার কোনোখানে পিন ফোটালে এখন ফিন্‌কি দিয়ে

বক্ত ছুটবে। এ-সবের অর্থ সে ক্রমশ স্বাস্থ্য ফিবে পাচ্ছে।

'আজ ডলিকে ফোন করেছিলাম।' মিনি বলল, 'তুমি কি শুনছ?'

'কখন?'

'এই তো, আধ ঘণ্টা আগে। ভীষণ লোন্‌লি ফিল করছিলাম।'

'হঠাৎ!'

'নির্বাণ ফিরেছে। হ্যাড এ জলি গুড ট্রিপ্। যেতে বলল। ভাবছি—'

কথা শেষ করার আগেই থেমে গেল মিনি। উৎকর্ণ হলো। আর কিছু নয়—সে আবার ভেঙে যাচ্ছে—কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর নিরাপত্তা ছিন্ন কবে আবার বেরিয়ে এলো ভিখিরিদের গলা। ও মা, মা গো, এক মুঠো বাসী ভাত দাও মা। টানা, দীর্ঘ স্বর। থামার পবও রেশ যায় না।

মিনি কিছু দেখতে পেল না। একবাব সোমেশের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। ডাইনিং রুমে বসেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল, গ্রীলের ফাঁকে কতকগুলি মুখ দাঁড়িযে আছে, প্রকৃত বর্ণনাহীন মুখ—লনের ওপর শীত-শুরুর অস্পষ্ট হাওয়া খেলছে, বাতাস নিয়ে আসছে তাদের সুদূর গলার স্বব। প্রথমবার সমুদ্র দেখার আগে এরকম অদৃশ্য স্বর শুনেছিল মিনি। মনে পড়ল কাল রাতেও শুনেছিল; মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকারে হারিয়ে যাওয়া সেই শব্দ-নৈঃশব্দ্যের ভয়াবহতা অল্পক্ষণেব জন্য হলেও সেই প্রথম ধরা দিয়েছিল বুকে। এখন মনে পড়ল।

সোমেশকে চুপচাপ উঠে বেসিনের দিকে এগোতে দেখে বিরক্ত হলো মিনি।

'মানুষকে খেতে পর্যন্ত দেবে না!'

'দিস ইজ আওয়ার কান্‌ট্রি।' তোয়ালের আড়ালে থাকায সোমেশের গলা ভারি শোনায়। টাইয়ের নট ওপরে তুলতে তুলতে হেসে বলল, 'সকালে বলেছিলাম না কাগজে চিঠি লেখো। এই সাবজেক্ট চিঠিতে কুলোবে না। একটা আর্টিকেল বরঞ্চ লেখা যায়। চেষ্টা কববে নাকি?'

ঠাট্টাটা ভালো লাগল না মিনির। রাম সিংকে একবার গেটের দিকে পাঠালে হতো। বলল, 'তুমি কি আমাকে একটা লিফ্‌ট দেবে?'

'কোথায়?'

'ডলিদের বাড়ি। ফেরার সময় তুলে নিও?'

বাইরে আবাব সেই স্বব। শব্দ ছাপিয়ে শিস্ দিল সোমেশ। স্যুইট বার্ড অফ ইউথ, মিনি ঠিক চিনতে পারল।

সোমেশ বলল, 'কাম অন। জল্‌দি। পাঁচ মিনিট।'

'প্লীজ! দশ মিনিট!'

'ও-কে, ও-কে।'

এ-সব সময় মিনি হাঁসের মতো লঘু হয়ে যায়। ওজনের ঘাটতিটাকেই স্বাচ্ছন্দ্য ভাবতে ভালো লাগে।

দশ কেন, মিনিকে পনেরো মিনিটও দেওয়া যেতে পারে। রিল্যাক্সড্ হবার জন্য সোমেশ সোফা গা এলিয়ে দিল। কাগজটা পাশে রেখে উয়োম্যান অ্যান্ড হোম তুলে নিল হাতে। প্লেয়ারে রেক চাপিয়ে দিয়েছে মিনি। গমগমে শব্দে অন্য সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সোমেশ একটা সিগারে ধরালো।

তারপর ওরা বেরিয়ে গেল।

চশমার ভিতর চোখ বন্ধ করলে মিনি কিছু দেখতে পায় না। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকেও না। সুস্থ হতে তাকে কিছুটা দূরত্ব পেরোতে হয়। নির্জনতায় গাড়ির চাকার শব্দও যায় বদলে—মিনি এ-সব চিনতে ভুল করে না। দুরন্ত হাওয়ায় ডানা ঝাপটায় মাথার স্কার্ফ। আর কিছু দূর গিয়ে তার শাড়ি আঁচলও খসে পড়বে।

পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার কী আর এমন অভাব! তেমন দরকার হলে এ-বাড়িটাও ওরা নিশ্চিন্ত বদলে ফেলতে পারবে।

দাঁত

নিয়ে এক সময় আমার খুব গর্ব ছিল। গভীর পাথরের কাজেব মতো নিখুঁতভাবে সাজানো সমান চর সারি, তেমনি ঝকঝকে, মুক্তোর সঙ্গে তুলনীয়। এক কস্‌মেটিক্‌স্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি দর টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছিল আমাকে, দাঁত বের ক'বে একরকম নির্বোধ হাসি হেসে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল তখন। সে-বছর ওই টুথপেস্টের বিক্রি দেড়গুণ বেড়ে যায়। দাঁত নিয়ে এই অহঙ্কার অবশ্য বেশিদিন পোষায়নি। কিছুদিন থেকেই একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিলাম। ড়তে ব্যথা, জল খেতে গিয়ে দাঁত কনকন ক'রে ওঠে হঠাৎ, মাঝে মাঝেই জিব নেড়ে নেড়ে বাড়তি সের অস্বস্তি কাটাতে হয়।

আসল ব্যাপারটা টের পেলাম পরে।

তখন আমার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়। পুরোদস্তুর সামাজিক হবার রাস্তাটা ক্রমশ দীর্ঘ ও ব্যস্ত পড়ছে। এই নিয়ে কিছুদিন থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি চলছিল। অথচ, আমি লোকটা খুবই ন্তপ্রিয়, যে-কোনো রকমের ঝামেলা আমার ঘোরতর অপছন্দ। সেদিন মোটামুটি একটা আপোস র ছুটতে হলো বিছানায়।

গোলমালটা বাঁধল তারপর। চুম্বনে উদ্যত হতেই দাঁতমাড়িসুদ্ধ বাঁ গালটা কন্‌কন্ ক'রে উঠল হঠাৎ. হলো দাঁতের গোড়ায় কেউ আলপিন ফুটিয়ে দিচ্ছে সজোরে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে এলাম। কড়ায় মাছ চাপানোর মুহূর্তে গ্যাস ফুরিয়ে গেলে যা হয়—'কী হলো!' —স্ত্রী রিঅ্যাক্ট করল াতাড়ি।

হাতে গাল চেপে বললাম, 'দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা—'

'দাঁতে ব্যথা !' অসম্ভব রাগে, অপমানেও হতে পারে, নীলিমা তখন গরগর করছে। দূরত্বে থেকে ল, 'মদ , মেয়েমানুষ আর পার্টিকেই যারা জীবন ভেবে নেয়, স্ত্রী সংসার তাদের ভালো লাগবে কেন ! ব অজুহাত আমি বুঝি না !'

আমি গল্প লেখক নই, হ'লেও নিজেকে ব্যাখ্যা করা সহজ হতো না। কিন্তু, মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর াতেই আমি কীরকম তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এর অনেকটাই সত্যি।

সত্যি দাঁতের ব্যথাটাও। স্ত্রী ভুল বুঝুক, সারা রাত ধ'রে যন্ত্রণাটা নির্ভুলভাবে টের পেলাম আমি। ন কি গোটা কয়েক বড়ি গিলেও সকাল পর্যন্ত ব্যথাটা থেকে গেল এমন একটা স্তরে যে বাড়ছে না ছে কিছুই বোঝা যায় না।

কিন্তু সামান্য দন্তকষ্ট নিয়ে আঁকুপাঁকু আমার সাজে না। ডাক্তারের কাছে ছুটব, সে-উপায়ও নেই। মি ব্যস্ত মানুষ—কর্মী ও তৎপর, এ-সবের জন্যে তরতর ক'রে ওপরে উঠে যেতে কোনোদিনই কোনো বিধে হয়নি। অফিসে আমার ওপর অনেক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত। বিশেষত আজ—আজ আমাকে তেই হবে সময়মতো। বোনাস নিয়ে একটা গোলমাল চলছে কিছুদিন ধরে, ইউনিয়ন থ্রেট করেছে াতাড়ি রফা না হ'লে স্ট্রাইক করবে। ম্যানেজমেন্টের ইচ্ছে ব্যাপারটা পিছিয়ে যাক—কিছুদিন সময় ওয়া গেলে যা হোক তা হোক করে একটা রফায় আসা যাবে। কর্মচারীদের উত্তেজনা দেশলাইয়ের শুনের মতো, নিবতে দেরি হয় না। এ-সব কাজে মধ্যস্থতা করতে হবে আমাকে।

আমাকে দিয়েই সুবিধে, কারণ আমার কী কাজ আমি তা জানি। কর্মচারীরা, মায় ইউনিয়নের পাণ্ডারা ড, আমাকে মানে—কারণ আমি খুব ভালো হাসতে পারি। ম্যানেজমেন্ট একেই কনফিডেন্স বলেন। কারণ অবশ্য আরো আছে। বছর দুয়েক আগেই হবে বোধ হয়, মেশিন টুল্‌স ফ্যাক্টরিতে লোক

ছাঁটাই হবার পর বোর্ড মিটিং থেকে বেরুবার সময় ক্ষিপ্ত ছাঁটাই-কর্মচারীরা চেয়ারম্যানকে ছেঁ ধরেছিল—প্রোটেকশন ছিল না কোনো, হয়তো মারধোর করত। ঠিক সেই সময় উপস্থিত হলাম আ সরাসরি গণ্ডগোলের মাঝখানে, দেশলাইয়ের আগুনের মতো হঠাৎ জ্বলে-ওঠা উত্তেজনা থামা এতোটুকু দেরি হলো না। বাড়ি ফিরে চেয়ারম্যান সাহেবের বউয়ের ফোন পেলাম, ইউ হ্যাভ সেভ মাই হাসব্যান্ডস্ লাইফ। উই আর সো গ্রেটফুল টু ইউ, ইত্যাদি।

সে-বছর একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। ষোলজন ছাঁটাই কর্মচারী পুনর্বহাল হলো, আর আমার বুঝতেই পারছেন, ফরচুন ফেভারস্ দ্য ব্রেভ।

সে যাই হোক, দাঁতে ব্যথা নিয়েই সময়মতো অফিসে পৌঁছুলাম আমি। সকালে আয়নায় দেখেছিল চোয়ালের নিচে গালটা ফুলে উঠেছে বিসদৃশভাবে. বাইরে থেকেও যে-কারুর চোখে পড়বে। কি দাঁতের ব্যথা কি আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে পারে ? নিশ্চয়ই নয়। বরং, আজকে অন্তত, ওইটেই আমা ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহাব করতে হবে।

মিটিং শুরু হবার মুহূর্তেই অসম্ভব দাঁতের যন্ত্রণায় কাতরে উঠে আমি বললাম, 'যদি কিছু মনে করেন, আজকে কি মিটিংটা বন্ধ রাখা যায় না ? যদি খুব তাড়াতাড়ি আর একদিন—'

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল (আর কী করবে), ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আমি জানতা রাজী ওদের হতেই হবে। যে-কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে ওদের, কিছু পরামর্শ আলোচনার দরকার হয়—দু'পা না পেছোলে কখনোই তিন পা এগোতে পারে না। আকস্মিক প্রস্তা কিছুটা বিভ্রান্ত হবেই। সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত একজন বলল, 'তাড়াতাড়ি, মানে কবে জানিয়ে দি ভালো হয়। আমরা আর অপেক্ষা কবতে পাবব না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—।' ফাইলটা বন্ধ ক'রে ফেললাম আমি।

ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা আমাকে এগিয়ে দিতে এলো। বলল, 'আপনাকে দেখে তো মনে হয় দাঁতে কোনো রোগ আছে ! ডাক্তার দেখিয়েছেন ?'

'ডাক্তারের কাছেই যাচ্ছি—।' গাড়ির ভিতর বসে হাসলাম আমি। 'দাঁত যে কী জিনিস হাড়ে হা টের পাচ্ছি। অফিসে আসতে আসতে ভাবছিলুম, বিপ্লবের আগে কী ভাগ্যিস কমরেড লেনিনের দাঁ ব্যথা হয়নি !'

লেনিনের নাম শুনে লোকটা খুশি হলো। সুযোগ বুঝে রওনা হলাম আমি। হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। আশাতীতভাবে মিটিংটা শেষ হওয়ায় একটু আগেই এসে পড়েছি চেম্বারে তখনো কিছু লোক—একপাশে এক যুবতী বধূ, ঈষৎ গ্রাম্য চেহারা, মাফলারে গাল মাথা ঢে ঝিমুচ্ছে। আমি ছাড়াও আরো অনেকেই যে একই সময় দাঁত নিয়ে ভুগছে, হঠাৎ এই তথ্যটি আবিষ্কা করে আমার মধ্যে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। অতি সাধারণ এইসব মানুষ ; সত্যি বলতে এরকম সাধারণ হয়ে যাবার কোনো বাসনা আমার নেই। বিরক্ত হয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিলা তাড়াহুড়োয় পড়া হয়নি সকালে। কর্পোরেশন আর কাম্বোডিয়ার পর সবচেয়ে বড়ো খবর ট্রেড ইউনিয় নিয়ে—নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় একটা সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ওই খবরের নিচে এক কারখা মালিকের ওপর হামলার খবর। ঘুরে ফিরে কয়েকটা শব্দই ব্যবহার হচ্ছে : বুর্জোয়া, শ্রমিকের রক্ত শ্রেণী সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ লড়াই। মানুষ বোধহয় স্পষ্টই দুটো দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, যে-কোনোদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কাগজটা রেখে দিতে দিতে হঠাৎই একটা প্রশ্ন মাথায় এলো, আমি কোন দলে আর তখনই, অসাবধানে, মাড়িতে চিড় ধ'রে গেল আমার—দাঁতের ব্যথাটা মনে হলো অসহ্য, ছড়ি পড়ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত, সর্বত্র।

হয়তো আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার দিকে তাকি থাকলাম। প্রচুর লোকজন পরস্পরকে ওলট-পালট করে হাঁটছে, ট্রাউজার্স ছাড়িয়ে যাচ্ছে ধুতিকে, ধুতি সংলগ্ন পায়জামা ; প্রত্যেকটি মুখই নির্বিকার, নিষ্ঠুর, উপলক্ষহীন, উদাসীন। যুদ্ধ আসন্ন, এদের সকল ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, তুমি কোন দলে ?

'বেশ একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছেন দেখছি !' অন্যমনস্কতার মধ্যে ডাক্তার আমার মুখে স্পুল ঠো

য় বললেন, 'ব্যথাটা কতোদিন চলছে ?'

মুখের মধ্যে স্পুল, একটা ভ্যাবলা শব্দ ক'রে আমি বললাম, 'এই তো, কাল থেকেই বেড়েছে—'

'আগে কখনো টের পাননি ?'

'না, মানে—'

মাড়ির কোণে আয়ডিন-ভেজানো তুলো ঠুসে দিতে অসম্ভব জ্বালায় বাক্‌রোধ হয়ে গেল আমার।

ডাক্তার ততোক্ষণে প্যাডের ওপর খসখস করে লিখতে শুরু করেছেন। লিখতে লিখতেই বললেন, মপ্লেসেন্সির জন্যেই আপনাদের যতো গণ্ডগোল। আরো আগে আসা উচিত ছিল আপনার। যা খছি, দাঁতগুলো তুলে ফেলতে না হয়।'

'বলেন কি !' আঁতকে উঠলাম আমি।

'হবেই যে তা বলছি না।' প্রফেসানাল গলায় বললেন ডাক্তার, 'তবে সব জিনিসেরই ক্ষয় আছে ! রোগকে চাপা দিয়ে রাখতে নেই, একবার চেপে ধরলে সহজে ছাড়ে না। যাক, একটা ইঞ্জেকশন খে দিলুম, আজ থেকেই শুরু করে দিন। ব্যথা কমলে যা হোক করা যাবে।'

আমি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমার চোখের সামনে কয়েকটা পুরনো এক টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ডল দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগল—এই মুহূর্তে সে-ই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আর, যুদ্ধ শুরু হবার াগেই বুঝতে পারলাম, আমি হেরে যাচ্ছি।

ডাক্তারের কি ভুল হতে পারে না ? এই রকম একটা সান্ত্বনা খুঁজতে খুঁজতে আমি বাড়ি ফেরার কথা াবলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল নীলিমার মুখ—আমার স্ত্রী—আমার ব্যবহারে কাল সে অসন্তুষ্ট য়েছিল, সেই থেকে বাক্যালাপ বন্ধ। অন্য সময় হলে এটা আমার ভাবনার কারণ হতো না। এখন লো ; কারণ দাঁতের ব্যথা নিয়ে এখন আমাকে বাড়িই ফিরতে হবে। ডাক্তার গার্গল করতে বলেছেন, াঝে মাঝে নুনের পুঁটলির সেঁক, সে-সবের জন্যেও দরকার হবে নীলিমাকে। তার আগে একটা আপোস রকার।

ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করে ফেললাম। পাবলিক টেলিফোনের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ান করলাম অসীমাকে, নীলিমার ছোট, 'কী খবর তোমাদের ?'

'আপনি যে খবর নিচ্ছেন বড়ো ?' অসীমা যথারীতি শুরু করল, 'সূর্য কোনদিকে উঠল ।'

'কোথায় সূর্য !' আয়ডিনের গন্ধ ততোক্ষণে শুকিয়ে এসেছে মুখের মধ্যে , হেসে বললাম, 'কথা লতে পারছি না। এইমাত্র ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছি। দাঁতে অসম্ভব ব্যথা—'

'তাই বুঝি আমাকে মনে পড়ল ! দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলেন না, এখন আর—', অসীমা কটা পুরনো রসিকতা চালিয়ে খুশি হচ্ছে মনে হলো।

ব্যাপারটা হজম ক'রে বললাম, 'সন্ধের দিকে এসো তোমরা ? আসবে ? অনেকদিন দেখা হয় না !'

'দেখি।' অসীমা বলল, 'ওর কথা বলতে পারি না। সম্ভব হলে আমি আসব।'

মানে আসবে। এলে, যেমন তেমন করে হোক, পারিবারিক আবহাওয়ায় নীলিমার রাগ কিছুটা াডবে। আমিও তাই চাই, অন্তত এখন একটু বিশ্রাম, কিছুক্ষণের নিরাপদ স্বস্তি।

বাড়ি ফিরতেই নীলিমা বলল, 'তোমাদের এম-ডি ফোন করেছিলেন। ডাইরেক্ট লাইনে রিং করতে লেছেন—'

'কনগ্র্যাচুলেসনস।' ফোন করার পর এম-ডি বললেন, 'ভালোভাবেই ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছ ; ওরা কছুই বুঝতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দাঁতের ব্যথা—'

'ব্যথাটা সাজানো নয়। সত্যিই আমার দাঁতে—'

'ও-কে, ও-কে। সত্যি হলে তো কথাই নেই। তুমি এখন কিছুদিন অফিসে এসো না। তাহলেই স্যুটা পেছিয়ে দেওয়া যাবে।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে নীলিমাকে বললাম, 'ব্যথাটা খারাপ। ডাক্তার বলছে হয়তো দাঁতগুলো তুলে ফলতে হতে পারে।'

চুপচাপ আমাকে দেখল নীলিমা, যেন সন্দেহ নিরসন করতে চাইছে। চোখমুখের ভাব অন্যরকম।

দেখে মনে হলো দাঁতের ব্যথাটা নিয়ে সে আদৌ চিন্তিত নয়, বরং অন্য কিছু ভেবে যাচ্ছে। টুকিটাকি কাজ নিয়ে আমার সামনেই ক'বার ঘরবার করল। এক সময় হঠাৎই এসে বলল, 'তোমার মিসেস বায়চৌধুরী ফোন করেছিল—'

'কখন !'

'অফিসে না পেয়ে বাড়িতে ফোন, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না !' নীলিমা বলল, 'তোমার মচ্ছব বাইরেই রেখে এসো। আর—', অল্প থেমে, 'আমাকে যদি পছন্দ না হয় পরিষ্কার ব'লে দিও। আমি নিজের ব্যবস্থা করতে পারব।'

আমাব মুখে একটা জবাব এসে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠতে সামলে নিয়ে বললাম, 'ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। নীনা আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি একটা গর্দভ নই, ও-রকম ন্যাগিং মেয়েমানুষ অনেক দেখেছি। আবার ফোন করলে ব'লে দিও কথা বলা সম্ভব নয়। আমি খুব ক্লান্ত—'

'সাধু, সব সাধু !' নীলিমা বলল, 'তোমার দাঁতগুলো যেন সত্যিই পড়ে যায়।'

পরের দিন খুব দুর্ভোগের মধ্যে কাটল। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, ওপরে ও নিচে, গোটা মাড়ি জুড়ে এমনই ভয়াবহভাবে ক্যাভিটি ফর্ম করেছে যে সীল ক'রে ওসব গর্ত বোজানো যাবে না। 'অসুবিধে কি !' ডাক্তার বললেন, 'ইউনিফর্ম নয় ব'লে কতো সুস্থ লোক বিনা প্রয়োজনে আসল দাঁত ফেলে নকল দাঁত পরছে—আর, মশাই, আপনার তো রীতিমতো দরকার। তা ছাড়া একবার বাঁধিয়ে ফেললে কে আর বুঝতে পারছে ! এখন শুধুই দাঁতে আছে, দু'দিন বাদে চোখ যাবে, লিভার নষ্ট হবে, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত—'

আমি বললাম, 'না, না। তুলে দিন।'

দিন কুড়ির মধ্যে আমার মুখ খালি হয়ে গেল। গাল ঝুলে পড়ল। আয়নায় তাকালেই অসম্ভব নির্বান্ধব মনে হয় নিজেকে, আশ্চর্য নির্ভার, হয়তো একেই জরাগ্রস্ত বলে। সারাক্ষণ বাড়িতে থাকি। মদ্যপানে আমার বরাবরের আসক্তি, সুস্থির হয়ে পাঁচ মিনিট একসঙ্গে বসে থাকা আমাব ধাতে সয় না। কিন্তু দাঁতের অভাবে আমি কার্যত অথর্ব হয়ে পড়লাম। অসীমা একদিন বলল, 'সত্যি জামাইবাবু, আপনাব দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না !' আমি চুপ ক'রে থাকলাম ; কারণ মুখ খুললেই আমার বয়স্ক আল্‌গা আল্‌গা উচ্চারণ তোলপাড় শুরু করবে বুকে। নীলিমা আমার যত্ন নিচ্ছে। আর নীনা, দ্যাট ফ্যাবিউলাস বীচ্, ইচ্ছে করেই ক'দিন এড়িয়ে গেলাম তাকে। বাড়িতে বসেই খবর পাচ্ছি অফিসে ম্যানেজমেন্ট এখনো টানাহেঁচড়া চালাচ্ছে—একটা লোকের অসুস্থতায় অমন ইমপর্ট্যান্ট একটা ইস্যু ঝুলে থাকতে পারে না জেনেও। তবু চলছে, কারণ লিখিতভাবে একটা চুক্তি হয়েছিল তখন—আপোসে আসা যায় কিনা দেখা, ম্যানেজমেন্টের পক্ষে আমার প্রতিনিধিত্ব ইউনিয়ন সাগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছিল।

কিন্তু, এটা কি কোনো রাস্তা ? বিছানায় শুয়ে কিংবা খবরের কাগজে চোখ রেখে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই আমি। মুখের শূন্য গহ্বর জুড়ে হাওয়া খেলে, শূন্যতা ক্রমশ অধিকার ক'রে নেয় আমাকে। আর তখনই মনে হয়, এর চেয়ে যন্ত্রণা ভালো ছিল ; যন্ত্রণা সত্ত্বেও দাঁতগুলো ছিল পরিপাটি, দাঁত নিয়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ। কিন্তু এখন ? এখন কী ! সামান্য কয়েকটি দাঁত থাকা না-থাকায় হেরফেরে কি একটা মানুষের অস্তিত্ব জুড়ে ধস্ নামতে পারে !

হয়তো পারে। ডাক্তারের চেম্বারে বাঁধানো দাঁতের সেট মুখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার এই উপলব্ধি হলো। মনে হলো আমার বয়স কমে গেছে কয়েক বছর, ক্লান্তির চিহ্নগুলো সব অদৃশ্য ; খুব বাড়াবাড়ি না হ'লে বলা যেত অবিকল সেই আমি—টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে যাকে মডেল করা হয়েছিল। অভিজ্ঞতা তাকে আরো সপ্রতিভ করেছে। সত্যি বলতে, হঠাৎ, হঠাৎই আমি যেন আমার পুরনো প্রতিভা ফিরে পেলাম।

'এই তো, চমৎকার !' আমাকে খুশি দেখে ডাক্তার বললেন, 'এগুলো নকল। কিন্তু আপনি ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারবে না—'

'জানি বলেই বুঝতে পারছি, না হ'লে—'

পুরোপুরি নিজেকে ব্যক্ত করতে পাবলাম না। আনন্দে আমাব শরীর ছটফট ক'রে উঠল। অনেক দিন নিজেকে এমন ঝরঝরে, স্বতঃস্ফূর্ত লাগেনি। এখন আমি আবার আগের মতো সহজ হতে পারি।

ডাক্তারের চেম্বার থেকেই তাড়াতাড়ি দুটো ফোন করলাম। প্রথমটা অফিসে।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম।' ডিপ্লোম্যাটিক চালে কথা বলছেন এম-ডি, 'কাল একটা এজিটেসন হয়ে গেছে। ওরা আর অপেক্ষা করতে নারাজ—'

'স্যার, আমরা অনেক সময় নিয়েছি—'

'আমি জানি, ইয়েস। কিন্তু এখন আমরাও শক্ত, হুমকি দিয়ে টাকা ওরা আদায় করতে পারবে না; কাল ওরা আমার বাড়ির দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে গেছে, স্লোগান দিয়েছে। চেয়ারম্যানেবও একই অভিজ্ঞতা। বাট হোয়াই! উই নো হাউ টু—'

কানে রিসিভার লাগিয়ে আমি চুপ ক'রে থাকলাম। কানের ভিতর অনর্গল রাগ, বিদ্বেষ ও জেদ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। কথা শেষ করার আগে এম-ডি বললেন, 'দুপুরে আমবা একটা ডিসিসন নেবো। তুমি কি সন্ধ্যায় একবার বাড়িতে আসতে পাবো?'

'হ্যাঁ, বাই অল মীনস্—'

'প্লীজ ডু কাম। দেরি করেই এসো—'

দ্বিতীয় ফোনটা করলাম নীনাকে। বিশেষ কিছু ভাবতে হলো না। নীনা স্নান করতে যাচ্ছিল, ফোনে আগেভাগে সেই কথাটা ব'লে ফেলল। তারপর স্বব বদলে, ন্যাকা গলায়, 'সকাল থেকে মনে হচ্ছিল তুমি ডাকবে, তাই বাথরুমে যেতে দেরি হয়ে গেল। তুমি এতো দেরি কবলে কেন! ডার্লিং, কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'—ইত্যাদি।

ন্যাকামি আমি পছন্দ করতে পারি না। কিন্তু, নীনার সঙ্গে আলাদা ব্যাপার। ভরাট গলায় বললাম, 'যতো শীঘ্রি সম্ভব। আজকেই আমি নতুন দাঁত পেয়েছি, ধারটা তোমার ওপরেই পরীক্ষা কবতে চাই।'

'মাই নটি চাম।' নীনা গলে গেল। 'পার্কে এসো, বিকেলে। দু'টার মধ্যেই পৌঁছে যাব আমি। কোন শাড়িটা পরব বলো তো?'

'কাম নেকেড—'

অনভ্যাসের জন্যেই সম্ভবত, মাড়িতে সুড়সুড়ি লাগছিল। ফোন ছেড়ে দিলাম।

অনেক দিন পরে নীনার সঙ্গে কথা ব'লে মোটামুটি ভালো লাগছিল। নিজেই বুঝতে পাবছি এখন আমি বেশ সহজ, অনেক বেশি সাবলীল, শরীর ও মনের কোথাও এতোটুকু আটকানো ভাব নেই। ফিরতে ফিরতে ভাবছিলুম, প্রয়োজনহীন, তবু কেমন এক একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় এর সঙ্গে ওব, যেমন নীনার সঙ্গে আমার। নীনা, অর্থাৎ মিসেস রায়চৌধুরী, বয়সে নিশ্চিত আমার চেয়ে বড়ো—নেহাত শরীরটা আঁটসাঁট আছে ব'লে চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য শরীর বা বয়েস-টয়েসেব জন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ওর সঙ্গে আলাপ চালিয়েছি আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তাগিদে; এটা জেনেই যে রায়চৌধুরীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আমার মতো একজন পুরুষকে দরকার হবে ওর। এবং যতোদিন এই প্রয়োজনটা সক্রিয় থাকবে ততোদিন অন্তত ও আমাকে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে টেনে নিয়ে যাবে। আমার জন্যে সব করবে। স্ট্যান্ডার্ড ফ্যানের সত্তর লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্টটা যে আমরা পেয়ে গেলাম—যার লভ্যাংশ নিয়েই বোনাসের গণ্ডগোল শুরু, সেও তো নীনারই দান। 'সওব', নীনা এইভাবে বলে।

আমি কি খুব বেশি ভাবছি? না হলে, আশ্চর্য, এতো অল্প সময়ের মধ্যে নতুন-পাওয়া দাঁতের কথা ভুলে গেলাম কী ক'রে! খানিক আগেও অস্বস্তি ছিল, মাড়ি জুড়ে একটা বিজাতীয় অনুভূতি—হাতের ওপর অন্য কারও নিঃসাড় হাত এসে পড়লে যেমন হয়—এ-সব আমি ভুলে ছিলাম কী ক'রে! আর, মনে পড়ল একেবারে বাড়ির দরজায় এসে, যখন হঠাৎই নীনাকে ভুলে নীলিমার কথা ভাবতে শুরু করেছি। নীলিমার সঙ্গে আমার, অর্থাৎ দাঁতগুলোর, কি আলাদা কোনো সম্পর্ক আছে! নাকি এতোকাল-ধরে যা অভ্যাস করেছি, অর্থাৎ নকল হওয়া—এই নকল দাঁতগুলোও আমার সেই স্বভাবের অংশ হয়ে গেল!

নিজেকে নিজে যতো ভালো ক'রে বুঝতে পাবি, আর কেউ তা পারে কী ক'রে! সেটা অসম্ভব, ঈশ্বর দর্শনের মতোই ভুয়া।

সুতরাং, রাত্রে এম-ডি যখন আমার সামনে তাঁর প্রস্তাব রাখলেন, চুপচাপ শুনে গেলাম আমি ; ইচ্ছে করেই চোখে আনলাম কিছুটা নেশার আমেজ, যাতে তাঁর সরল বক্তৃতায় ছেদ না পড়ে। আমি তো জানিই আমাকে কী করতে হবে এবং কতোদূর করব, কীভাবে করব। দিনে দিনে এ-সবই আমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, হচ্ছে। না হলে, আটটা থেকে ন'টা নীনার শরীরের সান্নিধ্যে থেকে সদ্য ঘুম-ভাঙা পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো ঠিক সাড়ে ন'টায় এম-ডি'র দরজায় কলিং বেল টিপতে পারতাম না।

নিরুত্তর থেকে শুনে যাচ্ছিলাম সব। অস্বস্তি বলতে এই মুহূর্তে একটিই : গলায়, জিবে, স্বাদ পাচ্ছি না কোনো। ব্ল্যাক লেবেলের তীব্র, তবল স্বাদ মুখের ভিতর কেমন পিছলে যাচ্ছে মনে হলো—পানীয়ের সঙ্গে কোথায় একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। সে কি আমার নকল দাঁতের জন্যে ! ঠিক বুঝতে পারছি না।

'তোমার কি কনসেন্সে লাগছে !. বিবেক চাপ দিচ্ছে ?' এম-ডি বলছিলেন, 'সাকসেসফুল হবার পক্ষে ওটাই প্রথম বাধা। থাকা না-থাকা সমান। ধরো তোমার দাঁতের ব্যাপারটা—আমি তো বুঝতেই পারিনি ইতিমধ্যে দাঁতগুলো বদলে ফেলেছ তুমি, ইট ইজ সো ন্যাচারাল ! বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ, তোমার সব দাঁতগুলো নকল হলেও তুমি ঠিক আগের মতনই থেকে যাচ্ছ। বরং একটা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলে—'

ভদ্রলোক বোধহয় ইউনিভার্সিটি ডিবেটে অংশ নিতেন। আর বেশিক্ষণ সময় দেওয়া উচিত হবে না। গা-ঝাড়া দিয়ে ব'লে উঠলাম, 'আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন, স্যার, আই শ্যাল অ্যাক্ট অ্যাকোর্ডিংলি। এই লোকগুলো সব সময় জবরদস্তি করতে চায়। কিছুতেই খুশি নয়, ভাবছে গায়ের জোরে আদায় করবে। কিন্তু, এই গায়ের জোর ওদের দিচ্ছে কে ! উই, যাদের ওরা বুর্জোয়া বলছে, বলছে দালাল। আই হেট, আই হেট দিজ পিপ্‌ল। আট পারসেন্টের বেশি আর এক পয়সাও ওদের দেওয়া হবে না—'

'ও-কে, ও-কে।'

উত্তেজনায় অনভ্যস্ত মাড়ি থেকে দাঁতগুলো খুলে পড়ার উপক্রম হলো।

বাড়ি ফিরে নীলিমাকে বললাম, 'জরুরি কাজে কাল সকালে বোম্বাই যাবো। স্যুটকেস গুছিয়ে দাও, দিন সাত আট থাকতে হতে পারে। আর, শোনো, আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি অসীমাদের সঙ্গে থাকো না ? অফিসে বোনাস নিয়ে গণ্ডগোল চলছে, স্টাফরা যদি বাড়ি পর্যন্ত এসে ডেমনস্ট্রেসন করে—'

'বাড়িতে আসবে কেন ! তুমি কী করেছ ?'

'কিছুই না, তবে—'

কাচের বাটিতে দু'পাটি দাঁত গুছিয়ে রাখতে রাখতে সন্দেহের চোখে আমাকে দেখল নীলিমা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দাঁত গেল, স্বভাব গেল না !'

কথাটার মানে কী, বোধগম্য হলো না আমার। অনেক সময় অনেক কথাই বলে নীলিমা, যার অর্থ খুঁজতে আমাকে তেপান্তরে ছুটতে হয়। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি। কিন্তু, এখন আমি বলতে পারব না। কথা বললেই মুখের গহ্বর জুড়ে ফাঁকা হাওয়ার দাপাদাপি শুরু হবে, শব্দগুলো বিশ্রীভাবে জড়াজড়ি করবে পরস্পরের সঙ্গে। আমি চুপ করে থাকলাম।

নীলিমা জানল না, পরদিন সকালে গাড়ি আমাকে হোটেলে তুলে নিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলেছে। হোটেলের দায়বদ্ধ জীবনে এসেই প্রথম টের পেলাম, আমি লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। আরো একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ; স্টাফরা আমাকে খুঁজছে এবং তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে আমিই ম্যানেজমেন্টের হাতের তাস। এখন আমার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই ; দু'পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক অনুভূতিহীন নিরেট দেয়াল। এটা কি ঠিক হলো? এই স্বাতন্ত্র্য হারানো—আত্মগোপন করা ? এইসব চিন্তায় অস্বস্তি বেড়ে গেল আমার। দাঁতটাও সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। যতো দিন যাচ্ছে ততোই অনুভব করছি দাঁত ও মাড়ির মাঝখানে পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত কিছু

একটা—ঠিক জানি না কী—অনবরত ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে। অস্বস্তিটা সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত ক'রে রাখে, কখনো বা বিমর্ষ ; প্রায় রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। শেষে এমন হলো যে অস্বস্তি কাটাবার জন্যে নিতান্ত খাবার সময় ছাড়া অধিকাংশ সময়েই আমি দাঁতগুলো খুলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখি ; দেখি।

ইতিমধ্যে পর পর দু'দিনে দুটো ঘটনা ঘটল। আমি চলে আসার পর নীলিমা চলে গিয়েছিল তাব বোনের বাড়ি। ঠিক তার পরের দিনই আমাদের ফ্ল্যাট আক্রান্ত হলো। দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দা ঘেঁষে আমাদের শোবার ঘরের জানলার কাঁচগুলো ভেঙে পড়ল ইঁটের আঘাতে। বাড়িব সামনে এখন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আশ্বস্ত হয়ে আমি ভাবলাম, কী ভাগ্যিস নীলিমাকে চলে যেতে বলেছিলাম !

দ্বিতীয় ঘটনাটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় ম্যানেজমেন্ট লক-আউট ঘোষণা করেছেন। খবরটা আমি কাগজে পড়াব পরই এম-ডি ফোন করলেন আমাকে। 'এটা কি ঠিক হলো, স্যার ?' এম-ডি বললেন, 'হযতো হলো না। কিন্তু আমাদের পার্সোনাল সেফ্‌টির জন্যেই করতে হলো। লোকগুলো সত্যিই এমন ক্ষেপে যাবে বুঝতে পারিনি। কাল একজন দারোয়ান স্ট্যাব্‌ড্ হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি ট্রাইবুনালে যেতে।···তোমার স্ত্রীকে কি কোনো খবর দেবার আছে ?' আমি বললাম, 'না।'

আমার স্যুইটে একটা টেলিফোন আছে। ইচ্ছে করলে এখান থেকে আমি যে-কাউকে ডাকতে পারি। প্রচুর, অফুরন্ত অবসর নিয়েই এখন আমাব যতো চিন্তা। কিন্তু কাকে ডাকব ? নীনাকে ? না, তাতে লোক জানাজানি হতে পারে। নীলিমা জানে আমি অন্যত্র গেছি, তার সঙ্গে নতুন কোনো প্রবঞ্চনা করতে ইচ্ছে করল না। বাইরে থেকেও যে হঠাৎ কেউ আমাকে ডাকবে তেমন ভরসা নেই। একা ঘরে নিজের সঙ্গী বলতে এখন আমি নিজে। একা, ভয়ঙ্কর রকমেব একা।

সেদিন রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমার স্যুইটের দেয়ালের হাল্‌কা সবুজ রঙ ক্রমশ পাল্‌টে যাচ্ছে। এক সময় সেটা সম্পূর্ণ পালটে গিয়ে ফ্যাকাশে রক্তের মতো বঙ ধরল। না, আমি ভুল করেছিলাম। রঙ নয়, ওগুলো পিঁপড়ে, কোটি কোটি বিষাক্ত পিঁপড়ে ছেয়ে গেছে চতুর্দিকে। ক্রমশ তারা আমার বিছানা ছাড়িয়ে শরীর বেয়ে উঠতে শুরু করল, ক্রমশ আমার মুখের ওপর এবং ঠোঁটে এসে জড়ো হতে লাগল। বিষাক্ত কামড়ে আমি পাশ ফিরে শুলাম। আর তখনই দেখলাম, দু'ভাগে ভাগ হয়ে পিঁপড়ের দল মেঝের ওপর দিযে আমার দু' পাটি দাঁত টেনে নিয়ে যাচ্ছে—

এই সময় ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখে না অন্য কোনো কাবণে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে ঘাম ; প্রবল ঘামে বিছানার চাদর ভিজে গেছে। বাইরে থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছিল। ভোর হয়ে গেছে, স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে স্যুইটে আলো এসে পড়ছে। ঘুমের জড়তা কাটতেই বাইরের কোলাহল, চিৎকার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম, আমি ধরা পড়ে গেছি।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে আমি বাথরুমে গেলাম, জল দিলাম চোখ মুখে। এখন আমার কী করা দরকার, কী কবলে উপদ্রুত এলাকা থেকে বেরুতে পারব—আবার প্রতিষ্ঠা করতে পারব নিজেকে, বুঝতে পারছিলাম না। ওদের প্রতিটি সবল, হিংস্র চিৎকারে আমার রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল, কম্পন শুরু হলো সর্বাঙ্গে, মনে হলো সঙ্কুচিত হয়ে আসছে আমার সমস্ত শরীর।

হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে চৈতন্য হলো। দরজা খুলে দেখি বিব্রত, কিছু বা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে ম্যানেজার দাঁড়িয়ে। 'সরি, জেন্টলম্যান। এই জনতাকে সামলানো অসম্ভব। এরই মধ্যে ওরা আমাদের রিসেপসন তছনছ করে দিয়েছে। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি, কিন্তু—,' অল্প থেমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এতো বড়ো রিস্ক আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে।'

ওরা কি এগিয়ে আসছে ? অন্তত চিৎকার শুনে তাই মনে হবে। কোনোরকমে নিজেকে সংযত ক'রে বললাম, 'আপনি ভাববেন না। ওরা সম্ভবত ভুল ক'রে আমাকে খুঁজছে —।' দাঁত না পরায় মুখ থেকে শব্দগুলো এলোমেলো হয়ে বেরুতে লাগল। বললাম, 'আমি ওদের ফেস করব।'

'আর ইউ ম্যাড !' বিব্রত ম্যানেজার আর দাঁড়ালেন না।

ঘরে ঢুকে আমি টেবিলের দিকে এগোলাম। দাঁতের পাটি দুটো পাশাপাশি সাজানো। মুখে ভরতে গিয়ে আমার হাত কাঁপতে লাগল। কোনোরকমে লাগিয়ে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে আল্‌গা হয়ে গেল—বোধহয় আমার মাড়ির মাপ ছোট হয়ে গেছে। আমি আবার চেষ্টা করলাম এবং একইরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘামতে ঘামতে ভাবতে লাগলাম, এখন কী করা উচিত, এখন কী করা উচিত !

বাঁধানো দাঁতগুলোকে বাগে আনতে ভীষণ সমস্যায় পড়লাম আমি। হয়তো ডাক্তারেব কথাই ঠিক। আমি খুব দেরি ক'রে ফেলেছি।

মাড়িয়ে যাওয়া

অফিসে বেরুতে বেশ দেরি হযে গেল অনিলের। কাজ আছে ভেবে একটু আগেই তৈরি হয়েছিল সে। খেয়েদেয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে, এমন সময় কলিং বেলের শব্দ। 'দ্যাখো তো, বোধহয কাগজঅলা।' শীলাকে বলল, 'বলে দাও রোববার আসতে।' বলতে বলতে প্রায়-নতুন শুয়েব ফিতে বাঁধল অনিল, চামড়ার ওপর আলতো বুরুশ বুলিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিল।

'কী হলো! কে?'

'সেই জমির দালাল। বলছে, নাকি রাজি হয়েছে—'

'ইস্, আর দেখা করার সময় পেল না!' অনিল একটু ভাবল। 'আচ্ছা, বসতে বলো—'

কথাবার্তা চালাতে দেবি হয়ে গেল। অফিসেব ভাবনাটা মাথায় ছিল; বিকেলে বা সন্ধ্যায আসতে ব'লে লোকটিকে কোনোরকমে বিদায করল সে। তারপব ছুটে বেরুল ঘব থেকে।

রাস্তায় বেরিয়েই অনিল টের পেল ভিড় বড়ো বেশি। এতো লোকজন, বিশেষত তাড়াব সময়ে, সে একেবারেই পছন্দ করে না। হাঁটছে, ছুটছে, কিন্তু সকলের চলাফেরাতেই কেমন একটা 'দাঁড়িযে থাকি' ভাব। এ সময়টা মর্নিং কলেজের মেয়েবা ঢিমে তালে বাড়ি ফেরে, অ্যাডভান্স বুকিংয়ের দীর্ঘ লাইন পড়ে সিনেমা হাউসের সামনে, রক থেকে উঠে-আসা ছেলেরা জামার কলাব তুলে জটলা করতে করতে মেযে দেখে। ফুটপাথের বাজারে বেচাকেনা তো আছেই। এ-সবই অনিলেব চক্ষুশূল। এখন তার ছোটাব কথা; কিন্তু এমনই এলোমেলো ভিড় যে সে দ্রুত হাঁটতে পর্যন্ত পাবছে না।

ভিতর থেকে চটপট একটা রাগ উঠে এলো মাথায়। আর পাঁচ সাত মিনিটেব মধ্যে বাসে উঠতে না পারলে সময়মতো অফিসে পৌঁছুনো অসম্ভব। ঠিক দশটায় তাদের পাঁচজনেব ম্যানেজিং ডিরেক্টরেব ঘরে ঢোকার কথা; হার্ডশিপ অ্যালাউন্স নিযে কথা হবে। উদ্বেগ অবশ্য হার্ডশিপ নিয়ে নয; অনিল ভাবছিল, এই প্রথম হয়তো সে এম-ডির সঙ্গে কথা বলতে পারবে। মুখচেনা থাকার সুবিধে অনেক। সুযোগ পেলে এরপর সে কি আর একা-একাই দেখা করতে পারবে না!

ইত্যাদি চিন্তায় ব্যস্ত অনিল ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখল চাকা ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে আসছে পাঁচ নম্বর—একটু জোরে হাঁটলে বাসটা স্টপে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে চট কবে উঠে পড়তে পারবে সে। বলতে গেলে এখান থেকেই বাসটা এক্সপ্রেস-এর স্পিডে ছুটবে। আর মিনিট কুড়ি। পৌঁছে যাবেই।

হাঁটতে গিয়ে ছুটতে শুরু করল অনিল। ঠিক এই সময়—বাস ও তার মধ্যে দূরত্ব যখন ন্যূনতম, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে বাসের হ্যান্ডেল—সেই শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ কানে এলো।

'উঃ, বাবা গো!'

'কী হলো! দেখি—'

'ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিল—'

লাফিয়ে উঠতে গিয়েও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল অনিল। ছ'সাত বছরের একটি শিশু তর্জনী উঁচু করে আছে তার দিকে। কোমর থেকে ওপরের শরীর হেলে পড়েছে মাটির দিকে, ক্ষতিগ্রস্ত ভাঙাচোবা মুখ; টলটলে দুটি চোখ ভরে উঠেছে জলে। শিশুটির পাশের ভদ্রলোক প্রায উবু হয়ে বসে পড়েছে ফুটপাথে। সম্ভবত ওই লোকটিই শিশুটির বাবা।

'ইস্, রক্ত বেরুচ্ছে যে!'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকেব সঙ্গে চোখাচোখি হলো অনিলেব। এক কানে এই কথা, অন্য কানে

বাসের ঘন্টি ও হতবুদ্ধি ভিড়ের শব্দ, সুতরাং অনিল আর দাঁড়াল না। এ-বাসটি তার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কোনোমতেই এটা মিস কবা যায না।

বাসটা সম্ভবত অনিলের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ডান পা-টা কোনোরকমে ফুটবোর্ডে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল।

এক পা ফুটবোর্ডে, এক হাতে হ্যান্ডেল ধরা ; অনিল তাকিয়ে থাকল পিছনের দিকে। এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেখানে। অন্তত আবো একটা স্টপ পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পিছনের দৃশ্য পবিষ্কাব লেগে থাকল তার চোখে। যতোদূর বোঝা যায়, ছোটখাটো একটা ভিড় এখন জমে উঠেছে সেখানে, কারণ আশপাশের অন্য জায়গাগুলো খালি লাগছে। একটি শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট কান্নাও কি ভেসে আসছে দূর থেকে ! এতো শব্দ চারিদিকে, এতো ভিড যে এ-সবের মধ্যে ঠিক বেহালায় ছড টানার মতো নিঃসঙ্গ কোনো সুর ধরা পড়ছে না। কোন হাত তুলেছিল শিশুটি—বাঁ হাত, না ডান হাত ? যে-হাতই হোক, অনিল অনুভব করল তার বুকের ঠিক মধ্যিখানে শ্বেতির মতো একটা দাগ ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। বেশ অস্বস্তি বোধ করল অনিল। বাস-ভর্তি মানুষের গায়ের ঘাম ও ব্যস্ততার মিশ্র গন্ধ ছাপিয়ে শিশু রক্তের কাঁচা গন্ধে নাক ভরে গেল তার। পরের স্টপে বাস পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর—কী মশাই, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন ! অনিল সাধারণত এ-সব মন্তব্য হজম করে না। আজ চুপ করে থাকল। গা-ঠেসাঠেসি ভিড ও গুঁতোগুঁতিব মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে-যেতে সে ঠিক বুঝতে পারল না, এতো তাড়াহুড়ো করে অফিসে যাওয়া সত্যিই তাব পক্ষে জরুরি ছিল কিনা।

বাঁ পা-টা কিছুক্ষণ থেকেই ভাবী লাগছিল। বাস থেকে নেমে হাঁটতে গিয়ে টের পেল ডান পাযেব সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। জুতোটা প্রায় নতুন হলেও ফোস্কা পডার দিন পেরিযে এসেছে, এখন আর মশমশ শব্দ হয় না। গোড়ালিব ওপরে অনেকটা পর্যন্ত নাইলনের মোজায ঢাকা। সে-জন্যে নয়। এমনও হতে পারে, সোল-এর নিচে কিছু একটা আঁটকে গেছে, পাতা-কুটো বা গোবরেব চাঙ—এ-বকম প্রায়ই হয়। ফুটপাথের একদিকে স'রে গিয়ে ঝুঁকে বাঁ পায়ের জুতোর সোলটা দেখে নিল অনিল। না, কিছু নেই। শুধু সামনের দিকে কতকটা জায়গায় ভিজে গিরিমাটির মতো কিছু লেগে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। অনিল এগিয়ে গেল। ঠিক মাটিই তো !

ঠিক দশটায় পাঁচজন যাবে এম-ডি'র কাছে ডেপুটেসনে। অনিলের দেরি হয়ে গেল।

'একটা দিনও মশাই ঠিক সময়ে আসতে পারেন না !'

কথাটা সত্যি নয়। অনিল প্রায় রোজই ঠিক সময়ে আসে। এ-সব ব্যাপাবে সে অত্যন্ত ডিসিপ্লিনড ও রুটিন-নির্ভর, কাজকর্মে চটপটে ও দায়িত্ববান। সে জানে, দক্ষতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নিজেব স্বার্থ, না হলে চাকরি করে এই বাজারে সে দু কাঠা জমি কেনার কথা ভাবতে পারত না। হোক না বারুইপুরে—কলকাতা থেকে দূরে, নিজের জমি তো !

গলা শুনেই অনিলের ধারণা হলো ইউনিয়নের সেক্রেটারি জ্যোতি দাশ তাকে সহ্য করতে পারে না। জ্যোতির ইচ্ছে ছিল না অনিলও যায় ডেপুটেসনে। কাজ হাসিল করতে বেশ কায়দা করতে হয়েছে তাকে। অনিল প্রায়ই লোকটির ওপর প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবে। আজ জোর পেল না। সঙ্কুচিতভাবে বলল, 'একটু পার্সোনাল কাজে আঁটকে পড়েছিলাম—'

'সে তো বুঝতেই পারছি। অতো পার্সোনাল কাজ থাকলে সকলের ইন্টারেস্ট দেখা যায় না।'

পঞ্চম ব্যক্তি হয়ে এম-ডির ঘরে ঢুকল অনিল, অন্যদের পিছনে পিছনে। বসতে বলে এম-ডি প্রথমেই ঘড়ি দেখলেন। 'সরি স্যার', জ্যোতি বলল, 'আমরা একটু দেরি করে ফেলেছি !' বলে অনিলের দিকে তাকাল। অনিল তখনই ডুবে গেল; বাঁ পা নিয়ে কিছুক্ষণ ধরেই অস্বস্তিতে ভুগছে সে। যতোবার পা রাখছে মাটিতে, ততোবারই মনে হচ্ছে কার্পেটটা অসমান। ভুল হলো, তখনই ফুটপাথের কানায় জুতো ঘ'ষে মাটি তুলে ফেলা উচিত ছিল। ও গুলো মাটিই তো ! তখন ঠিক দেখেছিল তো ! পরবর্তী কী একটা কথায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর উষ্মা প্রকাশ করতেই মাথার ভিতর গুলিয়ে গেল সব কিছু। শিশুহাতের একটা তর্জনী উঠে এলো বুকের কাছে— ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিল ! আকস্মিক

শীতে জমে গেল অনিল। ওই লোকটা মানে কোন লোকটা ? শিশু, তুমি কি ঠিক জানো, যার দিকে তর্জনী উদ্যত করেছ, তোমার অভিযোগ ঠিক তার প্রতিই ? ওই ভিড ও ব্যস্ততার মধ্যে অতোখানি নির্দিষ্ট হওয়া কি ভালো।

'কাজের মধ্যে শুধু পা ঝাড়া !' বেবিয়ে এসে প্রকাশ্যে বিবক্ত হলো জ্যোতি, 'এ-সব মিটিংয়ে কেন আসতে চান বলুন তো ! এর চেয়ে শিবদাসকে নিলে কাজ হতো । আবগু কবতে পারে—দু'চাবটে কথা বলতে পারে—'

অনিলের হঠাৎ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো এম-ডি কী বললেন ? অ্যালাউন্স পাওয়া যাচ্ছে তো ? তবু চেপে গেল, প্রকাশ্যে খিস্তিও তেমন নাড়াতে পাবল না। এ-সমস্তই তাকে নিয়ে। বস্তুত, সে কিছুই শোনেনি। তার যাওয়া উচিত হয়নি। এমনও হতে পারে, তাব অমন নিশ্চেষ্ট বসে থাকাটা এম-ডিও ভালো চোখে দেখেননি।

অনিল খুব দমে গেল। যে-জন্যে এতো তাড়াহুড়ো কবে আসা সেটাই ব্যর্থ হলো, মাঝখান থেকে সহকর্মীদের কাছে কিঞ্চিৎ অপ্রিয় হতে হলো তাকে।

এমন হবে ভাবা যাযনি। কথাবার্তা সে বেশ গুছিয়েই বলতে পাবে, প্রযোজনে ইংবিজিতেও। জ্যোতি দাশের আপত্তি সত্ত্বেও তাবক, ভবানীরা তাই তাব নাম সাজেস্ট কবেছিল। গত জানুয়ারিতে স্টোর্স সেকসনের তপন মুখার্জিকে নিযে একটা ঝামেলা হয—প্রাযই কামাই কবত ছেলেটা, অসুখে ভুগত। ওকে ছাঁটাই করার কথা উঠতেই হই-চই পড়ে গেল অফিসে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাব জিজ্ঞেস করেছিল, 'এতো লোকের অসুখ হয় না, ওরই বা হয় কেন !' প্রশ্নটায সকলেই হকচকিয়ে যায। অনিল বলেছিল, 'আপনার যদি হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অন্য লোকেবও কি হবে স্যাব ! দিস ইজ অ্যাবসার্ড।' অফিসার আর কিছু বলতে পারেনি। দু'মাসেব স্পেশাল লিভ নিযে তপনকে ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে বলা হলো। তখন থেকেই ওরা অনিলকে সমীহ করতে শুরু করে।

ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে ঘুবতে থাকল মাথায়। ড্রয়ার থেকে বাফ প্যাড বেব করে হিজিবিজি ছবি আঁকতে শুরু করল অনিল। এটা তার অভ্যাস। তবু সহজ হতে পারল না। বস্তুত, তার বাগ হচ্ছিল নিজের পায়ের ওপর—বাঁ পা-টা ক্রমাগত অস্বস্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এ-রকম কখনো হয় না। অথচ ব্যাপারটাই এমন যে কাউকে বলা যাবে না শুধুমাত্র এই কারণেই এম-ডি'র সামনে সে সুবিধে করতে পারেনি। নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে থাকতে সেই একই বকম অনুভূতি ফিরে এলো তাব মনে—'ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিল—'

অস্বস্তিতে আশপাশে তাকাল অনিল। খুশি খুশি মুখগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ডেপুটেসন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সেটাই ছিল মূল বিষয় ; সম্ভবত সেইজন্যেই তার ব্যর্থতা নিয়ে আপাতত কেউ তেমন মাথা ঘামাবে না। ব্যাপারটা এইরকমভাবেও ভাবা যায়—সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে একটু পিছিযে পড়েছে, অন্যরা এগিয়ে গেছে একটু। ডেপুটেসনে যাবার মতলব না থাকলে সেও ওদের সঙ্গে এগুতো। আর কিছু না হোক, সে-ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে হতো না ; হযতো—হয়তো কেন, নিশ্চিত, শিশুটির পা মাড়িয়ে দেওযার দায় থেকে অব্যাহতি পেত সে।

হঠাৎ ভাবনায় হাড় পাঁজরায় শীত ঢুকে গেল অনিলের। বাঁ পায়ে জোব দিয়ে উঠে দাঁডাল সে, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মনে হচ্ছে মোজার আড়ালে কুলকুল কবে ঘামছে বাঁ পায়ের চেটোটা—চটচটে কী একটা লেগে আছে পায়ের তলায়। অনিল ভাবল, জুতো মোজা খুলে একবার পরীক্ষা করে নেয়। জুত পেল না। উল্টোদিকেব সারিতে তিন-চারটে সীট বাদ দিয়ে রতন হাজরা বসে, অনিলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল অল্প। রতনের বয়স কম, খেলার জন্যে এ অফিসে চাকবি পেয়েছিল।

পা-টা টেবিলের তলা থেকে টেনে রতনের দিকে এগিয়ে গেল অনিল।

'সিগারেট খাবে নাকি একটা ?'

রতন মাথা নাড়ল।

'জানেন তো, খাই না। আজ আবার খেলা আছে—'

প্যাকেট বের করে অনিল নিজে একটা ধরিয়ে নিল।

'এরিয়ান্সের সঙ্গে, না ?'

'হ্যাঁ।'

ধোঁয়া গিলতে যতোটা সময় লাগে তার মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল অনিল। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

'তুমি তো ফুটবল খেলো। বুট পায়ে যদি কারুর পা মাড়িয়ে দাও, খুব কি লাগে ?'

'খেলতে গেলে একটু-আধটু লাগেই। অতো আর কে ভাবছে !'

'সে-কথা বলছি না।' সোজাসুজি রতনের মুখের দিকে তাকাল অনিল। পরের কথাটা গুছিয়ে নিল। 'ধরো যদি খালি পা হয় ? আমি জুতোসুদ্ধ পায়ের ওয়েট জানতে চাইছি—'

রতন হাসল। ঈষৎ ভুরুও কোঁচকালো।

'কী ব্যাপার বলুন তো ! হঠাৎ এ-সব জানতে চাইছেন ?'

'আস্তে, আস্তে—।' বিব্রত গলায় বলল অনিল, 'এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

আর এগুলো না। রতন তখনো তাকিয়ে আছে দেখে মুখে হাসি টেনে অনিল বলল, 'বড়ো টীমের সঙ্গে খেলা থাকলে বোলো, একদিন তোমার খেলা দেখতে যাব।'

সীটে ফিরে ডান পা দিয়ে বাঁ পা-টা মাড়িয়ে ধরল অনিল। কোনো যন্ত্রণাই টের পেল না। তখন ভাবল, খালি পা হলেই বা এমন আর কি লাগত ! ইনস্ট্যান্ট প্রেসার অনেক সময়ই আঁচড় কাটে না। ছোটবেলায় সরস্বতী ভাসান দিতে যাবার সময় রিকশার চাকা গড়িয়ে গিয়েছিল তার পায়ের ওপর দিয়ে—খুব কি লেগেছিল ! একটু চিনচিন করেছিল মাত্র।

আজ সে যখন বাস ধরবার জন্যে ছুটতে শুরু করে, তখন সে একা ছিল না—ওই সময় কম করেও বিশজনকে ডিঙিয়ে যায় সে। এদের কাউকে কাউকে ধাক্কা দিয়েছিল ; এদের কেউই শিশু নয়। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে পড়ে গেলে সে নিশ্চয়ই সাবধান হতো, গতি কমাতো বা এমনভাবে এড়িয়ে যেত যাতে বাচ্চাটার চোট না লাগে। ছেলেটিকে সে দেখতে পায় গলার স্বর শুনে এবং পিছনে তাকিয়ে। এমনও হতে পারে মুখোমুখি দাঁড়ানোর ফলেই শিশুটির হাত উঠে আসে তার দিকে। আর কেউ তাকালে যে তাকাত তার দিকেই উঠত। শিশুটি নিশ্চয়ই আগে থেকেই তার প্রতি লক্ষ রাখেনি !

এইভাবে ঘটনাগুলো সাজিয়ে নিল অনিল। নিজেকেও।

একটু আশ্বস্ত হলেও তার পরের অনেকটা সময় সে কোনো কাজ করতে পারল না। কাগজে হিজিবিজি কাটল, নানারকম মুখ আঁকল—শীলার মুখ, আট বছরের ছেলে সেন্টুর হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে—এ-রকম একটা ছবিও এঁকে ফেলল। চারটে নাগাদ তার মনে হলো জ্বর আসছে ; মুখের ভিতর জিভটা জল নেঙড়ানো গরম তুলোর মতো ঘন হয়ে উঠছে ক্রমশ। খানিক শান্তভাবে বসে থেকে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে উঠে পড়ল সে। ক্লান্ত ও অস্বস্তিকর পা টেনে-টেনে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে তারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'উঠবে নাকি ? আমি চলে যাচ্ছি—'

'এতো তাড়াতাড়ি !'

'শরীর ভালো নেই। জ্বর আসছে—'

তারক ওর কব্জিটা ধরে তাপ দেখল। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সকালে এমন হলো, এখন আবার জ্বর !'

'যাবে তো চলো।'

তারক একটু ভাবল। তারপর বড়ো লেজারটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'চলো।'

বেশ কিছুটা সময় চুপচাপ হাঁটল দু'জনে। ছুটির পর সাধারণত তারা বাসে ওঠে। আজ নিজেই ট্রাম স্টপের দিকে এগিয়ে গেল অনিল। অপেক্ষা করতে করতে তারককে বলল, 'সকালে একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম। মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেছে।'

'কী-রকম ?'

ঘটনাটা বর্ণনা কবাব আগে অনিল একটু সময নিল। শিশুটিব তর্জনীর দিকে তাকিয়ে যেমন হয়েছিল, সেইবকম কাঠ-কাঠ হয়ে এলো শরীর।

'বাসে উঠতে গিয়ে একটা লোক একটা বাচ্চার পা মাড়িয়ে দিল। বাচ্চাটার বোধ হয় খুবই লেগেছে। বক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল—'

'বলো কি! ইস! কতো বড়ো বাচ্চা?'

'কতো আর! পাঁচ ছ' বছরের হবে। লোকটা দাঁড়ায়নি, বোধহয় বুঝতে পারেনি। বাসে উঠেই চলে গেল।'

এই পর্যন্ত বলে একটা নিঃশ্বাস চাপল অনিল এবং তারক কী বলে শোনার জন্যে স্নায়ুগুলো একাগ্র কবে আনল। একটা ট্রাম আসছিল। অনিলের মনে হলো ট্রামটাকে পুবোপুবি দেখতে পাচ্ছে না। ঝাপ্সা মতো—শুধু চাকার বিচিত্র ধাতব গুরগুর শব্দটা কানে আসছে। আবো কাছে আসতে সে ট্রামটাকে লাইনচ্যুত হতে দেখল। তারকেব হাতটা খপ করে মুঠোয় ধরে বলল, 'এটা নয়, পবেবটা—'

'সংসারে এমন কিছু বদ লোক থাকে, যাদের প্রাণে মাযাদযা থাকে না।'

'কার কথা বলছ?'

'তুমিই তো বললে! লোকটা দাঁডাল না পর্যন্ত! আচ্ছা হারামজাদা তো!'

মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল অনিল। এখন তার সতর্ক হওযা দবকাব। তাবককে লক্ষ করতে করতে বলল, 'তুমি কি ঠিক বলছ? লোকটা ইচ্ছে করে মাডাযনি। এমনও হতে পাবে ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারেনি। তার দোষ কী!'

'বাখো রাখো। এ-সব লোকদের দু'দশ ঘা দিলেই সব বুঝতে পাবে।'

অনিল ঘামতে শুরু করল। মনে হলো তার শবীরের ভিতর ক্রমাগত উত্থান-পতন চলছে জ্বরের, দপদপ করছে রগের শিরাগুলো এবং বাঁ পা-টা মাটি থেকে অনেক ওপবে ও হাঁটু থেকে বেশ নিচে আলগা হয়ে ঝুলে আছে। ট্রামের জন্যে তারক এগিয়ে গেলে ওর আড়ালে দু'বাব পা ঠুকে নিল অনিল।

মূল ব্যাপারটা তাবক নিশ্চিত বুঝতে পারেনি। বাস্তার দিকে তাকিযে অন্যমনস্ক অনিল সেই শিশুটি ও তাব বাবাব মুখ মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রকৃত কোনো আদল ধরা পড়ল না। এতে সে খানিকটা হাল্কা বোধ করল—যাদের মুর্খ তার মনে নেই, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারাও কি অনিলের মুখ মনে রাখবে? অসুবিধে, যে-পাড়ায় সে থাকে এবং যেখান থেকে বাসে ওঠে, সেখানে অনেকেই তাকে চেনে। তারা কি ঘটনাটা লক্ষ করেছিল?

ট্রাম থেকে নেমে পুনরায় ঘটনাস্থল মাড়িয়ে গেল অনিল। এখন ভিড নেই, জায়গাটা খুব নোংরা হয়ে আছে। ফুটপাথে বিকেল ছড়ানো। দাডিঅলা একটা লোক ধনেশ পাখির বিদঘুটে ঠোঁটের চারিদিকে রকমাবি শিশি সাজিয়ে বসেছে, তার কোলেব কাছে হল্দে ছোপ-লাগা মড়ার খুলি। খুব সতর্ক হয়ে জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল অনিল। সিগারেটের দোকানের লোকটির সঙ্গে এই সময় তাব চোখাচোখি হলো। পকেটে সিগারেট ছিল, তবু কী ভেবে অনিল একটা সিগারেট চাইল—আগুন ধরাবার ছুতোয় দাঁড়িয়ে থাকল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময়। তেমন কিছু ঘটে থাকলে এই লোকটি নিশ্চয়ই তার সাক্ষী থাকবে। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল, বাঁ পায়ের মতো ডান পায়েও কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। সম্ভবত জ্বরের কারণে। শরীর রসস্থ হ'লে এমনিতেই পায়ের জোর কমে আসে।

বাড়িতে ঢোকার আগে সিগারেটটা ফেলে দিল অনিল। দরজা খুলল ঝি। অনিল তার পিছনে সেন্টুকে দেখল এবং শীলাকে খুঁজল।

'মা রুটি কিনতে গেছে।' গায়ে-গায়ে লেগে এলো সেন্টু, 'তুমি এতো তাড়াতাড়ি এলে কেন?'

'শরীরটা ভালো নেই—'

ঘরে ঢুকে খুব মনস্কভাবে ছেলের দিকে তাকাল অনিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এখন সে পুরোপুরি জ্বর অনুভব করতে পারছে, উত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে কানে, নিঃশ্বাসও গরম। আত্মহত্যা বা খুন

কবা—দুটোব কোনোটাই এখন তাব পক্ষে অসম্ভব নয়।

বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থেকে ছেলেকে কাছে টানল অনিল। কাঁধদুটো ধরল। আড়চোখে সেন্টুর পাযের দিকে তাকিয়ে জুতোসুদ্ধ পা-টা তুলে দিল ওর নরম আঙুলের ওপর, 'স্কুলে আজ কী কী হলো বলো?' তারপর আস্তে থেকে জোরে চাপ দিতে থাকল।

কথা বলার জন্যে ঠোঁট খুলেছিল সেন্টু। অনিল দেখল প্রথমে হতচকিত, তারপর হঠাৎই শরীর দুমড়ে চিৎকার করে উঠল সেন্টু, 'উ-উ, লাগছে, লাগছে—'

একটুক্ষণ ছেলের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আর্ত গলায় অনিল বলল, 'খুব লেগেছে, বাবা! আমি দেখতে পাইনি—'

একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু

সেবার শীতে অনেকেরই ঘরবাড়ি গেল পুড়ে। ঘরবাড়ি বলতে চালা আর খাপরা। কিন্তু পোড়ায় তো আগুনই! সর্বভুক সে, ছোট থেকে বড়ো হয়ে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতে সময় নেয় না। তখন হা-কপাল করে যতোই মাথা চাপড়াও সে আর ফিরিয়ে দেবে না।

আগুন নিবে যাবার পর কথাটা বলল মহিম।

লোকে ডাকে, লেংড়া মহিম। খোঁড়ার চলায় ছাঁদ নেই কোনো, বাঁধন নেই মুখেও। যেটুকু বলে সবই গুছিয়ে, যত্ন করে। লোকে প্রশংসা করে তার কথার; কিন্তু শোনে যে কতোটুকু তা বলা মুশকিল।

আগুনের আবির্ভাব প্রথম টের পেয়েছিল মহিম। ধোপাদের ছেলে, বাপ-ঠাকুরদার রুজিতে মন টেকেনি। ছোটবেলা থেকেই ভোর-ভোর উঠে চলে যেত গঙ্গার ঘাটে, বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনে। ঘাটে স্নান সেরে পুণ্যার্থীরা উঠে আসে একে-একে, ফোঁটা কাটে কপালে। সে-জন্যে ব্যবস্থা করে রাখে নেবী ঠাকুর, ফোঁটা প্রতি পাঁচ পয়সা। ঠাকুর বসে জলচৌকির ওপর। বামুন মানুষ, ছোঁযাচ সহ্য হয় না সকলের। কিন্তু ধোপাদের খোঁড়া ছেলেটির উপস্থিতি ভুলে যায় বেমালুম। মহিম তার সাকরেদি করে, কখনো চন্দন বাটে, কখনো তুলসীপাতা ধুয়ে আনে গঙ্গা জলে।

শীতে লোকের ভক্তি যায় কমে, শুকনো নদীর জল স্থির হয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। ফোঁটা কাটার ভিড় হয় না তেমন। তখনই কাজ বাড়ে মহিমের। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘাট পর্যন্ত নেমে গিয়ে পুণ্যার্থী ধরে আনে নেবী ঠাকুরের জলচৌকির সামনে। ঠাকুরের না হলে তারই বা কিছু হবে কেমন করে! এই ভাবেই বছর দশেক বয়স থেকে গোটা যুবকালটা কাটিয়ে দিল মহিম।

ইতিমধ্যে বাপটা মরে গেল কলেরায়। পিঠোপিঠি একটা ভাই ছিল। বাপ-ঠাকুবদার পেশায় তারও জুত হয়নি তেমন—বয়স থাকতেই ভিড়ে গিয়েছিল ওয়াগন ব্রেকারদের দলে। এ খবরটা সকলে জানত না! মদ-গাঁজা খেত বলে মহিমের এই ভাইটির নাম হযেছিল গেঁজা। একদিন জি-আর-পি'র একটি লোক খুন হতে ডেরা থেকে পুলিশ ধরে নিযে গেল তাকে। সেই যে শহর ছেড়ে চলে গেল গেঁজা, আব ফিরল না। শোনা গেল দ্বীপান্তর হয়েছে তার। তখন একটু বেশি দিনের সাজা হলেই লোকে দ্বীপান্তবে পাঠাত।

বাপ, ভাই গেলে থাকল শুধু মা। মহিমকে বাগ মানাতে না পেরে কিছুদিন নিজেই ধোপাগিরি কবল সে। রোজ সন্ধেয় দেখা যেত তিনটি গাধার পিঠে কাচা কাপড় তুলে ঢিকুতে ঢিকুতে ডেরায় ফিরছে মহিমের মা। খাপরার চালার নিচে কুপি জ্বালিয়ে সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত ইস্ত্রি করছে কাপড়। ঘরেব বাইরে রাস্তার গা-ঘেঁষে বালতি-উনুনের গনগনে আঁচে গরম হচ্ছে লোহার ইস্ত্রি। আর বাত একটু বেশি হলেই চেঁচিয়ে, প্রায় অভ্যাসে ডাক পাড়ছে, 'মহিম, এ মহিম! আরে তোবা ঘর নেহি ছে কী!'

কে কানে তোলে সে-কথা! ঘর কি সত্যিই আছে মহিমের! দ্যাখো গিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে হরপার্বতীর ছবি আঁকছে কি না!

এক বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছর ঘরের বাইরে খাটিয়ায় ঘুমুতো মহিম। ঘরটা ছেড়ে দিত তার ক্রমশ বুড়ী-হয়ে-যাওয়া মাকে। মহিমের আশপাশে ছড়িয়ে থাকত তিনটি গাধা। হেগেমুতে একাকার হতো তারা। সে-জন্যে মহিম বা গাধাগুলির ব্যস্ততা ছিল না কোনো। এমনিতেই নির্বিকার গাধাগুলির কিছু-কিছু গুণও ছিল। অন্ধকারে ভোরের গন্ধ পেলেই ঘুম-কাতুরে মহিমকে জাগানোর জন্যে সমস্বরে ডাক পাড়ত তারা— হেঁক্কো, হেঁক্কো, হেঁক্কো। দেখত ঠিক-ঠিক ঘুম ভাঙছে কিনা মহিমের। খাটিয়ায় জেগে উঠে বসে সদ্য শুরু হওয়া পাখির কূজন শুনত মহিম। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শব্দ করত

মুখে—ব্যোম্। এর পর সে চলে যাবে ঘাটের দিকে। ফিরবে সেই সন্ধে পেরিয়ে, রাতে। এ-সব গাধাগুলিও জানত। মহিমের পরিবারের পাঁচটি প্রাণীর মধ্যে এক অলিখিত শান্তি ছিল।

দারোগা-পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে সাপে কাটল মহিমের মাকে। মহিম যখন টের পেল তখন মরে গেছে বুড়ী। শ্মশানে মাকে জ্বালিয়ে এসে সারারাত খাটিয়ায় বসে ঘুনঘুন করে কাঁদল মহিম—'এ মাঈ, মাঈ-গে' বলে। বড়ো করুণ সেই স্বর, যে শোনে তারই বুক ফাটে। কান্না শুনে লোক জড়ো হতে লাগল। কাছেপিঠের বস্তির লোকেরা ছিল, তারা এলো। বস্তির গা-ঘেঁষে নতুন বাড়ি তুলেছেন উকিলবাবু, তিনিও এলেন। প্রত্যূষের আলোয় মানুষের সমবেদনায় ভরে উঠল মহিম। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে উকিলবাবু বললেন, 'রোনেসে মা লোট আয়ে গী ? চুপ রহ্, চুপ রহ্।' তা শুনে দ্বিগুণ কান্না জুড়ে দিল মহিম। রকম-সকম দেখে মনে হলো বাপ-ভাই গেছে যাক, মা যে কোনোদিন মরবে এটা সে বিশ্বাস করেনি। মহিমের শোকে তিনটি গাধাও চোখের জল ফেলল। আঁচলে বাসন-ধোয়া হাত মুছতে মুছতে বস্তির মেয়ে শকুন্তলা বলল, 'যার কিছুই নেই তার ওপরেই ভগবানের যতো নজর !'

সবাই যে সমবেদনা জানাতে এসেছিল তা নয়। বুড়ী ছিল জোগাড়ে। সেই সুবাদে ধোয়া-কাচা করতে বিস্তর কাপড় জড়ো হয়েছিল ঘরে। কাচা না-কাচা সেই শাড়ি, জামা, ধুতি, পাতলুনের বিলি-ব্যবস্থা লোকেই করে নিল যে যার মতো করে। সারাদিন ঘরের বাইরে খাটিয়ায় বসে বাবুদেব কাপড় বাছাই লক্ষ করল মহিম।

সন্ধেয় ভিড় কমে যেতে ঘরে ঢুকল।

পাকা দেয়ালের ওপর খাপরার চাল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কম নয়। মহিমের বাপ সুন্দর এটা তৈরি করেছিল। এতোদিন কাপড় ঠাসা থাকায় বোঝা যায়নি ; সকালে খালি ঘরের পিছন দিকের জানলাটা খুলে দিতেই আলোয়, হাওয়ায়, রোদ্দুরে ঠেসে গেল ঘরটা। সেই আলোয় ঘরভর্তি নানা ছবির ওপর চোখ পড়ল মহিমের। কালী আছে, গঙ্গামাঈ আছে, হনুমানজী আছে, আছে সুরাইয়া আর নুরজাহানের ছবি। রঙিন কাগজে ছাপা একটা মেমসাহেবের ছবি চোখে পড়ল—পা খোলা, টান-টান চেহারা। মহিম অবশ্য কার ছবি চিনত না। প্রায়-ন্যাংটো মেমসাহেবের ছবি দেখেই সুন্দর ওটা ঘরে টাঙিয়েছিল।

মহিমের ভাবনায় পাপ নেই। মেয়েমানুষের ছবিগুলো সরিয়ে দিয়ে সেখানে টাঙালো ঠাকুর-দেবতার ছবি। ধূপধুনো জ্বালল। তিন দিন কামাই করে ঘাটে গেল মাথা মুড়াতে। নেবী ঠাকুরকে বলল, 'ঘর খালি হয়েছে ঠাকুর, ওখানে একটা মন্দির কবব। ভালো দেখে একটা শিবলিঙ্গ কিনে প্রতিষ্ঠা করে দাও।'

ঠাকুর শুনে থ। এতোদিনে তার খেয়াল হলো মহিম ধোপার বাচ্চা ; জাত-পৈতের বালাই নেই। জিব কেটে বলল, 'আরে তু পাগলা হো গিয়া ক্যা ! ইয়ে সব ধান্দা ছোড় দে—'

বলল আরো কথা। সে-সবই মহিমের ইচ্ছেয় জল ঢালার জন্যে।

মহিম তবু দমল না। ইদানীং যেতে-আসতে উকিলবাবু দুটো চারটে কথা বলতেন তার সঙ্গে, হাসতেন। উকিলবাবুর হাবভাব দেখে মহিমের মনে হয়েছিল বাবুর প্রাণে দয়া আছে, তাকে ভালোবাসেন একটু-আধটু। রবিবার সকালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে উকিলবাবুর দরজায় ধর্না দিল।

মক্কেলদের নিয়ে সদরে বৈঠক করছিলেন উকিলবাবু। মহিমকে দেখেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

'কী রে লেংড়া, কী হলো ?'

খোঁড়া ডান পায়ের হাঁটুটা ডান হাতে চেপে রেখেছে মহিম। বাঁ হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'কিছু টাকা দিন, বাবু। মন্দির হবে—'

'মন্দির ! কোথায় ?' কপালে চোখ তোলেন আর কি ! সামলে নিয়ে বললেন, 'লেংড়া, তুই পাগল হয়ে গেছিস নাকি ?'

কথাটা গায়ে মাখল না মহিম। আগে আগে লেংড়া বললে কষ্ট হতো তার, এখন ওটাই হয়ে গেছে ডাক নাম। হাত তুলে নিজের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

'দিন না, বাবু ! খেটে শোধ করে দেবো !'

'আরে ছিয়া ছিয়া ! ধোবীর ছেলে মন্দির !' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেলেন উকিলবাবু।

মহিম বুঝল না এটা ঠিক প্রত্যাখ্যান কি না, সে চলে যাবে কি না। তখনই উকিলবাবুকে ফিরে আসতে দেখে ভরসা হলো। আঠারো, বিশটা বছর ঘাটে চন্দন বেটেছে সে, তুলসীপাতা ধুয়ে এনেছে গঙ্গাজলে। তাতে কি দোষ হয়েছিল! ভাবল বুঝিয়ে বলবে।

অতশত শোনার সময় নেই উকিলবাবুর। সরাসরি কথাটা পাড়লেন এবার।

'টাকা চাস দেবো। শ-দুশোতেও আপত্তি নেই। ঘরটা আমাকে ছেড়ে দে, লেংড়া।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মহিম বলল, 'সে কি, বাবু! বাপের ঘর আমার; ছেড়ে দেবো! থাকব কোথায়?'

'সে-ব্যবস্থা করে দেবো। গ্যারাজটা খালি আছে, থাকিস ওখানে। জমিটা তো তোর বাপের ছিল না—'

শেষের কথাটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মহিম। চন্দনবাটা মাথায় বিষয়-বুদ্ধি খেলে না তেমন, তবু প্রস্তাবটা যে প্যাঁচালো তা বুঝতে দেরি হলো না। মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল দূরে।

উকিলবাবু বললেন, 'সময় নে, ভাব। ধোবীখানা গেছে, কিছু তো করতে হবে!'

একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মহিম। কী কথায় এসে গেল কোন কথা—বলেছিল মন্দির বানাবে, তার বদলে এলো ঘর ছাড়ার কথা! না, ঘর সে ছাড়বে না। তার বাপের জমি না হলে কার জমি! এ-ঘরেই জন্ম হয়েছিল তার, বাপ মরেছে এ-ঘরে, এখান থেকেই শ্মশানে নিয়ে গেছে মাকে। নয় বললেই হলো!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারা বেলা ঘরের মধ্যে ধূপধুনো জ্বেলে শুয়ে কাটালো মহিম। ঘাটে গেল না। গাধাগুলোর এখন আর কাজ নেই কোনো। অভ্যাস থেকে তবু রোজ সকালে দাবোগা-পুকুরের দিকে হেঁটে যায় তারা, ফেরে সন্ধে পেরিয়ে। অন্ধকারে খাটিয়ায় বসে দেখতে পায় মহিম, বহুদূব থেকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে তিনটি মন্থর জীব—পায়ে গতি নেই কোনো, ভাষা নেই মুখে। দীর্ঘ দিনেব অভ্যাসে চালিত হয় তারা। ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ, ঝিমোয়।

বর্ষার দিনেও বৃষ্টি পড়ে না তেমন। রাতে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে শরীর। ঘুম আসে না চোখে। হঠাৎ দ্যাখে ধাঙড় বস্তির ডাকসাইটে মেয়ে শকুন্তলা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। অন্যমনস্কতাব মধ্যে কখন যে সে এলো টেরই পায়নি।

'কী রে, লেংড়া, একা বসে আছিস?'

'তো কী করব!' অনিচ্ছেয় জবাব দিল মহিম, 'বহুত গবম—'

'হ্যাঁ। তা গরমে গরম হবে না!' খাটিয়ার কোণে বসে পড়ল শকুন্তলা, 'অন্ধকারে তোকে ওই গাধাগুলোর মতো লাগছিল—'

'তা হবে—'

একটু সরে বসল মহিম। মেয়েমানুষের গন্ধ লাগছে নাকে। কী মতলবে এসেছে বোঝা যায় না। তবে এটুকু বুঝল, মতলব আছে। যে-সে মেয়ে নয় শকুন্তলা। এককালে গেঁজার সঙ্গে মেলামেশা ছিল। গেঁজার অন্তর্ধানের পর একটা রিকশাওলাকে বিয়ে করে, একটা বাচ্চাও হয়েছিল। কিছুদিন হলো কলেরায় মরে গেছে দুটোই। শকুন্তলার শরীর, স্বাস্থ্য, ঠাটঠমকে ভাঁটা পড়েনি এতোটুকু। এখন বাবুদের বাড়ি ঠিকে খাটে। আর ভিতর-বাড়ির কেচ্ছা ছড়িয়ে দিয়ে আসে বস্তি পর্যন্ত।

'এ মহিম, তুই ধোবীখানা খুলছিস না কেন আবার?' চুপ করে থাকতে দেখে শকুন্তলা বলল, 'এতোদিনের ব্যবসা ছেড়ে দিবি?'

'ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না—'

'তো তুই খাটিয়ায় বসে থাকিস, পুজোপাঠ করিস। কাজ আমি করব।'

'তা কী করে হয়—!' খোঁড়া পায়ে মশা বসেছিল, মহিম একটা চাপড় মারল।

'কেন, তুই আমাকে শাদি করে নে! বাচ্চা পয়দা কর! আমার জওয়ানি আছে, তোরও তো দরকার!'

কথাটা আশা করেনি মহিম। অবাক হয়ে তাকাল শকুন্তলার দিকে। গরমে জামা পরেনি গায়ে, এখন মনে হচ্ছে এ-সব বলবে বলেই পরে আসেনি। জ্যোৎস্না ফিনিক দিচ্ছে শরীরে। মহিম তাকাতেই

আঁচলটা এমুড়ো-ওমুড়ো করে ঘাম মুছল গলার। গন্ধটা তীব্র হয়ে লাগল নাকে।

মহিম বলল, 'আমার মন খারাপ। তুই ভাগ এখান থেকে—শাদি-ফাদি আমি করব না। ও-সব মতলব আর করবি না।'

'ও রে লেংড়া, খুব রোয়াবি হয়েছে তোর! তুই না করলে অন্য লোকে করবে। সবাই তোর মতো লেংড়া নাকি!'

রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল শকুন্তলা। কিন্তু, আবার এলো দিন দুই বাদ দিয়ে। সেই রাতের অন্ধকারে। এবার গলা অনেক নরম।

শাদি না করিস, থাকতে দে ওই ঘরে। তোর সব কাজ করে দেবো, ঘর পাহারা দেবো। শোয়াবসা করিস আমার সঙ্গে। লেংড়া তো কী, পুরুষ মানুষ তো! শরীরে গরম নেই তোর?'

মহিমের ঘর জুড়ে দেবদেবীর ছবি। সকাল সন্ধে ধূপ জ্বেলে আনতে চায় একটা পবিত্রতার আভাস। পুরনো ময়লা কাপড়ের ভ্যাপসা দুর্গন্ধ যা ছিল ধুয়েমুছে গেছে এতোদিনে। এখনো তার চোখে লেগে আছে মন্দিরের স্বপ্ন। শুরু করবে ছোট করে, একটু বাড়-বাড়ন্ত হলে চুড়ো তুলবে মাথায়—ঘাটের শিবমন্দিরের আদলে। ও ঘর কি মেয়েমানুষ তোলার জন্যে! শকুন্তলার শরীরে মাংস আছে ঢের, মনটাই নেই। থাকলে পবিত্রতার আভাস পেত।

রাগ দেখিয়ে মহিম বলল, 'তুই ওই গাধীর চেয়েও খারাপ। ওটাও মেয়েমানুষ, কিন্তু তোর মতো মতলববাজ নয়!'

একে খোঁড়া, তায় গোঁজার্ ভাই বলে নিজের সুখ-সুবিধের ভাবনা ছাড়াও মহিমের প্রতি একটু আলাদা টান ছিল শকুন্তলার। সেই মহিমের মুখে এই কথা! অপমানে কাঁই হয়ে পাল্টা দিল শকুন্তলা।

'বটে! এই কথা! আরে লেংড়া, ওই গাধীর সঙ্গেই শাদি কর তাহ'লে—'

বলতে বলতে সেই যে চ'লে গেল, সাতদিন আর মুখ দেখাল না। মহিম ভাবল, আ-হা, তিনকূলে কেউ নেই বলেই বোধ হয় এতো মতলব এঁটেছিল। এভাবে বিদায় করা ঠিক হলো না। কাছে রাখলে মেয়েমানুষটা হয়তো সত্যিই তার দেখভাল করত।

মন গেল মুষড়ে। ঘরে বসে, ঘর পাহারা দিতে দিতে শরীরও কাহিল হতে লাগল ক্রমশ। উকিলবাবু একদিন লোক পাঠিয়ে ডাকলেন। মহিম জানত দরকারটা কী হতে পারে। কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল।

'কী রে লেংড়া, কী করবি ঘরটার?'

'মন্দির বানাবো বাবু।'

'মন্দির বানাবি! ধোবীর বাচ্চা তুই, লোক খেপিয়ে লাভ কি!'

মহিম নিচু হলো না। বিনয় বজায় রেখেই বলল, 'পুজো তো আর নিজে করব না বাবু, পূজারী করবে। লোকে বলবে কেন! ধাঙড় বস্তিতে মা কালীর মন্দির নেই!'

'হুঁ!' গম্ভীর হয়ে গেলেন উকিলবাবু, 'পাঁচশো টাকা দিতাম। ঘরটা ছেড়ে দিলে ভালো করতিস। ও জমি তোর বাপ ঠাকুরদার নয়, জবর দখল করেছিল। তোর কাছে দলিল আছে· কোনো?'

নেই। মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেল মহিমের। লক্ষ করে উকিলবাবু বললেন, 'ছেড়ে দিলে ভালো করতিস। অন্য কেউ নিলে কানাকড়িও দেবে না।'

বুকে জোর এনে মহিম বলল, 'গরীবের একটা চালাঘর, কেন নেবেন বাবু আপনারা!'

'ঠিক আছে, যা এখন—'

আশঙ্কায় অন্যমনস্ক হতে লাগল মহিম। জমিটা কার জানে না, কিন্তু ঘরটা তার বাপের। ত্রিশ বছর কেউ অন্য কথা বলেনি। আজ বলছে। কিন্তু বললেই সে ছেড়ে দেবে কেন! ভগবান ভরসা, তার মনে পাপ নেই কোনো। ভগবানই বাঁচাবে। এই ভেবে আট আনা দিয়ে একটা পাথরের শিব কিনে এনে মেঝেয় পুঁতে রাখল মহিম। পুরো একদিন উপোস করে ভগবানকে বলল, 'তোমার ঘর তুমিই পাহারা দাও, ভগবান। আমি চললাম পেটের ধান্ধায়।'

নতুন সাকরেদ রেখেছে নেবী ঠাকুর। মহিম প্রায়ই ডুব মারে, তাকে দিয়ে কাজ চলছিল না। পুরো

দুটো দিন মন্দিরের সিঁড়িতে বেকার বসে থাকল মহিম। খোঁড়া মানুষ মুটে-মজুরি করতে পারবে না, রিক্‌শা চালাতে পারবে না। তাহলে পেট চলবে কী করে।

অনেক ভেবে-চিন্তে উপায় বের করল একটা। পয়সা খরচ করে পোয়াটাক জল আঁটে এমন মাটির কলস কিনল কুড়িটা। তাতে গঙ্গাজল ভরে মুখ চাপা দিল মাটি দিয়ে। গলায় সুতো বাঁধল, যাতে আঙুলে তুলে নেওয়া যায়। সেগুলো নিয়ে এলো মন্দিবের চাতালে। চক দিয়ে আঁকল বড়ো এক শিবমূর্তি—তাঁর হাতে ত্রিশূল, মাথায় ফণা তুলেছে সাপ। ছবির নিচে সাজিয়ে রাখল কলসগুলি। পুজো দিতে এসে লোকে সেগুলো কিনতে লাগল নির্দ্বিধায়।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিকিয়ে গেল সব। পরের দিন বিক্রি হলো আরো কিছু বেশি। মহিম ভাবল, তাব প্রার্থনা মিথ্যে হয়নি। এ-সবই দিচ্ছেন ভগবান। অল্পস্বল্প কিছু খেয়ে রোজই আট আনা এক টাকা আনতে লাগল ঘরে।

দেরিতে-আসা বর্ষা চলল অনেকদিন ধরে। বান ডাকল গঙ্গায়। ঘাট ছাড়িয়ে জল উঠে এলো রাস্তা পর্যন্ত। ভেসে যাওয়ার ভয়ে কেউ আর জলে নামে না। পর পর ক'দিন ঘাটে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে এলো মহিম। হাত পড়ল জমা টাকায়। সে আর কতোই বা! এভাবে চলবে না বেশি দিন। ভেবে-চিন্তে আবার উকিলবাবুর দরজায় ধর্না দিল সে।

'দশ-বিশটা টাকা দিন, বাবু। যা বর্ষা, পেট চলছে না।'

'ভালো পরামর্শ দিলে তো শুনবি না!' সাদাসিদে গলায় বললেন উকিলবাবু, 'ঘরটা ছেড়ে দিলেই পারতিস!'

মহিম জবাব দিল না। দশটা টাকা হাতে দিয়ে উকিলবাবু বললেন, 'পুবনো চাল, খাপরা ফুটো হয়েছে। আর দু'চারদিন বর্ষা চললেই ভেঙে পডবে। আমার ঘবে ঘরামি কাজ করছে, বলিস তো ছেয়ে দিক।'

'আপনি কেন খাটাবেন, বাবু!' কাঁচুমাচু হয়ে বলল মহিম, 'কাঁচা বাঁশের ভারা দিয়েছিল আমার বাপ, সহজে পডবে না। বর্ষা আব ক'দিন!'

টাকাটা ফেরত চাইলেন না উকিলবাবু। খানিক অপ্রত্যয়ে চেয়ে থেকে বললেন, 'লেংড়া তো নয়, উকিলের বুদ্ধি! তুই গড়বি মন্দির! যা ভাগ! আর আসবি না এদিকে।'

মুঠোর ভিতর গলে গেল দশ টাকার নোটটা। দশ দিনও গেল না।

গুড়হাট্টা পুলের ওদিকে বাসস্ট্যান্ড। সকাল-সন্ধে সারাক্ষণ দেওঘর, দুমকা, জসিডি, রাঁচিব বাস ছাড়ে। ভাডা গাড়িতে ঘি আর সিল্‌কের গাঁটরি পার করে আড়তদাররা। একে-ওকে ধরে, গাড়ি ধোয়ামোছা করে ক'দিন পেট চালালো মহিম। ভোর-ভোর চলে যায় বাসীমুখে, ফেরে সন্ধে পেরিয়ে। কালসিটে-পড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে খাটিয়ায়। গাধাগুলো ঝিমোয়, নাক ঘষে ধুলোয়, পিছনের পা তুলে লাথি ছোঁড়ে অকারণ। কলেরায় মরা শব নিয়ে 'রাম রাম' হাঁকতে হাঁকতে শ্মশানের দিকে চলে যায় মানুষেরা। নাকের সামনে ভনভন করে মশার ঝাঁক। জলমাটি গাধার নাদির গন্ধে থিকথিক করে হাওয়া। মহিম বুঝতে পারে খিদে মোচড় দিচ্ছে পেটে—মাটির নিচে ক্রমশ মলিন হয়ে যাচ্ছে পাথরের শিব। বড়ো একলা লাগে নিজেকে। মনে পড়ে মাকে, গেঁজাকে, বাপ সুন্দরের ঘাড়ের আবটিকে, আর নেবী ঠাকুরকে। শকুন্তলা আজকাল লরি-ড্রাইভার কালুর সঙ্গে থাকছে। কী অদ্ভুত শরীরী ক্ষুধা মানুষের! পেটের ভিতর খলবল করে শূন্য হাওয়া। ভাবে শরীরের কষ্ট বড়ো কষ্ট, মনটাকে দুর্বল করে দেয়।

একদিন রাতে আবার ফিরে এলো শকুন্তলা। কোমরের কষি থেকে পরোটা আব মেঠাই বের ক'রে বলল, 'নে লেংড়া, খেয়ে নে।'

'মেঠাই কোথায় পেলি?

'নাগরমলদের বাড়ি শাদি ছিল, ফেলে দিচ্ছিল। নিয়ে এলাম তোর জন্যে।' একটা মেঠাই নিজের মুখে পুরে প্রাণপণে চোয়াল নাড়তে লাগল শকুন্তলা, 'শালাদের বড়ো রোয়াব! একটা শাড়ি চাইলাম, দিল না।'

মহিম হাসল। পরিতৃপ্তির হাসি।

'কাল রাতে তুই কাঁদছিলি কেন ?'

'শুনেছিস তুই ! লেংড়ার কান আছে !' রঙ্গ করার ধরনে বলল শকুন্তলা, 'কালু শালা জানোয়ার একটা। খুব পিটেছে। পিটতে পিটতে রাস্তায় বের করে দিল। আমাকে রাণ্ডি বলল—'

'তো আর কী বলবে !' মহিম বলল, 'তুই রান্ডি, তোর শরীর জুঠা। তুই পাপী।'

'ঔরতের শরীর জুঠা হবে না তো কি তোর হবে !' নির্বিকার গলায় বলল শকুন্তলা, 'তুই শালা নিমকহারাম ! তোর মেঠাই নিয়ে এলাম, এখন রান্ডি বলছিস !'

কথাটায় বিলক্ষণ মজা পেল মহিম। খালি পেটের হাসিতে হিল্লোল জাগল শরীরে। হাসতে হাসতেই বলল, 'তুই রান্ডি তো কি ! মন্দির হোক, তোকে আমি দেওদাসী করে নেবো—'

'মাঈ গে মাঈ !' গালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'তুই আজব আদমি, মহিম ! খানা জোটে না, তুই বানাবি মন্দির ! ভগবান তোকে সত্যিই পাগল বানিয়ে ছাড়ল !'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মহিম। হয়তো ঠিকই বলেছে শকুন্তলা। হয়তো পাগলই হয়ে গেছে সে। আকাশের দিকে চোখ তুলে ভাবল, তুমি কি বলো !

বর্ষা ছাড়তেই টান ধরে হাওয়ায়। হুড়মুড় করে এসে পড়ে শীত। জল সরে গিয়ে ঘাটে-মাঠে থিকথিক করে পাঁক। সিকি মাইল পাঁক পেরিয়ে কেউ আর স্নানের ঝুঁকি নেয় না। দাম বাড়ে আনাজপাতির। মানত আর শ্রাদ্ধের কাজ ছাড়া আর কেউই মন্দিরমুখো হয় না।

ঘাটের কাছে মহিমকে ঘুরঘুর করতে দেখে অনেকদিন পরে সস্নেহে ডেকে নিল নেবী ঠাকুর। কাছে বসিয়ে বলল, 'দিনকাল খারাপ হলো। লোকে পেটের চিন্তা করবে, না পুজোপাঠ করবে !'

মহিম ঘাড় নাড়ে, 'সে তো ঠিক কথা।'

নেবী ঠাকুর বলে, 'মুলুক চলে যাবো। ছেলে চিঠি দিয়েছে। এখানে চালিশ বছর হলো—।'

জবাব না দিয়ে ভাষাহীন চোখ তুলে তাকাল মহিম। বয়স খুঁজল ঠাকুরের পাকা ভুরুর তলায়। ঠাকুরের মুলুক আছে, সে কোথায় যাবে ? ফিনফিনে একটা ব্যথা পাশ কাটিয়ে গেল বুকে। কাজকর্ম নেই, এখন শুধু ভাবনা আর খিদে। দুটোই চলে সমানে। পাশাপাশি।

শীতের হাওয়ায় খড়ি ওঠে গায়ে। সন্ধের মুখে কাছারি-ফেরত উকিলবাবু কী ভেবে গাড়ি থামায় মহিমের সামনে এসে।

'কী রে লেংড়া, খবর কী ?'

'ভালো, বাবু।'

খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মহিম। উকিলবাবু বললেন, 'কী হলো গোঁসা করে ! দেশে ফসল নেই। লোকে ঘরবাড়ি বেচে দিচ্ছে জলের দামে। তখন দিলি না। এখন আর দাম পাবি না।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মহিম। জীবনে একবার রেগে উঠতে ইচ্ছে করে। তবু সামলে নেয় নিজেকে।

'ঘর আমি বেচব না, বাবু।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—'

উকিলবাবু আর দাঁড়ালেন না। বুকের নিচে পর্যন্ত মবিলের গন্ধ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল মহিম। যতোক্ষণ ঘরটা আছে, আশা আছে। ঘর গেলে খোঁড়া মহিম কানা হয়ে যাবে। চোখে পড়ে গাধাগুলো। মাদীটার পেট ফুলেছে। মনে হয় গাভীন। সুন্দর বেঁচে থাকলে গায়ে হাত বোলাতো এ-সময়। গাধার বাচ্চা ধোপার ভাগ্য ফেরায়। মহিম ধোপা নয়। তবু, আস্তে উঠে গিয়ে মূক প্রাণীটার গায়ে আদরের হাত রাখে সে। জলে ঢিল পড়ার মতো থিরথির করে কেঁপে ওঠে শরীর—লম্বা কান দুটো খাড়া করে মহিমের বুকের কাছে মাথা নিয়ে আসে মাদীটা। মহিম ঠিক বুঝতে পারে না এগুলো এখনো থেকে গেছে কেন ! অন্ধকারে গাধাগুলোর উপস্থিতি ছমছমে ভয় ধরিয়ে দেয় বুকে। চারজনকে নিয়ে পরিবার ছিল সুন্দরের। সংখ্যাটা ভাঙেনি এখনো।

স্বপ্নের মতো বিষয়টা গেঁথে যায় মাথায়। রাতে ঘুমের মধ্যে বিচরণ করে গাধাগুলো—দারোগা

পুকুরের দিক থেকে হু-হু করে ছুটে আসে উত্তুরে হাওয়া। কাঁচা বাঁশের ভিতর তাদের আনাগোনা শব্দ তোলে মট্-মট্-মট্॥ এতো শীতেও গরমের তাপ লাগে মহিমের, হাঁসফাঁস করে শরীর। অস্বস্তির ভিতর কানে আসে গাধাগুলির চিৎকার—হেঁক্কো, হেঁক্কো, হেঁক্কো। ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখতে পায় মহিম, শিবের জটা থেকে নেমে এসেছে অজস্র সাপের ফণা, লকলকে জিব মেলে ছুটে আসছে তার দিকে। একটুক্ষণ থম মেরে থাকে সে। তারপরেই বুঝতে পারে, আগুন লেগেছে ঘরের চালে। স্বপ্ন থেকে খোঁড়া পা হিঁচড়ে বেরিয়ে আসে সে। চিৎকার করে পরিত্রাহি গলায়—'আগ, আগ লগি গেলে—জাগো—আগ—আগ—'

তার একার নয়। পাশাপাশি পুড়ছে কয়েকটা চালা, উত্তুরে হাওয়ার তাড়ায় তেজী ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে আগুন। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সম্মোহিত বোধ করে সে। অসহায়ভাবে শীতল হয়ে আসে হাত-পা।

চারিদিকে হুড়োহুড়ি, চিৎকার। বস্তি ভেঙে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে মানুষ। আলোয়-অন্ধকারে তাদের বীভৎস মুখগুলি বড়োই করুণ লাগে মহিমের। কেঁদেকেটে লাভ নেই, জনে জনে ডেকে বলতে চায় সে—মাটির নিচে পুড়ছে স্বয়ং ভগবান। কে শুনবে! কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না কোনো।

আজও উকিলবাবু এসে হাত রাখেন তার কাঁধে। মহিম হাসে। চুপচাপ। ভাবে একটা দুশ্চিন্তা গেল। পেটের ভিতর গুরগুর করে ওঠে আগুনের জিবগুলো। অনেকক্ষণ পরে সে শুধু বলে, 'ঘর তো আগুনই পোড়ায়, বাব!'

গন্ধের আবির্ভাব

বিকেলের চা-টা শেষ ক'রে সবে সিগারেট ধরিয়েছে পরিমল, ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল।

অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সলিল সরকার, এবারে ইউনিয়ন ইলেকসনে জিতে কিছু একটা হয়েছে। পরিমল চেনে। ভালোভাবে না তাকিয়েই সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার ?'

একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে সলিল সরকার বলল, 'পড়ে দেখুন। কিছু হেল্‌প্ করতে হবে—'

ছ'টি শব্দের মধ্যে একমাত্র হেল্‌প্ কথাটিই কানে ঢুকল পরিমলের ; উচ্চারিত হবার পর শব্দতরঙ্গ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই বাকি কথাগুলো ভুলে গেল। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল অল্প। অন্য সময় হ'লে ভ্রূক্ষেপ করত না। কিন্তু, বিরক্ত হ'লেও ঐ 'হেল্‌প্' কথাটিই কাগজটির প্রতি টেনে নিল তাকে।

নতুন কিছু নয়। গ্রাম থেকে শহরে আসা একজন শরণার্থী ; হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল অসুস্থা স্ত্রীকে, রাস্তাতেই মারা গেছে। সৎকারের জন্যে কিছু সাহায্য চায়।

ছ'সাত লাইনের আবেদনের নিচে সাহায্যকারীদের নাম ও দানের অঙ্ক। যতো দ্রুত সম্ভব নাম ও ফিগারগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে পরিমল বুঝতে পারল, দাতাদের মধ্যে সকলেই পদমর্যাদায় তার নিচে এবং সর্বোচ্চ দানের পরিমাণ, এ-পর্যন্ত, এক টাকা। দেখল, এক টাকা দিয়েছে শুধু সলিল সবকার, তার পরের অঙ্কটি পঁচাত্তর পয়সা। অর্থাৎ কিছু দিতে হ'লে এখন এক টাকার বেশিই দিতে হবে তাকে সেক্‌সনের ইনচার্জ সে, অফিসার বিশেষ ; না হ'লে প্রেস্টিজ থাকে না।

পরিমলের পকেটে আছে ছ'টাকা এবং কিছু খুচরো পয়সা। বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে যে-পরিমাণ অর্থকে কোনো ভদ্রলোকের পকেটে থাকা সে ন্যূনতম ও আবশ্যিক মনে করে, তার বেশি নেই। এর থেকে দুটো টাকা দিয়ে দিলে যা থাকবে তা যথেষ্ট নয়। যদি কোনো কারণে ট্রাম-বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং নিরুপদ্রবে ট্যাক্সিতে ফেরার কথা ভাবতে হয় তাকে, তাহ'লে এ-টাকায় কুলোবে না।

মুহূর্তের মধ্যেই এ-সব ভেবে নিল পরিমল। তারপর বিরক্ত হয়ে দুটো টাকা বের ক'রে সলিল সরকারের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'এভাবে আর কতোদিন চলবে ?'

'কেন স্যার ! রোজই কি দিতে হচ্ছে আপনাকে ?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে পরিমল বলল, 'যতো সাহায্যপ্রার্থী সব এই অফিসেই আসে কেন বলুন তো ?'

সলিল সরকার তখন পরিমলের নামের পাশে দানের অঙ্ক বসাচ্ছে। একটু থেমে বলল, 'দু' টাকা দিচ্ছেন কেন ! অসুবিধে হ'লে একটা টাকাই দিন। আমরা জোর করছি না তো !'

অফিসার হবার পর থেকে 'আমরা' কথাটাকে ভয় পায় পরিমল ; তার টেবিল ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে পড়ে ছায়ামূর্তিরা—ক্রমশ চেপে ধরে তাকে। ঠিক কেন বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় সীটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের দোষেই হয়েছে এটা। চেয়ার ও টেবিল দুটোকেই ঘুরিয়ে একদিন সে দেয়ালমুখী ক'রে নেবে ; চোখগুলি তখন তার কপালে না প'ড়ে, পড়বে পিছনে। আপাতত সলিলকে বিদায় করার জন্যে সে বলল, 'না, না, দু'টাকাই দিলাম।' এবং ভেবে আশ্বস্ত হলো, 'রাখুন' না ব'লে সে 'দিলাম'ই বলেছে। স্বস্তি থেকে আবার সিগারেটটা মুখে দিল সে।

সলিল সরকার বলল, 'সিগারেট খেয়ে উড়িয়ে দিতেন টাকাটা, সে-জায়গায় একটা গরীব লোকের উপকার করলেন।'

ছেলেটি নিরাপদ দূরত্বে চ'লে যেতে কঠিন হয়ে-ওঠা চোয়াল দুটো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিল

পরিমল। চায়ের পর সিগারেট খাওয়াটা তার নিয়মিত অভ্যাস। এখন তেমন জুত না লাগায় দু টান দিয়ে গুঁজে দিল অ্যাশট্রের ভিতর। খাপছাড়া একটা অনুভূতি ছড়িয়ে গেল শরীরে। দূরে, একেবারে লাস্ট রোয়ে, নিখিল দাসের টেবিলের কাছে সলিল সরকারকে ঘিরে জটলা করছে তিন চারজন ; হয়তো এই মুহূর্তে তাদের আলোচনার বিষয় সে-ই, কিংবা তার কথাগুলো। ওরা বুঝবে না—, চিন্তাটা অসম্পূর্ণ রেখে পরিমল তার মাথার পিছনে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অভ্যাসবশত হাতটা নিয়ে গেল।

পরিমলের বয়স চুয়াল্লিশ। স্বাস্থ্য ভালো, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, মাথার পিছনে অল্প একটু জায়গা জুড়ে টাক পড়তে শুরু করেছে। এক নজরে তাকিয়ে যে-কেউই বুঝবে সে একটু পরিপাটি থাকতে ভালোবাসে। সাধারণ কেরাণী থেকে সেক্সন-ইনচার্জ হবার পথে মানুষ যে-সব গুণ ও ঔজ্জ্বল্য আস্তে আস্তে বিসর্জন দেয়, তার অনেকগুলিই এখনো সযত্নে ধ'রে রেখেছে পরিমল। তার নানা অভ্যাসের একটি—সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই কখনো সে টেবিলের ওপব রাখে না , যখন প্রযোজন হয় পকেট থেকে বের ক'রে আবার ভ'বে রাখে পকেটে। নিজের বদান্যতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগই সে নেয় না। পরিবর্তে নিজেও কারুর কাছে হাত পাতে না কখনো। এই ক্রমশ-দুর্দিনের বাজারেও মাসিক সাতশো তেষট্টি টাকা মাইনে থেকে একটি-দু'টি টাকা মাসের শেষ দিনেও সে নিয়ে আসতে পাবে অফিসে। এ-অফিসে তার বাইশ বছরের চাকরি। এর মধ্যে, স্পষ্ট মনে পড়ে, মাত্র দু'বার লোন নিয়েছিল। প্রথম, বাবার মৃত্যুর পর। দ্বিতীয়বার বোনের বিয়ে উপলক্ষে। মুখ ফুটে কেউ চাইলে কিছু কিছু ধারও যে দেয়নি তা নয়। সাধারণত এ ধরনের মানুষ কথাবার্তাও বলে ভেবেচিন্তে। একটু বুদ্ধি থাকলেই সলিল সরকার বুঝত, পরিমলের ব্যবহৃত তিনটি বাক্যেই কিছু-না-কিছু যুক্তি ছিল।

পরিচ্ছন্নভাবে কামানো গালটা দেড়টা-দুটো পর্যন্ত নিখুঁত ও মোলায়েম থাকে, বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ হতে শুরু করে আবার। মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে এখন গালে হাত বুলিয়ে সেই কর্কশতা অনুভব করল পরিমল। টেবিলের এক কোণে একটা ধূপের প্যাকেট পড়েছিল, সেটা অবহেলায় তুলে ফেলে দিল বাতিল কাগজের ঝুড়িতে। একটা সিগারেট ধবাতে ইচ্ছে করলেও এখন সে ছোঁবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছুটি হবে অফিসের, তখন হেঁটে ট্রাম স্টপের দিকে যেতে যেতে দিনেব সপ্তম সিগারেটটি মুখে দেওয়া যেতে পারে। তাব আগে নয়। অস্বস্তি ও অভাববোধ থেকে বিরক্তি বাড়ে বাড়ুক ; পরিমল ঠিক করল, আজ আর সে ধর্মচ্যুত হবে না। সকাল থেকেই যা শুরু হয়েছে।

হঠাৎ কী মনে পড়ায় বাঁ হাতের কাছে ইন্টারকমটা তুলে নিল সে। একটা নাম্বার ডায়াল ক'বে চাপা গলায় বলল, 'গিরিজাদা, আমি পরিমল—'

ওপাশের জবাব শুনে ভুরু কোঁচকালো অল্প। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'টাকাটা দেবেন আজ ?'

তারপর কী শুনে বলল, 'ও'। টেলিফোন রেখে দিল। রুমাল বের ক'রে চাপ দিয়ে মুখটা মুছে নিল একবার। এবং ভাবল, আজও পাওয়া গেল না টাকাটা।

গত মাসে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিলেন গিরিজাবাবু। মাইনে পেয়েই শোধ ক'রে দেবার কথা ছিল। দেননি ; ইতিমধ্যে আরো তিন দিন খেলাপ করেছেন কথার। আজ আবার অসুবিধেব কথা বললেন—বললেন মাইনে পেলেই দিয়ে দেবেন। মাস শেষ হতে এখনো দিন সাত-আট দেরি আছে , এব মধ্যে ভদ্রতার খাতিরে পরিমল আর তাগাদা দিতে পারবে না। সম্ভবত জলেই গেল টাকাটা। কাল দুপুরে ক্যাশিয়ার অবনীবাবু বলছিলেন, মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যেই অফিসের চল্লিশ ভাগ লোক অ্যাডভান্স নিয়েছে এবার। সংখ্যাটা গত মাসের প্রায় দ্বিগুণ। গিরিজাবাবুও যে বাদ দেননি এটা ধ'রে নেওয়া যায়। যখন কেউই অ্যাডভান্স নিত না, তখনো তিনি নিতেন। টাকাটা জলেই গেল।

পরিমল ভাবল, জেনেশুনেই সে এই টাকাটা দিয়েছিল। একটা প্রেসক্রিপসন হাতে ভদ্রলোক এসেছিলেন তার কাছে—ছেলের অসুখ, টাকা নেই, কাল থেকে প্রেসক্রিপসন হাতে ঘুরছেন। একসঙ্গে তিরিশটা টাকা পরিমলের পকেটে থাকে না। কিছুটা চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে ড্রয়ার খুলে চেকবইটা বের করেছিল সে—

'বিয়ারার চেক দিচ্ছি। ভাঙিয়ে নিতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ ভাই, পারব। ছেলেটা তো বাঁচুক—'

চেকটা সই ক'রে হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত পরিমল কিছু ভাবেনি। গিরিজাবাবু চ'লে যাবার পর নিখিল দাস বলল, 'প্রেসক্রিপসনটা একবার দেখে নিলে ভালো হতো না ?'

'কেন ?'

'ওই ভাঁজ-করা কাগজ দেখিয়ে তিনজনের কাছে ধার নিয়েছে।'

পরিমল হতভম্ব হয়েছিল। কিছু বলেনি। আজ আবার সে-সব ঘটনা মনে পড়ায় ঘাড়ের পিছনে মৃদু উত্তেজনা শুরু হলো তার। দিনকাল খারাপ, হু-হু ক'রে দাম বাড়ছে জিনিসপত্রের, বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যাচ্ছে না। নিজেকে দিয়েই সে বুঝতে পারে ব্যাপারগুলো। দু'তিন মাস ধ'রে খুব হাত টেনে সংসার চালাচ্ছে প্রতিমা ; না হ'লেই নয় এমন খরচ ছাড়া বাকি সবই বাদ দিয়ে দিচ্ছে। গত দু'মাসে তারা একটাও সিনেমা দেখেনি, দুটো বিয়েব নেমতন্ন বাদ দিয়েছে অসুখের অজুহাতে। এক সেরের জায়গায় বাড়িতে এখন আধ সের দুধ রাখা হয়। সপ্তাহে পাঁচদিন একবেলা মাছ বা মাংস, অন্য বেলা নিরামিষ। বাকি দু'দিন পুরো নিরামিষ। সবই নিজেদের কষ্ট দিয়ে। তা ব'লে প্রতারণা করবে কেন !

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। অনন্যোপায় পরিমল, সংযম হারিয়ে সপ্তম সিগারেটটি না ধরিয়ে পারল না। এতোগুলো টাকা জলে যাবার পর হিসেবের বাইরে একটি সিগারেট বাঁচিয়ে কী লাভ হবে তার ! এই ভেবে সিগারেটে টান দেবাব সঙ্গে সঙ্গেই সলিল সরকারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। চোখ তুলে সামনে তাকিয়ে দেখল জটলা ভেঙে গেছে, তিন-চারটে চেয়ার এরই মধ্যে খালি ; অন্যরাও বেরুবার তোড়জোড় করছে। সিগারেটে টান দিতে দিতে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করল সে।

ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে অভূতপূর্ব একটি দৃশ্যের সম্মুখীন হলো পরিমল। তাদের অফিসের সামনেই ফুটপাথের ওপর কিছু একটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় শ' খানেক লোক। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ককিয়ে-ওঠা শব্দ উঠছে থেকে থেকে। একটু শুনেই সে ধরতে পারল, গলাটা পুরুষের এবং শোকার্ত। অর্থহীন এ-রকম গোঙানি ও নাম-না-জানা ভিড় কলকাতায় নতুন নয়, বিশেষত আজকাল, ম্যাজিক দেখায় অভ্যস্ত বাঙালি সুযোগ পেলেই ভিড় বাড়ায়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এ-সব ভাবতে ভাবতে ভিড় এড়িয়ে চ'লে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ তিন-চারটে চেনামুখ লক্ষ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং এর-ওর গলা ও ঘাড়ের পিছন দিয়ে নিজের মুখটাও বাড়িয়ে দিল।

কগ্‌ণ একটা মানুষের কাঠামো, মুখ পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা, লম্বা চুলের দু'একটা গোছা বেরিয়ে এসেছে বাইরে। স্বাস্থ্যহীন, তবু চুলের বহর দেখেই মেয়েমানুষ ব'লে চেনা যায়। তাকে ঘিরে দু'পাশে ব'সে আছে গোটা চারেক শিশু, বালক ও কিশোরী। আর চল্লিশ-বেয়াল্লিশের একটা পেটরোগা, উস্কোখুস্কো লোক দু'হাতে মুখ ঢেকে ককিয়ে উঠছে মাঝেমাঝে। সাদা চাদরটার ওপর কিছু পয়সা ছড়ানো। নিতান্তই এটা কলকাতার ফুটপাথ এবং দৃশ্যটা ভিড়াক্রান্ত, না হ'লে সীটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু পয়সাঅলা বাড়ির মড়া জড়িয়ে গ্রুপ ফোটো তোলার মতোই, মরবিড !

অফিসের একটি ছেলেকে দেখে পরিমল বলল, 'একেই না হেল্‌প্ করা হলো ?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে ফেলে রেখেছে কেন ! অনেক টাকাই তো উঠেছে !'

এ-কথার কোনো উত্তর পেল না সে। তখন রাগে ও বিরক্তিতে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'ভাঁজ-করা কাগজ—'

কিছু না-বুঝে হাসি-হাসি মুখে তাকাল ছেলেটি।

পরিমল দাঁড়াল না। মুখ থেকে হাত সরিয়েছে লোকটা, ক' পলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একটু খটকা লাগল তার, একে কি ভিখিরি বলা যাবে !

ভিড় ঠেলে বেরুবার সময় দেখা হলো বিমল মুখুজ্জ্যের সঙ্গে। একই বছরে, দু'চারদিনের এদিক-ওদিকে, চাকরিতে জয়েন করেছিল দু'জনে ; বছর তিনেক একসঙ্গে একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছে। বিমল এখন বিলিংয়ের ইনচার্জ, সে শেয়ারের। মাইনে-টাইনে এক হলেও দু'জনের মধ্যে এখন একটা ফ্লোরের ব্যবধান, দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয় না।

বিমল ওর গা-ঘেঁষে এলো।

'বাড়ি ফিরছ ?'

'হ্যাঁ—।' একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল পরিমল, এখন আবার সেই শব্দটা শোনা যাচ্ছে। মাঝরাতে হঠাৎ-শোনা পাগলা কুকুরের চিৎকারের মতো—টানা, কর্কশ, শেষের দিকে মিইয়ে-পড়া। বিমলকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে লালদীঘির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'ভিখিরিগুলোও আজকাল কেমন প্রফেসনাল হয়ে উঠেছে দেখেছ ! শালাদের ধরন-ধারন পাল্টে গেছে সব। একেবারে শো বিজনেস !'

'বউটা মরে গেছে।'

'সাজানোও হতে পারে। তুমি কি চাদরটা তুলে দেখেছ—জ্যান্ত, না মরা ?'

'না, মরেই গেছে।' ভারী গলায় বিমল মুখুজ্জ্যে বলল, 'মানুষ মরে গেলে একরকম গন্ধ বেরোয়। আমি সেই গন্ধটা পেলাম।'

'কী জানি !' থতমত খেয়ে পরিমল বলল, 'হতেও পারে—'

বিমল শিয়ালদার দিকে যাবে, পরিমল বালীগঞ্জে। স্টপে দাঁড়িয়ে চুপচাপ থাকল দু'জনে। এই সময়ের মধ্যে ঝুলন্ত ভিড় নিয়ে গোটা তিনেক ট্রাম চ'লে গেল। এ-রকম প্রসঙ্গহীন দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না পরিমলের, মনে হয় নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ ; নাক অব্দি জল, ডুবে যাচ্ছে।

কিছু না ভেবেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের ক'রে বিমলের দিকে বাড়িয়ে ধরল পরিমল।

'খাবে ?'

'না। ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি হে, কবে থেকে।' খুশি হয়েই বলল পরিমল, 'তুমি তো চেন স্মোকার ছিলে ?'

'থাকতে পারলাম কই ! যা দাম, আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না—খরচ সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি !'

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল পরিমল।

'ব্যাচেলার মানুষ, তোমার অতো খরচের ভাবনা কি ! বেশ তো আছো—'

'না, নেই।' দৃঢ় অথচ মন্থর গলায় বিমল মুখুজ্জ্যে বলল, 'গত মাসে দাদা মারা গেছে। বউদি তার চারটে বাচ্চা নিয়ে আমার ঘাড়ে এসে উঠেছে।' ব'লে থামল একটু, 'একটা ব্রাহ্মণ ছেলের খোঁজখবর পেলে দিও তো। বড়ো মেয়েটার আঠারো হলো, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে। যেমন-তেমন ক'রে একটা বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।'

পরিমল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ককিয়ে-ওঠা শব্দটা ছুটে এলো আবার। বিব্রত ভঙ্গিতে নাকটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল সে। বিমল বলছিল, মরা মানুষের গা থেকে একটা গন্ধ বেরোয়, সম্ভবত ঠিকই। হাওয়ার গন্ধটা খুব স্বাভাবিক নয়, পরিমল অনুভব করল, বর্ষার জলে ভেজা আস্তাকুড়ের গন্ধের মতো, চাপা একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। হাতের উল্টো পিঠে নাকটা ঘ'ষে নিল সে।

'কী যে হচ্ছে ক্রমশ !'

'কী ?'

'ভিখিরি !' বিমল বলল, 'দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিয়ালদার আশপাশে দেখো। আমাদের ওদিকটা তো গিজগিজ করছে—রাত একটা দুটো পর্যন্ত হত্যে দিয়ে ব'সে থাকে দরজায় !'

'বলো কী !' উচ্চারণ করতে করতেই দূরে তাকিয়ে পরিমল দেখল, উত্তর-পুবে সিনেমার বড়ো হোর্ডিংটার নিচে দিয়ে এগিয়ে আসছে এক দঙ্গল ভিখিরি। পরের কথাটা সে বলতে পারল না। টালীগঞ্জ-মার্কা একটা ট্রাম আসছিল—এটাতে বেশ ভিড়, উপরন্তু এটায় গেলে মাঝপথে আবার ট্রাম বদলাতে হবে তাকে। তবু চলন্ত ট্রামের হাতলটার দিকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সে বলল, 'আমি চলি—'

সে কি ভয় পেয়েছিল ? ট্রামে ওঠার পর এই প্রথম প্রশ্নটা নিজেকে জিজ্ঞেস করল পরিমল। কিন্তু এমন কোনো উত্তর পেল না যা থেকে সহজেই একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। হতে পারে সলিল সরকার এবং শরণার্থী, মৃত ভিখিরি এবং বিমল মুখুজ্জ্যের বর্ণনা—সব মিলে একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল মনে।

ভারসাম্য থাকেনি। এইভাবেই এখন ব্যাপারটা ভেবে নিল সে, ফিরিয়ে আনল আত্মবিশ্বাস এবং হঠাৎ লাফিয়ে ট্রামে ওঠার ঘটনাটিকে সমর্থন করল। তাছাড়া তার ফেরার তাড়াও ছিল। ছেলেমেয়েকে বলেছে আজ ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে যাবে। প্রতিমার এক বান্ধবীর ছেলের অন্নপ্রাশন—ছোটখাটো একটা উপহারও কেনা দরকার।

বাড়ি ফিরে ছেলের মুখে পরিমল শুনল, প্রতিমার নতুন পেটিকোটটা চুরি গেছে। কাচাকাচির পর অন্য কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে শুকোতে দিয়েছিল দড়িতে ; পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খবরটা এলো আঘাতের মতো। কিছু বলবে না ভেবেও ভিতরের উত্তাপ চাপা দিতে পারল না পরিমল। চাপা গলায় স্ত্রীকে বলল, 'এতো অসাবধান হ'লে হারাবেই—'

'অসাবধান কিছুই হইনি।' প্রতিমা বলল, 'দড়িতে তো রোজই কাপড় শুকোয়, কবে আর গেছে!'

'রোজ কি আর যায়, এক-একদিনই যায়। কাপড়-চোপড় সময় মতো তুলে নিলেই পারো!'

বুলি বলল, 'বাবা, আজ একসঙ্গে অনেকগুলো ভিখিরি এসেছিল। মা বলছে তারাই নিয়েছে।'

চায়ের কাপটা মুখের কাছে এনেছিল পরিমল, সরিয়ে নিল। না হ'লে বিষম খেত। এ-রকম কতকগুলো শারীরিক প্রতিক্রিয়া সে আগেই টের পায় ; স্বভাবই ব'লে দেয় কখন কীরকম ব্যবহার করবে। খানিক চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ?'

'দুপুরে—'

'ভিখিরি কি চোর কে জানছে!' প্রতিমা বলল, 'দূরে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেতে বলতেই চ'লে গেল। খানিক পরে কাপড় তুলতে গিয়ে দেখি পেটিকোটটা নেই!'

'যাক গে।' ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্যে আবার কাপটা তুলে নিল পরিমল, 'একটু সাবধানে থেকো। এখন লোকসানের কপাল চলছে—'

প্রতিমা আশ্বস্ত হলো। চোখ মুখে এমন ভাব আনল যাতে সে আজকালের মধ্যেই আর একটা পেটিকোট কিনে ফেলার সুযোগ পায়। এর জন্যে দরকার পরিমলকে খুশি করা। মাসের শেষ এবার অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে, সংসার খরচের টাকা থেকে এখন আর কিছু কেনাকাটা করা যাবে না। মনে মনে সে একটা উপায় ভেবে নিল।

'তোমার আবার কী লোকসান হলো!'

'আর বলো কেন! অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই একটা মেয়ে এসে হাজির। বিবাহিতা। স্বামীর চাকরি নেই, ছাঁটাই হয়েছে, ধূপকাঠি বেচে সংসার চালাচ্ছে। একটা টাকা বেরিয়ে গেল!'

'এনেছ ?'

'কী ?'

প্যাকেটটা ?'

'না, ফেলে দিয়েছি। বলেছিল পঞ্চাশটা কাঠি আছে। খুলে দেখলাম গোটা দশ বারো—ফেলে দিলাম। টাকাটাই জলে গেল!'

'এর পরে এলে পুলিসে ধরিয়ে দিও—'

কথাটা গায়ে মাখল না পরিমল। টেবিলের এদিক-ওদিকে স্ত্রীর মুখোমুখি বসা, তা সত্ত্বেও সে নিজেকে আবিষ্কার করল অফিসের চেয়ারে। ভিতর থেকে একটা রাগ উঠে আসছে, উসখুস করছে গলা—ঠিক কেন বুঝতে পারছে না। মেয়েটি প্রতারণা করেছিল ব'লে ? নাকি সলিল সরকারের কথায় অপমান ছিল ? দুটোই সম্ভব। পরবর্তী লোকসানের ঘটনাটা সে আর ব্যক্ত করল না।

একটু পরে ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে ফুচকা খেতে বেরিয়ে বিমল মুখুজ্জ্যের কথাগুলো মনে পড়ল পরিমলের। খুব সাবধানে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে চোখ রাখল দু'দিকে ; যদি কোনো ভিখিরি চোখে পড়ে। একটিও পড়ল না। তখন প্রতিমাকে শুনিয়ে বলল, 'এদিকটা এখনো ভদ্র আছে। বিমল বলছিল, ওদের দিকে ভিখিরি বেড়েছে খুব—'

'কোন বিমল ?'

'বিমল মুখুজ্জ্যে। মনে নেই, বরযাত্রী গিয়েছিল ?'

প্রতিমার চোখ দোকানের শো-কেসে। এ-মাসটা কোনোরকমে কেটে গেলে সামনেব মাসে একটা ব্রেসিয়ার কিনবে। তিন টাকা আশির দরে দু'কিলো চাল কিনেছে আজ। পরিমলের আরো কিছু দেওয়া উচিত। কথাগুলো ভালো ক'রে না শুনেই সে বলল, 'ও—'

তারপর ধরা পড়ল ব্যাপারটা। মোড়ের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ের ফুচকা খাওয়া দেখছিল পরিমল, হঠাৎ চোখে পড়ল, ছিট-কাপড়ের দোকানের টিনের দেয়ালের পাশের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনটি মুখ তাকিয়ে আছে তাদেরই দিকে। ঠিক আন্দাজ করা যায় না, তবে দশ থেকে পনেরোর মধ্যে যে-কোনো বয়স হতে পারে। মনে হয় অনেকক্ষণ ধ'রেই লক্ষ রাখছে—একাগ্র দৃষ্টি, পলক পড়ছে না, কিন্তু লক্ষ্য যে বুলি ও রঞ্জুর দিকে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

বুলি রঞ্জুরা খেয়াল করেনি ; প্রতিমা এখনো দোকান দেখছে। ডানদিকে স'রে এসে দক্ষিণ থেকে পুবমুখো হয়ে দাঁড়াল পরিমল এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, দশ বারো হাত দূরে একটা না-ওঠা স্টলের চৌকিতে ঠাসাঠাসি হয়ে ব'সে প্রায় ছ সাতটি অন্ধকার মুখ তাকিয়ে আছে এদিকে। আলোর উল্টোদিকে বসায় মুখের আদল স্পষ্ট হয় না। তবু নির্ভুল সমকোণ ছুঁয়ে যায় দৃষ্টি।

অল্প নড়ে গেল পরিমল। একটা সিগারেট ধরানোর কথা ভেবেও নিবস্ত কবল নিজেকে, ইতিমধ্যেই সে বরাদ্দের চেয়ে দুটো সিগারেট বেশি খেয়েছে।

'হযেছে ফুচকা খাওয়া ?'

'আর খাবো না বাবা ?' চোয়াল নাড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল বুলি।

'আর একদিন খেও—'

দাম মিটিয়ে দূরত্বে এসে একবার পিছনে তাকাল পরিমল। মাঝখানে অনেকটা জাযগা সাদা হয়ে আছে মার্কারির আলোয় ; সেখানে গাছের ছায়া। সম্ভবত সেইজন্যেই ওদিকটা অস্পষ্ট। নিয়মিতভাবে হেঁটে চলেছে মানুষজন, মেয়ে পুরুষ, ভিড় জুতোর দোকানে আর কাগজেব স্টলে, একজোড়া হিপি-হিপিনি হেঁটে গেল পাশ দিয়ে। মেয়েটি ভিতরে কিছু পরেনি। এসব দেখতে দেখতে পরিমল বলল, 'এদিকেও কিছু কম নেই—'

'কী ?'

'ভিখিরি-

'কী হয়েছে বলো তো ?' আড়ে তাকিয়ে প্রতিমা বলল, 'শুধু ভিখিরি খুঁজছ ! আমার তো চোখে পড়ে না—'

'কেন, বললে যে দুপুরে এসেছিল ?'

'ওরা ভিখিরি নয়, চোর। ভিখিরি ভিক্ষে চায়—ওরা চুরি করতে এসেছিল। মাঝখান থেকে আমার পেটিকোটটা গেল—'

পরিমল কথা বাড়াল না। পেটিকোটের শোক ভুলতে না-পারা পর্যন্ত প্রতিমা স্বাভাবিক হবে না। তাতে তারও অসুবিধে কম নয়। মনে মনে একটা হিসেব সেরে খোশামোদের গলায় বলল, 'কী আর দাম। আর একটা কিনে নাও—'

'দেবে তুমি ? দাও না—'

অনেক বেশি রাতে প্রতিমার ব্লাউজের বোতামে হাত দিয়ে তীব্র শারীরিক উত্তেজনার মধ্যেও একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল পরিমল। বুলি ও রঞ্জু ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, চারিদিক নিঝুম, ঘরের অন্ধকারের সঙ্গে এখন সে বাইরেটাও মিলিয়ে দেখতে পারে। ওরই মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে শুনল, একটা মৃদু আনুনাসিক স্বর এগিয়ে আসছে ক্রমশ। আরও একটু কাছে আসতে কথাগুলো পরিষ্কার হলো, 'মা—মা—মাগো—'

'জ্বালাতন!' অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল পরিমলের গলা দিয়ে।

'কী হলো !'

'কিছু নয়।' প্রতিমার শরীরের গন্ধে ডুবে যাবার চেষ্টায় দ্বিতীয় বোতামটি খোলায় মনোযোগ দিল পরিমল।

'এ-বছর তোমার প্রমোশন হবে না ?'

'কেন ?'

'বলোই না ?'

'জানি না।' দ্বিধান্বিত গলায় বলল পরিমল, 'এর পরেই তো একজিকিউটিভ গ্রেড। সহজে তুলবে ব'লে মনে হয় না।'

মুখটা সরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে চোখ রাখল প্রতিমা। এমন কি পরিমলের মুখও সে দেখতে পাচ্ছে না এখন ; শরীরে শুধু শরীরের টান। পাখা বন্ধ। বোধ হয় লোড-শেডিং শুরু হলো। কথাটা বলবে কি না ভাবতে ভাবতে ঠোঁট ছড়াল সে।

'এ-টাকায় সংসার চলে না। কীভাবে চালাচ্ছি যদি জানতে !'

একটা নিঃশ্বাস ছাড়ার আগে রুখে নিল পরিমল, ইতস্তত করল একটু। তারপর আর না এগিয়ে আস্তে আস্তে আলগা ক'রে নিল নিজেকে।

'কী হলো !'

'আর সময় পেলে না !'

'সময়-অসময়ের কী আছে ; যা সত্যি তাই বলছি। তোমার সব তাতেই রাগ !'

'জানি। তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে একটা পেটিকোট কেনাব কথা ভাবতে না—'

পাশের ঘরে চ'লে এলো পরিমল। সিগারেটের প্যাকেট খুঁজে আগুন জ্বালল। ঘর থেকে বেরুবার মুখে একটা কিছু বলেছিল প্রতিমা, পরিমল শোনেনি। যাই ব'লে থাকুক, পেটিকোটের কথাটা এখনই তোলা উচিত হয়নি তার। তবু তুলল। আগে আগে এ রকম প্রসঙ্গে কাঁদত প্রতিমা। ছেলেমেয়ে বড়ো হবার পর থেকে অনেক কিছু সারতে হয় নিঃশব্দে।

বিস্বাদ মুখ। অচরিতার্থতার ঘাম বিজবিজ করছে গলায়। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রাত টের পেল পরিমল। নিস্তব্ধতার মধ্যে থেকে মনে হচ্ছে কাছেই কোনদিক থেকে ভেসে এলো কানে, 'মা—গো—'। না, দূরে নয়, আশপাশের কোনোখান থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো, প্রায় নিরপেক্ষ এবং ক্লান্ত সেই স্বর—ঠিক কোন দিক থেকে ধরা যায় না।

উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পরিমল। এটা কোন মাস ? ফাল্গুন, না চৈত্র ? আকাশে কেমন একটা ঘোলাটে ভাব—না জ্যোৎস্না না অন্ধকারে থমথম করছে চারিদিক। কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা ডাস্টবিনের গন্ধ নিয়ে হাওয়া উঠছে থেকে থেকে। হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল পরিমল। মেরুদণ্ড বেয়ে তরতর করে নেমে গেল একটা কনকনে অনুভূতি। তাদের বাড়ি থেকে মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূরে ডাস্টবিনেব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি নানা বয়সের মানুষ। মেয়ে বা পুরুষ এখান থেকে ঠিক চেনা যায় না। গন্ধটা এখন পুরোপুরি নাকে এসে লাগল। চেনা লাগছে। নিঃশ্বাসে পুরোপুরি মিশে যাবার আগেই পরিমল টের পেল, বিকেলে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে সে এই গন্ধটাই পেয়েছিল।

চোখাচোখি হবার ভয়ে তাড়াতাড়ি জানলাটা বন্ধ ক'রে দিল সে।

সংসার খরচের জন্যে এই প্রথম ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনল পরিমল এবং প্রতিমার হাতে দিতে দিতে বলল, 'ব্যাঙ্কের টাকাও শেষ হয়। এভাবে পারা যাবে না, খরচ কমাও।'

'কোন খরচটাই আর বেশি হয়।' প্রতিমা বলল, 'নিজে কিছুদিন চালিয়ে দ্যাখো না।'

'চারদিন নিরামিষ করো—'

'তোমাদের মুখে রুচলে আমার না করার কি আছে !' ছেলেমেয়ে দুটোরই অসুবিধে হবে।

'তোমার চেহারাটা হঠাৎ এমন কালচে হয়ে গেল কেন ?'

জবাব পেল না। তখন একটু চুপ ক'রে থেকে পরিমল বলল, 'ঠিক আছে। চারদিন করতে হবে না।

তিনদিন করো।'

এইভাবে খরচের সঙ্গে সে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করল। টিফিনে আট আনার বেশি খরচ করে না। সিগারেটটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, ছাড়তে পারে না ; অনেক ভেবেচিন্তে ব্র্যান্ড চেঞ্জ ক'রে ফেলল। ব্যাপারটা নিখিল দাসের চোখে পড়তেই পরিমল বলল, 'বয়স হচ্ছে, এখন কড়া স্বাদ না হ'লে ঠিক জুত হয় না। নতুন ব্র্যান্ড ধরলাম।'

'অনেকেরই দেখছি হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে—'

পরিমল এড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন তুমুল বৃষ্টিতে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেতে তিন মাইল রাস্তা হেঁটেই বাড়ি ফিরল এবং খুশি হলো। ক্লেশ স্বীকার তাকে ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ প্রায় চার টাকা বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

একদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দুটো খবরে চোখ আটকে গেল পরিমলের। 'খাদ্য সংকটে রাজ্যে চরম দুর্দিন—মন্ত্রীর স্বীকৃতি' এবং 'কলকাতায় দু'লক্ষ নতুন ভিখারি।' দ্বিতীয় খবরটা সে পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বেশ কয়েকবার। অন্য পাতায় গিয়েও নতুন ক'রে পড়ার জন্যে ফিরে এলো আবার। তারপর কী ভেবে ওই অংশটুকু কেটে নিয়ে রেখে দিল পকেটে। এবং বিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করতে লাগল, প্রাত্যহিকতায় অভ্যস্ত জীবনযাপন হঠাৎই কেমন খাপছাড়া লাগছে।

অফিসে বেরুবার জন্যে দরজা খুলতেই সেদিন একটা নতুন দৃশ্যের মুখোমুখি হলো পরিমল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ময়লা কাপড়-পরা একজন মহিলা, সঙ্গে গেঞ্জি-পরা একটি বছর সাত-আটের ছেলে। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে পরিমল জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?'

'মা আছেন ?'

'কী দরকার ?'

গলা শুনে এগিয়ে এলো প্রতিমা।

মহিলা বলল, 'বড়ো বিপদে পড়ে গাঁ থেকে চ'লে এসেছি মা। কাল থেকে ছেলেটার পেটে কিছু পড়েনি—'

'ও, ভিক্ষে চাই !' রুক্ষ গলায় বলল পরিমল, 'ওসব হবে না। যান, অন্য কোথাও দেখুন—'

'ওভাবে বলবেন না, বাবা। হাতে নোয়া আছে, আমি ভদ্দর বাড়িরই বউ। নেহাত বিপদে না পড়লে—'

'এখানে কিছু হবে না। যান, যান বলছি—'

তখন একটু অবাক হয়ে ছেলেটার হাত ধ'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল মহিলাটি।

'কী ভাবে কথা বলো লোকজনের সঙ্গে !' প্রতিমা বলল, 'না হয় ভিক্ষেই চাইছিল—'

'এইভাবেই বলতে হবে।' পরিমল এমন ভাব দেখাল যেন তাড়াতে পেরে খুশি হয়েছে, 'মন্ত্রীদের দরজায় গিয়ে ধর্না মারুক। খেতে দেবার দায়িত্ব তাদের, আমার নয়।'

'কী জানি বাপু, তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ !

ট্রামে যেতে যেতে পরিমল ভাবল, সম্ভবত এভাবে বলা ঠিক হয়নি। ক্ষুধা অতি বিষম বস্তু এবং তাকে উপেক্ষা করা অন্যায়। আর কিছু না হোক, আনা চারেক পয়সা হয়তো সে সাহায্য হিসেবে দিতে পারত। কিংবা, হয়তো সাহায্য না করলেও—একটু ভদ্রভাবে বলা যেত কথাগুলো। মানুষকে উপেক্ষা করার অনেক ধরন আছে ; সন্দেহ নেই এর মধ্যে সবচেয়ে রূঢ় ধরনটিই বেছে নিয়েছিল সে। সম্ভবত এখন থেকে প্রতিমা তাকে একটু ছোট ক'রে দেখবে। এসব ভেবে চিন্তিত হলো পরিমল, চুপচাপ ডুবে যেতে থাকল নিজের মধ্যে এবং অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে পকেট থেকে খবরের কাগজের কাটিংটা বের ক'রে মেলে ধরল চোখের সামনে। অক্ষরগুলো নয়, সেই বৃহৎ সংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ ভেসে উঠল চোখে। দু' লক্ষের ভৌগোলিক আয়তন এই শহরের অনেকটাই ঢেকে ফেলতে পারে।

অফিসে নাম সই করেই সে ছুটল বিমল মুখুজ্জ্যের খোঁজে।

'তোমার ওদিকের খবর কি ?

'কোন খবর !'

'ভিখিরি ? সেদিন বলছিলে বাড়ছে ?'

'ও, সেই ব্যাপারটা। তা হঠাৎ !'

পরিমল জবাব দিল না। আশপাশে কেউ লক্ষ করছে কিনা দেখে নিয়ে কাটিংটা বের ক'রে বিমলকে দিল এবং বলল, 'দ্যাখো, পড়ে দ্যাখো—'

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে শব্দ ক'রে হাসল বিমল।

'ব্যাপার কি ! হঠাৎ খবব জড়ো কবতে শুরু করেছ ! তুমি আমি এখনো এ হিসেবে আসিনি।'

'হেসো না।' বিমলের হাতে চাপ দিল পরিমল, 'হাসছ কেন ! আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম—'

'বলো।'

বলার কথাটা মনে মনে গুছিয়ে নিল পরিমল। কাঁধে মুখ ঘষে, মাথার পিছনের ফাঁকা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে নিল একবার।

'তুমি সেদিন বলেছিলে মরা মানুষের গা থেকে একটা গন্ধ বেরোয়। সেদিন বাড়ির সামনে কতকগুলো ভিখিরি দেখলাম। তারা মরা নয় ; কিন্তু গন্ধটা ছিল—'

'কী বলছ !'

'হ্যাঁ।' পরিমল মুখ নামিয়ে আনল। 'ওদের চাউনি লক্ষ করেছ ? কীভাবে তাকায়—যেন টানতে চাইছে !'

'হবে।' বিমল বলল, 'ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তার চেয়ে বড়ো খবর আসছে—'

'কী !'

'হার্ডশিপ অ্যালাউন্সের ডিম্যান্ডটা নাকি ম্যানেজমেন্ট নাকচ করে দিয়েছে। প্রোডাকসন কম, প্রফিট নেই। শুনছি ছাঁটাইও হতে পারে—'

'বলো কী !'

পবিমলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শূন্য, অর্থহীন ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হাল্‌কা হবার চেষ্টা করল বিমল মুখুজ্জ্যে, 'ওভাবে তাকাচ্ছ কেন ? আগে হোক।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

খুব মৃদু গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল পরিমল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, নেমে এলো নিচে।

সীটে বসে প্রবলভাবে ঘামতে লাগল সে। অস্বস্তি লাগছিল। ঠিক বুঝতে পারছে না, সম্ভবত প্রেসারের গণ্ডগোল। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় আবার পকেট থেকে খবর-কাগজের কাটিংটা বের করল পরিমল। মনে হচ্ছে খবরটা পুরনো। 'মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গেছে—', এই পর্যন্ত এসে থেমে গেল এবং আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করল।

অফিস থেকে বেরুবার সময় পরিমল লক্ষ করল না সে একটু ঝুঁকে বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে সেদিন আর সে বিশেষ কোনো আগ্রহ বোধ করল না, একা একা, ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল ফুটপাথ ধ'রে। ময়দানে একটা বক্তৃতা চলছিল, খানিকটা শুনল এবং তারপর লোড-শেডিংয়ের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরে প্রতিমাকে বলল, 'এভাবে চলবে না। অফিসে শুনলাম চাল নাকি সাড়ে চার টাকা। এই অবস্থায় যদি ছাঁটাই করে—'

'কী বকছ আজেবাজে !'

'ঠিকই বলছি।' বুড়ো আঙুল ও তর্জনী তুলে কর্কশ গালে হাত বুলোতে বুলোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল পরিমল।

'কী জানি, বাবা।' অসহিষ্ণু গলায় প্রতিমা বলল, 'কী হয়েছে বলবে তো !'

সে কথার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল পরিমল। তারপর সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, 'কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছ না ?'

'কই, না তো !'

প্রতিমার অস্বস্তিকে আমল না দিয়ে জানলার দিকে ছুটে গেল পরিমল। দু' হাতের মুঠোয় গরাদ চেপে দাঁড়াল। দূরাগত অস্পষ্ট আলোয় ঘন হয়ে আছে সামনের অন্ধকার ; কিছুই চোখে পড়ল না। দৃষ্টি একাগ্র রেখে সে তবু শক্ত করল হাতের মুঠো দুটো—যেন যে-কোনো মুহূর্তে একটা কিছু ঘটবে, ঘটে যাবে।

ততোক্ষণে প্রতিমাও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কপালে ঘাম ফুটতে শুরু করেছিল পরিমলের। ভীত, সন্ত্রস্ত এবং চাপা গলায় অনেকক্ষণ পরে শুধু বলল, 'আসছে, আসছে—'

মূকাভিনয়

মূকাভিনয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলাব আগে একটু ভূমিকা ক'রে নেওয়া দরকার। তাতে ঘটনাটা বুঝতে সুবিধে হবে অনেকেবই।

বাঁধা মাইনেব চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আমি যখন হঠকারিতার পথ বেছে নিলুম, ঠিক সেই সময়ে আলাপ হয়েছিল অবাঙালি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আলাপ করিয়ে দিল আমার এক সাংবাদিক বন্ধু।

খবরেব কাগজে নিযমিত একটা ফিচাব লেখাব বিষয়ে আলাপ করতে গিয়েছিলুম বন্ধুর অফিসে। কাজেব ফাঁকে ফাঁকে এটা ওটা কথা বলতে বলতে সে আমাকে বসিয়ে বাখল অনেকক্ষণ। পরে, একটা টেলিফোন সেবে, বলল, 'কাগজে ফিচার লেখার চেয়ে প্রফিটেবল একটা ব্যাপার ভেবে বেখেছি তোমাব জন্যে। একটু ঘোরাঘুরি কবতে হবে। তবে কাজটা তোমাব খারাপ লাগাব কথা নয়। পযসা আছে, অভিজ্ঞতাও বাডবে অনেক। আপাতত মাস চাব-পাঁচের কাজ। ভদ্রলোক আসছেন এখুনি, আলাপ ক'রে দ্যাখো।'

মূল ব্যাপাবটা সে আব একটু বিস্তৃত করল। ভদ্রলোকের নাম গণেশ মানকড। আসছে বোম্বাই থেকে। এব একটা নাটকের দল আছে। কিন্তু, সাধারণত যে সব নাটকের দলেব সঙ্গে আমাদেব পরিচয ঘটে, এদের ভূমিকা তার চেয়ে আলাদা। এবা মূকাভিনয় কবে।

এতোক্ষণ আমি ছিলাম নীরব শ্রোতা। কিন্তু এবার একটু খটকা লাগতে কয়েকটা প্রশ্ন নাডা দিল মনে। প্রধানত, এ ব্যাপারে আমি কোন কাজে লাগতে পারি।

মূকাভিনয় সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা ছিল। নাট্যাভিনয়েব এই ধরনটিব তেমন চল না থাকলেও এর আবিষ্কাব সেই বোমান যুগে। শব্দেব অর্থ মানুষের কাছে ঠিকঠাক বোধগম্য হবার আগেই বোধ্য ছিল অনুভূতি ও অভিব্যক্তি ; শুধু অভিব্যক্তিময়, নির্বাক, অভিনয় ক'রে রোমানযুগে অভিনেতারা ব্যক্ত কবতেন নিজেদের ভূমিকা। মুগ্ধ, অশিক্ষিত জনগণ সেইসব অভিব্যক্তির সঙ্গে সহজেই বিনিময় করতেন নিজেদের। পরে, কথাব আধিপত্য বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, লোকে গ্রহণ করতে শেখে সবাক অভিনয। মূকাভিনয়ের দিন শেষ হয়ে যায় ক্রমশ।

সন্দেহ নিরসন করল বন্ধু। গণেশ মানকড়ের দলটি পেশাদার এবং মূকাভিনয়ে এদের বেশ নামডাক আছে। ভ্রাম্যমাণ। প্রধানত গ্রামাঞ্চলে, শিক্ষিতের সংখ্যা যেখানে কম, এরা মূকাভিনয় প্রদর্শন ক'রে বেড়ায়। অভিনয়ের বিষয় প্রাযই শিক্ষা বা প্রচারমূলক। ইতিমধ্যেই এরা উত্তর ও পশ্চিম ভারত ঘুরে এসেছে—রূপাযিত করেছে দু' একটি সরকারি পরিকল্পনাও। এবার পশ্চিম বাংলায়।

অসুবিধে হলো, বাংলা ভাষাটা গণেশ মানকড়ের আয়ত্তে নেই। ভাঙা-ভাঙা কিছু কথ্য বুলি যদিও শিখে ফেলেছে এরই মধ্যে। ওদের চাই একজন ভাষ্যকার—পরিকল্পনার প্রয়োজন বুঝে যে রচনা করবে ভাষ্য, মুহূর্ত ও নাট্যবস্তু।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাপ হলো গণেশ মানকড়ের সঙ্গে। প্রাথমিক পরিচয়ের পর সে আমার হাতে একটি কার্ড গুঁজে দিল। আইভরি বোর্ডের ওপর কালোয় ছাপা সুদৃশ্য কার্ড : গণেশ মানকড়, প্যান্টোমাইমিস্ট, ডিরেক্টর 'মাইম'। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশের মধ্যে, দীর্ঘ ও সুদর্শন, কথাবার্তায়, বিশেষত ইংরিজি বলায়, বেশ তুখোড়। লোকটির আদবকায়দা ও আচরণে এমন কিছু আছে যা সহজেই আকর্ষণ করে। পোশাকেও দুবস্ত। এই লোকের বেশিরভাগ সময়ই যে গ্রামে-গ্রামে কাটে, সহজ বুদ্ধিতে তা বিশ্বাস্য মনে হয় না।

সাধারণত চাপা স্বভাবের মানুষ আমি ; ভাবালুতা প্রশ্রয় দিই না চট ক'রে এবং সিদ্ধান্ত নেবার হ'লে

বেশ ভেবেচিন্তেই নিই। কিন্তু, আগেই বলেছি, এই ভদ্রলোক, গণেশ মানকড়, তার সহজাত প্রতিভা দিয়ে মুগ্ধ করতে পারে অকপটে ও প্রায় প্রথম সাক্ষাতেই। তেমন ক'রে কিছু ভেবে ওঠার আগে আমিও বশীভূত হলুম। গণেশ আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল তার হোটেলে।

বলতে ভুলে গেছি, বন্ধুর অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে হোটেলে আসাব সময়েই গণেশ তার যথাসম্ভব জ্ঞান নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল বাংলায়। বুঝলুম, আঞ্চলিক ভাষায় সে যতোটা সম্ভব রপ্ত হয়ে নিতে চাইছে—এইভাবেই এর আগে সে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরেব ছ' সাতটি ভাষা। কথা হচ্ছিল হোটেলে ব'সে। বম্বের এক ভিটামিন খাদ্যপ্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানেব হয়ে গ্রামে গ্রামে তাদের তৈবি জিনিসের প্রচার চালাতে চায় গণেশ। গ্রামেব লোকের হাতে কিছু পয়সা আছে, কিন্তু আধুনিক খাদ্যপ্রণালী ও ভিটামিনের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই তাদের। রোগ, অপুষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারগুলোতে তারাই বেশি ভোগে। টিনের ভিটামিন গ্রহণের অভ্যাস শহবাঞ্চলে বেশ চালু হ'লেও এ-সবের প্রকৃত বাজার হলো গ্রামাঞ্চল, গ্রামের মানুষ। কিন্তু আধুনিক প্রচার-মাধ্যমগুলির পক্ষে সম্ভব নয় গ্রামের একেবারে ভিতর পর্যন্ত ঢুকে আধুনিকতম এই স্বাস্থ্যার্জন প্রণালীর দিকে মানুষের চোখ ফেবানো ; দৈনন্দিন জীবনধারণে এগুলির উপযোগিতা বুঝিয়ে বস্তুগুলি ক্রয়েব দিকে তাদের আকৃষ্ট কবা। মূকাভিনয় এই কাজটি ভালোভাবেই পারবে। কারণ, চড়া গলার যাত্রাভিনয়েব সঙ্গে পবিচিত গ্রামের মানুষের কাছে এটা হবে একেবারেই নতুন ব্যাপার। উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক হ'লেও সেটা আসছে পরে। মহারাষ্ট্র থেকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হয়ে মানকড় এখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি কভার কববে। মাস চারেকের প্রোগ্রাম। এখান থেকে যাবে আসামে।

মানকড় এবার আসল কথায় এলো। তাদের দলের সদস্য ষোল জন, তার মধ্যে জন তিনেক বাঙালিও আছে। তারা অভিনেতা, অভিনেত্রী। অসুবিধে হযেছে ভাষ্য রচনা নিয়ে। অভিনয় চলাকালে পর্দার আড়াল থেকে শ্রোতা ও দর্শকদের সুবিধের জন্যে দরকার ধারাবিবরণীর। আমি যদি সেই কাজটা নিই।

বিষয়টি কৌতূহল সৃষ্টি কবছিল আমার মধ্যে। পারিশ্রমিকের অঙ্কও মন্দ নয় ; সে তুলনায়, বলা উচিত, কাজ কমই। মোটামুটি রাজী হয়ে গেলাম। মানকড় আমাকে অভিনযের বিষয়গুলি বুঝিযে দিল।

পরের দিন সে আমাকে নিয়ে গেল মহড়া দেখাতে।

এটাকে গল্পের ভূমিকা হিসেবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু আমার নিজেরই সন্দেহ আছে এটা গল্প কি না। বস্তুত গল্পের পরিকল্পনা নিয়ে এই রচনার কথা ভাবা হযনি ; আমার লক্ষ্য মূকাভিনয়ের সূত্রে পাত্র-পাত্রীদের কিছু চরিত্র অবলোকন। এই করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হলো, মূকাভিনেতারা সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থেকে রীতিমতো আলাদা।

মানকড় নিজে এক অভিজাত হোটেলে উঠলেও তার দল উঠেছে ভবানীপুর অঞ্চলে একটি পুরনো বাড়িতে। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে। বাড়িটি চারতলা। নিচে স্কুল, আশপাশে ঘন জনবসতি। তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে উঠে চারতলাটি বিরাট হলঘর আকারের—হতে পারে কখনো-সখনো বিয়ের জন্যেও ভাড়া দেওয়া হয়। সময়টা বিকেল, ছুটি হয়ে গেছে স্কুল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাই একটা গা-ছমছম করা স্তব্ধতা ঘিরে ধরে আমাদের। প্রায় পোড়ো বাড়ির শূন্যতায় ছড়িয়ে আছে পায়রার বিষ্ঠার গন্ধ ; সিঁড়িময় ধুলো, আমাদের পদশব্দে লুকানো ঘুলঘুলি থেকে জানলা দিয়ে উড়ে যায় কয়েকটি পায়রা।

এটা মূকাভিনয়ের পটভূমি তৈরির চেষ্টা নয়। আসল ব্যাপারটি আসে পরে।

ছাদের ঘরটি বেশ বড়ো ; ধুলো ও আসবাবহীনতায় আরো বড়ো দেখায়। গোটা দু'তিন নড়বড়ে চেয়ার অবশ্য ছিল। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল একটা বিজাতীয় রূপ : মুখে রঙমাখা জন চার-পাঁচ পুরুষ ও নারী—তাদের কেউ উবু হয়ে ব'সে আছে ধুলোয়, কেউ চেয়ারে। আমাকে সহ মানকড়কে ঢুকতে দেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল লোকগুলি—আচরণে তৎপরতা বা অভ্যর্থনা প্রকাশ পেল না কোনো। বরং যেভাবে উঠে দাঁড়াল এবং বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র হয়ে এলো, তাতে হঠাৎই অন্য একটা ভাবনা এসে

যেতে পারে মনে—দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কয়েকজন অপরাধী ঘাতকের আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

কোনো আনুষ্ঠানিক পরিচয় দানের প্রয়োজন বোধ করল না মানকড়। ঘরে ঢোকার থেকে পরবর্তী কাজের মধ্যে ব্যবধান ছিল একটি সিগারেট ধরানোর, তারপরেই একটি স্বতঃস্ফূর্ত যান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত তার বাচনভঙ্গি শোনা গেল : 'স্টোরি নাম্বার থ্রি। অ্যাকসন্—'

ঘটনাটি দেখবার মতো। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে প্রায় চারফুট দুরত্বে লাফিয়ে এলো কুশীলবদের একজন—বলাই বাহুল্য, পুরুষ, সেই লাফের বিশিষ্টতা অর্জন কোনো মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। মঞ্চের অভাবে ধুলোমাখা মেঝেই তখন মঞ্চ। লোকটি তার হাত, পা, সমগ্র শরীর ও বিশেষত চোখের ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলছে অমানুষিক রূপ। মানকড় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, 'লোকটি বাড়ি ফিরছে সাবাদিন লেবারের পর। কিন্তু, অপুষ্টিতে হাঁটতে পারছে না—'

মানকড়ের সূত্র থেকে কাহিনীক্রম তখন এগিয়ে গেছে আরো অনেক দূর—ঠিক সেই সময়ে ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীটি এগিয়ে এসেছে লোকটির শুশ্রূষায়. বোঝা গেল স্ত্রী , মূর্ত তার অভিনয়ে যন্ত্রণার চেয়ে বেশি স্পষ্ট অসহায়তা—এবার সে একটি হঠাৎ-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করবে। প্রতিবেশীরাও সমবেত। প্রায় মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর মৃত প্রথম অভিনেতাটিকে অন্যান্য প্রতিবেশীরা কাঁধে তুলে নিয়ে যাবার সময় মানকড় হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল, 'বল হরি· · হরি বল · ।' মূকাভিনেত্রীর মুদ্রায় বিভ্রম ঘটল না কোনো। ধূসব মেঝেয় সে তখনো মাথা ঠুকে চলেছে ক্রমাগত।

'নরেনবাবু, আপনি যে লাফটা দিলেন তা হয়েছে হনুমানের মতো—।' অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবাব পর মানকড় বলল, 'শালা মরবার আগে যদি এইসে লাফ দিবেন তো **মালনিউট্রিসনের ফিকির কি!** যাকে বলা হলো সেই প্রথম অভিনেতা নরেনবাবুর চোখে কিছু বা অস্বস্তি ফুটে উঠল, আর কিছু নয়। অন্যরাও কথায় ফিরল না। মানকড় তখনো অন্যান্যদের খুঁটিনাটি উদ্ধার করছে। মেয়েটির নাম রাধা। হঠাৎই প্রত্যক্ষ করলুম, মূকাভিনয়েব এইসব পাত্র-পাত্রীরা অভিনয়েব বাইরেও প্রায় স্তব্ধতায় বিশ্বাস করে। এতোটা সময়ের মধ্যে আমি একটিই অত্যন্ত মৃদু উচ্চাবণ শুনলুম, মেয়েটির গলায়, 'আমার চিরুনিটা কোথায় ?'

'এক একটা শোয়ে এমন দশ থেকে বারোটা স্টোরি প্রেজেন্ট করা হয়— ।' ফেবার পথে মানকড় আমাকে বোঝাতে শুরু করল, 'প্রত্যেক স্টোরিতেই একটা লেসেন আছে, দ্যাটিজ, আল-প্রোটিন হেল্‌থ ভালো রাখার পক্ষে খুব জরুরি। তবে, হ্যাঁ, রিভিসন দরকার—আই উড শো ইউ দ্য স্ক্রিপ্ট্‌স্। ডেথ্‌টা হাইলি মেলোড্রামাটিক—কী মনে করেন ? পাবলিসিটি অ্যাসপেক্টটাও দেখতে হবে তো।'

আমি সায় দিলুম। পরের দিন থেকেই লেগে যেতে হলো স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজে। আর দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই বেরুতে হবে আমাদের।

মূকাভিনয়ের তাৎপর্য ও ধরন-ধারণ বিষয়ে ইতিমধ্যেই হয়তো কিছু কিছু ধারণা করা যাচ্ছে। এটা অভিনয়ের একটা ধরন মাত্র ; কিন্তু, আমি ঠিক বলতে পারব না মূকাভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের প্রভেদ ঠিক কোনখানে শুরু হয়। কিংবা, এ কথাও বলা খুব কঠিন, অভিনয় প্রত্যক্ষভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আনে কি না। সাধারণত আনে না। কিন্তু, খুব নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি আমি, মানকড়ের দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চরিত্রে ও আচরণে সেই সময়েই আমি কিছু কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ করেছিলুম—সাধারণ মানুষের চরিত্রোচিত ব্যবহার ও আচরণের সঙ্গে প্রায়ই যার পার্থক্য ঘ'টে যায়। প্রথমত, অভিনয়ের ক্ষেত্র ছাড়াও এঁরা কথা বলেন খুব কম এবং প্রায়ই বলেন না। আর, যেটুকু বলেন সবই ভঙ্গির মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, এঁরা নিঃসঙ্গ থাকতে ভালোবাসেন। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই পরবর্তী কয়েক দিনে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এমনকি 'মাইম' দলের সদস্যদের দু'জন, নরেনবাবু ও রাধা—স্বামী-স্ত্রী, যেটা পরে শুনেছিলুম মানকড়েরই মুখে—স্বামী-স্ত্রী হয়েও পরস্পরের মধ্যে রেখে চলেন এক অস্বাভাবিক দূরত্ব, যেটা যে-কোনো সাধারণ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে।

যা বলছিলুম, মূকাভিনয়ের দলটির সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে 'আল-প্রোটিন'-এর প্রচার চালানোর কাজে

বেবিয়ে পড়ার আগে দিন পাঁচ-ছয় নাট্যরূপ বচনার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হলো আমাকে। নাট্যরূপ, ভাষ্য ও কিছু কিছু নেপথ্য সংলাপ। এ সবের জন্যে দৈনিক এক নাগাড়ে তিন-চার ঘণ্টা আমাকে কাটাতে হতো মানকড়ের সঙ্গে, তার হোটেলে। সেখান থেকে রিহার্সালেব জন্যে যেতে হতো ভবানীপুবেব সেই পুরনো স্কুল বাড়ির ছাদে। ইতিমধ্যে দলটির সঙ্গে প্রায় পবিচিত হয়ে গেছি। নরেনবাবু, বাধা, দুলি কেষ্ট, শিউশরণ, রাজিন্দব পাঁড়ে, বুন্দেলকার, পদ্মা, যুগল—পরিচিত হয়ে গেছি এইসব নামেব সঙ্গে। ভারী অদ্ভুত এই পরিচয়—যেখানে দূরত্ব থেকেই গ'ড়ে ওঠে সম্পর্ক, অধিকাংশ বিনিময়ই চলে নৈঃশব্দোব মধ্যে। দু' একদিন যাবার পরই এদের ধরন-ধারণ আচবণ হাঁফিয়ে তুলছিল আমাকে, ঠিক বুঝতে পারছিলুম না এর কারণ কি! মানকড়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই কি এই মানুষগুলিকে আমাব প্রতি ইঙ্গিতময় ক'রে রাখে! এটা ঠিক, মানকড়ের এদের প্রতি আচরণ ক্ষমতাবান প্রভুব মতো একপেশে ও কঠোব; কিছু বা বক্রও। এটা একটা কারণ হতে পারে। নাও হতে পারে। বস্তুত, ইতিমধ্যে একধরনের ভয়ও আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। লক্ষ কবছিলুম, ইদানীং আমি নিজেও কথা বলছি কম, কিংবা বলছি ঠিক ততোটুকুই, যতোটা না বললেই নয়। লক্ষ কবছিলুম, জিব ও ঠোঁট চঞ্চল হবার আগেই চঞ্চল হয়ে ওঠে আমার অন্যান্য অবয়ব। প্রায় জোব করেই এইসব সময নাড়া দিতুম নিজেকে, যাতে ফিবে পাই ব্যক্তিত্ব।

সম্ভবত আমরা একটা গল্পের মধ্যে চ'লে যাচ্ছি। কিন্তু, আগেই বলেছি, এটা গল্প নয়। তবে, ইচ্ছে কবলে এই সব ছোটোখাটো অভিজ্ঞতা ও ঘটনা থেকেই যে গল্পের আবহ তৈবি কবা যায না, তা নয়। কমবেশি—তখনই মনে হয়েছিল আমার—এরা সকলেই এক-একটি চবিত্র; এবং যতোই ক্ষুদ্র হোক, এদের প্রত্যেকেরই ইঙ্গিত-ভারাক্রান্ত দিনযাপনেব আড়ালে কোনো-না-কোনো ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে। বিশেষত মানকড়—সে নিজেই একটি চরিত্র। একটি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে বোধ হয অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মূকাভিনয়ের দলটির গতিবিধি সম্পর্কে আমাকে একেবারে অস্পষ্ট বাখা হ'লেও কাজেব সময ছাড়াও কোনো-না-কোনো ভাবে মানকড় যে এদেব সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না কোনো। কলকাতায় থাকতে থাকতেই একদিন এই সূত্রে আমি একটি বিবল ঘটনা প্রত্যক্ষ করি।

মানকড় সাধারণত সময মেনে চলতে অভ্যস্ত। প্রতিদিনই ফেরার আগে সে আমাকে জিজ্ঞেস ক'বে নিত পরের দিন ঠিক কোন সময়ে আমি আসব। যতোদূব সম্ভব আমি এই সময মেনে চলতুম। যেদিনেব কথা বলছি সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগেই আমি হোটেলে পৌঁছুই—নির্দিষ্ট কোনো কাজের অভাবে। মানকডের ঘরের দবজায 'ড্যু নট ডিসটার্ব'-এর নোটিস ঝোলানো। ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়েই সহজ বাঙালিপনায় অভ্যস্ত আমি কলিং বেল টিপি, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করি, কোনো সাড়াশব্দ মেলে না। হয়তো অবেলায় ঘুমুচ্ছে এ-রকম একটা ধারণা থেকে পুনবায় কলিং বেল ব্যবহার করার কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খোলে এবং অল্প-ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় মানকড়ের বিরক্ত মুখ—

'হোয়াট ড্যু ইউ ওয়ান্ট? নোটিস দ্যাখেননি!'

'একটু আগেই এসে পড়েছি—', বিব্রত গলায় বলি আমি।

মানকড়ের বিরক্ত মুখের পরিবর্তন হয় না। সোজাসুজি তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, 'তাহ'লে অপেক্ষা করুন লবিতে। ঠিক সময়ে আমি ডাকব আপনাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় দরজা এবং সশব্দে। শব্দই বুঝিয়ে দেয় ঘটনাটি কতো অপমানজনক। লবির দিকে যেতে যেতে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয় আমার মধ্যে, ভাবি, ফিবে যাওযাই সঙ্গত। তবু, কোনোরকমে নিরস্ত করি নিজেকে, নানা কথা বুঝিয়ে। আসলে আমার প্রয়োজনই আমাকে নিবস্ত করতে থাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষণ্ণ আমি লবিতে ঘোরাফেবা করতে করতেই দেখতে পাই রাজিন্দরকে—'মাইম' গ্রুপের এই যুবকটির উল্লেখ সম্ভবত আগেই করেছি। উত্তরপ্রদেশের এই যুবকটি ও তার বোন পদ্মা অনেকদিন কাজ করছে মানকড়ের সঙ্গে। শুনেছিলুম পদ্মা বিধবা এবং রাজিন্দরও সম্পূর্ণ অশিক্ষিত—যদিও মূকাভিনয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অনেকদিনের। সে যাই হোক, চোখাচোখি হতেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে রাজিন্দর আমাকে এড়িয়ে যেতে তৎপর হয়ে ওঠে। অভিনয়ের সময়েই

শুধু নয়, রাজিন্দরের স্বাভাবিক পদক্ষেপেও একটা পা টিপে চলার ভঙ্গি আছে। সম্ভবত ব্যক্তিগত জীবন থেকেও এরা শব্দকে বাদ দিতে চায়।

অপেক্ষা ক্লান্ত ক'রে তুলছিল। ফলে, নির্দিষ্ট সময়ের চার-পাঁচ মিনিট আগেই আবার ফিরে যাই, মানকড়ের ঘরের কাছে, অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আর তখনই চোখে পড়ে ঘটনাটা। দেখি, মানকড়ের ঘর থেকে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে আসছে পদ্মা এবং তার পিছনে একটি রোমশ হাত দরজায় ঝোলানো ড্যু নট্ ডিসটার্বের নোটিসটা তুলে নিচ্ছে। আমাকে দেখেই করিডোরের মধ্যে থমকে দাঁড়ায় পদ্মা। কাঁধ থেকে হাত দুটো চল্লিশ ডিগ্রি রেখায় ছড়িয়ে পড়ে দু' পাশে, শক্ত হয়ে ওঠে মুঠো এবং বিস্ফারিত হয়ে ওঠে চোখ দু'টি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আমার—স্টোরি নাম্বার সেভেন, সিকোয়েন্স থ্রি। বস্তুত, এই দৃশ্যে পদ্মা হাততালি পাবার মতোই অভিনয় করে।

মূকাভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র অবলোকন করতে গিয়ে এরকম আরো অনেক ঘটনাই আমি প্রত্যক্ষ করি ; এ-রকম একটি খণ্ড রচনায় তার সব বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়। তবে, দু'একটি ঘটনা হয়তো এখানেও উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রথমটি : অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনশন ধর্মঘট।

ঘটনাটি ঘটেছিল ফুলবেড়িয়া গ্রামে। এই গ্রামটিকে কেন্দ্র ক'রে আশপাশের চার-পাঁচটি অঞ্চলে সে সময় আমরা শো ক'রে বেড়াচ্ছি। জায়গাটার একটা সুবিধে ছিল ; গ্রাম-গাঁ হ'লেও এখানে বিদ্যুতের অভাব নেই কোনো এবং রাস্তাঘাটও মোটামুটি ভালো। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি অর্ধসমাপ্ত পাকা বাড়িতে ক্যাম্প পড়ল আমাদের। নিজে আলাদা থাকার সুবাদে মানকড় আমার জন্যেও একটু আলাদা ব্যবস্থা করেছিল। আলাদা মানে ঐ আর কি—মেঝের বদলে তক্তপোশ, কাঁচের গ্লাসে জল, ইত্যাদি। তিনবেলা খাবার আসে কাছাকাছি এক গ্রাম্য রেস্তোরাঁ থেকে।

কেষ্ট নামে একটি ছেলে ছিল আমাদের দলে, বাংলা ও হিন্দি দু'ভাষাতেই কথা বলতে পারত এবং প্রায়ই মিশিয়ে। এলাহাবাদের ছেলে। অভিজ্ঞতা বলে, দলের মধ্যে সে'ই যা একটু সবাক ছিল। বিপত্তি ঘটল তাকে নিয়েই।

জায়গার নাম বাণী। হ্যাজাক জ্বালিয়ে শো হবে। এই ধরনের অনুষ্ঠান জমানোর জন্যে যা করণীয় সকাল থেকেই বেরুতে হয় চোঙা নিয়ে ঘোষণায়, হাতে লেখা পোস্টারে লেই লাগিয়ে টাঙাতে হয় থানা, বাজার, বি-ডি-ও অফিস ও পোস্টাপিসের দেয়ালে। এ কাজগুলো কেষ্টই করত। অভিনয়ের জায়গায় পৌঁছে সমস্ত ব্যাপারটা একবার সরেজমিনে তদন্ত ক'রে নিত মানকড়।

সেদিন শো শুরু হবার সময় পেরিয়ে যেতেও লোকজন না আসায় বীতিমতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল মানকড়। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেকআপ নিয়ে তৈরি, পোর্টেবল মাইক্রোফোন সাজিয়ে আমিও তৈরি—একরকম হতাশা থেকে মাঝে মাঝে 'হ্যালো' 'হ্যালো' ক'রে যাচ্ছি। তাতে দু'চারজন আগাছা কিশোর সমবেত হলেও কাজের কাজ কিছু হলো না। বলতে ভুলে গেছি, এ-ধরনের প্রচার কার্যের সাফল্যের প্রমাণ গ্রাম-প্রধানের সীলসহ সার্টিফিকেট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি কাছেই থাকেন। তাঁর কাছে খোঁজখবর করতেই জানা গেল শো-এর ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না, এমন কি তাঁর কাছেও কেউ আসেনি। একটুক্ষণ বিব্রত থেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে মানকড় তাঁকে কী বোঝালো কে জানে, দেখলুম খড়ম পায়ে তিনি গুটি গুটি চলেছেন শো-এর জায়গায়। তাঁর পিছনে পিছনে ক্রমশ জড়ো হতে লাগল আরো কিছু লোক। তখন নিজেই মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে পবিত্রাহি গলায় চ্যাঁচাতে লাগল মানকড়, 'ভাইসব, বোনসব—এ গ্রামের বিলকুল মেয়েপুরুষ সব লোকজন—চলে আসুন, দলে দলে আসুন—দেখুন কেমন মজা হয়, যাত্রা হয়, নাটক হয়—দেখুন বোবা মেয়েছেলে, পুরুষ ছেলে কেমন লাফালাফি, কাঁদাকাঁদি করে—' ইত্যাদি। উৎসাহী ছেলে-ছোকরাও কিছু জুটে গেল দলে। মেয়ে-পুরুষের মোটামুটি ভিড় জমতে শো শুরু হলো। কেষ্টর দেখা নেই তখনো। দুটো স্টোরির মাঝখানে অল্প বিরতিতে থমথমে মুখে মানকড় বলল, 'বানচোত্ যাবে কোথায় ! ওর লাশ ফিরত যাবে এলাহাবাদে।'

বস্তুত ঘটলও তাই। সেদিন শো-এর পর ক্যাম্পে ফিরে পাওয়া গেল কেষ্টকে। নেশা ক'রে চুর

শোনা গেল স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও গডাগড়ি যাচ্ছিল রাস্তায়। পোস্টারের বাণ্ডিল সমেত লোকজন তুলে দিয়ে গেছে ক্যাম্পে।

মানকড সম্ভবত এইরকম একটি দৃষ্টান্তের অপেক্ষাতেই ছিল। কেষ্টকে দেখার পর যে-রূপে ও ভূমিকায় সে নিজেকে আবির্ভূত করল, তা নিশ্চিত কোনো মানুষের নয়। আরো আশ্চর্য, মূকাভিনয়ের পাত্র-পাত্রীরাও ক্রমাগত দেখিয়ে গেল প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের অদ্ভুত সংযম—চাবুকের আঘাতে একটি নেশাগ্রস্ত যুবকের চামডা ফুটে রক্ত বেরুনোর মতো বিস্ময়কর দৃশ্য যেন আর হতেই পারে না।

মানকড় চ'লে যাবার পর আমি একটু একা হলুম। একা, কেননা মূকাভিনেতা নই। বাডির সামনে মাটিতে প'ড়ে আছে একটি ক্ষতবিক্ষত মানুষ, মৃত নয় বোঝা যায় মাঝে মাঝে তার এপাশ-ওপাশ মাথানাডা দেখে। তবে অর্ধমৃত নিশ্চয়ই। দেখলুম, একে একে তার পাশে এসে দাঁডাচ্ছে অন্যরা, মূক। লোকটিকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো ঘরে। গলার স্বর শুনে বোঝা গেল না কে ফার্স্ট-এড বক্সের খোঁজ করছে। দীর্ঘ সময় পরে পরে কথা বলার ফলে এদের কণ্ঠস্বরের প্রাথমিকতা কখনোই জডতামুক্ত হয় না এবং প্রায়ই উচ্চারিত হয় স্তব্ধতা মিশিয়ে।

পরের দিন সকালে জানা গেল পুরো দলটিই ধর্মঘট শুরু করেছে। রাতে পরিবেশিত খাদ্য পড়ে রয়েছে যেমন কে তেমন, ছোঁয়নি কেউ। ঘরে ও বারান্দায় কাছাকাছি দূরত্ব রেখে ব'সে আছে কয়েকটি মেয়ে ও পুরুষ, চোখেমুখে ও বসার ভঙ্গিতে সুস্পষ্ট ক্লান্তি, গত সন্ধ্যার রঙ মুছে না ফেলায় মুখগুলি আরো কিম্ভূত লাগে। যাকে নিয়ে এতো কাণ্ড, সেই কেষ্টকে সম্ভবত আগলে রেখেছে কোথাও।

আমি তৃতীয় পক্ষ, স্বভাবতই দূরে দূরে থাকছি। দায় মানকড়ের, ব্যাপারটার গুরুত্ব আঁচ করেই সম্ভবত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সে। বেলার দিকে একটা বোঝাপড়ার জন্যে নরেনবাবু ও বৃন্দেলকারকে ডেকে পাঠিয়েছিল ঘরে, সেই সময় তাদের মধ্যে চাপা গলায় কিছু কথাবার্তা হয়, কিন্তু কাজের কাজ হয় না কিছুই। প্রমাণ, অনশনকারীরা স্থান পরিবর্তন করেনি—গত রাতের পর সকালে যাকে যেখানে দেখা গিয়েছিল পরেও দেখা যাচ্ছে সেখানে। চা জলখাবার ছোঁয়নি, খাবার ছোঁয়নি। সেখানে মাছির রাজত্ব। এইভাবে দুপুর গড়িয়ে গেল।

আজ রাতের শো হবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। চিন্তাগ্রস্তভাবে মানকড়ের ঘরে ঢুকে দেখলুম হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে সে ব'সে আছে চুপচাপ। কথাটা জিজ্ঞেস করতে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ডোন্ট নো—'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে পর পর দেখা যায় শিউশরণ, বৃন্দেলকার ও নরেনবাবুকে। একটু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ঢুকে পড়ে ঘরে—পিছনে পিছনে আরো কয়েকজন। অর্ধচন্দ্রাকারে মানকডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, কেননা, এই প্রথম একটি উপলব্ধি আমার শরীরে শীতের অনুভূতির মতো বিশিষ্ট হতে থাকে. মূকাভিনয়ের প্রচণ্ডতা যে ভাষার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অস্পষ্ট রঙমাখা মুখগুলির প্রত্যেকটি চোখে একই রকম অভিব্যক্তি, একই অভিব্যক্তি দাঁড়ানোর ও হাত মুঠো করার ভঙ্গিতে। মানকড়ের চোখ ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মুখের ওপর। প্রায় মিনিট দশেক এইভাবে কাটানোর পর উঠে দাঁড়ালো মানকড়, হাত জোড় করল এবং বলল, 'বাবা, মাফ কর দেও। আর এমন হবে না—'

বৃন্দেলকারের ইঙ্গিতে লোকগুলি তখনই প্রস্থান করল, একে-একে, নিঃশব্দে। প্রস্থানের এই মূক ভঙ্গিতে এক ধরনের বিষণ্ণতা আছে—যা অতর্কিতে শব্দের সৃষ্টি করে, এবং স্বস্তির, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায় বহুদূর আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া অদৃশ্য প্লেনের মতো এক দূরত্ব।

সেদিন রাতে আর শো হয়নি। মানকড় নিজেই বন্ধ করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল চব্বিশ পরগণা ভ্রমণের সময়। এই ঘটনাটির খুঁটিনাটি আমার খুব ভালো করেই মনে আছে, কারণ এই ঘটনার পরেই বিক্ষুব্ধ আমি মূকাভিনয়ের দল ছেড়ে চলে আসি।

সেবারও ক্যাম্প পড়েছিল একটি স্কুলে। এটিকে বেস বলা হয়—এটিকে কেন্দ্র করে বিশ-বাইশ মাইল দূর পর্যন্ত এক-একটি জায়গায় শো অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলবাড়ির এক প্রান্তে দু'টি ঘরে থাকি আমি আর মানকড়, আরেক প্রান্তে অন্যান্যরা। অসুস্থতার কারণে সেদিন আমি দু'তিনটি স্টোরি কভার করেই

চ'লে আসি বেসে। আমাদের যাতায়াতের জন্যে একটি জীপ ও একটি স্টেশন ওয়াগনের ব্যবস্থা ছিল, জীপটি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে যায় শো-এর জায়গায়। অসুবিধা হবার কথা নয়; ইতিমধ্যেই শুনে শুনে বিভিন্ন সিকোয়েন্সের ভাষ্য রপ্ত ক'রে নিয়েছিল মানকড়; জানতুম অশুদ্ধ উচ্চারণে হ'লেও ধারাবিবরণীর কাজ সেদিনের মতো সে নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে।

পরবর্তী সময়প্রবাহ বিষয়ে হুঁশ ছিল না কোনো। তবু হঠাৎই, ঘুমের মধ্যে ঘুম ভেঙে উঠে বসি আমি। একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি অনেকক্ষণ ধ'রে—কর্কশ ও থমথমে, শব্দটা অনুসরণ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে মানকড়ের ঘরের সামনে পৌঁছে যাই। দরজা বন্ধ। বাইরের অবিমিশ্র অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেনা গেল তাকে—নরেনবাবু। সম্ভবত দরজায় আঘাত করছিল।

বিষয়টা বোধগম্য হচ্ছিল না কিছুতেই! 'কী হয়েছে' জিজ্ঞেস করাতে অস্ফুট উচ্চারণে লোকটি কী বলল বোঝা গেল না, তারপরেই কপাল চাপড়াতে শুরু করল দু'হাতে। সেই মুহূর্তের আচ্ছন্নতাই সম্ভবত জ্ঞানশূন্য ক'রে তুলল আমাকে। বন্ধ দরজায় আঘাত করতে করতে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'মানকড়, মিস্টার মানকড়—দরজা খুলুন—'

দরজা খুলল একটু পরে। মানকড় নিজেই খুলল। সে কিছু বলবার আগেই লণ্ঠনের আলোয় চোখে পড়ল, তক্তপোশের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসেছে রাধা। এটা গ্রাম, কলকাতার হোটেল নয়—মানকড়ও সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে উঠেছিল, না হ'লে সে আগের মতোই আত্মবিশ্বাসে তিরস্কার করে উঠত। এই অব্যবস্থার সুযোগে আমরা সবাই ঢুকে পড়েছি ঘরের মধ্যে।

কিন্তু, পরবর্তী ঘটনার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ করলুম, নরেনবাবুর হাতে একটি ছুরি—মানকড়ের থেকে গজখানেক দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে সে, অদ্ভুত ভঙ্গি শরীরের, সমগ্রভাবে প্রস্তুত— মনে হয় এর পরেই সমবেত দর্শকদের হাততালিতে মুখর হয়ে উঠবে পরিবেশ। আতঙ্কজনক অবস্থা। কী করব বুঝতে না পেরে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকলুম আমি।

মানকড় বা রাধার সম্পর্কে এখানে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি লক্ষ করছি নরেনবাবুকে। মূকাভিনেতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তার চোখে—খুন করার আগেই সে পরিপূর্ণভাবে খুনীকে গ্রহণ ক'রে নিতে পারে চোখে। অভিব্যক্তিই এখানে চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। খুন করার পর অনুতপ্ত খুনী যা যা করে, নরেনবাবুর সেই মুহূর্তের আচরণে সেইসব ধারাবাহিকতায় ত্রুটি ঘটল না কোনো। ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে কপালের ঘাম মোছার ভঙ্গি করল, চ'লে গেল দূরত্বে—তারপরেই চকিতে পিছনে ফিরে রাজহাঁসের ডানা ঝাড়ার মতো লম্বমান দুটি হাত কাঁপাতে কাঁপাতে ঘুরতে লাগল আমাদের চারদিকে।

এতোক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল মানকড়, 'নরেনবাবু!' সেই চিৎকারে সফল মূকাভিনেতার একাগ্রতায় বাধা পড়ল না কোনো। মেঝেয় হাঁটু মুড়ে ব'সে সে তখন মৃতের জন্যে শোক করতে ব্যস্ত।

আমার হুঁশ হলো পরে, যখন প্রায় আর্তনাদ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল রাধা, 'পাগল—ও পাগল হয়ে গেছে—'

বলেছি তো, সেদিনই আমি ফিরে আসি।

গুপ্ত বিপ্লব

অনশনকারীদের একজনের নাম সুরথ। লক-আউট ঘোষিত হবার পাঁচদিন পরে সে এলো মুঙ্গের থেকে।

স্টেশন রোড ফালি হয়ে ঘুরে গেছে রাণ্ডিচকের দিকে। এককালে বনবাদাড় ছিল ; রাতে শোনা যেত আতঙ্কিত শিয়ালের ডাক, ঝালার শব্দে একটানা ডেকে যেত ঝিঁঝি, ক্বচিৎ নেকড়ের পদক্ষেপ যে-কোনো শিশুর জননীকেই করে তুলত সন্ত্রস্ত। বস্তুত, শর্টকাটের জন্যে শ্মশানযাত্রীরা ছাড়া রাতের দিকে আর কেউই ও-পথ মাড়াত না। পরে অবশ্য দিনকাল বদলে যায়। দু'একটি কারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোখাটো প্রয়োজন মেটানোর মতো দোকানও খোলে কয়েকটি। পাকা বসতি জমাতে এই সময়ই আগমন ঘটে বেশ্যাদের। তারা আসে পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা থেকে, এ-স্টেশন ও-স্টেশন ঘুরে, শ্লথগতির ট্রেনে চেপে—স্ত্রী-পুত্রহীন প্রবাসে কারখানা শ্রমিকদের শরীরের খিদে মেটানোর জন্যে। ইচ্ছেমতো হিসি করার তৎপরতায় আমাদের ছোটো বয়সে চমকপ্রদ এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যায় স্বচ্ছন্দে।

প্রবাসী এইসব শ্রমিক ও ক্বচিৎ মালিকদেরও শরীরে খিদের সঙ্গে দয়াও কম ছিল না। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে উঠে আসা বেশ্যাদের পরিশ্রম লাঘব করার জন্যে কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে ওঠে সেখানের ভাষায় ঝোপড়ি—বাঁশ-বাখারির দেওয়ালের ওপর তালপাতার ছাউনি। সামনে বড়ো মাঠ। বাতে ভেজানো শরীর শুকোতে দিনের রোদ্দুরে বেশ্যারা গড়াগড়ি যেত মাঠের সবুজে—উদোম গায়ে যেটুকু কাপড় না রাখলেই নয়, রাখত না তার বেশি, মুখে খিস্তি ছুটত অনর্গল। কারখানার জানলা থেকে কয়েদির চোখে সেদিকে তাকিয়ে শ্রমিকরা ভাবত রাতের কথা।

দু'যুগ পরে বেশ্যার নামগন্ধ না থাকলেও তাদের স্মৃতি থেকে যায় রাণ্ডিচক নামে। থেকে যায় রক্তেও। বেশ্যা হলেও, বলা বাহুল্য, সে-সব রমণীরা ছিল নারী এবং যথোপযুক্তভাবে প্রজননক্ষম—শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া থেকে কখনো-সখনো ফুলে উঠত তাদের পেট ; এইভাবে অস্থিরতা থেকে সেই সময়েই জন্ম নিয়েছিল কতিপয় শিশু। শোনা কথা, কলকারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাণ্ডিচকে বেশ্যাদের আধিপত্য খর্ব হলেও তাদের সন্ততিদের অনেকেই মিশে যায় ওই শ্রমিকদের মধ্যে।

যে-কারখানায় লক-আউট তার প্রধান দফতর মুঙ্গেরে। সুরথকে যে আসতেই হতো তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবু সে এসেছিল আত্যন্তিক তাগিদে, ভিতরের প্রেরণায়।

সদ্য-বিবাহিত বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এই দেশীয় যুবকটির চেহারায় স্বাস্থ্য ছিল, মনে আবেগ এবং কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। ভূমিহার বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আদর্শের কারণে পিতা-পিতামহের ভূমিকার ছিটেফোঁটাও প্রবেশ করতে পারেনি তার ব্লু-ব্লাডে। লেখাপড়ায় তেমন চৌকশ না হলেও ছোটো বয়সেই উত্তর বিহারের এক গুপ্ত বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসে শোষণ ও নির্যাতন বিষয়ে শিখেছিল অনেক। নিজেকেও ভাবত একজন গুপ্ত বিপ্লবী। এমনকি, তখনই, নিজের বাপ-জ্যাঠাকে প্রকৃত শ্রেণীশত্রু বলে চিনতে সামান্য অসুবিধে হয়নি তার। বছর তিনেক আগে প্রথম সুযোগেই তাই সে শ্রমিকের চাকরি নেয়। কেজরিওয়ালা এন্টারপ্রাইজের কারখানা ইউনিয়নে সে এখন কমিটি মেম্বার—কথা বলে আত্মবিশ্বাস মিশিয়ে, যুক্তিতে নড়ে না কখনো, সাহস আছে প্রচণ্ড। সবচেয়ে বড়ো কথা, সে সমাজবাদ ও সমানাধিকারে বিশ্বাসী।

রাণ্ডিচক কারখানায় লক-আউটের খবর নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অস্বস্তিতে কেঁপে উঠল মুঙ্গের কারখানার শ্রমিককুল। রাণ্ডিচক ইউনিয়নের শিশুকাল কাটেনি তখনো—অস্তিত্ব

বলতে নামমাত্র, শ্রমিকদের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা ; খবর এলো মালিকপক্ষ তারই সুযোগ নিয়েছে। খবর নিয়ে এলো রাণ্ডিচকেরই একজন। নতুন ওয়ার্কস্ ম্যানেজার **কেজরিওয়ালাদেরই আত্মীয়**। জয়েন করার প্রথম দিনেই দেরিতে ডিউটিতে আসার জন্যে ছাঁটাই করে একজনকে, শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে, ব্যাপারটা তখনই জটিল রূপ নেয়। হয়তো তখনো সুযোগ ছিল একটা সমাধানে পৌঁছুনোর , গেল না—ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের ইতিহাস-জ্ঞানই বানচাল করে দিল সমস্ত সম্ভাবনা। সে জানে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় প্রতিবাদকারীদের। আন্দোলনের প্রথম ঝোঁকেই জিবে আড়ষ্টতা না রেখে সে এদের সম্বোধন করল **'বেশ্যার বাচ্চা'** নামে।

কথাটায় কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া **সম্বোধনে** যদি গর্হিত কিছু থাকে, তাহলে বেশ্যার বাচ্চারাও সত্য-সম্বোধনে টলবে বইকি ! আসলে তাদের লেগেছিল অন্য জায়গায়, অসহায়তায়—জন্মে যেহেতু কোনোই অধিকার নেই, জন্মের দাসত্বই বা তারা বহন করবে কেন ! লোকটি প্রহৃত হলো।

মুঙ্গেরে মালিকপক্ষ এবং ইউনিয়নের যৌথ বৈঠকে প্রথম প্রস্তাব আনল সুরথ। লক-আউট প্রত্যাহার করে নিতে হবে। উত্তর : বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ এবং ছাঁটাইয়ের নির্দেশ বহাল। তখন দ্বিতীয় প্রস্তাব আনা হলো : কথাগুলো প্রত্যাহার করাই শুধু নয়, নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে ওয়ার্কস্ ম্যানেজারকে। উত্তর : কথাগুলো যে আদৌ উচ্চারিত হয়েছিল তার প্রমাণ নেই কোনো। কিন্তু, লোকটিকে যে অন্যায়ভাবে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল তার প্রমাণ মাথায় ব্যান্ডেজ জড়িয়ে সে এখনো শুয়ে আছে হাসপাতালে। পুলিশের **ডায়েরিতে** মার্ডারের অ্যাটেম্পট্ রেকর্ডেড হয়েছে এবং গ্রেপ্তার হয়েছে দু'জন। ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ইউনিয়ন হতাশ বোধ করল। এক্ষেত্রে অসুবিধে একটাই। জন্মসূত্রে মালিকপক্ষ কখনোই বেশ্যাগর্ভজাত হতে পারে না ; সুতরাং পাল্টা সম্বোধন অকেজো হতে বাধ্য। কিন্তু, তথাকথিত বেশ্যার বাচ্চাদেরও আছে অপমানবোধ এবং শারীরিক শক্তি। প্রথমটি, খুব স্বাভাবিকভাবে, প্ররোচিত করেছিল দ্বিতীয়টাকে। উপলব্ধির আকস্মিকতা পরবর্তী ও সম্ভাব্য যে-কোনো প্রস্তাবই মূক করে রাখল।

মীটিং ভেঙে গেল। বেরিয়ে এসে নতুন প্রস্তাব দিল ইউনিয়ন : অনশন শুরু করো। কারণ, সুরথই বলল, এখন উপায় কেজরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। প্রহার যদি লক-আউটের পক্ষে কোনো সহানুভূতি সৃষ্টি করে থাকে, অনশনকারীদের ক্ষুধার্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়েই তা ক্ষয় হবে। ঘটনার গতি লক্ষ করে মুঙ্গেরেও ধর্মঘট ডাকা যেতে পারে।

রাণ্ডিচকের লোকটি অনশন স্কোয়াড গড়তে চলে যাবার আগে নির্যাতিত শ্রমিকদের সমর্থনে কেজরিওয়ালা এন্টারপ্রাইজের মুঙ্গের কারখানার গেটের বাইরে সেদিন যে জমায়েত হয় তা এককথায় অভূতপূর্ব। মানুষের শক্তির প্রধানতম উৎস **মানুষ—সমবেত** ও কাতারে কাতারে জোটবদ্ধ মানুষ, এটা টের পেয়ে তার বক্তৃতার **স্ট্র্যাটেজি** ঠিক করল সুরথ। কেন অনশন, এ-বিষয়ে তার কিছু বলার আছে।

প্রথমত, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উপায় **হিসেবে** এটি সবচেয়ে মোক্ষম ; কারণ, অনশনের আবেদন প্রধানত বিবেকের কাছে। নিরস্ত্র ও অহিংস একদল মানুষ বাঁচার তাগিদে সর্বজনসমক্ষে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে আত্মহত্যার দিকে—সহানুভূতি অর্জনের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের আন্দোলনে যেটা সবচেয়ে **বেশি** দরকার তা হলো বিক্ষোভকারীদের মনে পারস্পরিক ও আত্মিক ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলা, যাতে প্রকৃতভাবে তারা কাজ করতে পারে একসঙ্গে, একমাত্র শক্তি হিসেবে। সেটা সম্ভব একমাত্র অনশনের দ্বারা—যন্ত্রণাবোধের তারতম্য থাকলেও, অনশনই একমাত্র উপায় যা সকলকে একই সঙ্গে ধাবিত করে একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে। আত্মোপলব্ধি যতো তীব্র হয় ততোই একাগ্র হয়ে ওঠে নিজের ও অন্যের পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতনতা ; ক্রোধ ও হিংসা—ইত্যাকার প্রতিবাদের যেগুলো বাহ্যিক রূপ—খুঁজে পায় কী করতে হবে না হবে তার প্রকৃত নির্দেশ।

বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিশেষভাবে পাওয়া দরকার সেই নির্দেশ এবং তা আসা দরকার নেতৃত্বের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে নয়, প্রত্যেকের **নিজের** ভিতর থেকে। আন্দোলনের শুরুতেই আমরা কিছুটা

পিছিয়ে পড়েছি, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। জয় আমাদের হবেই। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমাদেব উপলব্ধি যতো তীব্র হবে, এক হবে ঐক্য, শত্রুকে সমূলে বিনাশ করার দিকে ততোই এগিয়ে যাব আমরা।

জনতা উদ্দাম হলো। এক লক্ষ বাজপাখির একসঙ্গে উড়ে যাওয়ার ধ্বনি ফুটে উঠল সমবেত হাততালিতে। মনে হলো বিষয়টির সঙ্গে তারা হতে পেরেছে একাত্ম। হাততালি থেমে যেতে-না-যেতেই উঠল আর একটি ধ্বনি, 'সুরথজী, জিন্দাবাদ—'

লক-আউটের পর পঞ্চম দিনে রাণ্ডিচক ক্যাম্পে অনশনকাবীদের মদত দিতে নিজেই এগিয়ে এলো সুরথ! মুঙ্গের থেকে সাইকেলে **জামালপুর,** সেখান থেকে ট্রেনে ঘণ্টা দেড দুইয়ের বেশি লাগে না। পরনে ধুতি ও শার্ট, পায়ে কাবলি চটি, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে দু'একটি বাড়তি জামা-কাপড। এব বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না অনশনযাত্রীব—শক্তিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অন্যান্য যাবতীয় বসদই সে সংগ্রহ কববে ভিতর থেকে।

তবু, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পিছুটানে দুলে যায সুরথ। আগেই বলা হযেছে লোকটি সদ্য-বিবাহিত। বিয়ের পাঁচ মাস পরে এই প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলো তার—ট্রেন চলতে শুরু করাব সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল সে বলে এসেছে দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিববে। এটা বলেছিল কেন? স্ত্রীকে স্তোক দেওয়ার জন্যে, নাকি সে নিজেও তাই বিশ্বাস **করে**? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য চিন্তাটাকে তাড়িযে দিল সে। গুপ্ত বিপ্লবী বলেছিল, বিপ্লবী যাওয়ায় বিশ্বাস করবে, ফেরায় নয। সে কখনোই এক জায়গায়, এক মানুষ এবং একই পরিস্থিতির মধ্যে স্থির করে রাখবে না নিজেকে। তাকে এগোতে হবে এবং সে এগিয়ে যাবে। ইত্যাদি ভেবে ট্রেনে সীট থাকা সত্ত্বেও সুরথ দাঁড়িয়েই থাকল, টান-টান, মেরুদন্ড সোজা করে। এক লক্ষ বাজপাখির একসঙ্গে উড়ে যাওয়ার শব্দ এবং 'সুবথজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি তাকে সচেতন করে তুলল অব্যবহিত বর্তমান সম্পর্কে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ক্লিন্ন ও ক্ষুধার্ত কযেকটি অনশনব্রতী মুখ। শত্রুপক্ষের সমূহ শক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না হয়েও তারা চায় জিততে। অনশনের দার্শনিক ব্যাখ্যাই সম্ভবত তাদের প্রলুব্ধ করেছে **বেশি**। যে জেতাবে সে এখন দূবত্ব পাব হচ্ছে নিঃশব্দে। চিন্তাটা সামান্য কাঁপিয়ে দিল সুবথকে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেদিকে জনপদ সুরথ হাঁটতে লাগল তার উল্টোদিকে। এব আগে বাব দু'তিন এ-খানে এলেও রাস্তা যে খুব চেনা তা নয়। স্টেশন রোড ধবে খানিকটা এগিয়েই আকাশেব দিকে উঁচু-করা চিমনি চোখে পড়ল তাব; খাঁ খাঁ দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে, সন্ধ্যার আবছাযায় সেটাকে দূব জাহাজের মাস্তুলের মতো লাগে। ঠিক তার ওপরে জ্বলজ্বল করছে একটি তারা। অন্য সময হলে নিশ্চিত ধোঁয়া উঠত, পরিচ্ছন্ন আকাশ হারিয়ে যেত কালো পাকানো ধোঁয়ায় এবং মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকিতে। এখন সে-সব কিছু নেই। আছে শূন্যতা—হয়তো থাকবে আরো অনেকদিন। একলক্ষ্যে তাকিয়ে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে তারাটা দপ্ করে জ্বলে উঠল সুরথের বুকের মধ্যে। এই মুহূর্তেব অনুভূতিটাকে ভয় বলে চিনতে অসুবিধে হলো না তার। হঠাৎ খেয়াল হলো আর একটু এগোলেই সমবেত অনশনকারীদের সম্মুখীন হবে; তার কাজ অনশনে যোগ দিয়ে তাদের মনোবল অটুট রাখা। তারপর কী হবে না হবে জানা নেই। তার আগে—এমনও হতে পারে, এই তার শেষ পথ হাঁটা। ভাবনাটাকে জমতে দিল না সুরথ। বিপ্লবীর কাজ এগিয়ে যাওয়া, সে শক্তি সঞ্চয কবে ভিতর থেকে। তফাত এইটুকু, শক্তির উৎসে যে উত্তেজনা **থাকে,** সহানুভূতিতে এখনো তাব কোনো প্রভাব খুঁজে পাচ্ছে না। হয়তো পাবে। ক'দিন আগে, বক্তৃতায়, সে নিজেই বলেছিল ব্যাপারটা পারস্পরিক। মানচিত্রে অখ্যাত রাণ্ডিচক নামে ভূখণ্ডে পৌঁছে কয়েকজন ক্ষুব্ধ অনশনকারীর সান্নিধ্য হয়তো এ-ব্যাপাবে সাহায্য করবে তাকে।

অনশনকারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল। কারখানার বড়ো ফটক বন্ধ, তাব সামনে পুলিসের প্রহরা। তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে বিশেষ কিছুই মনে হলো না সুরথের—জনচারেক রাইফেলধারী পুলিসের নিষ্ক্রিয় বসে থাকায় ঘটনার স্মৃতি আছে শুধু, আব কিছু নয়। রাস্তা ফাঁকা, স্তব্ধ জীবন-প্রবাহের কারণে দোকানপাট যে ক'টি আছে সব বন্ধ। একটি দুটি লোক

ক্বচিৎ হেঁটে যাচ্ছে নিঃশব্দে। শব্দ বলতে প্রহরারত পুলিসদের পারস্পরিক বাক্যালাপ। এতোই মশগুল তারা যে সুরথের প্রখর দৃষ্টিপাতেও সামান্য বিচলিত হলো না। কোনোক্রমে জ্বলা টিমটিমে গ্যাসের আলোয় তাদের মুখগুলি অস্পষ্ট, তবু, আলস্যের ভাবটা চোখ এড়াল না সুরথের। এ-রকম আলস্য একটা অসম যুদ্ধের সম্ভাবনাই প্রগাঢ় করে তোলে, যেন চারজন যে-কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে চার লক্ষে—শুধু কারখানা নয়, যেন সমস্ত এলাকাটাই বন্ধ হয়ে আছে তাদের দখলে। তাতে বিপন্ন বোধ করার কারণ নেই কোনো। কারখানার দেয়ালে লটকানো অন্ধকারে অস্পষ্ট পোস্টারগুলির দিকে তাকিয়ে হাতের মুঠো শক্ত করল সুরথ ; এ-সবই বানচাল হয়ে যেতে পারে একটি ছোটো আঘাতে। শক্তির পরিমাপ তার ব্যাপকতায় নয়—বিস্ফোরণ ক্ষমতায় ; অনশনকারীদের প্রধান অবলম্বন তাদের ধৈর্য ; বিপ্লবীর কাজ এগিয়ে যাওয়া। মেধাবী ছাত্রের স্মৃতি-বিচরণের মতো এ-সবই তার চিন্তায় এলো পরপর। সুরথ এগিয়ে গেল।

কারখানার চৌহদ্দি ছাড়িয়েই বড়ো মাঠ। রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাঠে। রাস্তা থেকেই সেখানে চোখে পড়ে হ্যাজাকের আলো, ত্রিপল টাঙানো ছাউনির নীচে অনশনকারীদের অবস্থান। সংখ্যায় তারা কম হবে না। অল্প থেমে দাঁড়িয়ে গুনবার চেষ্টা করল, ঠিক ধারণা হলো না। দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন ঘরবাড়ির আলো দেখা গেলেও ছাউনির বাইরে মাঠ জুড়ে অন্ধকার। শোনা কথা, এককালে দিনের রোদ্দুরে বেশ্যারা গা শুকোতো এখানে, সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। সম্ভবত এখনো হাওয়ায় মিশে আছে তাদের নিঃশ্বাস। কথাটা ভেবেই গা সিরসির করে উঠল সুরথের। 'বেশ্যার বাচ্চা' কথাগুলো উচ্চারিত না হলে সম্ভবত এই লক-আউট এড়ানো যেত। তার নিজের শরীরে আছে খাঁটি ভূমিহারের রক্ত। এখানে দাঁড়িয়ে, এই মুহূর্তে, অপমানের গভীরতা স্পর্শ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলেও সে ব্যর্থ নয়। বিপ্লবীর কাজ সম্ভাবনাগুলোকে উস্কে দেওয়া এবং ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। নিরপেক্ষ হলেও, শত্রু উৎখাতের কাজে স্বচ্ছন্দে মিশে যেতে পারবে এদের সঙ্গে।

রাতের অন্ধকারে সুরথের হঠাৎ আবির্ভাব অনশনকারী ও তাদের সঙ্গীদের অভিভূত ও বিমূঢ় করে রাখল কিছুক্ষণ। তারপরেই মাঠ কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠল, 'সুরথজী জিন্দাবাদ—'

অনশনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটির নাম দুখন। রোগা, খাড়া চেহারা, পাক ধরেছে মাথার চুলে। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি ও ময়লা ধুতি, শীর্ণ গালে তিন-চারদিনের জমা দাড়ি, চোখের কোণে পিচুটি। সকলের আগে এই লোকটিই এগিয়ে এলো, জড়িয়ে ধরল সুরথকে।

'আও, বেটা, আও। হাম সবকো মদত দেও।'

আলিঙ্গন ছাড়াতে গিয়ে সুরথের হাত দুখনের পাঁজর ছুঁয়ে গেল। আঙুলগুলো বিস্তৃত হতে চাইছে। তবু, দ্বিধা কাটিয়ে, সুরথ বলল, 'হাম সব এক হ্যায়। 'সুরথজী জিন্দাবাদ', আজ ইস বখতসে ইয়ে নারা নেহি চলে গা। বোলিয়ে, হামারা মাং পুরি হোগা—'

তখন মাঠ কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠল, 'হামারা মাং পুরি হোগা—'

মাঠ কেঁপে উঠলেও সদ্য-আগত অনশনকারীর কানে সেই চিৎকারের বৈষম্য বাজল বিশেষ করে। অনশনকারীদের কণ্ঠস্বর অন্যান্য মানুষের কণ্ঠস্বরের চেয়ে কিছুটা আলাদা হলেও হতে পারে—এই ভেবে ওই ধ্বনির সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে নিতে চাইল সুরথ, যাতে তফাতটা বুঝতে পারে।

'ইনক্লাব—'

'জিন্দাবাদ।'

এবারেও পার্থক্যটা ধরা পড়ল না স্পষ্ট। তবে, টের পেল সুরথ, এতোক্ষণ দ্বিধান্বিত তার নিজের ভিতর থেকে উঠে আসছে পরিচ্ছন্ন আবেগ, উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। তাকে ঘিরে অন্তত আঠারো বিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে। বিষণ্ণ মুখগুলি, মুখের চেয়ে স্পষ্ট তাদের চোখ। তাদের থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক। জানকীরাম, পরিষ্কার চিনতে পারল সুরথ, রাঙাচক ইউনিয়নের সেক্রেটারি। মুঙ্গের থেকে অনশনের নির্দেশ নিয়ে সেই এসেছিল এখানে ; সম্ভবত এ ক'দিনের ধকলেই রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। চোখাচোখি হতেই মুখ নিচু করল।

সুরথ এগিয়ে গেল। নেতৃত্বের ধারণা তাকে শিখিয়েছে অনেক ; জানকীরামের কাঁধে হাত রেখে

বলল. 'সব ঠিক হ্যায়, জানকীরাম ?'

মৃদু মাথা নেড়ে লোকটি বলল, 'জী।'

শতরঞ্জির ওপর কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রাখল সুরথ, জামাটা খুলল। বসতে বসতে বলল, 'আজ পঞ্চম দিন। দরকার হলে পঞ্চাশ দিন চালাতে হবে এই অনশন। নতুন নতুন লোক যোগ দেবে। আমার কাছে খবর আছে, কেজরিওয়ালারা এরই মধ্যে ভাবতে শুরু করেছে। জয় আমাদেব হবেই—'

এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেল সুরথ। ফ্যাল ফ্যাল করে লোকগুলি তাকিয়ে আছে তাব দিকে, অভিব্যক্তিহীন। নতুন কোনো আবেগ যুক্ত হলো না তাদেব মুখে। প্রত্যেকটি মুখেব দিকে আলাদাভাবে তাকিযে থাকতে থাকতে সন্দেহে শবীর কেঁপে উঠল তার।

সুরথের আবির্ভাব ও পরবর্তী কিছুক্ষণের ঘটনাক্রম ও কথাবার্তা অনুসরণ কবলে বুদ্ধিমান যে-কেউই বুঝতে পাববেন একটি ব্যর্থ আন্দোলনকে হয়তো যুক্তিহীনভাবে জিইয়ে রাখা ছাড়া এবপব যা ঘটবে তার মধ্যে আর কোনো সম্ভাবনা নেই। জানকীরামের ভঙ্গি ও আচবণে অন্তত তারই আভাস। ব্যাপাবটা সুবথও যে অনুমান কবেনি তা নয়, কিন্তু, যে-সময়ে ও যেভাবে কবল তা নিজেকে প্রত্যাহাব কবে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ততোক্ষণে সে হয়ে গেছে অনশনকারীদেবই একজন। রাত বেড়ে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে বাম্ভিচকেব মাঠে নেমে এসেছে অবিশ্বাস্য স্তব্ধতা, হ্যাজাকেব আলোব বাইরে আর্দ্র চোখের দৃষ্টি আব কোথাও নিয়ে যায না। একটানা ও ক্রমাগত ঝিঁঝির ডাক মিশে যায অভিনিবেশেব সঙ্গে। অনশনেব সূচনায মানুষের সহানুভূতি বলে সুরথ যা ব্যাখ্যা ও প্রার্থনা করেছিল, কার্যত তা দূবে-দূবে বিস্তৃত সমুদ্রেব কাঠিন্য ছাড়া আর কিছু নয়। তার মধ্যে ডুবো পাহাড়েব ধাক্কায় পর্যুদস্ত জাহাজের ডেকে উদ্ধারেব আশায় অপেক্ষা করছে অনশনকারীরা। কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ ঝিমিয়ে, কেউ ঘুমিয়ে। হ্যাজাকের বিভিন্ন আলোয় তাদের শীর্ণ মুখগুলিতে ফুটে উঠেছে অনাগত সম্ভাবনার ছাপ। রক্তের ঝিমুনি সত্ত্বেও কোনো সন্দেহ নেই তারা জেগে আছে—প্রত্যেকেই ; ব্যর্থতাবোধ থেকে ক্রমশ সংগ্রহ করে নিচ্ছে পাবস্পবিক ঐক্য।

এ-সবই সুরথ বুঝতে পারে পরিষ্কার। জীবনে প্রথম এক গুরুত্বপূর্ণ অনশনে অংশ নিতে এসে ইতিহাসে দৃষ্টান্ত খোঁজে সে ; এবং ভাবে, এগুলো সাময়িক, এগুলো চলে যাবে। না গেলেও ব্যর্থতা সহ্য করতে হবে প্রকৃত বিপ্লবীব মতো, যাতে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীরা নিতে পারে শিক্ষা। বিপ্লবীর কাজ পরাজয় কিংবা জয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া।

জনমত গঠনের জন্যে পরের দিন সকালেই একটা নতুন উপায় উদ্ভাবন করে সুবথ। বোদ যতো বাড়ে এবং বেলা ছড়ায়, অনশনকারীদের প্রত্যক্ষ করার জন্যে ততোই সমাগম হতে থাকে লোকেব। তাদের কেউ কেউ, বিশেষত কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা, ছাউনির কাছাকাছি এগিয়ে আসলেও, অধিকাংশই লক্ষ করে দূর থেকে। মানুষ ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হতে পাবে ; কিন্তু সেটা অনুভবের ব্যাপার, দৃষ্টিগোচর নয়। একসঙ্গে এতোজন অনশনকারীর ক্ষুৎকাতর অভিব্যক্তি লক্ষ করাব মধ্যে অবশ্যই আছে দশনীয় কিছু। বিগত দু'যুগের মধ্যে রাম্ভিচক বিশেষ কোনো বদল দেখেনি, আলোচ্য বিষযও খুঁজে পায়নি তেমন। এতোদিনে পাচ্ছে আবার। শোনা কথা, এককালে এই মাঠে দিনেব বেলায় ভিড় হতো বেশ—তখন উদোম হয়ে রোদ্দুরে গা শুকোতো বেশ্যারা। যারা দেখত তাদের সন্ততিবা এতোদিন পরে অনশনকারীদের প্রত্যক্ষ করার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল। অসীম কৌতূহল তাদেব চোখে। দেখাদেখি এলো চিনেবাদাম ও চায়ের ফেরিওলা। জনান্তিকে একজন জিজ্ঞেস করল, কতোদিন চলবে ?

কথাটা সুরথের কানে গিয়েছিল। তখনই উপায়টা ভেবে নিল সে। শ্রমিকদের সহায়তায় কিছু কাগজ, কালি ও তুলি নিয়ে নিজেই বসল পোস্টার লিখতে। বিষয় তিনটি। পোস্টারও তিনটি। এক, 'আজ অনশনের ষষ্ঠ দিন।' দুই, 'শোষণের হাত মুচড়ে দাও।' এবং তিন, 'বিনা শর্তে লক-আউট তুলে না নেওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে।' চতুর্থ আর একটি বিষয়ও তার মাথায় ছিল, কিন্তু সেটা রূপায়িত করার আগেই ক্ষুধার প্রথম ধাক্কায় মোচড় দিয়ে উঠল তার পাকস্থলী। লোকেব আগ্রহেব বিষযগুলিব

দিকে তখন সে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। খাঁচায় বন্দী সার্কাসের জানোয়ারের মতো ভ্রূক্ষেপহীন ঝিমিয়ে চলেছে অনশনকারীরা। সুরথের আগ্রহ কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করল না তাদের আড়ষ্ট মুখগুলিতে।

দু'তিন দিনের মধ্যে ভিড় কমতে শুরু করল। দিনের বেলা তবু কেটে যায় যেমন তেমন করে, কিন্তু রাতগুলো হয়ে উঠল অসহ্য। অনশনহেতু শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হতেই সুরথ অনুভব করল বিষয় থেকে সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে দূরে। দশম দিনে যখন আর কেউই এলো না, তখন কিছুটা ক্লান্তিবোধ কিছুটা অভিমান থেকে পোস্টার লেখার তুলিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ক্লান্ত অনশনকারীদের কেউই লক্ষ করল না ব্যাপারটা।

অনশনের একাদশ দিনে দেখা গেল অনশনকারীর সংখ্যা আঠারো থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পনেরোয়। ঠিক বোঝা গেল না বাকি তিনজন গেল কোথায়। সম্ভবত রাতের অন্ধকার তাদের বাড়তি সাহস দিয়েছিল। নতুন কেউ যুক্ত হলো না। পনেরো জনের একজনের নাম সুরথ। চোদ্দজনকে জড়ো করে ক্ষীণ গলায় নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনল সে। বলল, 'ধৈর্য যাদের নেই, তাদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানে হয় না কোনো। আমাদের ঠিক করতে হবে এই অনশন চলবে কিনা। যদি না চলে তাহলে অর্থ একটিই, লক-আউট উঠবে না—'

যাদের বলা হলো তারা চুপ করে থাকল।

'একটি উপায় অবশ্য আছে, তা হলো বদলি লোক। যদিও তাতে ব্যাপারটা কমজোর হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। সেইজন্যে দরকার নিত্য-নতুন অনশনকারীর আরো বেশি সংখ্যায় যোগদান। দরকার যতোক্ষণ না শরীর ভেঙে পড়ে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকের অনশন চালিয়ে যাওয়া। এইভাবেই আমরা শত্রুপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারব। একটা কথা ভাবা দরকার—এই অনশন সাময়িক ; কিন্তু এখন যদি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে অনশনই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবে।'

যাদের বলা হলো তারা কেউই কিছু বলল না, কিন্তু, বক্তৃতার পরোক্ষ ফল হিসেবে সেদিনই দু'জন যোগ দিল অনশনে। দু'জনই খঞ্জ। এই ক'দিনে সুরথ এই লোক দুটিকে ছাউনির আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছে। কিঞ্চিৎ সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চবাচ্য করল না সে। এ-ক্ষেত্রে, বোঝে, সংখ্যার প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশি। শারীরিক ক্লেশ তাকেও কিছু কম ন্যুব্জ করেনি। সেদিনই বিকেলে মুঙ্গের থেকে বিশেষ বার্তাবহ এলো দুটি চিঠি নিয়ে। একটি ইউনিয়ন নেতৃত্বের, অন্যটি তার স্ত্রীর। সুরথ লোকটিকে ফেরত পাঠাল।

অনশনের ত্রয়োদশ দিনে প্রথম চাঞ্চল্য এলো ক্যাম্পে। হ্যাজাকের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত দাবার ঘুঁটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কয়েকজন অনশনকারী। ভোরে দেখা গেল ছাউনি থেকে অল্প দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একজন। নিঃস্পন্দ। যে-মাটিতে মুখ রেখেছিল সেখানে জমাট হয়ে আছে কিছুটা কালো রক্ত। লোকটি দুখন। মৃত্যু সকলকে মূক করে দিলেও কেউই ঠিক-ঠিক বুঝতে পারল না মরবার জন্যে ছাউনি থেকে দূরে যাবার কী দরকার পড়েছিল দুখনের!

ইতিমধ্যে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে অনশনকারীদের চেহারা। চেহারা বলতে চোখ—সেখানে পরিস্ফুট উজ্জ্বল দার্শনিকতা। খসখসে চামড়ায় ফুটে উঠেছে হলুদ সৌম্যভাব ; নিরপেক্ষভাবে দেখলে এখন তাদের ঋষি বলে ভ্রম হতে পারে। ঝিমুনির মধ্যে পাশ ফেরার মতো ঘটনাটিকে তারা গ্রহণ করল নিঃশব্দে।

ইতিমধ্যেই জানাজানি হয়েছিল। দূরে, আশপাশে জড়ো হয়েছিল কিছু লোক। অ্যাম্বুলেন্স এলো। পুলিস ও হাসপাতালের লোক যখন দুখনের দেহটা ধরাধরি করে গাড়িতে তুলছে, তখন স্তব্ধতা থেকে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সুরথ, 'ইনক্লাব—।' চিৎকারটা জেগে উঠেছিল অনুভূতিতে, শব্দ হলো না তেমন। তখন মূক মুখগুলির ওপর একে-একে চোখ বুলিয়ে সুরথ বলল, 'শহীদ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তার উদ্দেশে নারা দিতে হয়। দুখনের মৃত্যু আমাদের জয়ের দিকে এগিয়ে দিল। মুঙ্গের থেকে খবর এসেছে, দু'একদিনের মধ্যেই লক-আউট প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। জয় আমাদের হবেই—'

যাদের বলা হলো, মূক সেইসব অনশনকারী বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকাল শুধু। ঝিমুনির মধ্যে অভ্যাসে পাশ ফিরল তারা। রোদ বাড়তে লাগল এবং কমতে লাগল। হাওয়ায় জোর বাড়ল ক্রমশ।

মাঠ বলেই আগল নেই কোথাও। দুর্ধর্ষ হাওয়ায় ক্যাম্পের খুঁটি নড়ে উঠলেও অনশনকারীদের প্রতিজ্ঞায় তা কোনোরূপ বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারল না।

সেদিন গভীর রাতে মুহুর্মুহু 'ইনক্লাব-জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে ঘুমের মধ্যে সচকিত হয়ে উঠল বাস্তিচকের অধিবাসীরা। রাত বলেই সাহস করে বেরিয়ে এলো না কেউ। কিন্তু ধ্বনিটা ক্রমাগত টানতে লাগল তাদের।

অনশনের চতুর্দশ দিনে ভোরের প্রথম দর্শক যে ছুটে এলো, দেখল, ক্যাম্প ফাঁকা, অনশনকারীরা অদৃশ্য। শুধু গতির বিরুদ্ধে দূর রাস্তা অতিক্রম করছে দুজন ব্যস্ত খঞ্জ। শুধু মাঠ যেখানে উঠে গেছে রাস্তার দিকে, সেখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটি লোক। তার পায়ে কাবলি চটি ও কাঁধে ঝোলা। শিথিল আত্মবিশ্বাসে ঠোঁটের কোণদুটো কুঁকড়ে আছে অল্প।

সীমানা

তিন ঘণ্টা ট্রেন জার্নির পর আরো ঘণ্টা দেড়েক বাসে, তাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সীমা। গা-সরু বাসের সীটে এমনিতেই জায়গা কম। তার ওপর বহুদিন ব্যবহারে জীর্ণ চামড়ার কুশনের তলা থেকে নারকোলের ছোবড়া ছুঁচ ফোটাচ্ছে থেকে থেকে। নড়বে যে তারও উপায় নেই, হাঁটু এঁটে আছে সামনের সীটের পিছনে। সেখানে বসা দু'জন যাত্রীর একজন বাস ছাড়ার পর থেকে সেই যে নাক ছেড়ে ঘুমোতে শুরু করেছে, এতো ঝাঁকুনি সত্ত্বেও ব্যাঘাত ঘটেনি এতোটুকু। অন্য জনের ঘাড়ে ঘামের পলেস্তবা, খদ্দরের পাঞ্জাবির চিট দেখে মনে হচ্ছে কম করেও দু'মাস কাচেনি। সঙ্গে দুর্গন্ধ, ধুলোময় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দমকে দমকে। পচা শাকসবজি জমতে জমতে যেরকম হয়।

নড়াচড়ার ব্যর্থ চেষ্টায় দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে স্বগতোক্তি করল সীমা।

দীনেশ পুরুষমানুষ। নিজের অস্বস্তি ফোটাতে পারে না। আস্তে বলল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

'সেটাও কি মুখ ফুটে বলতে হবে!'

'তা বটে!' এখন সহানুভূতি দেখানো মুর্খামি। হাল্‌কা গলায় হাসি মাখিয়ে দীনেশ বলল, 'শহুরে পশ্চাৎ তব, গ্রাম তাহে ধরিবে কেমনে।'

সীমা তাকাল ভুরু উঁচিয়ে। অন্য সময় হ'লে দীনেশের কথায় সুখ বোধ করা যেত, যে-রকম করে; কিন্তু এখন খোঁচাকে খোঁচা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বাসের যাত্রীদের কেউ কেউ সেই গোড়া থেকেই ঘুরে ফিরে লক্ষ রাখছে তার ওপর—তার চোখ-মুখ-স্বাস্থ্য ও বিশেষত কথাবার্তার ওপর, এটা নতুন ক'রে খেয়াল হতেই চেপে গেল। বাড়তি কিছু বললে দীনেশও পাল্টা দেবে। দখল নিতে হ'লে এই কষ্টটুকু পোহাতে হবে বইকি! একটু আগেই ফিরিস্তি দিচ্ছিল, বড়ো শরিকদের ঘরে যাচ্ছ। জানো তো, ঊনআশি ভাগ দেশ মানে এই!

হতে পারে। দেশফেশ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই সীমার। এটুকু বোঝে, ভাগ ছাড়তে নেই। দীনেশের ভাবালুতা এ নিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে—দয়া, রক্তের সম্পর্ক, নানা কথা বলে। আট বছর যার সঙ্গে এক নাগাড়ে শোয়া বসা, এসব সময় তাকে সত্যিই অসুবিধে হয় চিনতে।

চোখ দুটো বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নিল সীমা। না তাকিয়েই বুঝল দীনেশ ঘড়ি দেখছে। রাস্তাটা তারও চেনা নয়। ঘড়ি দেখেই এখন সে ঠিক করবে দূরত্ব, যদি বাসের গতিও তাল রাখে সময়ের সঙ্গে। পকেট থেকে ভাঁজ-করা চিঠিটা বের করতে দেখে বুঝল নিশ্চিত হতে পারছে না। এটা ওর বাবার দেশ, ওর নয়। বাড়ির দেয়ালে একটা ছবি আছে, কালেভদ্রে সেদিকে চোখ পড়লে বাবাকে মনে পড়ে দীনেশের।

এটা দীনেশেরই কথা।

দু' পাশে ধু ধু মাঠ আর গাছপালা ছাড়া বসতি বিশেষ নেই। তার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চ'লে গেছে বিদ্যুতের লম্বা লম্বা খাঁচা। সীমা গ্রাম দেখেছে ক্যালেন্ডারে আর সিনেমার ছবিতে। সেখানে পুকুর থাকে, ভিজে গায়ে উঠে মেয়েরা প্রায়ই কাপড় টানে বুকের। তাদের কলেরা বসন্ত হয়, কিন্তু কেউই বোধহয় মরে না; তাহলে জনসংখ্যা কমত। দুপুরে, দীনেশ অফিসে গেলে, মাথায় পুঁটলি নিয়ে যেসব মেয়েরা চাল বেচতে আসে, আঁচলে দাম বাঁধতে বাঁধতে তারা প্রায়ই পুরনো শাড়িটা, ব্লাউজটা চায়। একবার একজন 'বডিস' চেয়েছিল। তির্যক চোখে তাকিয়ে সীমা লক্ষ করেছিল মেয়েটি সায়া পরে না।

চোখেমুখে প্রচণ্ড ধুলোর ঝাপ্‌টা লাগতে মুখ টেনে নিল সীমা। ধুলো ও ঘামে সে নিশ্চয়ই অনেকটা

কালো হয়েছে ইতিমধ্যে। রঙ ফেরাতে সময় লাগবে।

'তোমার কাকা লোক কেমন?'

'কেন!'

'এতো দূরে ডেকে এনে বিপদে ফেলবে না তো!'

দীনেশ হাসল, যে-হাসির অর্থ সামলে নেওয়া। সীমার প্রশ্নে ভান নেই। ভেবে দেখল, উত্তরটা সে নিজেও ভালো জানে না। তারা একই পদবিধারী। একটু আগে চিঠির হরফে চোখ বোলাতে বোলাতে দীনেশের মনে হয়েছিল তাদের হাতের লেখার ছাঁদেও মিল আছে। রক্তের সম্পর্ক বললে নিজেকেও টানতে হবে। এসব দ্বিধার কথা সীমাকে বলা যায় না।

'বাবার ভাই। খারাপ বলি কী ক'রে!'

'ভাই হ'লেই ভালো হয় না—'

'জানি।' জবাবটা আগেই আন্দাজ করেছিল দীনেশ। বলল, 'লোক কেমনে যায় আসে না। বিষয়টা জমিজমা নিয়ে, সম্পত্তি নিয়ে। ভাগ বুঝে নিতে পারলেই হলো।'

অনেকক্ষণ নির্জনতার পর দু'একটা মুখের দেখা মিলছে। একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল। বহুদূর বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে উঁচু মেঠো রাস্তা, তার ওদিকে গাছপালার আড়ালে কিছু কিছু বসতি। এসব দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক গলায় সীমা বলল, 'খাবার-দাবার চেখে খেও।'

দীনেশ ভাবল, কেঁচোরও প্রাণ থাকে। সীমার সাবধান ক'রে দেওয়ার সঙ্গে এই ভাবনার সম্পর্ক কোথায় বুঝল না ঠিক।

পুরোপুরি থেমে যাবার আগে দুবার বড়ো ঝাঁকুনি খেল বাসটা। আশপাশে রাস্তার দু'ধারে ছাউনিমেলা দোকানঘর দেখা যাচ্ছে দু'একটি, অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কিছু কথাবার্তা, ব্যস্ততা। পুরোপুরি জ্ঞানে থেকেও দীনেশের মনে হলো এতোক্ষণ সে ঘোরের মধ্যে ছিল, আকস্মিক চাঞ্চল্যে তাই বেশ রদবদল লাগছে মনে। বাস থামবার আগেই সামনের সীটের ঘুমন্ত লোকটি পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটল দরজার দিকে। সঙ্গে আরো কয়েকজনও। জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে ড্রাইভার বলল, 'বাবু, আপনারা এইখানে নামুন—'

স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিল দীনেশ। সীমার নামার ধরনে কোমরের জট ছাড়ানোর ভঙ্গি।

'এ যে দেখছি একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর!' নেমে বলল, 'এবার কোনদিকে যেতে হবে? একটা রিকশা-টিকশাও তো দেখছি না!'

'না থাকলে দেখবে কোত্থেকে! পড়োনি, বাস রাস্তা থেকে আধ ক্রোশ হাঁটা!'

'আধ ক্রোশ মানে কতো?'

'কতো আর! মাইল খানেক হবে।'

'হয়েছে!' আঁচলে মুখ ঘষতে ঘষতে ব্যস্ত গলায় সীমা বলল, 'ওখানে টয়লেট আছে?'

দীনেশ তখন এদিক-ওদিক তাকাতে ব্যস্ত। তবু না হেসে পারল না।

'নেই মানে! সমস্ত মাঠ জুড়ে টয়লেট। হাত-পা ছড়িয়ে কাজ সারতে পারবে। ধানকাটা হয়ে গেছে, এই সময় গোড়াগুলো চোখা হয়ে থাকে। শহুরে লোক দেখলেই চিনতে পারে।'

বাসটা চ'লে যাবার উপক্রম করছে। স্টার্ট করার বিকট শব্দে কান রেখে সীমা বলল, 'তোমার বাবা আর জন্মাবার জায়গা পেল না!'

দীনেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। ধুলোর ঘূর্ণির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'ওই তো, মেজকাকা!'

আদলে মিল আছে। দীনেশের চেয়ে এক বিঘত উঁচুই হবে। কপাল আর হাতের শিকড়গুলো এখান থেকেই দেখা যায় স্পষ্ট। তবু অমিলের ভাগটাই বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে সীমা কিছুতেই চিনতে পারত না। দীনেশের বলা সত্ত্বেও তাই ভুরু কোঁচকালো।

'ওহ লুঙ্গিপরা লোকটা?'

'চুপ, চুপ! শুনবে!'

সীমা হঠাৎ বলল, 'আমি বাপু ঘোমটা-টোমটা দিতে পারব না।'

দীনেশ হাসল। সীমা রঙ চেনে, পোশাক চেনে। ঠিক জানে কোথায় কী করতে হয়। এক লহমায় বাবার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল দীনেশের। বিয়ের কার্ডে এই লোকটির নাম ছাপানো হয়েছিল। যাতে না আসতে পারে সেজন্যে সে খবর পাঠায় দেরিতে।

সীমাকে শেখাতে হ'লে তাকেই ঝুঁকতে হবে আগে। এগোতে এগোতে দীনেশ বলল, 'প্রণামটা অন্তত কোরো।'

হাওয়ায় ধুলোর গন্ধ। আঁচলটা মুখের ওপর টেনে এনে দীনেশকে অনুসরণ করল সীমা।

'থাক মা, থাক।' সীতেশ স'রে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ রে, দীনু, রাস্তায় খুব কষ্ট হয়নি তো?'

'না, না, বিশেষ নয়।' ব'লে চটপট কথাটা বদলে ফেলল দীনেশ, 'সোমবার অফিস করতে হবে। আমরা কিন্তু কালই ফিরব, মেজকাকা!' সীমা খুশি হবে।

'না আসতেই ফেরার কথা!' ঝাড়াই বাছাইয়ের ভঙ্গিতে বাঁ হাতে রুক্ষ মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে সীতেশ বলল, 'আগে চল তো, তারপর কথা হবে। ও সোমনাথ, দাঁড়িয়ে রইলি কেন! দাদা, বউদিকে প্রণাম কর। স্যুটকেসটা হাতে নে—'

বেঁটে, রোগা, ইজের ও শার্টপরা একটি ছেলে এতোক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তার চোখ ছিল দূরের দিকে—যেখান দিয়ে ছোটখাটো ধুলোর ঝড় তুলে বাসটা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। যাত্রী যারা নেমেছিল মাঠের রাস্তায় এতোক্ষণে অনেকটাই এগিয়ে গেছে তারা। তালপাতার ছাউনির নীচে চায়ের দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে নিচু গলায় কথা বলছে দু'টি লোক—চক্রাকারে এলোমেলো উড়ছে গোটা কয়েক বোলতা। ঘুন-ঘুন-ঘুন-ঘুন একটা শব্দ উঠছে থেকে থেকে। এসব থেকে নৈঃশব্দ্য তুলে অভিব্যক্তিহীন ছেলেটি এগিয়ে এলো কাছে—এমনই এক ধরনের চেহারা যে বয়স বোঝা যায় না। হরির লুঠের বাতাসা কুড়নোর ধরনে ঢিপ ঢিপ ক'রে প্রণাম সারল, তারপর দীনেশের স্যুটকেসটা তুলে নিল হাতে।

সসঙ্কোচে দীনেশ বলল, 'আহা, আমিই তো পারতাম!'

কথাটায় কান না দিয়ে সীতেশ বলল, 'তোরা আস্তে আস্তে রওনা হ। আমি একটু ডাক্তারখানা ঘুরে যাব। তোর কাকীমার আবার হাঁপানির অসুখ তো! দেরি হবে না। যাব আর আসব।'

চারিদিকে তাকিয়ে দীনেশ বুঝতে পারল না এখানে ডাক্তার কোথায়! দূরে দূরে কিছু ঘর-বাড়ির আভাস থাকলেও সেগুলো জনশূন্যই মনে হয়। মাঠের রাস্তা ধ'রে একটা গরুর গাড়ি এগিয়ে আসছে এদিকেই, মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে জন চারেক ব'সে আছে ওপরে—পশ্চিমমুখো ব'লেই সম্ভবত রোদ্দুরে ঝাপ্‌সা হয়ে আছে মুখগুলি। স্যুটকেস হাতে ছেলেটি চ'লে গেছে ওপারে। গায়ে গায়ে সেঁটে এলো সীমা। দীনেশ বলল, 'চলো।'

'অসমান রাস্তা—', ওদের রওনা হতে দেখে সীতেশ বলল, 'একটু সামলে হেঁটো, বউমা।'

ছেলেটি এগিয়ে গেছে অনেকটা। তেমন কিছু ভারী নয়, তবু এরই মধ্যে স্যুটকেসটা দু' বার হাত বদল করতে দেখে দীনেশের মনে হলো, ওর পক্ষে ভারীই। ব্যাপারটা হয়তো শোভন হলো না। তার পরেই ভাবল, সীমা সঙ্গে আছে, এখন শোভনতার অর্থও পাল্টে যাবে। বরং পরে ভাববে।

'আদিখ্যেতা!' রাস্তা থেকে গড়ানো জমির দিকে নামতে নামতে সীমা বলল, 'যেন শান-বাঁধানো রাস্তার খোঁজে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এসেছি!'

পিছনে তাকালে সীতেশকে দেখা যায় না। খানিক সূর্য এসে মাখামাখি করে চোখে। তার মানে বেশ খানিকটা ঢালু। এইমাত্র লেজে মোচড় খেয়ে গরুর গাড়িটা উঠে গেল ওপরে। তারা যেদিক থেকে এসেছিল তার উল্টোদিক থেকে একটা বাস আসছে যেন। হাওয়ায় ধুলোর আগাম গন্ধ।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল দীনেশ। সীমার কথা শুনে পিছিয়ে এলো।

'যে খোঁজে এসেছ তা পাবে মনে করছ?'

'কী!'

'সম্পত্তি।'

সীমা তাকাল, সোজাসুজি। একটু ভাবলও যেন।

'তুমি ধাপ্পা না দিয়ে থাকলে সম্পত্তি আছে। তা খুঁজতে হবে না। যদি না—'

'কী ?'

'যদি না তোমার কাকা অন্য কোনো মতলব এঁটে থাকে।'

'মতলব থাকলে খবর দিত না।' কিছু রুক্ষতা, কিছু মায়া মিশিয়ে দীনেশ বলল, 'অসৎ ব'লে তো শুনিনি। দশ বছর যোগাযোগ নেই, এদিকে আসিওনি কোনোদিন। কয়েক বিঘে জমি, একটা ভাঙা বাড়ির অংশ, একটা পুকুরের ভাগ—। সীমা, এসব নিয়ে কি আমরা এখানে বাজত্ব ফাঁদব।'

'বাব্বা, তুমি যে দেখছি একেবারে গ'লে যাচ্ছ !' সীমা বলল, 'অতো কথায় কাজ কী ! যেটা ভাগের সেটা বুঝে নেবে, ব্যস ! আমার বাবা বলে—'

'তোমার বাবার কথা অনেক শুনেছি। সম্পত্তি আয়ু বাড়ায়। তাঁর বেড়েছে। সেই সঙ্গে মামলা মোকদ্দমাও। কালো কোট না পরলেও হামেশাই যেতে হয় কোর্টে। লাভটা কী !'

'লাভ !' দৃঢ় গলায় সীমা বলল, 'যে বেচাকেনা করে সেই লাভ বোঝে। তা ছাড়া—'

সরু খালের ওপর বাঁশের সেতু। সাবধানে তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে কথার মধ্যিখানেই সীমা হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।

'অ্যাই দ্যাখো, স্যুটকেস নিয়ে ছোকরাটা গেল কোথায় !'

দীনেশও দাঁড়াল। কিছু বা হতচকিত। চেনা ও অভ্যস্ত রাস্তা ব'লেই সম্ভবত এতোক্ষণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হাঁটছিল ছেলেটি, তবু লক্ষের মধ্যেই ছিল। খালপাড় এইখানে অনেকটা উঁচু, ক্রমশ মিশে গেছে ঢালু জমিতে। কথায় কথায় তারা অনেকটাই এগিয়ে এসেছে মনে হয়। এখান থেকে পিছনে ফেলে আসা রাস্তা বেশ দূরে ; সামনে দৃষ্টির মধ্যেই ধরা পড়ছে গ্রাম। মাঝে নিম, কাঁঠাল, কলা গাছের আড়াল। কিন্তু, ছেলেটা গেল কোথায় !

দু'পাশে হাত ছুঁড়ে সীমা বলল, 'দেখেছ ! তখনই বলেছিলাম মতলব ভালো নয়। শাড়ি জামা টাকাকড়ি ওষুধ—সবই যে ওই স্যুটকেসে !'

'চুপ, চুপ !' দীনেশ ধমক দিল প্রায়, 'পালানো অতো সহজ নয়।' তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'সোমনাথ, সোমনাথ !'

মাটির ডেলা ভাঙার মতো দীনেশের গলার স্বর ভেঙে ছড়িয়ে গেল মাঠে। আবছা প্রতিধ্বনি থেকে উঠে এলো ছাগলের কাতর ডাক। পাশের বাঁধের আড়াল থেকে মাথা তুলছে সোমনাথ, ঠোঁটে আঙুল চাপা, নিষেধ করছে চ্যাঁচাতে। হাতটাকে পরিণত করল হাতছানিতে।

দীনেশ দৌড়ে গেল। পিছনে সীমা। দেখল, হাত তিন চার দূরে কিম্ভূতভাবে বাচ্চা বিয়োচ্ছে একটা ছাগল। এরই মধ্যে ভূমিষ্ঠ একটি ছানা গড়াগড়ি দিচ্ছে মাটিতে, আরেকটিরও জন্ম সমাগত। এ-সবেরই কাছাকাছি স্যুটকেসটা পড়ে আছে মাটিতে।

'মা গো ! কী অসভ্য ছেলে !' সীমাই কথা বলল প্রথম, 'এই দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছে !'

'এই, এই সোমনাথ !' সীমার সামনে এই প্রথম দীনেশের মনে পড়ল সোমনাথ তার ভাই। হুট্ ক'রে রাগ চেপে গেল মাথায়, 'ফাজিল ছেলে ! আমরা মরছি খোঁজাখুঁজি ক'রে, আর তুই কি না—'

'চিল্লাচ্ছ কেন ! দেখছ না !' সোজা দাঁড়িয়ে ছেলেটি হঠাৎ দূরের দিকে ইঙ্গিত করল। দেড় দু'শ গজ দূরে পাড়ের কাছে ওই জায়গাটায় হঠাৎই গজিয়ে উঠেছে ফণি-মনসার জঙ্গল। তারই কাছে এদিকে তাকিয়ে ঘুর ঘুর করছে গোটা তিনেক শেয়াল। যেন এই তিনটি মানুষ স'রে গেলেই এগিয়ে আসতে পারবে।

'ও মা !' সীমা বলল, 'ওই বাচ্চাগুলোকে খাবার মতলব করছে- নাকি !'

'কেন করবে না !' সোমনাথ বলল, 'সেবার নাটু ঘোষের বউ আলের ধারে মেয়েকে শুইয়ে মাঠে গিয়েছিল।-ফিরে এসে দেখল নেই !'

'উঃ ! বীভৎস !'

'কী হচ্ছে এখন ?' খেলো গলায় বলল দীনেশ, 'ভয়, না শ্রদ্ধা ?'

ছেলেটি ততোক্ষণে দু'হাত ভর্তি মাটির ডেলা কুড়িয়ে হেই-হটর করতে করতে ছুটেছে শেয়ালগুলোব পিছনে। ছত্রখান হয়ে লেজ তুলে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে শেয়ালগুলো। খানিক পরে তাদের আর দেখা গেল না।

২

মেজকাকীর সঙ্গে পরিচয়ের পব দোষের মধ্যে সীমা এই গল্পটা করেছিল। তাতেই কথা গড়াল।

দীনেশ জানে, এই প্রসঙ্গটা না থাকলে নাকেমুখে আঁচল গুঁজে সমানে চুপ ক'রে থাকত সীমা। 'তুমি বলেছিলে চার পাঁচটা !' এসেই টিপ্পনী কেটেছিল, 'এ তো দেখছি এক ডজনেব কম হবে না ! নাম ধাম চেহারা সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হারাধনের দশটি ছেলেকেও ছাড়িয়ে গেল—'

দীনেশ জবাব দিল না। জবাব খুঁজে পেল না বলাই ভালো। তাকে খবর পাঠানোব ব্যাপারে যদি মেজকাকার সততা থেকে থাকে, তাহ'লে এই ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে সৎভাবে, পর পর—ঘাসেব কোলে আগাছার মতো। সময় মতো বৃষ্টি পায়নি, বাড়েনি। একটা থেকে আরেকটাকে বয়স দিয়ে চেনা যায় না। স্বাস্থ্য দিয়েও না। 'এই জমিই আমার ভরসা— ।' মেজকাকা লিখেছিল, 'এতোগুলি পেট, পুরোপুরি ভরানো যায় না। বোগ জ্বালায় চিকিৎসা হয় না। মেজমেয়ে লক্ষ্মী গত বছর বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। মাঝে মাঝে ভাবি আমি বেঁচে থাকতে থাকতে অন্যগুলিও একে একে গেলে কিছুটা স্বস্তি হতো। আমাদেব অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে। এদিকে জমি বাবদ আইন কানুনও কড়া হচ্ছে। দাদার অংশ তুমি হস্তান্তর করলে ভালো, নচেৎ বেহাত হবে। দাদার আশীর্বাদে তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ধনী হয়েছে।গ্রামকে ভুলে গিয়েছ। এখন দাদার অংশের হিসাব তুমি বুঝে নেবে কি না ভেবে দেখো। যদি তোমার দরিদ্র ভাইবোনেদের মুখ চেয়ে দান করতে চাও, তা হ'লেও দলিলে তোমার স্বাক্ষব লাগবে—'

সীমা বলেছিল, 'সম্পত্তি ভোগ করছে করুক। তা ব'লে দানের কথা ওঠে কী ক'রে !'

'মেজকাকা যদি হঠাৎ মারা যায়, তখন কী হবে ?'

'সেইজন্যেই পাকা ক'রে রাখা।'

বেঁচে থাকতে বাবা কখনো এ-প্রসঙ্গ তোলেনি। পিতৃসূত্রের সবটাই দীনেশ পেয়েছে শহরে এসে। কিন্তু শিকড়টা আছে এইখানে; গোড়ার মাটিও। খরখরে পাথরের মেঝেয় ব'সে চলকা-ওঠা পেয়ালায় চা খেতে খেতে দীনেশ ভাবল, এই বাড়িতে জন্ম হয়েছিল বাবার ! ছমছমে একটা অনুভূতি তার শরীব ছুঁয়ে গেল। পাশে সীমা। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে খানিক আগে দোতলায় উঠেছিল। পিছু পিছু এক ডজন। দীনেশকে বলল, 'একটা টর্চে এই অন্ধকার যায় না।'

দিন বড়ো। রোদ গিয়েও যেতে চায় না। লালপেড়ে শাড়ি পরে উঠোনে উবু হয়ে বসেছে মেজকাকীমা। ফেঁসে যাওয়া গরদের শাড়ি—অল্প আগে তোরঙ্গের ডালা পড়ার শব্দ পেয়েছিল। গন্ধটা এখনো আছে। মুখের ওপর রোদ পড়েছে তেরছা হয়ে, কানের দিকের পাকা চুলগুলো আরো ঝলমল করছে তাতে। কপালের ডান দিকে দেড় ইঞ্চি ফাটা দাগ। ফুটবল মাঠের খেলোয়াড়দের মতো ছেলেমেয়েগুলো বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। নড়বড়ে কাঠের দরজা দিয়ে সন্ত্রান্ত ভঙ্গিতে তিনটে হাঁস ঢুকে এলো উঠোনে। তারপর আরো দুটো। পুরনো গরদের গন্ধ ছাপিয়ে পালকেব আঁশটে গন্ধ পেল দীনেশ। কায়দা ক'রে নাকে আঁচল দেওয়ায় সীমার জুড়ি নেই।

'ওপরের ঘরটা দেখলে তো, বউমা ? ওটা তোমার শাশুড়ীর ঘর।' এক-একটা সেনটেন্স ব'লে হাঁফের টান সামলাচ্ছে মেজকাকীমা। তবু দান ছাড়ার লক্ষণ নেই। শ্বাস টেনে বলল, 'দীনুর বাবা তো স্বদেশী করত, অর্ধেক দিন বাড়িই ফিরত না। বড়দি শহরের মেয়ে। একা ঘরে কিছুতেই ঘুমোতে পারত না। বাঁশ ঝাড়ের পাশে পুকুরে হরি বায়েনের বউকে খুন ক'রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, রোজ রাতে বাঁশ ঝাড়ের তলায় ব'সে কাঁদত সে। তোমার শাশুড়ির সে কী ভয় ! রোজই ডাকত, ছোট, একটু আয় তো, আমার বড়ো ভয় কবছে ! তো আমাকেই শুতে হতো তার সঙ্গে—'

সীমা বলল, 'এখন আর কাঁদে না ?'

কে ? হরি বায়েনের বউ !' গালে তর্জনী ঠেকিয়ে অবাক হলো মেজকাকীমা, 'ওমা! সে আজকের কথা নাকি ! সে কবে মবে ভূত হয়ে গেছে !'

'কে আবার ভূত হলো !'

সীতেশ ফিরেছে আগেই। এতোক্ষণ ঘববাব করছিল ; এবার বেবিয়ে এলো।

'দিনের আলো আছে। চ দীনু, জমিটা তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, চলো।' দীনেশ উঠল। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল সীমাকে, 'তুমি কী কববে ?'

'যাব।'

সীতেশের পিছনে পিছনে প্যাঁক প্যাঁক করতে কবতে হাঁসগুলোও চৌকাঠ ডিঙালো।

পুকুর ও বাঁশঝাড় পেরিয়ে খানিক এগোতেই বসতির শেষ। জমি ছড়িযে গেছে দু' দিকে। মাঝখানে আল। শীর্ণ, লম্বা শবীর নিয়ে খাড়া হাঁটছে সীতেশ। ঘাড়ে চকচক করছে হলদে আলো। অনেকটা পিছিয়ে তারা। পায়ের শব্দে সচকিত একপাল ঘুঘু উড়ে গেল নিঃশব্দে।

'যতো সব গাঁজাখুরি গল্প ব'লে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা।' সীমা বলল, 'বাঁশঝাড়, খুন, হরি বায়েনের বউ—ভেবেছে এসব বললেই ভয় পেয়ে ছেড়েছুড়ে চ'লে যাব !'

আলগোছে স্ত্রীর দিকে তাকাল দীনেশ। জবাব দিল না।

'তখন দলিলের কথা কী বলছিল ?'

'সই সাবুদের জন্যে দলিল একটা দরকার, তাই। দেখাবে বলেছে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সীমা বলল, 'তোমাকে বাপু এখনই কেমন নার্ভাস লাগছে। ঠকে যেও না যেন !'

সামনে বিশাল কাঁঠাল গাছ। সেই পর্যন্ত পৌঁছে পিছনে তাকিয়ে তাদেব দেখে নিল সীতেশ। তাবপব মাঠে নামল।

ফাঁকা জমিজমার মধ্যে পা রাখলে চেহারা বদলে যায় মানুষের। মনে হয হাঁটতে হাঁটতে গেঁথে যাবে এক সময়। পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মাটির ডেলা ; শুকনো গোড়া আঁচড় কাটছে পায়ে। হাঁটুর কাছে মুঠোর মধ্যে শাড়ি ধ'রে হাঁটছে সীমা। আগুয়ান সীতেশের দিকে তাকিয়ে দীনেশ ভাবল, যারা জানে তারা ঠিকই হাঁটে।

একটা ছোট নালা পেরিয়ে সীতেশ দাঁড়াল।

'আয়, দীনু। এসো বউমা।' গলা কাঁপছে উত্তেজনায়। আঙুল তুলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখিযে বলল, 'উত্তরে ওই আমগাছ পর্যন্ত—'

'অনেকটা, মেজকাকা !'

'হ্যাঁ, অনেকটাই। আগে আরো ছিল। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে।'

দীনেশ ভাববার চেষ্টা করল খোদ কলকাতায় এতোখানি জমির দাম কতো হবে ? দু'লাখ ? তিন লাখ ? হিসেবে কুলালো না। আপাতত এই জমিতে তার অংশ আছে তা পর্যন্ত ভাবতে পারছে না। থাকলেও কী হবে ! সে নিশ্চিত লাঙল নিয়ে মাঠে নামবে না, ধানের গোছা থেকে আগাছা আলাদা করবে না ! তবে ?

সীতেশ বলল, 'আরো হবে।' ক্ষীণ হাসি ফুটল মুখে।

সীমা তাকিয়ে আছে দূরে। সীতেশের ভাষা বুঝবার জন্যে সে এখানে আসেনি। দূর আমগাছ বরাবর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধোঁয়া কিসের ?'

'ট্রেন যাচ্ছে।' সীতেশ বলল, 'এদিকের বাস রাস্তা হয়েছে অনেক পরে। আগে আগে ওই রাস্তায় হেঁটে গিয়ে আমরা ট্রেন ধরতাম।'

দীনেশ এসব শুনছে না। এখনো আঁটকে আছে সীতেশের 'আরো হবে'র বিষণ্ণতায়। তার পরেও আরো হবে। মেজকাকার দশ বারোটিতে ভাগাভাগি করলে বাটিতে মাটি উঠবে। সে-মাটিও শুকিয়ে যাবে একদিন। উড়ে যাবে ধুলো হয়ে। থাকবে হাতে ধরা বাটিগুলো। আজ প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে স্টেশন চত্বরে পা দিতেই ওরকম কয়েকজন তাদের ছেঁকে ধরেছিল। ক্ষুধার্ত, অপরিচিত মুখগুলি।

অনেক বছর পরে সে যদি আবার ফেরে তাহ'লে হয়তো চিনতে অসুবিধে হবে না।

দীনেশের পায়ের তলায় কিছুটা মাটি দেবে গেল।

'দীনু, এই জমির ওপর দিয়ে তোর বাবা গাঁ-ছাড়া হয়েছিল। এখনো আমি স্পষ্ট দেখতে পাই সেদিন জ্যোৎস্নার রাত ছিল—'

দীনেশ উপলক্ষ মাত্র। সীতেশ কথা বলছে মাঠকে জনসভা ভেবে। পড়ন্ত আলোর আভা তার রেখাকীর্ণ তামাটে মুখ পুরনো ক'রে তুলেছে আরো। হাওয়ায় কাঁচাপাকা চুলগুলো উড়ছে অল্প অল্প। ভঙ্গি দেখে মনে হয় এইখানেই দাঁড়িয়েছিল, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

'তুই তখন পেটে। খবর এলো পুলিস আসছে। যে ভাবে ছিল সেইভাবেই পালাতে হলো দাদাকে। আমি গেলাম এগিয়ে দিতে। ওই আমগাছ পর্যন্ত গিয়ে দাদা বলল, সীতু, তুই ফিরে যা। বাড়িতে দুটো মেয়েমানুষ একা আছে। ওদের বিপদ হতে পারে—

'বড়ো সাহসী মানুষ ছিল তোর বাবা। মনও ছিল তেমনি। সেদিন রাতের আবছা আলোয় তাকে তার চেহারার চেয়ে বড়ো দেখাচ্ছিল। বলল, যদি আমি আর না ফিরি, সব রইল—তুই দেখিস—

'আমি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিসে ঘিরে ফেলল বাড়ি। দরজা ভেঙে ফেলে আর কি! তোর কাকীমা কাউকে যেতে দিল না। সে নিজে যাবে। বলল, বড়দি পোয়াতি, ওর ওপর হামলা হ'লে ক্ষতি হবে। দাদা যতোক্ষণ না অনেকদূর এগিয়ে যান, আমি দোর আগলাবো—।'

গলা বুজে আসছে মেজকাকার। ঢোক গেলার সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে কণ্ঠার হাড। নিঃশ্বাস টেনে বলল, 'তো সে আগলে ছিল। ডাণ্ডা মেরে সরাতে হয়েছিল তাকে। কপালে এখনো কাটা দাগ আছে, দেখিস—'

সেই মাঠে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সীতেশ। ভাঙা, অস্ফুট গলায় বলল, 'তোর সঙ্গে যে আমাদের রক্তের সম্পর্ক, দীনু!'

দীনেশ চুপ। অস্বস্তিতে ছটফট করতে করতে সীমা হঠাৎ বলল, 'ওমা! আপনি যে কাঁদতে শুরু করলেন!'

'কিছু নয়, বউমা। কিছু নয়।' হাতের উল্টোপিঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সীতেশ বলল, 'পুরনো দিন মনে পড়লে একটু আবেগ এসে যায়। চলো, এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

সীতেশ দাঁড়াল না। মাটি থেকে উপড়ে তোলার মতো একটানে এগিয়ে গেল অনেকটা। হাঁটার ধরনে মেজকাকার এই দ্রুত ভঙ্গিটা আগাগোড়া লক্ষ করছে দীনেশ। সে ততো তৎপর হতে পারে না।

আলের ওপর উঠে সীমা বলল, 'হয় পাগল, না হয় অভিনেতা। কেমন একটা সীন করল দেখলে!'

ভুরু কুঁচকে স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল দীনেশ। তারপর পিছনে ফেলে আসা জমিটার দিকে। আমগাছ বরাবর অন্ধকার ঘন হতে শুরু করেছে। ওইখানে সীমানা। সীতেশ বলেছিল, আরো হবে। হয়তো হবে। সে ঠিক জানে না।

৩

স্লিপিং পিল গিলে হাই তুলল সীমা। পুরনো মশারির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'সই না করায় কিছু বলল না!'

'কী বলবে!' চুপচাপ সিগারেটে টান দিল দীনেশ। জানলায় গরাদ নেই। পাথরের খাঁজে হাত রাখলে ঠাণ্ডা উঠে আসে বুক পর্যন্ত। আধ-নেবানো লণ্ঠনের আলোয় মশার ওড়াউড়ি দেখা যায় স্পষ্ট। ঘুটঘুটে চারিদিকে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে জ্যোৎস্নার আলো। নীচে থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসছে পুরনো গলার কাশি। শব্দ চেনা হয়ে গেছে এতোক্ষণে। নৈঃশব্দের মধ্যে হঠাৎ চারিদিক জুড়ে শেয়াল ডেকে উঠল।

'এখানে মানুষের চেয়ে শেয়ালের সংখ্যা বেশি।' এলানো গলায় বলল সীমা। দীনেশ উত্তর দিচ্ছে না দেখে সময় নিল।

'তুমি কি জেগেই থাকবে না কি?'

'সিগারেটটা শেষ করি। তুমি ঘুমোও না!'

'ঘুম এলে তো!' আবার হাই তুলল সীমা; শব্দটা চেপে দিল গলার মধ্যে। তারপর বলল, 'ভাগ ছাড়ার কী দরকার! সকালে সদরে গিয়ে সইটা ক'রে এসো। ঝামেলা ঝুলিয়ে রাখা ভালো নয়।'

'দেখি—'

সীমা পাশ ফিরছে। কথা বলছে বালিশে মুখ গুঁজে। তার মানে ঘুম আসছে। এই সময়েব স্তব্ধতায় মিশে গেছে ঝিঁঝির ডাক। আবার কাশির শব্দে ফিরে এলো সীমা।

'ফিরে গিয়ে বরং দু' দশ টাকা পাঠিয়ে দিও। ছেলেমেয়েগুলোর জামা কাপড়ের যা দশা! কিছুদিনের হিললে হবে।'

দীনেশ বলল, 'দেখি—'

বাঁশঝাড়ে হাওয়া লেগে শব্দ উঠছে কটকট। পুকুবের অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি; পাঁক-মেশানো একটা সোঁদা গন্ধ নাকে এলো। তারস্বরে ডাকতে ডাকতে দিক বদল করছে একটা পেঁচা, আবছা অন্ধকারে দীনেশ সেটাকে উড়ে যেতে দেখল বাঁশঝাড়েব দিকে! ওইখানে ব'সে কাঁদত হবি বায়েনেব বউ। এই ঘরে শুয়ে ঘুম আসত না মা'র। ভয় পেত।

নিবে-যাওয়া সিগাবেটটা টোকা দিয়ে পুকুরের দিক ছুঁড়ে দিল দীনেশ। জ্যোৎস্না পবিষ্কার হচ্ছে ক্রমশ। কোনাকুনি তাকালে জমিটা দেখা যাবে। মাঝখানে বাঁশঝাড়ের আড়াল। এককালে বিস্তৃত ছিল আরো বহু দূর; ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। মেজকাকা বলেছিল, আরো হবে। ভাগাভাগির দলিলে সই কবার জন্যে কাল সকালে তাকে নিয়ে যাবে সদরের কাছারিতে। মনে হচ্ছে তখন থেকেই ব'সে আছে দাওয়ায়। কাশছে। আবেগ একবাবই এসেছিল।

ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে শীত নেমে গেল দীনেশের। সামনে জ্যোৎস্নাময় মাঠের দিকে যেটুকু চোখ যায় তাকিয়ে দেখল দ্রুত পায়ে হেঁটে লম্বা চেহারার একটা লোক চ'লে যাচ্ছে গাঁ ছেড়ে। যতো দূরে যাচ্ছে ততোই নিজের চেয়ে বড়ো দেখাচ্ছে তাকে। দেখল, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে জমিতে নামছে সীতেশ। সীমানা দেখানোর জন্যে এখন আর বেশি দূর তাকাতে হয় না তাকে। আগেব সীমানা ছিল ওই আমগাছ বরাবর। এখন দীনু দখল নিয়েছে।

অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল দীনেশ। ঘুমন্ত সীমার নিঃশ্বাসের শব্দ সহজ ক'রে নিল কানে। তারপর জামাটা গায়ে গলিয়ে টর্চ হাতে আস্তে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে।

লণ্ঠনের আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে চুপচাপ ব'সে আছে সীতেশ। মাঝে মাঝেই চুল ঝাড়ছে ব্যস্ত হাতে। কুঁজো, ক্লিষ্ট এক ধরনের চেহারা, জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট হয় না আদল। খানিক তাকিয়ে থেকে দীনেশ তার পাশে গিয়ে বসল।

'কে! দীনু? ঘুমুলি না!'

'নতুন জায়গায় ঘুম আসছে না।' দীনেশ বলল, 'তুমি এভাবে ব'সে কেন।'

'ভাবছি রে, বাবা! থই পাচ্ছি না!' সীতেশ নড়ে উঠল, 'তুই শুয়ে পড়, দীনু। কাল সকালে কাছারিতে যেতে হবে। ধকল কম নয়।'

গলায় মায়া ঝরাচ্ছে সীতেশ, যেন কাছারি যাওয়াটা ধকল ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু চুপ ক'রে থেকে দীনেশ বলল, 'কাগজটা দাও, মেজকাকা। সই ক'রে দিই—'

'কী বলছিস, দীনু! ছেড়ে দিবি!'

দীনেশ হাসল।

'ছাড়াছাড়ির কথা উঠছে কেন! তুমিই না বললে ওই আমগাছ পর্যন্ত আমাদের সীমানা!'

খেলা

ভুতুর জন্মের পর অক্লেশে বদলে যায় পৃথিবী। চারিদিকের আলো হাওয়ার সংস্পর্শে ফুটে ওঠে আশ্চয সব রঙ, চোখে যদিও দেখা যায় না কিছুই।

সকালের রোদ্দুর এসে হাত বুলিয়ে যায় বিনয়ের চুলে—ডেকে তোলে ক্লান্ত ঘুম থেকে, ওঠো, সুদিন আসছে। ছুটির পরে রাস্তায় বিকেলের হাওয়া উড়ে চলে নির্দিষ্ট দিকে, তারপর যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় একটু, ফিরে এসে মুখচেনা হেসে বলে, এই তো ! পিঠ সোজা ক'রে হাঁটো—সুখবর পাবে। বাসে ট্রামে এতো ভিড়, গিসগিসে মানুষজনের গা থেকে ভুরভুর ক'রে বেরিয়ে আসে সুগন্ধী ঘাম। মায়াময় তাদের চোখমুখ—পাশ খালি হ'লেই বিনয়কে ডেকে নেয় বসবার জন্যে। আজ খুব গরম, তাই না ! আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে কেউ, বৃষ্টি হবে। অফিসে দীনেশবাবু খুব কড়া লোক, ভুরুর খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে রাখেন ডিসিপ্লিন কথাটা—এমন কি তাঁকেও মনে হয় অমায়িক আর ক্ষমাশীল। সাহস বেড়ে যায় বিনয়ের। অনেকদিন পর মনে হয় বেঁচে থাকাব একটা মানে সে খুঁজে পাচ্ছে।

একদিন বিকেলে চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে দীনেশের টেবিলের সামনের খালি চেয়ারটায় ব'সে বিনয় বলে, 'দীনেশদা, একটা কথা ছিল—'

'বলো—'

অল্প আমতা-আমতা ক'রে লজ্জটা কাটিয়ে নেয় বিনয়। বলে, 'দিন দুয়েক ছুটি নেব ভাবছি।'

'ছুটি ! এই সময়ে !' বুকে চিবুক ঠেকিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ গলিয়ে দেয় দীনেশ, 'কার অসুখ ? তোমার তো মাও নেই, বাবাও নেই !'

'না, না। অসুখ-টসুখ নয়।' লজ্জা পেয়ে বলে বিনয়, 'ইয়ে—'

'কিয়ে !'

'এমনিই। মানে, রিণা পরশু একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। তাই ভাবলাম একটু—'

'রিণা কে ?'

চারিদিকের পরিবর্তন বিনয়ের লজ্জাটাকে সুন্দর ক'রে তোলে। দীনেশকে ক্ষমাশীল ভাবতে গিয়ে নিজেও হয়ে ওঠে ক্ষমাশীল। এতোদূর অজ্ঞতায় রাগ হয় না একটুও। হেসে বলে, 'রিণা, মানে আপনাব বউমা—'

'অ। তাই বলো ! বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম বটে, কার্ড তো আর পড়ে দেখিনি।' বলতে বলতেই ফাইলপত্রে মনোযোগী হয়ে ওঠে দীনেশ। একটা কাগজের মার্জিনে নোট লিখতে লিখতে বলে, 'করেছে মানে তো পাস্ট টেন্‌স্ ! হয়ে গেছে। এতো খুশি হয়ে যখন বলছ, নিশ্চয়ই ভালো আছে। ছুটিটা কী জন্যে ?'

'একটু আমোদ করতাম।'

'ও, আমোদ !' দীনেশ জের টানে, 'আমার ছেলেমেয়ের সংখ্যা ন'টি। গত বছরেও হয়েছে একটি। আমোদ ব্যাপারটা কী হে ? জানলে পাওনা ছুটিগুলো সব নিয়ে নেব।'

'পাবো না !'

'বুঝে দ্যাখো। ছুটি পাওনা থাকলে নেবে বইকি !'

অল্প মুষড়ে পড়ে বিনয়। এ-বছরে একটাও ক্যাজুয়াল লিভ নেয়নি সে। সিকও হয়নি। প্রোমোশন হ'লেও হতে পারে ভেবে প্রতিদিন অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ ক'রে যাচ্ছে মন দিয়ে, যাতে ভুলচুক না হয়, একটাও খুঁত চোখে না পড়ে দীনেশের। নিজের মাথাটা যে একটু বোকা—মনটাও ভুলো, এটা

বুঝতে পেরে কিছুদিন থেকে সে চতুরও হয়েছে সামান্য। কষ্টের সংসার তার—বিণার নিপুণ হাত সারাক্ষণ গুছিয়ে চলে ব'লেই চ'লে যাচ্ছে কোনোরকমে। ঘরের সামনে ছোট্ট উঠোনে টবের মাটিতে যত্নে লঙ্কা ফুটিয়েছে রিণা। বিকেলের শেষ দিকে প্রায়ই মুড়ি আনিয়ে খায় দীনেশ ; মুড়ির সঙ্গে এক-এক গরসে এক-একটা লঙ্কা খেয়ে যখন ঢেকুর চাপা দেয়—বড়োই পরিতৃপ্ত লাগে তাকে। ব্যাপারটা লক্ষ ক'রে একদিন রিণার তৈরি এক ঠোঙা লঙ্কা এনে উপহার দিয়েছিল দীনেশকে। খুশি হয়ে, চিবিয়ে, দীনেশ বলেছিল, 'খাসা হে। বোঝাই যায় যত্ন আছে।' শুনে বেশ চনমনে বোধ করেছিল বিনয়। এই লোকটার হাতেই তো সব—এই লোকটা রেকমেন্ড করলেই ঘাড় গুঁজে মেনে নেবে অফিসাবরা।

সেদিন রাতে পোস্ত-বাটা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বিণাকে বলেছিল বিনয়, 'তোমার হাতে লঙ্কাও দেখি মিষ্টি হয়ে যায়!'

'আহা।' রিণার লজ্জাটা আধফোটা হয়ে থাকে, 'কী বলল গো? খুশি হয়েছে তো? এ-বছর দেবে তো?'

'দেখি—'। ভাতের থালার সামনে ক্ষুধার্ত বিনয়ের মুখে উদাসীন ছায়া পড়ে, 'না দিলেও চ'লে যাবে—'

'আরেকটু পোস্ত নাও।' রিণা বলে, 'নিজেদের জন্যে কবে আর ভেবেছি।'

দীনেশের আজকের কথাবার্তার পর খটকা লাগে একটু। মনটা দমে যায়। তবু, ভুতুর জন্ম একটা আলাদা ব্যাপার। পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্যের অতর্কিত ব্যবহারে যার আচরণে তাবতম্য ঘটে না এতোটুকু, বন্যা কিংবা ভূমিকম্পে মানুষের মৃত্যুর খবর শুনে তাকিয়ে থাকে অযাচিত চোখে—স্ট্রাইকের দিনেও তিন মাইল হেঁটে এসে সই করে হাজিরা খাতায়, নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে হঠাৎই ঠাসা বোধ করে সে। ভাবে, ছুটি তো অনেক—সবই প্রাপ্য, দু'দিন ডুব দিলে কে আর কী বলবে! সে তো বানিয়ে বলেনি কিছু! আমোদ কী, তাও বোঝে না ঠিকঠাক। তবে আমোদ করতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছেটা চিনতে পারছে, এই যা। আধমাইল লম্বা মালগাড়ির শেষ বগিটার মতো জীবন তার—এর আগে মাঝে মাঝে নিজেকে খুব ক্লান্ত আর দুঃখী মনে হ'লে এক-একদিন নিজেকে এইভাবে গড়িয়ে দিত বিনয়। ভুতুর জন্ম একটু অন্যরকম ক'রে দিল তাকে।

সেদিন হাসপাতালে ঢুকবার আগে এক ঠোঙা কমলালেবু কিনে নেয় বিনয়। মেটারনিটি ওয়ার্ডের বেডে রিণাকে খুঁজে নিয়ে বলে, 'তোমার জন্যে। দু'বেলা দুটো ক'রে খেও। ভিটামিন।'

রিণা লক্ষ করে খুব মন দিয়ে পাশে রাখা কটের ভিতর কাঁথা-জড়ানো ছোট্ট মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে বিনয়। অন্য চেহারা। অফিস-শেষের ক্লান্তি নেই, খাইখরচার ভাবনা নেই এতোটুকু। বেলাশেষের দয়ালু রোদ আদর বুলিয়ে যাচ্ছে মুখে আর কপালে। বেডের ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে দেখতে দেখতে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে রিণা। লজ্জাও পায় অল্প। তবু বলে, 'ওভাবে তাকিয়ে আছ!'

'দেখছি—।' বিনয় হাসে। বলে, 'ব্যাটা ভূত! ঘুমোচ্ছে যেন সাড নেই!'

'বাপের স্বভাব। এখনই বোঝা যাচ্ছে—'

একটু আনমনা হয়ে যায় বিনয়। কিছু ভাবে যেন। বেডের পাশে রাখা বেঞ্চিটায় ব'সে পড়ে আস্তে আস্তে।

'বাপ কি ঘুমোয়!'

'না। তার খালি টাকার চিন্তা। সংসারের চিন্তা। ঘুমোবে কী ক'রে!' ডান হাতে ভর দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে কাছ খুঁজে নেয় রিণা। বলে, 'ওর বুকে নাকি ছোট্ট একটা জড়ুল আছে। নার্স কমলাদি বলছিল মঙ্গলচিহ্ন!'

বিনয় তেমনিই হাসে। চুপচাপ। একবার স্ত্রীর দিকে তাকায়। চোখ সরিয়ে নিয়ে যায় ঘরভর্তি প্রসূতিদের ওপর। তারই মতো কেউ না কেউ কারও কাছে ব'সে। একেবারে কোণের দিকের ফর্সা বউটির কাছে অনেকে। রিণা ততো ফর্সা নয় ; তবু তার শামলা মুখ এ দু'দিনে বুক ভরিয়ে দিচ্ছে বিনয়ের। যার বুকে মঙ্গলচিহ্ন, বেরিয়ে আসতে সে একটু বেগ দেবেই। ধকল তো কম যায়নি! কাল কথা বলেছিল শুয়ে শুয়ে; আজই দেখছে উঠে বসেছে বেডে—মুখে ক্লান্তি নেই আর। কিংবা ক্লান্তিটা

ভুলে গেছে সহজে—পৃথিবীতে মানুষের জন্ম কতো যে সুখের ! ভাবতে ভাবতে ছটফট ক'রে ওঠে বিনয়ের চোখ দুটো ; চোখ ফিরিয়ে নেয় রোদের দিকে। হাসিটা মরে না।

রিণা জিজ্ঞেস করে, 'হাসছ যে !'

'এমনি।'

'আহা ! এমনিই কেউ হাসে নাকি ? বলো না।'

'এমনিই। কাল পরশু দুটো দিন অফিসে যাবো না।'

'ও মা! কেন ! আমরা এখানে। তুমি ছুটি নিয়ে করবে কী ?'

'এমনি। মনে হলো ছুটি নিই। একটু আমোদ করি—'

'ছেলে পেযে পাগল হ'লে—', বিনয়ের ঠোঁট জুড়ে আনমনা হাসি, খানিক তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বিণা বলে, 'দু'দিন পরে নিও বরং। আমরাও ছাড়া পেয়ে বাড়ি যাবো।'

'দু'দিন পরে ? বেশ। তাই হবে—'

হাসিটা বুঝতে পারে না রিণা। তবু ভালো লাগে দেখতে। মনে হয় শেষ বিকেলের আলোর খানিকটা ঢুকে পড়েছে বিনয়ের বুকে—বেরুতে না পেরেও ক্ষোভ নেই কোনো, খুশিতে খেলা ক'রে যাচ্ছে ক্রমাগত। দেখতে দেখতে একটা আবেগ ছড়িয়ে পড়ে রিণার বুকে। দুঃখী মানুষের হাসিও বুঝি করুণ হয় ! পাশ কাটিয়ে বলে, 'আমাকে কেমন দেখছ গো ?'

বিনয় হাসে। হেসে যায়। হাসতে হাসতেই আলতো ক'বে ছুঁয়ে ফেলে রিণার হাতটা।

'বিয়েব দিন যেমন ছিলে।' বোকা-বোকা মুখ ক'রে বলে বিনয়, 'লজ্জা পাচ্ছ ?'

'না গো, লজ্জা না। কেমন যেন মনে হয় !' উল্টে বিনয়ের হাতটাই ছুঁয়ে দেখে বিণা, অল্প ঝুঁকে আসে সামনে। বলে, 'তোমার ছেলে কিছুই খায় না। এতো দুধ ! বুক ভিজে যাচ্ছে—'

'ধ'রে রাখো। খাবে।'

হঠাৎই উঠে পড়ে কটটার দিকে হেঁটে যায় বিনয়। আস্তে হাত বুলোয় কটটার গাযে। তাকিয়ে থাকতেই টেব পায় সুদিনের আভাস। টের পায় শরীরের ভিতর আজগুবি গ্ল্যান্ডগুলি নিঃশেষে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদেব ; শান্ত একরকম বসে ভ'রে উঠছে মাথা আর বুকের ভিতরটা। আবারও হেসে ফেলে সে। দ্যাখে, হাসিতে অল্প কেঁপে যাচ্ছে শিশুটিরও ঠোঁট। ভারী মজা তো ! একটা খেলা পেয়ে যায় বিনয়। আশপাশে তাকিয়ে উদ্যত হাততালিটা টেনে নেয় মনে। বিড়বিড় ক'রে বলে, ঘুমো, তুই ঘুমো। যখন আর একটু বড়ো হবি, কথা বলবি, হাঁটবি টলমলে পায়ে—আমার সমস্ত ভুলে-যাওয়া খেলাগুলো শিখিয়ে দেব তোকে।

রিণা খুব আড়ষ্ট হয়ে থাকে। নিচু গলায় বলে, 'ওরকম একটা বাচ্চাদের কটের অনেক দাম, না গো ?'

'তোমাব ইচ্ছে ?'

'না।' রিণা বলে, 'ন্যাড়া তক্তপোষ আমাদের। ভয় লাগে বড়ো—'

'ভিতু !' অন্যমনস্ক হতে হতে বিনয় বলে, 'দাম হোক। কিনে দেব।'

আমোদ করার ইচ্ছেটা তুলে রাখে বিনয়। পরের দিন চ'লে যায় অফিসে। শশাঙ্ক চৌধুরী কো-অপারেটিভের লোন-টোন দ্যাখে। টিফিনে তাকে আলাদা ডেকে বলে, 'শশাঙ্কদা, শ দুয়েক লোন পাওয়া যাবে ?'

'লোন নেবে ? কী করবে ?'

'বাচ্চাটাব জন্যে কট কিনব একটা। দরদাম করেছি। যা বাজার ! শ দুয়েকের নীচে কিছু নেই—'

'গরীবের ঘোড়া রোগ কেন !' শশাঙ্ক বলে, 'যা আছে তাতেই শোয়াও। ঠিক বড়ো হয়ে যাবে—'

বিনয় একটা ঘা খায়। খেলাটা থিতিয়ে পড়ে হঠাৎ। সামলে নিয়ে বলে, 'কোনোদিন তো চায় না কিছু ! বউয়ের ইচ্ছে—'

'তাহ'লে দিতেই হয়। নতুন মা-হওয়া মেয়েদের ইচ্ছা বড়ো বিষম। ফেলতে নেই।' চোখে দয়া মাখিয়ে তাকায় শশাঙ্ক, 'তবে, ভাই, খরচ-খরচা একটু বুঝে-সুঝে কোরো। আগের লোনটার কথা মনে

আছে তো ?'

চুপচাপ নিঃশ্বাস ফেলে বিনয়। টেনে নেয় আবার।

'দেব। দিয়ে দেব।'

একটা নতুন কট পেয়ে যায় ভুতু। ঘুপচি, সোঁদা ঘর। তবু সকালের আলোয় দিব্যি ভ'রে ওঠে আজকাল। রিণার বুক থেকে অক্লান্ত দুধ **টেনে টেনে,** নাদুস-নুদুস **হাত-পাগুলো** নেড়ে, নিদাঁত মাড়ি বের ক'রে হাসে গি-গি ক'রে। নানারকম শব্দ করে মুখে। বিনয় তাকিয়ে থাকে, দ্যাখে—দেখতে দেখতে হঠাৎই সিরসির ক'রে ওঠে চোখের কোণ। শিশু হয়ে শব্দগুলো ফিরিয়ে দেয় ভুতুকে। ভাবে। ভাবতে ভাবতে টের পায়, নতুন ক'রে বুকের মধ্যে শুরু হচ্ছে খেলা।

রিণা তাড়া দেয়, 'ছেলে নিয়ে থাকলেই হবে! অফিসে যাবে না ?'

'যাবো—।' বিনয় বলে, 'যাচ্ছি—'

খেলা যতোই জমে ওঠে আর আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে ওঠে ভুতু—ব্যবহারের শব্দগুলো ততোই কমে আসে বিনয়ের। হারিয়ে যায় কথা। টের পায় কথার ছেড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ক্রমশ ভ'রে উঠছে অদ্ভুত বোধে আর অনুভবে। তার সবগুলো সে চিনতেও পারে না ঠিক মতো। খেলা যতোই জমে ওঠে, কেন যেন মনে হয় তার খুশির পাশাপাশি চুপিসাড়ে দখল নিতে এগিয়ে আসছে একটা আশঙ্কা—বদলের রূপগুলো ঝ'রে যাচ্ছে ক্রমশ। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে। মনে পড়ে ভুতুর মুখ। খড়খড়ে মেঝের ওপর নরম হাঁটু ঘ'ষে এখন সে **হামাগুড়ি** দিয়ে ছুটোছুটি করছে রিণার পিছু পিছু। অস্ফুট কথা ব'লে চেষ্টা করছে দেয়াল ধ'রে দাঁড়াতে—খাবার মনে ক'রে মুখে পুরছে পুরনো দেয়ালের পলেস্তরা। মনটা এলোমেলো হয়ে যায় বিনয়ের। অস্বস্তি লাগে ; আগের চেয়ে আরো একটু কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাজে। হাসে। দিন **যায়নি।** খেলাটা আবার ফিরে আসে বুকের মধ্যে।

সে-বছরও কিছু হয় না বিনয়ের। কেউ কেউ খবর পায়, সে পায় না। মাইনের **অঙ্কে** চোখ বুলিয়ে ঝপ্ ক'রে টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলে পকেটে। লজ্জা লাগে বড়ো। সীটে ফিরে গিয়ে অসহায় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে দীনেশের দিকে। ব্যস্ত মানুষ, কাজ ছাড়া আর কিছু চেনে না। সবাই বলে, অফিস চালায় দীনেশবাবু।

সেদিন বাড়ি ফিরতে একটু বেশিই দেরি হয়ে যায় বিনয়ের। ট্রামে বাসে না চড়ে আনমনা হেঁটে যায় অনেকটা—অভ্যস্ত দুঃখ এতোটুকু ক্লান্ত হতে দেয় না তাকে। কী ভেবে মোড়ে দাঁড়ানো বেলুনওলার কাছে থেকে লাল নীল হলদে সবুজ বেলুন কিনে নেয় চারটে।

নিজের কাজে খুব বেশি হাসি পেয়ে যায় তার—প্রশ্রয় পেয়ে অনেকদিন পরে ফিরে আসছে হারানো খেলাটা। এতো দেরি পর্যন্ত জেগে থাকবে না ভুতু। কিন্তু কাল সকালে **রঙিন** বেলুনগুলো দেখে চমক পাবে নিশ্চয়ই।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেয় রিণা। কোলে ভুতু। প্যাঁটপেঁটে চোখে বেলুনগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে একগাল। হাত বাড়ায়।

ঝপ্ ক'রে নিজেকে লুকিয়ে নেয় বিনয়। বলে, 'ব্যাটা **ঘুমোয়নি এখনো।**'

'কোথায় ঘুম!' রিণা বলে, 'কতোবার চাপড়ালাম, আলো নেবালাম—কিছুতেই কিছু নয়! খালি 'বাব্' 'বাব্' ক'রে যাচ্ছে! কী যে **বাবা-অন্ত** প্রাণ!'

'**আয়,** দেখি কেমন বাবা-অন্ত প্রাণ তোর!' বেলুনগুলো রিণার হাতে তুলে দিয়ে ছেলেকে কোলে টেনে নেয় বিনয়, 'টাঙাও দেখি—'

'এগুলো কিনলে!' একটুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রিণা জিজ্ঞেস করে, 'কোনো খবর আছে নাকি ?'

'নাঃ।' দু'হাতে মাথার ওপর ছেলেকে তুলে ধরে বিনয়। খিলখিল ক'রে হাসে ভুতু—ছোট্ট মুঠোয় চুল চেপে ধরে বিনয়ের। খেলায় মন রেখে রহস্য করে বিনয় বলে, 'আয়ু কম। তাই কিনলাম।'

রিণা আর জিজ্ঞেস করে না কিছু। নিঃশব্দে হেঁটে যায় হেঁশেলের দিকে। যেমন যায়।

রাত্রে খেতে ব'সে থালায় হাত আটকে যায় বিনয়ের। মুখ তুলে বলে, 'দিন দিন কালি হয়ে যাচ্ছে চেহারা। যত্ন নাও না কেন!'

'ওরকম হয়।' নিঃশ্বাস চেপে রিণা বলে, 'ছেলে খেয়ে যাচ্ছে এখনো। ছাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।'

হাতটা সচল হতে গিয়েও থেমে যায় আবার। বর্ষার জল-পাওয়া চারার মতো তরতর ক'রে বেড়ে উঠছে ভুতু। দামাল শরীব তার, আজ সন্ধ্যায় দু'হাতে ওপরে তুলতে গিয়েই ভার টের পেয়েছিল বিনয়, কাঁপুনি লাগছিল কনুইয়ের জোড়ে। তেমনি খিদেও। জোগানোর দায় রিণার। একদিন একঠোঙা কমলালেবুর ভিটামিনের ছাপ গায়ে-মাংসে পড়ে না। রিণার দায় তার। এসব ভাবতে গিয়ে কনুইয়ের জোড় খুলে যায় বিনয়ের।

'খাচ্ছ না কেন!' রিণা বলে, 'খাও?'

খাবার নাম করে বিনয়। চাপা দেয়ালের মধ্যে হাওয়া ঢোকে না তেমন, তবু ঠিকই শুকিয়ে যায় থালা। রিণা তার কিছু বোঝে, অনেকটাই বোঝে না। বলতে গিয়ে জড়িয়ে যায় গলা।

'নিজেকে দ্যাখো? তুমি কী হয়েছ!'

'আমার কথা ছাড়ো। আমার কিছুই হয় না, হবেও না।' উপুড়-করা গ্লাসের পুরো জলটা ভুতুর হাসির মতো গলা দিয়ে নেমে ছড়িয়ে পড়ে বিনয়ের গোটা বুকে। হাসতে হাসতেই বলে, 'এবার টুক ক'রে মরে যাবো একদিন। টেরই পাবে না কেউ।'

উঠে পড়ে বিনয়। মুখ ধুয়ে ঘরে এসে দাঁড়ায় ভুতুর কটের সামনে। নিঃসাড়ে কাদা হয়ে ঘুমুচ্ছে ভুতু—শান্ত মুখশ্রী, নিঃশ্বাসের টানাছাড়ায় অল্প ওঠানামা করছে বুক। মাথা, পা কটের প্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রায়। ছোট কট আর বেশিদিন ধ'রে রাখতে পারবে না ওকে। তখন অন্য উপায় ভাবতে হবে।

আলো নিবিয়ে বিছানায় টান-টান হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেয় রিণা। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে বিছানায়। সময়টা অনুমান ক'রে খটকা লাগে বিনয়ের—উঠে ব'সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কাঁধ ছোঁয় রিণার। ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'খেলে না?'

'থাক।'

হাতটা সরিয়ে দেয় রিণা। বিনয় তার কিছু বোঝে, অনেকটাই বোঝে না। থেমে থেমে বলে, 'পিত্তি পড়িয়ে লাভ কী! ওতে শরীর আরো খারাপ হবে—'

রোগা শরীরে হঠাৎ জোর পেয়ে যায় রিণা। চকিতে উঠে বিনয়কে ঠেসে ধরে বিছানায়। বুকে দুমদাম কিলোতে কিলোতে বলে, 'কেন বলবে এসব কথা! কেন বলবে!'

বিনয় বুঝতে পারে না। হাতে জোর নেই রিণার, তুলোর বালিশ আছড়ানোর মতো ভোঁতা শব্দ হয় কয়েকটা। নাকি এটা তাব বুকেরই শব্দ!

'কোন কথা! কী বললাম!'

'আমি না হয় ভিক্ষে করব। ছেলেটার কী হবে!'

বিনয় বুঝতে পারে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাবে, তাই তো! সে রিণার স্বামী নয়, ভুতুর বাবা নয়—নড়বড়ে একটা দেয়াল। দেয়ালটা ভেঙে পড়লেই ভুতুর হাত ধ'রে রাস্তায় নামবে রিণা। ভারী মজা তো! ভাবতে ভাবতেই টের পায় আর একটা খেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে সে। অন্ধকার ঘরে খোলা জানালা দিয়ে যেটুকু আলো ঢোকে তাতে চেনা যায় না কোন বেলুনটার কী রং। শুধু আবছাভাবে দোল খায় সেগুলো।

রিণা কেঁদে নেয় একটু। তারপর সামলে নিয়ে আদরে হাত বুলোয় বিনয়ের মাথায়, চুলে।

'মাথার ঠিক থাকে না! তোমার লাগেনি তো?'

'নতুন ক'রে আর লাগবে কি। অভ্যেস হয়ে গেছে।' অন্ধকারে হাসে বিনয়. 'তুমি অতো ভাবো কেন!'

স্বামীর বুকে মাথা নামিয়ে রিণা বলে, 'নিজের জন্যে নয়—'

'ভেব না। রোগা ঘরামির কাটারি বড়ো—আমার আয়ুও তেমনি। আমি ঠিক বেঁচে থাকব।'

বিনয়ের কথা শেষ হয় কি হয় না। ওরা শুনতে পায় অন্ধকারে খিলখিল করছে হাসির শব্দ। রিণা

আগে ওঠে, তারপর বিনয়। দু'জনেই কট ধ'রে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে। খানিক পরে রিণা বলে, 'স্বপ্ন দেখছে—'

দিন যায়। আস্তে, কিন্তু দ্রুত বড়ো হয়ে ওঠে ভুতু। এখন সে দিব্যি নিজের পায়ে হাঁটে। কথা বলে গোটা গোটা। বকলে কাঁদে। রাগ হ'লে রাগে, ধমকায়। বিকেলে রোদ পড়ে এলে বিণাব হাত ধ'রে বেড়াতে যায় পার্কে। দেখতে দেখতে বড়ো হযে যায আরো একটু।

বিনয়ের কিছুই হয় না। সে যতোই হাত বাড়ায়, আঙুলের 'ফাঁকগুলো বড়ো হয়ে যায শুধু। খাটে মন দিয়ে, নড়বড়ে দেয়ালটাকে সোজা বাখার চেষ্টা ক'বে যায ক্রমাগত। তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিবে হাঁকুপাঁকু করে ওভারটাইমের জন্যে। খাটতে খাটতে কুঁজো হয়ে যায আবো। তবু খাটে। খেলাটা জিইয়ে রাখে বুকে।

একদিন ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওভাবটাইমেব টাকাগুলো কডকড ক'বে ওঠে পকেটে। ভুতুব জন্যে দ্বিতীয় উপহারটি কিনতে গিযে মনে পড়ে, কবে ফেটে চুপ্‌সে গেলেও বেলুনেব চামড়াগুলো এখনো ঝুলছে ঘরেব মাথায়। মাঝে মাঝে সেগুলোব দিকে তাকায ভুতু, কিছু ভাবে, তাবপর ভুলে যায আবার। এসব ভেবে ফুটপাথের দোকানে ঝুঁকে পড়ে বিনয়। রঙিন লাঠির ডগায ছোট চাকা লাগানো, পাশে ব্র্যাকেটে আঁটা গোল ক্রিং-ক্রিং ঘণ্টি। হাতে পেলে আটখানা হবে ভুতু। ভাবে, কিছুটা গেল, কিছুটা থাকল। পরের ওভারটাইমেব টাকাটা রিণার।

দিন যায়।

একদিন অফিস ছুটির পর শশাঙ্কর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিনয় বলে, 'শশাঙ্কদা, আমাব কিছু হয না কেন বলুন তো ?'

'কী ক'রে হবে !' শশাঙ্ক বলে, 'ব্যাপারটাই এমন, কাকব হবে—কাকর হবে না। আমাব কী হলো ! আমি দীনেশের এক গ্রেড ওপবে ছিলাম। এখন দীনেশ আমার তিন গ্রেড ওপরে। সবটাই এখন ওব মর্জিতে—'

বিনয় চুপ ক'রে থাকে। ধবতে পারে না।

'এটা অবিচার।' শশাঙ্ক হঠাৎ বলে, 'বুঝলে, এই মিডিলম্যানগুলোই খচ্চডের আঁটি। সরাসবি অফিসারের কাছে গিয়ে প্রেজেন্ট করো না কেসটা ? পারবে না যেতে ?'

বিনয় শোনে। তারপর পিঠ খাড়া ক'রে বলে, 'যাবো ?'

'যাবে ?' শশাঙ্ক চুপ্‌সে যায়। বলে, 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কি ঠিক হবে ? দীনেশকে তো চেনো !'

বিনয় জবাব দেয় না। মেরুদণ্ডের খাড়া ভাবটা সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ। এগোতে গিয়ে পিছিয়ে এসে দু'হাতে নড়বড়ে দেয়ালটাকে ঠেকা দেয় সে। হাঁটু কাঁপে, থরথব ক'বে ওঠে পিঠ—যেটুকু রক্ত আছে সব জড়ো ক'রে আনে হাতে।

'কী করবে বলো তো !' আবো খানিকটা হেঁটে গিয়ে শশাঙ্ক বলে, 'বরং দীনেশকেই খোশামোদ ক'বে যাও—'

বিনয় মাথা নাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয না কোনো। তারপর বলে, 'কতোই তো করলাম ! খোশামোদে কাজ না হ'লে গ্লানিটা বেড়ে যায় আরো। নিজেকে আব মানুষ ব'লে মনে হয না।'

চারিদিকের অন্ধকার সংস্পর্শে হারিয়ে যায কথাগুলো। ফেরত দেয় না কিছুই।

বাড়ি ফিরতেই দৌড়ে আসে ভুতু। জামা ধ'রে টানে। বলে, 'বাবা, আমার একটা ঘোলা চাই—'

'ঘোলা কি রে !'

'ঘোড়া, ঘোড়া।' রিণা শুধরে দেয়, 'উচ্চারণ করতে পারে না, তবু শখ আছে। দোকানেব শো-কেসে কাঠের ঘোড়া দেখে সেই থেকে বায়না ধরেছে !'

'দাম কতো ?'

'অনেক।' রিণা বলে, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই। বায়না ধরলেই হয় নাকি !'

বিনয় জবাব দেয় না। আনমনে হাসে, হাত বোলায় ভুতুর মাথায়। তারপর বলে, 'দেব, বাবা। ঠিক

দেব। এখন তোমার সেই ক্রিং-ক্রিং ঘন্টিগাড়িটা নিয়ে খেলা করো। দেখি কেমন পারো—'

'সেটা আর আছে নাকি!' রিণা বলে, 'ফুটপাথের জিনিস, কতোদিন আর থাকবে!'

সোজাসুজি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় বিনয়।

তাকিয়েই থাকে। চেষ্টা করে হাসতে। তারপর অন্যরকম গলায় বলে, 'ঠিকই তো! ফুটপাথের জিনিস, কতোদিনই আর থাকে!'

রিণার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এইমাত্র একটা কথা ব'লে ফেলেছে সে। আড়াল খোঁজার জন্যে তাড়াতাড়ি স'রে যায় সামনে থেকে।

বিনয় এসব দ্যাখে না। শুধু বুক ফুলিয়ে নিঃশ্বাসটাকে টেনে নিয়ে যায় মাথা পর্যন্ত। টের পায় দূর থেকে ধুলোর ঝড় তুলে বুকের মধ্যে উড়ে আসছে খেলা। তাড়াতাড়ি ভুতুর হাতটা চেপে ধরে সে। বলে, 'কাঠের ঘোড়ায় হবে কি! তোকে সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়াবো—'

বলতে বলতে হাঁটু মুড়ে ফেলে বিনয়, তারপর হাত নামিয়ে চারপেয়ে হয়ে ওঠে। বলে, 'আয়। উঠে পড় পিঠে—'

ভুতু ওঠে। 'হ্যাত' 'হ্যাত' শব্দ করে মুখে। ঘাড়ের চুল ধ'রে টানে। বলে, 'জোরে—জোরে—'

ঘোড়াটা দৌড়তে শুরু করে। বহুদিন দানাপানি না-পাওয়া তার জীর্ণ পেশীগুলো টনটন ক'রে ওঠে যন্ত্রণায়; মনে হয় ফেনা উঠে আসছে মুখে। হাল ছাড়ে না তবু। ধুলোর ঝড় তুলে একটা কাঠের ঘোড়া তাড়া ক'রে আসছে পিছনে—কিছুতেই এগোতে দেবে না তাকে। শিরাগুলো জোঁকের মতো ফাঁপিয়ে তুলে দাপিয়ে দৌড়য় সে। হাঁফ ধ'রে যায় বুকে। টপ্‌টপ্ ক'রে জল পড়তে থাকে চোখ দিয়ে। দৌড়তে দৌড়তেই জিজ্ঞেস করে, 'ভুতু, কোন ঘোড়া ভালো?'

স্বর বেরোয় না কোনো।

কাচ

চাকরিতে উন্নতি হবার পর মতিগতি পাল্টে গেছে বিনোদের। প্রায়ই বাইরে যায়, বলে নাকি ট্যুরে যেতে হয়। আজ **দিল্লি**, কাল বাঙ্গালোর, পরশু বোম্বাই, তার পরের দিন হায়দ্রাবাদ। রমা যে একলা পড়ে থাকে সে-ব্যাপারে হুঁশই নেই কোনো, বলে নাকি চাকরিতে যারা উন্নতি করতে চায় সংসার তাদের শত্রু। কী কথার ছিরি! সংসার পরিবারের খেয়ালই যদি না থাকে তাহ'লে কাঁড়ি কাঁড়ি উপার্জন আর এই রক্ত জল-করা ছুটোছুটির মানে কি!

আজকাল **এরকমই** হয়েছে। উন্নতির এক ধাপ সিঁড়ি যদি এখানে থাকে, পরেরটা থাকে বোম্বাইয়ে। কর্তার আমলে এরকম ছিল না। একই অফিসে একই বাড়িতে ব'সে চল্লিশ বছর কাটিয়ে গেছেন তিনি, কেরানি থেকে বড়বাবু হতে অসুবিধে হয়নি কোনো। ওরই মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন তিন ছেলেকে, ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছেন দুই মেয়ের, যাবার আগে কল্যাণীতে একতলা বাড়িটাও তুলে গিয়েছিলেন। এদের বকমসকমই আলাদা।

এসব নিয়ে **খুঁতখুঁত** থাকলেও রমাকে দেখে অবশ্য সুখীই মনে হয় হেমলতার। বিয়ে হয়েছে **চোদ্দ** বছর, শরীর এখনও সেই বাইশ বছরের ছুঁড়ির মতো আঁটসাট। ছেলেপুলে হয়নি ব'লেই এরকম। অথচ মরা তিনটিকে নিয়ে এই বয়সেই সাতখানি বিয়োতে কোনোই অসুবিধে হয়নি তার। পুলু হয়েছিল আরো বছর তিনেক পরে। সেই মায়ের কিনা এই মেয়ে! বাঁজা না আজকালকার ঢঙে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ট্যানিং করছে কে জানে! ছেলেপুলে না হ'লে মেয়েমানুষের গরিমা কোথায়! বললে হাসে, কিংবা মুখ ঘুরিয়ে নেয় কখনো। জামাইটা ইয়ে নয় তো! তা যাকগে, ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে।

কিন্তু বিনোদ ওই হাবিজাবি বোতলগুলো গেলে কেন! রাত দুটো পর্যন্ত ফ্ল্যাটে এতো হইচই-ই বা কিসের! এক পুরুষের দঙ্গলে শেষ নেই, ঢলাঢলি আর হাসিতে সঙ্গের মেয়েগুলোও কম যায় না। মনে তো হয় গেলেও। কী সুখ বাপু ওই বোতলের জলে যে, বাড়িতে যে একজন মাতৃসমা গুরুজনও আছেন **সে-কথা** মনে পড়ে না!

ভাবনাটা সারারাত বিজবিজ করছিল মাথায়, রাগের সঙ্গে কৌতূহল মিশে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল চোখের। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘড়িতে যখন তিনটে পার, তখন সিঁড়িতে **জুতোর শব্দ**, বিলীয়মান গলার স্বর, **নীচে** গাড়ির স্টার্ট **হবার** শব্দ আর রমাদের দরজা বন্ধ করার শব্দে বুঝল বাড়ি শান্ত হলো। ঘুম এলো না তবু।

আরো কিছুক্ষণ পরে উঠে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলল হেমলতা, জল দিল চোখে-মুখে। বাইরে অন্ধকার লেগে থাকলেও ক্বচিৎ কাকপক্ষীর ডাক শুনে অনুমান করল ভোর হচ্ছে। ওদের ঘরের বন্ধ দরজার **সামনে** দাঁড়িয়ে কান পাতল খানিক। মজা এই, এদের কোল দেবার জন্যে ঘুমও যেন কাদা হয়ে থাকে! **হুঁশ** থাকে না কোনো! এই যে, দ্যাখো, সদরের দরজা লাগিয়েছে, কিন্তু বসার ঘরের আলো নেভাবার কথা মনে হয়নি। বোতল, **গ্লাস**, প্লেটে মাংসের টুকরো, সবই যেমন-কে-তেমন ছড়ানো। সকালে সারভেন্ট্স **কোয়ার্টার্স** থেকে বিশ্বনাথ এসে বেল না দেওয়া পর্যন্ত ওগুলোর হিল্লে হবে না কোনো। আজ রবিবার; মিঞা-বিবি ঘুম ভেঙে উঠবেন সেই দশটা এগারোটার আগে নয়।

কী ভেবে একটা খালি গ্লাস তুলে নাকের সামনে আনল হেমলতা। গন্ধ শুঁকলো। মিষ্টি-মিষ্টি, ওষুধ-ওষুধ, ঝাঁঝালো। রেখে দিল। পাশে পেটমোটা বাহারে এক বোতল, আস্তে হাতে ছুঁতেই গলার কাছে টলটল ক'রে উঠল জল। কী ভেবে, আর নিশ্চিত সাহস পেয়ে, এক হাতে বোতলের তলা ধ'রে অন্য হাতে ছিপিটা খুলে গন্ধ শুঁকলো আবার। মিষ্টি-মিষ্টি, ঝাঁঝালো। ওই **ঝাঁঝ** ওদের গলার মধ্যে দিয়ে

গড়িয়ে যায় পেটে, সুখে ঝলমল ক'রে ওঠে শরীব, তারপর আস্তে আস্তে, এইভাবে ঢলে পড়ে ঘুমে। উঠতে উঠতে সেই দশটা এগাবোটা। তার মানে এই সময়টা তাব, একাব—এই সময়টা হেমলতা কি করছে না কবছে রমা বা বিনোদ কেউই আব তা দেখতে আসছে না।

ভাবতে না ভাবতেই কাণ্ড। বোতলেব আগুন জিভ ছুঁয়ে গলার দিকে এগোতেই অদ্ভুত জ্বালায় দু'চোখে অন্ধকার দেখল হেমলতা, হঠাৎই মনে হলো বুক চেপে ব'সে পড়া দরকার। তাই করতে গিয়ে চলন্ত মোটরগাড়ির টায়ার পাংচারের দুমফুস শব্দ ক'রে ঢাউস বোতলটা আছড়ে পড়ল মেঝেয়। ততোক্ষণে বুক চেপে মাটিতে ব'সে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছে হেমলতা। দেখল, সুন্দর তরলরেখা এঁকেবেঁকে গড়িয়ে যাচ্ছে সদরের দিকে ; জ্বালাটা বেশি না হ'লে সে গতিরোধ করার চেষ্টা করত।

বোতলের শব্দে ছুটে এসে ওইখানে ওই অবস্থায় হেমলতাকে দেখে থমকে দাঁড়াল বমা। তাব পিছনে স্লিপিং স্যুটের বোতাম আঁটতে আঁটতে বিনোদ। তার আগেই টনটনে জ্ঞান ফিরে এসেছে হেমলতার, মেয়ে-জামাইকে কিছু বলবার সুযোগ না দিযে রমাব মা ও বিনোদের শাশুড়ী বলল, 'ও রমা, বুড়ো বয়সে এ কি শখ হয়েছিল রে আমার! ধর আমাকে! দ্যাখ, বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক হযে গেল!'

চারদিকে কাচের টুকরো ছড়ানো। আলগোছে এগিয়ে এসে হেমলতাকে তুলে দাঁড় করাল রমা, তারপর চাপা গলায় বলল, 'মদ গিলেছ!'

'মদ গিলব কি রে, আমি কি তোদের মতো! ওরে বাবা, বুক জ্বলে যাচ্ছে!' ওয়াক্ তোলার মতো মুখ ক'বে হেমলতা বলল, 'আমাকে বিদেয় দে তোরা। এ পাপেব বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকব না।'

'থামো, থামো! আর ঢঙ করতে হবে না। আমার মান-সম্মান আর কিছুই থাকল না!'

বিনোদ এতোক্ষণ কিছুই না ব'লে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া চোখে তাকিয়ে ছিল চৌচিব মেঝের দিকে। ঘটনা হৃদয়ঙ্গম ক'রে সশব্দে চাপড মারল কপালে।

'মাই গুডনেস্! শিভাস বিগ্যাল-এর নতুন বোতলটা!'

'বেশ হয়েছে! তখনই বলেছিলাম তুলে রাখতে—'

'বাবিশ!' পাকানো চোখে রমার দিকে তাকিয়ে ভাঙা বোতলের সবচেয়ে বড়ো টুকরোটার ওপব ঝুঁকে পড়ল বিনোদ, 'হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দিস্! মাল খাবাব ইচ্ছে থাকলে বললেই পারত।'

গলার জোরে কতোটা অনুতাপ আর কতোটা রাগ, রমা তা খুবই ভালো চেনে। একটু হাই হযে আছে, সম্ভবত সেইজন্যেই ভাবটা প্রকাশ করতে পারছে না ঠিকঠাক। না হ'লে ধাক্কাটা লেগেছে গভীরে। ঘোব যতো কাটবে ততোই বেড়ে উঠবে রাগ। টাকাব চেয়ে বড়ো কথা বোতলটা জোগাড করেছিল ম্যাকগ্রেগর সাহেবকে বাড়িতে ডাকবে ব'লে। তোয়াজের বহরে বোতলের পদার্থ বিশুদ্ধ তেল হয়ে যেত। ভিতরেই ছিল; গেস্টরা চ'লে যাবাব পর একটু চেখে দেখার সাধ হয়েছিল। মাঝখান থেকে হেমলতাই ভণ্ডুল ক'রে দিল সব!

হেমলতাকে টেনে বিনোদেব চোখের আড়ালে নিয়ে যেতে যেতে রমা বলল, 'ছি, ছি! কী করলে বলো তো!'

'ইচ্ছে ক'রে করিনি মা!' হেমলতা একটা ওয়াক্ সামলালো। বিনোদের সামনে দাপট দেখিয়েছিল অপরাধ আড়াল করার জন্যে। সেটা কাজে লাগেনি। পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছে। কে ভেবেছিল বোতলটা ভেঙে যাবে! এখন লজ্জার একশেষ! জামাই ভেবে নেবে শাশুড়ী লুকিয়ে এইসব করে তারপর সাতকান হবে। কেউই বিশ্বাস করবে না আচারটা বিস্কুটটা চেখে দেখার মতো হেমলতা শুধুই একটু চেখে দেখতে গিয়েছিল। এইসব ভেবে সিঁটিয়ে গেল হেমলতা।

এখন আর জ্বালা নেই। বেসিনে মাথা ঠুসিযে মাথায় মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়েছে রমা। মাথা ঠাণ্ডা হ'লেও গা-টা গরম লাগছে, নাভির চারপাশে কেমন একটু অস্বস্তি। সঙ্গে ভয়! বিনোদকে দেখা যায়নি এখনো। এমনিতে হাসিখুশি মানুষ হ'লেও রাগলে জ্ঞান থাকে না। বিনা চিনির চায়ে চুমুক দিয়ে কাপ-ডিশ ভেঙেছিল একবাব। তা তার নিজের জিনিস নিজে ভাঙুক, কেউ কিছু বলতে যাচ্ছে না। বোতলটা ভেঙেছে হেমলতা।

ঝাঁটা আর বালতি হাতে বমাকে সদরের দিকে যেতে দেখে ভিতু গলায় হেমলতা বলল, 'আমি

পরিষ্কার ক'রে দেবো ?'

'থাক, আর ঝামেলা বাড়িও না।' যেতে যেতে মুখ ঝাম্‌টা দিল রমা, 'যা করেছ, এরপর আমারই এ-বাড়িতে টেঁকা দায় হবে।'

কথাটা ঠাস্ ক'রে লাগল গালে। নিজের টেঁকার ওপর জোর দিল রমা ; তার মানে তো এই যে, অনেক জ্বালিয়েছ, এবার বিদায় হও ! একটু আগে হেমলতা নিজেই যখন কথাটা বলেছিল, অতশত ভেবে বলেনি। এমনও হতে পারে, রমা বিশ্বাস করেনি ব'লেই আড়ে-আবডালে এখন শুনিয়ে দিল কথাটা। হা ভগবান ! তাহ'লে কি সত্যিই—

এক ঢোঁক ছাইভস্ম গিলে গা-টা গরম হয়ে উঠছে ক্রমশ। মাথাটাও ভার-ভাব লাগছে কেমন। এর চেয়ে বিষ হ'লে ভালো হতো, অন্তত এই গ্লানি সহ্য করতে হতো না। বাইরের ঘরে বিনোদের ক্ষিপ্ত গলার চ্যাঁচামেচি শুনে ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল হেমলতা। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল। রমার দোষ নেই, ঠিকই বলেছে রমা। বোধহয় ভোর হয়ে আসছে। কাকপক্ষীর গলা ছাপিয়ে বিনোদের কর্কশ গলার স্বর শুনে কাঠ হয়ে এলো শরীর। রমাও বুঝি কিছু বলছে। আ-হা ! এর চেয়ে বিষ হ'লে ভালো হতো !

শরীর কাঠ ক'রে তার পরেও অনেকটা সময় মেয়ে-জামাইয়ের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনল হেমলতা, থানেও খুঁটে চোখ মুছে নিল বার কয়েক। টুকরো টুকরো যে-সব কথা কানে আসছে তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সকাল হ'লেই তাকে এ-বাড়ির পাট চুকিয়ে যেতে হবে। তা না হ'লে ঝগড়াটা চলবে। কোথায় যাবে ? ওই, উত্তেজিত গলায় রমা যেন ফোন করছে কাকে ! লাবুকে নাকি ? কী বলছিস মুখপুড়ি, তোর মা মদ গিলেছে, মদের বোতল ফাটিয়েছে ! এই কাকভোরে মানুষকে ঘুম থেকে তুলে এতো বড়ো মিথ্যা কথা বলতে আটকাচ্ছে না মুখে ! হা কপাল ! পেটের ছেলের কাছে মা'র নামে নিন্দে যে কী, বুঝতে পারতিস নিজের ছেলে হ'লে !

ওদের ঝগড়া থামছে না। এ-ঘরের অন্ধকারে একা-একা বিছানায় কপাল ঠুকতে লাগল হেমলতা। একবার ভাবল ছুটে গিয়ে বিনোদের পা জড়িয়ে ধ'রে বলে, ঘাট হয়েছে বাপু তোমার বোতল ভেঙে ! আমি চ'লে যাচ্ছি ; এবার ক্ষ্যামা দাও। আবার ভাবল, হাবুকে গিয়ে বলে কল্যাণীর বাড়ি বেচে যে-টাকা পেয়েছিলি সে-টাকা তোদের—ভাইদের—নামে জমা আছে ব্যাঙ্কে। ওর থেকে টাকা তুলে দাম শুধে দে ওর মদের বোতলের। তোদের নামে জমা থাকলেও ওটা তো আসলে আমারই টাকা, বাড়িটা তো কর্তা আমাকেই দিয়ে গিয়েছিল। ও হাবু, ও লাবু, ও পুলু—কী কুক্ষণে তোদের পরামর্শ শুনে বাড়িটা বেচে দিলাম আমি ! কেন তোরা বলেছিলি, পাঁচ ছেলেমেয়ের কাছে ভাগাভাগি ক'রে থেকে দিব্যি সুখে বাকি জীবনটা কেটে যাবে আমার ! এই কি সুখ ! এর চেয়ে ওই একলা নির্জন বাড়িতে পচে গলে মরে যাওয়াও ভালো ছিল আমার !

বিশ্রী গলায় কথা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে করতে হঠাৎই চুপ ক'রে গেল ওরা। বোধহয় শুয়ে পড়ল। ওদের ছেড়ে-দেওয়া শব্দের জায়গাগুলো ক্রমশ ভ'রে উঠতে লাগল কাকপক্ষীর ডাকে, ট্রাম চলার শব্দে, ট্যাক্সির ভেঁপুতে। জানলার বাইরে আকাশটা খোলসা হতে শুরু করেছে ; সিরসিরে অল্প একটু হাওয়াও ছুঁয়ে যেতে লাগল ঘাড়, পিঠ। হেমলতার চোখ জুড়লো না তবু। সময় কম। সকালের আলোয় এই কালোমুখ দেখানো যাবে না কাউকে ; যেন তার অসহায়তা টের পেয়ে সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে খেয়াল খুশির তোড়ে। থামবে না। নিরুপায় চোখে হেমলতা তাকিয়ে থাকল অন্ধকারে আবছা ঘরের আসবাবের দিকে, আলনায়, এমনকি স্টীলের ট্রাঙ্কটার ভিতর অব্দি। গোছগাছ ক'রে বেঁধে নেবার মতো তেমন কিছু নেই ব'লেই ফাঁকা জায়গায় হাওয়া খেলছে বেশি। শ্বাস টানতে গিয়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে পাঁজরের হাড়গুলো। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আবার ছাড়তে ছাড়তে হেমলতা হিসেব করল, এটা চৈত্রের মাঝামাঝি, রমার বাড়িতে এসেছিল ফাল্গুনের গোড়ায়। হাবুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বিশ্বনাথের সঙ্গে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল বিনোদ। তো, সেই গাড়িতে ওঠার পর দরজা বন্ধ ক'রে দিতে দিতে হাবু বলেছিল, 'কিছুদিন রমার কাছে থাকো। জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ ফিরে এসো আবার।' শুনে চুপচাপ ঘাড় নেড়েছিল হেমলতা। কেনই যে হঠাৎ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল রমা, আর হাবুও যে

ছেড়ে দিল কেন, কিছুই বুঝতে পারেনি তখনো। শত হোক, ছেলে নিজের ; মেয়ে কি আর তার ! বিনোদ যতোক্ষণ ঘুরঘুর করবে চোখের সামনে, ততোক্ষণই মনে হবে পরেব ঘরে আছি।

বুঝল রমার ফ্ল্যাটে এসে। কোম্পানির দেওয়া নতুন ফ্ল্যাট, হেমলতা এলো প্রথম। এটা দ্যাখো মা ওটা দ্যাখো মা ক'রে রমা যখন তাকে ঘরদোর দেখাচ্ছে, টিপ্পনি-কাটা গলায় বিনোদ হঠাৎ বলল, 'ঘর পরে দেখিও। আগে টয়লেটটা দ্যাখাও।'

শুনে রাগ দেখালো রমা, 'থামো তো ! যতো সব অসভ্যতা !'

অবশ্য তারপরেই টেনে নিযে গিয়েছিল বাথরুম দেখাতে।

'কমোডে তোমার অসুবিধে হয়, মা ! এই টয়লেটটা ইন্ডিয়ান স্টাইলের, তুমি এটাই ব্যবহার কোরো '

হেমলতার মুখ ফ্যাকাশে। কেঁচো গলায় বলল, 'হাবুর বউ বুঝি বলেছে তোদের !'

'না, না, তেমন কিছু বলেনি।'

'এমনিই হয়।' হেমলতা বলল, 'ওদিকের বাথরুম আটকানো ছিল, না হ'লে কি এমন কবি ! তাও তো মেঝে ধুয়ে দিয়েছিলাম পরিষ্কার ক'রে—'

'অমন হয়। শরীর অসুস্থ হ'লে তুমি কী করবে ! ও নিয়ে ভাবতে হবে না তোমায়—'

চুপচাপ গলায় হেমলতা বলেছিল, 'বউমা তো সেদিন থেকেই কথা বলা বন্ধ করেছে। এই যে এলাম তোর এখানে, একবারও থাকতে বলেনি—'

'অতো অভিমান কবো কেন !' রমা বলেছিল, 'বাড়িটা তো আর বউদির নয়, দাদার। তাছাড়া কলকাতায আমি আছি, ছোড়দা আছে। তোমার থাকার ভাবনা কী !'

হেমলতা জবাব দেয়নি। একটা থম এসে ভর করেছিল বুকে। তার থাকা না-থাকা নিয়ে হাবু, লাবু, রমা সবাইকেই হিসেব ক'রে চলতে হয। মারাঠী মেয়ে বিয়ে ক'রে পুলু আমেদাবাদে। যেতে বলেনি কখনো। বড়ো মেয়ে উমা থাকে ডিগবয়ে , শেষ কবে এসেছিল এদিকে মনেও নেই, তো তার কাছে থাকা ! আজকাল চিঠিপত্রও দেয় না। হাবু অবশ্য মন্দ বলেনি, জ্যৈষ্ঠ মাসে এসো। হিসেবে ঠিক আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে হাম্‌টি, ডাম্‌টির গ্রীষ্মের ছুটি হবে স্কুলে—ছেলেদের নিয়ে টানা দেড় মাস এলাহাবাদে-বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবে বউমা। হাবুও থেকে আসবে দু'তিন সপ্তাহ। তখন এই বুড়ীকে অতো বড়ো ফ্ল্যাটের খাঁচায় পুরে রাখা কি এমন অসুবিধে ! চাকর-বাকরের ওপর ভরসা ক'রে অতোদিন বাড়ি ছেড়ে থাকা যায় না। হেমলতা থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কিছুটা।

হেমলতা একটা নিঃশ্বাস চাপল। বাকি থাকে লাবু। টানাটানির সংসার তার, এরই মধ্যে চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, দু'ঘরেব বাসা-বাড়িতে জায়গার বড়োই টান। সারাক্ষণই তিরিক্ষি হয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীব মেজাজ, সাবাক্ষণই এটা ওটা নিয়ে কথা কাটাকাটি। মেজ বউমাও তেমনি, একেবারে গোছানো নয়। অথচ, কর্তার সংস্থান ছিল এব চেয়েও কম ; কই, কোনোদিন তো টের পাওয়া যায়নি। গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিকই চালিয়ে নিত হেমলতা। তা, এই নিয়ে বোঝাতে গিয়েই শুরু হলো বিপত্তি। মুখে মুখে চোপা করেছিল বউমা। লাবুটাও যা গোঁয়াব, শুনে ঠাস্ ক'রে এমন এক চড় কষাল বউমার গালে যে কালশিটে পড়ে গেল। ছি, ছি ! না হয় ব'লেই ছিল দুটো কথা, তা ব'লে গায়ে হাত তুলবে ! এরা এই রকমই—যতো আদিখ্যেতা, ততো বাগ ; কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই কোনো। তো, সেই কাণ্ডের পর, লাবু অফিসে বেরুলে কোলের ছেলেটাকে নিয়ে এক বস্ত্রে বাপের বাড়ি চ'লে গেল বউমা। কী লজ্জা ! রাতে দু'চোখের পাতা এক হয় না হেমলতাব, বউমার গালের ওই পাঁচ আঙুলের দাগ সারাক্ষণই ভাসে চোখের ওপর। চুপচাপ বাড়িতে সাবাক্ষণ মুখ শুকিয়ে থাকে তিনটি ছেলেমেয়ে। তিন দিনেও লাবুর কোনো টনক নড়ছে না দেখে হেমলতা বলল, 'আজই গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয় বউমাকে। আমি হাবুর বাড়ি চ'লে যাবো—'

যতো দিন যাচ্ছে ততোই যেন আরো কাঠ-কাঠ হয়ে যাচ্ছে লাবু। গম্ভীর মুখে বলল, 'যাক না ক'দিন। বাপের বাড়িতে কতো রাজভোগ জুটছে সে তো আমি জানিই। সুড়সুড় ক'রে নিজেই ফিরে আসবে—'

'আমি তোমার সংসার ভাঙতে আসিনি বাছা ! আমাকে নিমিত্ত কোরো না।' থমথমে গলায় বলেছিল হেমলতা, 'আমি হাবুর কাছে চ'লে যাচ্ছি। বউমাকে আজই ফিরিয়ে নিয়ে আয়।'

কপাল, কপাল ! না হ'লে এইসব হয় ! যাবার কিছুদিন আগে কর্তা বলেছিলেন, 'বুঝলে হেম, সংসার বড়ো হ'লে বউ ছেলে নাতি-নাতনি এসে বাঁচার স্বাদটাই দেয় পাল্টে। ইচ্ছে করে এদের জড়িয়েই আমোদ করি সারাক্ষণ !' কর্তা গো, এই বুঝি তোমার বেঁচে থাকার স্বাদ ! দু'বছর যেতে না যেতেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল ! তা তুমি মরেছিলে বুড়ো বয়সে। আরো আগে গেলে তো সব তীর্থ কবেই ঘোরা হয়ে যেত আমার !

একটা ঘোর ঘোর ভাব নিয়ে কখন যে বিছানা ছেড়ে উঠল হেমলতা, মুখ-হাত ধুলো, জামা-কাপড় ঠাকুরের ছবি তুলে গোছগাছ করল বাক্স, নিজেই খেয়াল করেনি। ওরা যেতে বলেনি, তবু শেষ রাতেব চ্যাচামেচি আর টেলিফোন করা শুনেই বুঝেছিল এখানে থাকা আর উচিত হবে না। লজ্জার মাথা খেয়ে হাবু বা লাবু যে-কোনো একজনের কাছে চ'লে যাওয়া যায়। পেটের ছেলেরা, ফেলে কি আর দেবে !

সাড় পেল দরজায় টোকা পড়তে। বোধহয় রমা। থানের খুঁটে চোখের কোণদুটো তাড়াতাড়ি মুছে, উঠে গিয়ে দরজা খুলল হেমলতা। রমাই। চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভারী মুখ। ঘুমোয়নি যে দেখেই বোঝা যায়।

মেয়ের মুখ থেকে চোখ সবিয়ে একটুক্ষণ সকালের প্রথম আলোব দিকে তাকিয়ে থাকল হেমলতা। চৈত্র মাসের সকালের রোদ বড়ো সুন্দর আর ঝলমলে ; তবু আজ একটু মেঘলা লাগছে যেন। নাকি চোখের দোষ ! একটু ইতস্তত ক'রে হেমলতা বলল, 'চা আনলি ! আজ এখনো পুজো হয়নি, ঠাকুব তুলে ফেলেছি।'

'তুলে ফেলেছ !' সামনে যা পেল তারই ওপর হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে, হেমলতাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল রমা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে কি চ'লে যেতে বলেছি !'

'তুই বলবি কেন, আমি নিজে বুঝি না !' গলা বুজে এসেছিল হেমলতার, ওরই মধ্যে হাসবার চেষ্টা করল, 'চ'লে যাওয়াই ভালো। এখন থাকলে তোর অশান্তি হবে—'

হেমলতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠোঁট কামড়ে ধরল রমা, চোখ নিচু করল।

'এতো বুদ্ধি তোমার, তবু কেন যে কাণ্ডটা করলে—'

'কাঁদিস না।' আলগোছে হাত বাড়িযে রমার চিবুক ছুঁলো হেমলতা, 'বুড়ো বয়সে ভীমবতি ধরে না মানুষের ! দোষ করেছি, শাস্তি পেতেই হবে—'

'রেগে গেলে লোকটা পাষণ্ড হয়ে যায়।' বলতে বলতে থেমে গেল বমা, আঁচল তুলে চোখ মুছল ! তারপব বলল, 'ছোড়দা বলেছে এসে নিয়ে যাবে তোমাকে। বেলা হোক, তারপব যেও—। রাগ পড়লে আমি আবার নিয়ে আসব তোমাকে—'

'সেই ভালো।' অল্প ইতস্তত ক'রে বলল হেমলতা, 'বিশ্বনাথকে বল না একটা ট্যাক্সি ডেকে দিক। আমি তো তৈরিই, শুধু শুধু লাবুর জন্যে অপেক্ষা করা কেন !'

'এতো তাড়া কিসের মা তোমার !'

'তাড়া !' একটু চুপ ক'রে থাকল হেমলতা। তারপব অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'তুই বুঝবি না।'

এই মুহূর্তে মা ও মেয়ের মধ্যে চোখাচোখি হলো , বলার কথাটা কেউই স্পষ্ট ক'রে বলল না যেন। বমা চ'লে যাচ্ছে ; ওর মন্থর হাঁটার ধরনের দিকে তাকিয়ে গাঢ নিঃশ্বাস চাপল হেমলতা।

'রমু, শোন ?'

রমা দাঁড়াল, কিন্তু তাকাল না।

'ঘরটা ভালো ক'রে পরিষ্কার করেছিলি তো ?'

'তোমাকে অতো ভাবতে হবে না—'

রমা চ'লে গেল। জানে, এরপর আর কথা হবে না কোনো। যাবার কথাটা মুখ ফুটে বলতে অসুবিধে হতো ওর ; ঠাকুর, এই শক্তিটুকু যদি দিলে, তাহ'লে বাকিটুকুও দাও—যেন বিনোদ আমার মুখ দেখার আগেই আমি চ'লে যেতে পারি। কর্তা বেঁচে থাকতে কোনোদিন একটু আঁচড় লাগেনি গায়ে ; কে জানত তিনি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবদিকের সব আগল খ'সে পড়বে ! কপাল, কপাল !

একটু আগে মেঘলা দেখেছিল রোদ্দুরে। এবার স্পষ্টই চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে এলো হেমলতাব।

আবেগ সামলানোর জন্যে বন্ধ বাক্সের ডালাটা চেপে ধবল দু'হাতে। বুড়ো হাড়ের কাঁপুনি সহ্য করতে করতে বলল, লাবু, এক তোর ওখান থেকেই স্বেচ্ছায় চ'লে এসেছিলাম ! পাঁচ আঙুলের কালসিটে পড়ুক আমার গালে। এখন তুই তাড়ালে যাবো কোথায় !

বমা ডাকল, 'এসো, মা—'

'হ্যাঁ, চল।' পরিষ্কার গলা হেমলতার, কুঁজো হওয়া পিঠটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ও বিশ্বনাথ, বাক্সটা নিবি তো !'

চাবি-বাঁধা থানের আঁচলটা একটু জোরেই কাঁধের ওপর ফেলল হেমলতা, কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল সদরের দিকে। এগোতে এগোতেই টের পেল রমাও আসছে পিছনে। তারও পিছনে বাক্স নিয়ে বিশ্বনাথ। দরজা খোলা। এই জায়গাটা পেরুলেই সিঁড়ি, রাস্তা। লাবুর বাড়ি সেই মানিকতলায়। যেতে সময় লাগবে না। না পৌঁছুনো পর্যন্ত নিঃশ্বাস নেবার সময় পাওয়া যাবে।

একটু দ্রুতই হাঁটছিল হেমলতা। হঠাৎ শরীর মুচড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাচ-ফোটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল ঠোঁটদুটো।

রমা বলল, 'কী হলো, মা !'

'কিছু না, কিছু না।' যন্ত্রণাটা হজম ক'রে নিতে নিতে থমকানো পায়ের পাতা ফেলল হেমলতা। এতোগুলিকে ভাগ ক'রে দিতে দিতে শূন্য, বুড়ো শরীরে রক্তও বেরোয় দেরিতে। রমাকে আড়াল ক'রে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তুই বড়ো অসাবধান, রমু। কতোবাব বললাম ঘরটা ভালো ক'রে পরিষ্কার কর। কোনো কথা যদি কানে তুলিস !'

ছাগল বিষয়ে দু'চার কথা

কাল রাত্রে আমি ছাগলের স্বপ্ন দেখেছি। বেয়াড়া স্বপ্ন ; যুক্তি দিয়ে যার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না।

অন্ধকার অবচেতন নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা অবশ্য এর নানা রকম ব্যাখ্যা করবেন। বস্তুত, স্বপ্নে সাপ, বিড়াল, মাছ এবং আরো কয়েকটি প্রাণী এবং জল, সিঁড়ি, খাদ ইত্যাদির আবির্ভাব সম্পর্কে ছকবাঁধা অর্থ বর্তমানে খুবই প্রচলিত। মনোবিজ্ঞানীদের এই সব সিদ্ধান্ত নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা নিয়ে যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন তাঁরা এমনভাবে কাজে লাগিয়েছেন ইদানীংকালে যে লেখার গোত্র ও চরিত্রে তাঁরা আর নিঃসঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন নন।

আমার স্বল্প পড়াশুনায় হাতির স্বপ্ন দেখার বিবরণ পেয়েছি ; খরায় অভিভূত চাষা গরুর স্বপ্ন দেখছেন, প্রেমহীন যুবকের কষ্টকর ঘুমে গাঢ় নীল আলোর ভিতর থেকে মুখের ওপর নেমে আসছে কালো দাঁড়অলা মাকড়শা, এরকম কতো ! আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' উপন্যাসে ব্যর্থ বুড়ো জেলেটি শেষবেশ দেখেছিল সিংহের স্বপ্ন। কিন্তু, ছাগল কারও স্বপ্নের বা লেখার বা আলোচনার বিষয় হয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। যতোদূর জানি, এ-বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম সুকুমার রায়। তাঁর হ-য-ব-র-ল কাহিনীতে ব্যাকরণ শিং নামধেয় ছাগলটির ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট ; প্রহসন জমে ওঠার সূত্রে নানারকম আবদার, অনুযোগের ভূমিকায় ব্যা-ব্যা কণ্ঠের প্রতিবাদে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করেছিল সে। কিন্তু, উল্লেখের ব্যাপারে, নিঃসঙ্গ নায়ক বা নিঃসঙ্গ লেখকদের চেয়েও ছাগলের নিঃসঙ্গতা ঢের বেশি ; কারণ তার উল্লেখ আঙুলে গোনা যায়। মনে হয় এ-বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণাও একই সাক্ষ্য দেবে।

কথা হলো, এই অবস্থায় আমি হঠাৎ ছাগলের স্বপ্ন দেখলাম কেন !

বেশ চিন্তায় পড়লাম। স্বপ্ন নিয়ে যাঁদের কাজ, অর্থাৎ লম্বালম্বি স্বপ্নের পেট চিরে যাঁরা বের ক'রে আনেন ব্যাখ্যার শিশু, তাঁদের একজনকে স্বপ্নের যতোটা মনে ছিল বা থাকা সম্ভব সংক্ষেপে বলবার পর এ-বিষয়ে প্রশ্ন করায় টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আমার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হলো। তিনি একজন মনোযোগ-বিশেষজ্ঞ। বিষয়টি যে তাঁর কাছে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে প্রথম বাক্যটিই তার প্রমাণ

'ছাগলের স্বপ্ন !' একটু থেমে বললেন তিনি, 'ঠিক বলছেন, ছাগলই তো ?'

'হ্যাঁ, ছাগলই। কেন ?'

'না, ছাগল বললে ভিরুলেন্স্ বা জোরটা কমে যায় কি না। তা ছাড়া আমার একটু স্ট্রেঞ্জও লাগছে ?'

'কেন !'

'ছাগল খুব ভীরু প্রাণী। ছাগল কখনো আক্রমণাত্মক হয়েছে এরকম শোনা যায়নি। যে-কোনো সংঘর্ষে তার ভূমিকা জেনারেলি পলাতকের। শুধু তাই নয়, তারা এতোই ভিতু যে তাড়া খেয়ে পালাবার সময় ছোট ছোট নাদি ছড়িয়ে যায়। গরু অনেক সময় গুঁতোতে আসে, গাধা লাথি ছোঁড়ে। কিন্তু ছাগল— !'

মনে হলো বেশ চিন্তায় পড়েছেন তিনি। তাঁর ভাবনার সুযোগে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আমি একবার একটা ছাগলকে একটা বাচ্চা ছেলেকে গুঁতোতে দেখেছিলাম—'

'তাই নাকি ! কোথায় !'

'এই ছোটবেলায় আর কি। আমাদের দেশে—'

তিনি একটি 'হুম' শব্দ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কি রামছাগল ছিল ?'

'তার মানে !'

'রামছাগল হ'লে ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে। তাতেও অবশ্য একটু খটকা থেকে যায়। তার আগে দেখা দরকার সেখানে একটা রামছাগল ছিল, না দুটো, এবং তারা কী অবস্থায় ছিল—'

'তার মানে!'

'মানে একটা আছে। ছাগল-বিশেষজ্ঞ ওরস্টারের বইয়ে আছে রামছাগলরা যৌন-সংসর্গ বা কপ্যুলেসনের সময় ডিসটার্বড হ'লে ক্ষেপে যায়। তারা বেসিকালি লজ্জাপ্রবণ আর আড়াল পছন্দ করে। কিন্তু মানুষের মতো স্থানকালের জ্ঞান বা বোধ না থাকায় তারা যে-কোনো জায়গায় ওই কুকর্মের আবেগে সাড়া দেয়। তখন ডিসটার্বড্ হ'লে ক্ষেপে যায়।'

'হুঁ—'

'কিন্তু তখনো আক্রমণের তীব্রতা থাকার কথা নয়। কারণ, ছাগল বেসিকালি বোকা আর নিরীহ জীব। আমাদের, মানুষের মধ্যেও কেউ যখন রেগে গিয়ে কাউকে 'ছাগল' সম্বোধন করে, তখন বুঝতে হবে রাগের মধ্যেও আছে এক ধরনের প্রশ্রয় বা স্নেহ। ঠিক ভেবে দেখুন তো, সেই ছাগলটি রামছাগল ছিল কি না?'

ভাবলাম, হবেও বা। একটি ছাগল একটি বালককে গুঁতোতে আসছে, হঠাৎ দেখা এই দৃশ্যে থমকে দাঁড়িয়ে ছাগলটির—অর্থাৎ সেটি রামছাগল না শুধুই ছাগল—জাত-বিচার করার প্রবণতা থাকলে এতোদিনে আমি ওবস্টারের চেয়ে বড়ো ছাগল-বিশারদ হয়ে উঠতে পারতাম। অথচ, আমি একজন সাধারণ চাকুরিজীবী মাত্র। যে-সব প্রবণতার জন্যে মানুষ ক্রমশ হয়ে ওঠে ও তারপর হয়ে দাঁড়ায়—তার কোনোটিই ঠিক সময়ে আমার মধ্যে আবির্ভূত না-হওয়ায় আমি কোনোদিনই কিছু হয়ে উঠতে পারিনি। আমার স্মৃতিও এমন কিছু প্রখর নয় যে টেলিফোনধরা অবস্থাতেই কুড়ি-বাইশ বছর আগে দেখা একটি ছাগল শুধু-ছাগল না রামছাগল ছিল তা মনে করতে পারব।

সত্যি বলতে, কোনো কোনো ব্যাপারে আমার নিরপেক্ষতা ও ঔদাসীন্য নিয়ে প্রায়ই ফ্যাসাদে পড়তে হয়। একদিন যেমন হলো। রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর?' আমি বললাম, 'ভালো।' তারপর যেমন এগিয়ে যাওয়া চলে তেমনি যেতে যেতে ভুলে গেলাম ব্যাপারটা। কিন্তু, কয়েক দিন পরেই টের পেলাম নিজের মনে এগিয়ে যাওয়ার এই ধরনটা সুখের নয়, বরং কোনো কোনো সময় তা ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। যেমন, ঐ ঘটনার পর আমার এক বন্ধু বলল, 'তুমি নাকি অমুকবাবুর শালাকে রাস্তায় দেখে চিনতে পারোনি! উনি খুব চটেছেন।' আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, কারণ অমুকবাবু রীতিমতো ক্ষমতাবান লোক এবং ইচ্ছে করলেই তিনি আমার ক্ষতি করতে পারেন। বন্ধু বলল, 'এবার একটু লোকজন চিনতে শেখ—'

ছাগল বা রামছাগলের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই কেন এই ঘটনা মনে পড়ল জানি না। যাই হোক, আমার—এবং নিশ্চয়ই তাঁরও—সময় নষ্ট হচ্ছে ভেবে টেলিফোনে গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'ওসব ডিটেলে গিয়ে কাজ কী! এতো ব্যাপার থাকতে আমি হঠাৎ ছাগলের স্বপ্ন দেখলাম কেন!'

'তা বটে!' চিন্তিত গলায় বললেন তিনি, 'আমিও তাই ভাবছি।' তারপর, 'আচ্ছা, আপনার বাড়িতে কোনো বাগান আছে?'

'বাগান! না, মশাই! বাগান-টাগান কোনো বাহারই নেই। আমি একটা ছোট বাড়ির ঘুপচি একতলায় থাকি। তার চারদিকে শুধু ইট-কাঠ-দেয়াল—'

'ও! বাগান থাকলে সেখানে কোনো ছাগল ঢুকে গাছটাছ তছনছ করেছে কিনা এবং তার ফলে আপনি খুব বিব্রত হয়েছেন কি না ভেবে দেখতাম। কি জানেন, প্রত্যেক স্বপ্নের সঙ্গেই বাস্তবের একটা যোগ থাকে। বাস্তবের ঘটনাই একটু তেরছা, কিম্ভূত কিংবা অন্যরকম হয়ে দেখা দেয় স্বপ্নে। বাস্তবে নিশ্চয়ই আপনি কোনো বা কোনো-কোনো ছাগলের সংস্পর্শে এসেছেন—'

আমি বললাম, 'না—'

'ভেবে দেখুন,' ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো ক'রে ভেবে দেখুন। এটা খুবই সায়েন্টিফিক ব্যাপার। একটু জটিল, তবে একেবারে অঙ্কের মতো। ছাগল আছেই।'

'আছেই—', ব'লে ফোন ছেড়ে দেবার পর যন্ত্রের গর্-গর্ শব্দটা ছুটে গেল আমার মাথার ভিতর

অনেক দূর পর্যন্ত। এতোদূর, যে ধাতস্থ হতে সময় লাগল। বস্তুত, টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে জানলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হলো একটা ছাগলকে যেন দেখতে পাচ্ছি। তার পর থেকেই চিন্তাটা থেকে গেল মাথায়।

মনোবিজ্ঞানী যখন বলেছেন তখন ব্যাপারটা সত্যি হ'লেও হতে পারে। অর্থাৎ, স্বপ্নে ছাগলের আবির্ভাব হয়ে থাকলে বাস্তবেও সে আছে। তাঁর কথা আমি একেবারে ফালতু ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি না। কারণ, বিষয়টি অঙ্কের মতো, জটিল হ'লেও প্রমাণসাধ্য। তার একটি প্রমাণ আমি এখনই পাচ্ছি। যেমন, বাগান আছে কি না এ-প্রশ্নটা তাঁর মাথায় এসেছিল মালার প্রসঙ্গ থেকে। মালা গাঁথা হয় ফুলে, সেই ফুল ফোটে গাছে, সেই গাছ থাকে বাগানে। ঠিকই। স্বপ্নের বিষয়টা তাঁকে যতোটা মনে পড়ে বলবার পর অবশ্য 'ছাগল' শুনে একটু অবাক হয়েছিলেন তিনি, কারণ, ছাগলের মুখে আমি যে-কথাগুলি শুনেছিলাম এবং বলেছিলাম তাঁকে তা এতোই গোছানো যে মনে হতে পারে মানুষ এখানে জায়গা বদল করেছে ছাগলের সঙ্গে। আমার স্মৃতিশক্তি একেবারে ভ্রান্ত না হ'লে ছাগলটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'মালায় একটি ফুল কম কেন ?' এমন একটি অবাক করা প্রশ্নে আমি থ (এমনও হতে পারে স্বপ্নের এই জায়গাটা আমি একেবারেই গুলিয়ে ফেলেছি), তখন সেই নধরকান্তি ছাগলটি হঠাৎ আমার চারপাশে ব্রতচারী নৃত্যের ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগল এবং মাঝে মাঝে আড়ে তাকাতে লাগল আমার দিকে, যে-চাউনির একটিই অর্থ হতে পারে, 'কেমন শুঁতো খেলে ! জব্দ তো !'

একটি ছা-পোষা, নিতান্তই সাধারণ লোকের বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে ছাগলের অবর্ণনীয় ঢুকে পড়া যে কী বিষম ব্যাপার হতে পারে তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। লজিক বা বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পেলে হয়তো আত্মরক্ষার উপায় ভাবা যেত একটা, কিংবা দুঃসহ এই অবস্থা থেকে বেরুনোর, কিন্তু যতোবারই গতকাল বা তার আগের দিন বা তার আগের কয়েকটা দিনের থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—যার সঙ্গে ছাগলের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে—খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম, আমার চিন্তায় এমন কোনো উপলক্ষ দেখা দিল না যাকে সূত্র ব'লে ভাবা যায়।

গত কয়েক দিনে উল্লেখযোগ্য যেসব ঘটনা ঘটেছে তার একটি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

যেমন, সেদিন লিফটে উঠতেই দেখলাম কাঠের দেয়ালে আলতো পিঠ ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রসাদবাবু। জরিপাড় ধুতির কোঁচা আলগাভাবে লুটোচ্ছে মেঝেয়, গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবি থেকে ভুরভুর ক'রে বেরুচ্ছে একটা অম্ল গন্ধ। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম সেটা কিসের গন্ধ। ভয়ে বা সমীহায় একটু এড়িয়ে দাঁড়ালাম আমি। তারপর, লিফট যখন মাঝামাঝি জায়গায়, প্রসাদবাবু হঠাৎ বললেন, 'কী খবর ?'

আমি বললাম, 'ভালো।'

বাসমতী চালের দানার মতো একটু হাসি পাকালেন তিনি। তারপর, লিফ্‌ট যখন জায়গায় পৌঁছুবার উপক্রম করছে, আমার পিঠে হাত রেখে প্রসাদবাবু হঠাৎ বললেন, 'হতাশ হ'ও না। তোমার কথাও আমি ভাবছি—'

এসব কথার আকস্মিকতা আমাকে এমনই বিমূঢ় করল যে, কেন আমি হতাশ হবো ও কেন তিনি ভাবছেন আমার কথা বুঝতে না পেরে হতচকিত গলায় বললাম, 'কেন !'

'কেন মানে !'

'মানে, আপনি হঠাৎ আমার জন্যে ভাববেন কেন।'

'অডাসিটি !' লিফ্‌ট থেকে ততোক্ষণে বেরিয়ে পড়েছি আমরা। খিটখিটে গলার গন্ধ ছড়িয়ে প্রসাদবাবু বললেন, 'আমি এটাকে ঔদ্ধত্য মনে করি—'

দেখলাম তিনি হেঁটে যাচ্ছেন প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত। একটু বেঁকে হাঁটার ফলে লুটানো কোঁচাটাও এগোচ্ছে সপ্‌সপ্‌ বাথরুম নিকোনোর ভঙ্গিতে।

তবে, কথা হলো, এইভাবে প্রসাদবাবু হেঁটে যেতে পারলেও আমি পারলাম না। আগাগোড়া ব্যাপারটার সাক্ষী লিফ্‌টম্যান তখনো দরজা বন্ধ না ক'রে দাঁড়িয়ে। আমাকে হতভম্ব দেখে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন ! মুড বুঝে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন, তা হ'লেই হলো।'

ক্ষমা সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি তা হলো ক্ষমা চাইতে হ'লে ক্ষমা চাওয়ার কারণটি জানতে হয় আগে। এ-ক্ষেত্রে কারণটা যে কী, বা কী হতে পারে, অনেকক্ষণ ধ'রে চিন্তা ক'রেও আমি বুঝতে পারলাম না।

যাই হোক, কথা হচ্ছিল ছাগল নিয়ে। এই ঘটনার সঙ্গে ছাগলের সম্পর্ক নেই কোনো।

আমার আর একটি ঘটনাও মনে পড়ল। পরশুদিন একটা ঢ্যাঙা, চশমা-পরা খোঁচাচুলের লোক অফিসে আমার সামনে এসে বসেছিল। লোকটি মুখচেনা ; হয় এ-অফিসেই নতুন ঢুকেছে, না হয় আশপাশে থাকে কোথাও। নাম জানি না।

'কিছু চাঁদা দিতে হবে—', কোনো ভূমিকা না ক'রেই অক্লেশে ও অমায়িক হেসে বলল লোকটি।

আমি বললাম, 'কেন ?'

লোকটি বলল, 'ধর্মের নামে না হয় কৃচ্ছ্রসাধন করলেনই একটু ! পাঁচ দশ টাকা যা হোক !' ব'লে, আবার অমায়িক হেসে একটি দামি সিগারেটের প্যাকেট খাড়িয়ে দিল আমার দিকে, 'চলে ?'

আমি বললাম, 'না—'

তখন, নিজেরটা ধরিয়ে সে বলল, 'ঠাকুরের কৃপায় কুঅভ্যাসটি নেই তাহ'লে ! দিন। আমার আবার একটু তাড়া আছে ; চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

অপ্রাসঙ্গিক এইসব কথায় বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'ধম্মেটম্মে আমার বিশ্বাস নেই কোনো। চাঁদাও দিতে পারব না।'

'তা'হলে এতোক্ষণ বসিয়ে রাখার কী মানে হয় !' সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে উঠতে উঠতে লোকটি বলল, 'যা ব্রহ্ম সদাচারেৎ' বা ওইরকম কিছু, 'ঠাকুর, এই পাপীকে ক্ষমা কোরো।'

এই পর্যন্ত ভেবে আমার মনে পড়ল স্বপ্নের ছাগলটি মালার প্রসঙ্গ তুলেছিল, 'মালায় একটি ফুল কম কেন !', ইত্যাদি। ঠাকুরের পুজোয় এবং ধর্মেকর্মে মালা লাগে—, তাহ'লে এই সূত্রেই কি ? না, তা হবার কথা নয়। লোকটি অকারণ আমাকে 'পাপী' সম্বোধন করলেও 'ছাগল' বলেনি। এখানে মুখ্য বিষয় ছাগল ; মালা নয়।

আমার দৈনন্দিন জীবনে ঘটনা কম। ঘুম থেকে ওঠা, চা খাওয়া, কাগজ পড়া, বাজার করা, দাড়ি কামানো, কোনোরকমে ভিড়েব বাসে নিজেকে ঠেলে দিয়ে অফিসে পৌঁছুনো, কাজ করা, গ্যাঁজানো এবং তারপব এইসব ব্যাপাবগুলিকেই উল্টোদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে শেষমেশ মশারির নীচে ঢোকা ও ঘুমুনো—এ-ছাড়া বিশেষ তারতম্য নেই কোথাও। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই ঘটে না বা ঘটেনি যাব সঙ্গে ছাগল নামক জীবটির সম্পর্ক থাকতে পারে। অবশ্য, আগে যে ঘটনাগুলির কথা বললাম সে-রকম হামেশাই ঘটছে। খুঁটিয়ে দেখেছি সেগুলোকে কোনো সূত্র হিসেবে ধরা যায় না।

ও, হ্যাঁ, আর একটি ঘটনাও ঘটেছিল, কাল। অফিস-ফেরতা বাস ধরতে গিয়ে দেখলাম ময়দানে খেলা ভেঙেছে, এতোই ভিড় যে ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে ওঠা যাবে না। তখন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। ধীবেসুস্থে চা খাচ্ছি ও সামনের অনন্ত যাতাযাতের মধ্যে হাবিয়ে যেতে দেখছি অসংখ্য গাড়ি ও মানুষকে, দেখি একজন মহিলা বেস্তোরাঁয় ঢুকে আবার বেরিয়ে যেতে গিয়েও আবাব ফিরে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে তাকালেন আমার দিকে।

'কী খবর ?'

আমি বললাম, 'ভালো।'

তারপর চিনতে পারলাম।

আমার উল্টোদিকের খালি জায়গাটায় থপ্ ক'রে বসে সীতাদি বললেন, 'ভালোই হলো। মনে হচ্ছে আমি একটু আগে এসে পড়েছি। তবু একজনকে পাওয়া গেল—'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ?'

'হ্যাঁ, ওই আর কি।' সামনের ক্ষয়া দাঁতটায় জিব বুলিয়ে ও বাঁ হাতের একমাত্র বালাটি সামনে পিছনে টানতে টানতে এবং তারপর আমি ক্রমাগত ওঁর বুকের দিকে তাকাচ্ছি ভেবে আঁচলটি যথাবিহিত ক'রে আলতো গলায় বললেন, 'চা খাওয়াবেন তো ?'

'খান— ।' বেয়ারাকে চা আনতে ব'লে আমি বললাম, 'তারপর ? আব কী খবর ?

'খবর আর কি !' সামনে ঝুঁকে এসে আঁচলটি যথাবিহিত নামতে দিলেন সীতাদি, 'জানেনই তো, মেয়ে হয়ে জন্মানোর কতোগুলো টেকনিক্যাল অসুবিধে আছে—'

আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, 'কেন !'

'আ-হা ! বোঝেন না যেন!' চোখ চেঁচে বললেন সীতাদি, 'ন্যাকা !'

চা শেষ হতে যতোটা সময় লাগে, ঠিক ততোটুকু ; তারপরেই 'আসছি' ব'লে উঠে যান সীতাদি। আমিও বেরিয়ে পড়ি এবং সুবিধে-অসুবিধে ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকি।

এই ঘটনাটির সঙ্গেও স্বপ্নের কোনো সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক নয়। কাবণ, সীতাদি আমাকে 'ন্যাকা' বলেছিলেন, 'ছাগল' নয়। বললেও, মনোবিজ্ঞানী যেমন বললেন, তার ভিরুলেন্স্ হতো কম ও তার কোনো প্রভাবও থাকত না। কারণ, ন্যাকা বলতে যেমন, তেমনি ছাগল সম্বোধনেও এক ধরনেব স্নেহ বা প্রশ্রয় থাকে ; জব্দ করার ব্যাপার থাকে না কোনো। কিন্তু যতোদূব মনে পড়ে, স্বপ্নের ছাগলটি স্পষ্টই আমাকে শুঁতিয়েছিল বা শুঁতোবার চেষ্টা করেছিল বা শুঁতোনো সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে আমাব চারপাশে ঘুবতে ঘুরতে এমনভাবে তাকিয়েছিল, যার অথ জব্দ তো !

ছাগল বা ছাগল সম্পর্কিত ভাবনা যে এমনভাবে অধিকাব ক'রে নেবে আমাকে, আমার সবকিছুর ওপর বিস্তার করবে আচ্ছন্নতার জাল, আগে তা ভাবিনি। যতোই ভুলতে ও গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলাম, দেখি প্রাণীটি তার উপস্থিতি ঘোষণা ক'রে যাচ্ছে নিয়মিত। মন বসছে না কাজে। যে-সময়ে যে-কথাটি মনে রাখা দরকার ও যে-সময়ে যে-কাজটি করা দরকাব তাব কিছুই হযে উঠছে না ঠিকঠাক। ব্যাপারটা টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভাবনায় পডলাম আমি ; কিঞ্চিৎ ভয়ও হলো। গুরুত্ব বুঝতে পারলাম যখন ভাগ্নীর বিয়ে নিয়ে যে-ভদ্রলোককে ফোন করতে বলেছিলাম তিনি ফোন কবলে আমি কোনো উৎসাহই দেখালাম না এবং বললাম, 'ব্যস্ত আছি। পরে কথা বলব।' অথচ দরকারটা ছিল আমারই। জানি না এই হঠকারিতাব ফলে সম্বন্ধটাই কেঁচে গেল কিনা।

সে যাক , ইতিমধ্যে আরো কিছু কিছু ব্যাপার ঘটতে লাগল। যেমন, বিষয়টির গভীরে যেতে যেতে টের পেলাম, নিজের স্মৃতি নিয়ে এর আগে আমি যা ভেবেছি, কিংবা শুধু-ছাগল না রামছাগল ইত্যাদি প্রশ্নের সমস্যায় মনোবিজ্ঞানীকে যা বলেছিলাম, সবটা না হ'লেও তার অনেকটাই ভুয়া। অর্থাৎ ছাগল প্রসঙ্গে আমার আবর্তন মোটেই নতুন নয়—এতোদিন কোনো-না-কোনোভাবে এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হযেছে। যেমন, ছোটবেলায় মায়ের এক গুরুদেব আমাদের বাড়িতে আবির্ভূত হয়ে ছাগলেব দুধ ছাডা আর কিছু খাবে না ব'লে বায়না ধরায় সেদিন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাবাকে বেরুতে হয়েছিল ছাগলের খোঁজে। অনেক ঘোরাঘুরি ও অনেক কষ্টের পর একটি দুগ্ধবতী ছাগলের সন্ধান পেলেও দুধ দুইবার সময় বাঁট এঁটে ধরে ছাগলটি ; বহু ধানাইপানাইয়েও বাঁট ছাড়েনি। দুধ পাওয়া যায়নি। এতে দুঃখিত হবার পরিবর্তে ছাগলের মালিক বেশ প্রসন্নই বোধ করে। বাবাকে বুঝিয়েছিল যে ছাগলের মুড বড়ো বিষম এবং সেইজন্যেই ছাগলের দুধের দাম বেশি।

পরের ঘটনাটি ঘটেছিল বেশ কয়েক বছর আগে ; ভুবনেশ্বরে। সেবার বেড়াতে যাবার দিন কী ক'রে টের পেয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে এক বন্ধু পাকড়াও করল আমাকে। ভুবনেশ্বরে থাকেন তার এক পিসশাশুড়ী; বলল, তিনি অসুস্থ, তাঁর কাছে একটা জরুরি ওষুধ পৌঁছে দিতে হবে। আমি বললাম, 'বেশ তো।' তারপর ঠিকানা চাইলাম। তাতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল বন্ধুর মুখ। ঠিকানাটা নাকি হারিয়ে গেছে এবং সে ঠিক ঠিক মনে করতে পারছে না। তবে, বন্ধু বলল, বাড়িটা চেনা খুব অসুবিধের নয়। টাউনের মধ্যে একতলা ছোট বাড়ি, তার সামনে বিশাল মাঠ। সেই মাঠের মধ্যিখানে একটি খুঁটিতে একশো গজ লম্বা দড়ি দিয়ে একটা ছাগল বাঁধা থাকে। গলায় লম্বা দড়ি বাঁধা ছাগল বললে যে-কোনো রিক্শাঅলা বাড়িটা চিনিয়ে দিতে পারবে।

আমার একটু খটকা লাগল। বললাম, 'ধরো, যদি এমন হয়, যে-সময় আমি যাবো তখন ছাগলটা খুঁটিতে বাঁধা নেই ?'

'তা হতেই পারে না।' বন্ধু বলল, 'এটি খুব উঁচু জাতের ছাগল। ছাড়লেই হাতছাড়া হবে ব'লে সব

সময়েই বাঁধা থাকে। তাতে অবাক হ'চ্ছ কেন! অতো বড়ো মাঠ আর লম্বা দড়ি থাকার ফলে সে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে পারে। এর চেয়ে বেশি তার আর কী দরকার!'

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে আমি একতলা, মাঠ, খুঁটি, একশো গজ দড়ি, ছাগল. ক্রমান্বয়ে এইসব ভাবতে লাগলাম। তারপর, ভুবনেশ্বরে পৌঁছে, উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখে ও আরো এগিয়ে একটা রিকশায় উঠে রিক্‌শাঅলাকে বললাম টাউনে নিয়ে যেতে। তারপর, টাউনে পৌঁছে রিক্‌শাঅলাকে বন্ধুর বর্ণনা মতো হুবহু ঠিকানা বলায় মাঝপথে রিক্‌শা থামিয়ে অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল, 'আমাব গাড়ি খারাপ, এখন ছাগল খুঁজতে পারব না। আপনি অন্য গাড়ি দেখুন, বাবু—'

জরুরি ওষুধটা সেবার আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছিল কলকাতায়। বন্ধু বিষণ্ণ বোধ করেছিল এবং আমিও যে বিপন্ন বোধ করেছি, তা বলাই বাহুল্য। আমার ও ঠিকানার মধ্যে গলায় দড়ি-বাঁধা একটি ছাগলের উপস্থিতি প্রায়ই খচখচ করত মনে।

আর একবার—, না। এসব ভাবব না। পৃথিবীতে এতো রকমের ভাবনা থাকতে একটি সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ শুধু ছাগল নিয়েই ভেবে যাচ্ছে, এটা শুনলে লোকেই বা ভাববে কি!

কিন্তু, বিষয়টি এমনই ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে লাগল আমার চিন্তা ও রক্তে যে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই তাড়াতে পাবলাম না মন থেকে। যে-কোনো কাজের মধ্যেই অস্বস্তি বাড়তে লাগল ক্রমশ। আমি পবিষ্কারই বুঝতে পারি, পরস্পব-প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি মন কাজ করছে আমার মধ্যে। একটি, যে যুক্তি সাজায়। আর একটি, যে যুক্তি তাড়ায়। অসুবিধে হলো, দ্বিতীয়টিই ক্রমশ কুক্ষিগত করতে লাগল আমাকে। শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে রাতে ঘুমোতে গিয়ে ঠিক ঘুম আসবার সময়টিতেই ছটফট ক'রে উঠি, ঘুম ভেঙে যায়—সচেতন আমার অনুভূতিই ব'লে দেয়, ঘুমিও না। ফলে শরীর খারাপ হতে লাগল এইভাবে। কিছুদিন পরে এমনই হলো যে একটু ঘুমের জন্যে আমি ঘুমের বড়ি না খেয়ে পারলাম না।

সেদিন রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখলাম। এবাবও সেই ছাগলের। কিন্তু, এবার স্বপ্নটা মাথায় রেখে একটুও ঘাবড়ালাম না আমি। মনোবিজ্ঞানী যেমন বলেছিলেন ঠিক সেইভাবে বিশ্লেষণ করলাম স্বপ্নটাকে। বুঝতে পারলাম আমার সারাদিনের চিন্তা কিম্ভূত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে স্বপ্নে। স্বপ্ন স্বপ্নই; কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ছাগলের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাবো কী ক'রে! এমনও মনে হলো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো!

সেদিনই বিকেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে মনোবিজ্ঞানীর কাছে গেলাম। দু'একজন পেসেন্ট ছিল, ইশারায় আমাকে কনসালটিং রুমে বসতে ব'লে চটপট বিদায় ক'রে দিলেন তাদের। তারপর ঘরে ঢুকে বন্ধ ক'রে দিলেন দরজাটা।

'ব্যাপাবটা যতো সহজ ভেবেছিলাম তা নয়।' মনোবিজ্ঞানী বললেন, 'আপনি সেদিন কথা বলবার পব আবো চারটি ছাগলের কেস পেয়েছি—'

'স্বপ্ন?'

'না। এগুলো আরো জটিল—'

ঘরের শান্ত আলোয় থমথম করছে তাঁর মুখ। চিন্তিত হ'লে সব মানুষেরই মুখের স্বাভাবিক রেখাগুলো বেঁকে যায় একটু। ঠিক বুঝতে পারছি না জটিল বলতে কী বোঝাচ্ছেন তিনি। আমার ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় ভেবে অল্প স্বস্তি হলো। সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবলাম, আজ রাত্রে স্বাভাবিকভাবে ঘুমোতে পাবব তো!

টেবিলের ওপর থেকে একটা লম্বা খাতা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন মনোবিজ্ঞানী। তারপর সেটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'পড়ুন—। আমি একটা জরুরি টেলিফোন সেরে নিই।'

রুলটানা খাতার মলাট ওল্টাতেই চোখে পড়ল বড়ো, গোটা অক্ষরে লেখা—'ব্যা, তার নীচে ব্র্যাকেটের ভিতর ছোট হরফে—'ছাগল বিষয়ে কিছু নূতন চিন্তা।' পরের পাতায় মাঝামাঝি জায়গায়

লেখা—'ভূমিকা'। তার নীচে: 'ব্যা' শুধুই একটি ধ্বনি নয়। মনোযোগ দিয়া ও কান খাড়া কবিয়া শুনিলে বুঝা যাইবে ইহার ভিতর সুস্পষ্ট ধ্বনি তবঙ্গ আছে এবং 'ব্যা' শব্দটি সোজাসুজি বাহির না হইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাহির হয়। প্রতিটি তরঙ্গের ভিতরেই আছে আলাদা অর্থ এবং সে-সব অর্থকে সরল ভাবিবাব কোনো কারণ নাই। অসুবিধা হইল, আমাদের ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা অনেক জটিল বিষয়কেই সবল মনে করিতে শিখাইয়াছে। ইহা যে ভুল অতঃপর 'ব্যা' নামক মহাগ্রন্থে তাহা ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।...

...ছাগল কী বলিবার আগে বলা দরকার ছাগল অনেক রকমের। এবং ছাগলকে নিতান্তই নিরীহ জীব ভাবিবার কারণ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ছাগল-বিশারদ ওরস্টার বলিয়াছেন যৌন-সংসর্গের সময় বিরক্ত করিলে নাকি ছাগলরা চটিয়া যায়। ইহা একটি তথ্য মাত্র, বিশ্লেষণ নহে। বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে এই যৌন-সংসর্গ ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। তাহাতে বিঘ্ন ঘটিলে চটিয়া তো যাইবেই। এই বিষয়টি ক্রমশ বুঝা যাইবে। এখন যাহা মৃদু গুঁতানোর চেষ্টায় সীমাবদ্ধ আছে ক্রমশ তাহা ব্যাপক হইবে। নিরীহতার মুখোশ আঁটিয়া ছাগলেরা সংঘবদ্ধ হইবার অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং—"

দ্রুত আঙুল চালিয়ে আমি পরের পাতায় যাবার চেষ্টা করছি, ছোঁ মেরে খাতাটা কেড়ে নিলেন মনোবিজ্ঞানী। হাসলেন একটু।

'পাগলের প্রলাপ! আমি তিনটে চ্যাপটার পড়েছি, হাইলি ইন্টারেস্টিং!'

ঢোঁক গিলে আমি বললাম, 'এসব কার লেখা!'

'একজন নামকরা অধ্যাপকের। মাসখানেক হলো চাকরিতে রিজাইন দিয়ে ব'সে আছেন বাড়িতে। তাঁব বিরুদ্ধে নাকি ষডযন্ত্র হচ্ছিল—'

'কী রকম!'

'কী ক'রে বলব!' না-বোঝার ধরনে হাসলেন তিনি, 'এই খাতাটি তাঁর ভাইপো পাচাব ক'বে এনে দিয়েছে।'

তাঁকে চুপ করতে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে বললাম, 'পাগল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না তিনি। একটা ফোন এলো; সেটা অ্যাটেন্ড ক'বে বললেন, 'চাকরি ছাডাব আগে থেকেই ভদ্রলোকেব ব্যবহাবে কিছু কিছু গোলমাল দেখা যাচ্ছিল। চাকবি ছাডাব পব সেটা বেড়ে যায় আরো। ঘব থেকে বেরুতেন না। ঘরে ব'সেই লেখাজোকা করেন আব নিজেব মনে বিডবিড় করেন কী-সব! এব মধ্যে একদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। ঘরের ভিতর থেকেই শোনা যায় তিনি দু'জন পুবনো সহকর্মীব নাম ধ'বে নানারকম কথাবার্তা চালাচ্ছেন। স্বাভাবিক গলাব সেইসব কথাবার্তা শুনে এই ভদ্রলোক—অর্থাৎ তাঁর ভাইপোটি—ভেবে নেয় কেউ এসেছে ও জ্যাঠামশায় তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। কৌতূহলে ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায়, ঠিকই; জানলার ধাবে দাঁড়িযে জ্যাঠামশায় বলছেন, 'তোমরা যেমন রাজত্ব করছ ক'রে যাও, আমি আর ও-মুখো হচ্ছি না—।' তখন, ঠিক কাদের সঙ্গে কথা বলছেন দেখার জন্যে এগিয়ে গিয়ে ভাইপো দ্যাখে, জানলার নীচে জ্যাঠামশায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িযে রযেছে দু'টি ছাগল!'

তিনি একটু থামলেন এবং দম নিলেন।

'পরের দিনও একই ব্যাপার ঘটেছে। তবে এবার নাকি ছাগলের সংখ্যা ছিল বেশি!'

এইসব কথাবার্তার মাঝখানে গত বাতে দেখা স্বপ্নটা ফিরে আসছিল আমার মাথায়। মনে পডল, ঠিক এইরকম না হ'লেও প্রায় এইরকম একটা ঘটনার কাছাকাছি গিয়ে সব গুলিয়ে গিয়েছিল কেমন। এখনো, এইসব শুনতে শুনতে, একটা মৃদু উত্তেজনা টের পেলাম কানের পাশে। প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা কবলাম আমি মানুষ, একজন স্বাভাবিক মানুষ। এবং চিন্তার জের টেনেই বললাম, 'লোকটি বদ্ধ উন্মাদ!'

'কে? অধ্যাপক তো?' মনোবিজ্ঞানী বললেন, 'হয়তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু, আমাব সমস্যা কেসটি যে নিয়ে এসেছে তাকে নিয়ে, অর্থাৎ ভাইপোটিকে নিয়ে। জ্যাঠা পাগল হয়ে ছাগল ভেবে কথা বলতে পারেন আপন মনে। কিন্তু, এই লোকটিও বাব বার ছাগলগুলিকে দেখতে পাচ্ছে কী ক'রে!

তাহ'লে কি ধ'রে নিতে হবে—'

এই পর্যন্ত ব'লে সোজাসুজি আমাব চোখেব দিকে তাকালেন তিনি। এমনভাবে, যে-দৃষ্টির যে-কোনো অর্থ হতে পাবে—যে-দৃষ্টি আমার মাথার ভিতর দিয়ে বুক পর্যন্ত পৌঁছে ববফের চাঙ ভেঙে টুকরো হবার মতো কনকনে ঠাণ্ডা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চাবদিকে। আমি ঘামতে লাগলাম। তাহ'লে কি আমিও একটি সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ! আমি কী করব?

বাইরে মানুষের গলা। সম্ভবত ইতিমধ্যে চেম্বার ভ'রে উঠেছে আবার। একটা কিছু ভেবে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু বৃথা; ছাগল ছাড়া আর কিছুই মাথায় এলো না।

'এসব নিয়ে ভাববার মানে হয় না কোনো—', মনোবিজ্ঞানী আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'নিজেকে অন্যান্য ব্যাপারে এন্‌গেজ্‌ড বাখুন, ভাবনাটা রিলিজ ক'রে দিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। এটা সময়েব ব্যাপাব—'

হয়তো তাঁব কথাই ঠিক। অকারণ বিব্রত হচ্ছি আমি। এই ভেবে আদ্যন্ত চিন্তাচ্ছন্ন, বাড়ি ফিরে ঠিক কবলাম ছাগল বিষয়ে আমাব অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা গল্প লেখা যেতে পারে। তাহ'লে দুর্ভাবনাগুলো কিছুটা রিলিজ কবা যায়। কোনো কাগজে ছাপা হ'লে গল্পটি পড়ে অনেকেই হাসবেন এবং আরো বেশি লোক গালাগালি করবেন। দোষ আমাব নয়। সত্যি বলতে, ছাগল এমনই এক অদ্ভুত জীব যে তাদেব নিয়ে কোনো গল্পও খাড়া করা যায় না।

আবির্ভাব

প্রিয়নাথরা যে গরীব, দিন চালায় কায়ক্লেশে, এটা সকলেই জানত। যে-পাড়ায় ওরা থাকত সেই পাড়ার মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। তাদের স্বচ্ছলতার সঙ্গে অবশ্য কোনো তুলনাই চলত না প্রিয়নাথদের। তবে সচ্ছল মানেই তো আর খারাপ নয়। পাড়ার যারা পুরনো বাসিন্দা এই গরীব পরিবারটিকে তারা আগলে রাখত ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে। নতুন কেউ এলেও চেষ্টা করত চিনিয়ে দিতে, যাতে প্রিয়নাথদের প্রতি তারাও হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল।

এমনতর পরিবেশে গরীব হওয়ার সুবিধা আছে। পাড়ার যে-কোনো বাড়িতে উৎসবের উপলক্ষ থাকলে এবং খাওয়া-দাওয়া হ'লে লিস্টের সবচেয়ে ওপরে নাম থাকত প্রিয়নাথদের। দু'ঘরের সংসারে স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঠাসাঠাসি ক'রে থাকা—দরজা খুললেই খ'সে পড়ে আব্রু। ব্যাপারটা সকলেই জানত ব'লে কেউই আর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করত না। দরজায় দাঁড়িয়েই বলত, রবিবার আমার বড়ো ছেলের বিয়ে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই আসবে—, ইত্যাদি। প্রিয়নাথ বা তার স্ত্রী শ্যামা বলত, একটু ব'সে যাবেন না? সকলেই জানত এটা ভদ্রতার কথা। বলত, না, না। এখন অনেক জায়গায় যেতে হবে তো! বরং আর একদিন—। তারপর বলত, শুধু রাত্রে নয়, দিনের বেলাতেও আসবে সকলে, খাবে—

প্রিয়নাথের তিন ছেলেমেয়ের বড়ো দু'টির বোধবুদ্ধি হয়েছে কিছুটা। আড়ালে থেকে এইসব কথোপকথনে কান দিত ওরা এবং আহ্লাদে আটখানা হতো যখন শুনত দু'বেলারই নেমন্তন্ন পেয়েছে তারা। ওদের লোনাঝরা আহ্লাদ প্রত্যক্ষ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলত শ্যামা। আর প্রিয়নাথ? দীর্ঘশ্বাস না ফেললেও একরকম বোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত সে। ক্ষুধা ও খাদ্যের সম্পর্কটা গোলমাল হয়ে যেত মাথার মধ্যে।

তবে এই কাঙালপনায় শুধুই যে দুঃখ ছিল তা নয়। কিছু মজাও ছিল। অভাবের সংসারে যেদিন কোনো কারণে হাঁড়ি চড়ত না বা শুধুই ভাতে ভাত হতো, প্রিয়নাথের ছেলেমেয়েরা সেদিনও খাবার জন্যে বায়না করত না কোনো। সেদিন কবে, কোথায়, কাদের বাড়িতে কী কী ভালো খাবার খেয়েছে এই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত তারা এবং বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্পর্কিত আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

এই ধরনের কাঙালপনা পছন্দ হতো না প্রিয়নাথের। গোড়ার দিকে তো অপমান লাগত রীতিমতো। কিছুতেই ভুলতে পারত না সে এম. এ পাশ, সুতরাং শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক। কিন্তু তার পরেই ভাবতে বাধ্য হতো, কী হলো এসব তকমায়! মানুষের বিচার হয় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে—এই দুটোর কোনোটাই পায়নি সে। কোনো চাকরিতেই পার্মানেন্ট হয়নি, কোনো কাজেই এঁটে বসতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে না পারায় এখন সে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে করবার চেষ্টা করে এবং কোনোটা থেকেই সেরকম উপার্জন করে না। টাকার দাম কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের দামও কমে গেছে অনেক—সংসারের কোনো ইচ্ছাই পূরণ করতে পারে না। এই অবস্থায়, তার সক্রিয় চেষ্টা ছাড়া ইচ্ছাগুলি যদি পাড়া-প্রতিবেশীরাই পূরণ ক'রে দেয়, তাতে সে বাধা দেবে কোন সাহসে!

ভাবনাটা একটা আপোস শিখিয়ে দেয় প্রিয়নাথকে। নিজে শেখার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকেও ব্যাপারটা শিখিয়ে দেয় সে। আপোসটা হলো, নেমন্তন্ন পেয়ে কাঙাল ছেলেমেয়েগুলোকে ক্ষুধা নিবৃত্তিতে পাঠালেও সে বা শ্যামা যুগ্মভাবে কখনো তাদের সঙ্গী হতো না। অর্থাৎ কখনো প্রিয়নাথ যেত, কখনো শ্যামা। যে যেত না সেদিন সে অসুস্থ থাকত। এইভাবে, লোকের চোখে না হ'লেও, নিজেদের চোখে

তারা পুরোপুরি কাঙাল হওয়া ঠেকিয়ে রাখত।

কিন্তু, শুধু খাবার জন্যেই যে ডাক পড়ত তাদের তা নয়। পাড়ার কোনো বাড়িতে কোনো মান্যিগন্যি বা বড়ো মানুষ এলেও ডাক পড়ত তাদের। যারা ডাকত, বড়ো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তারা বলত, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, আমাদের খুব প্রিয়জন। বড়ো ভালো মানুষ। এই ওর স্ত্রী, শ্যামা। আর এরা—ভুনি, টাকু, বিনি—ওদের ছেলেমেয়ে। বলত, চুপ ক'রে কেন, প্রিয়নাথ! আলাপ করো ওঁর সঙ্গে। তুমি তো অনেক কিছু জানো! এসব কথায় বিলক্ষণ লজ্জা পেত প্রিয়নাথ, কথা ফুটত না মুখে। কোলের ওপর জড়োসড়ো হাত দু'খানি রেখে ও দেখত বড়ো মানুষটির সান্নিধ্য পাবার জন্যে অনেকেই ঘুরঘুর করছে আশপাশে, কিন্তু সান্নিধ্য পাচ্ছে শুধু তারাই। ভুল ক'রে হ'লেও কখনো নিজেকেই বড়ো মানুষ ভেবে ফেলত সে।

বাড়ি ফিরে বড়ো মানুষের গল্প করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত ভুনি, টাকু, বিনি। তখন সে ও শ্যামা বড়ো মানুষ নিয়ে সাধারণ গল্প ছেড়ে ঢুকে পড়ত বিশেষ গল্পে। তারপর তারাও ঘুমিয়ে পড়ত।

এইভাবেই একদিন একটা অদ্ভুত কথা ব'লে ফেলল শ্যামা।

'পয়সা নেই ব'লে আমরা না হয় কাউকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পারি না। কিন্তু একজন বড়ো মানুষকেও কি ডাকতে পারি না কোনোদিন?'

প্রিয়নাথ কথাগুলি শুনল, কিন্তু আমল দিল না কোনো। শুধু বলল, 'কোন বড়ো মানুষটিকেই আর চিনি আমবা!'

'কেন! তোমাব সেই হ-বাবু, তিনি তো বিখ্যাত হয়েছেন!'

'হ-বাবু!' মনে করাব ধরনে প্রিয়নাথ বলল, 'হ্যাঁ, তাঁকে এখন বড়ো মানুষ বলা যেতে পারে।'

'এককালে তাঁর জন্যে তুমি অনেক খাটাখাটি করেছ, তাঁকে দাঁড়াতে সাহায্য করেছ।' শ্যামা বলল, 'বিয়ের পরেও অনেকদিন তুমি তাঁর গল্প করতে। একদিন এসেও ছিলেন, মনে আছে?'

প্রিয়নাথ বলল, 'তখনো তিনি বড়ো হননি। সেসব অনেক বছর আগেকার কথা। এখন হয়তো মনেই নেই আমাকে—যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে তাঁর পাশে অনেক অনেক অন্য মানুষ। আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন না। চেহারাটাও কতো বদলে গেছে আমার!'

শ্যামা বলল, 'যে-সিঁড়ি দিয়ে উঠল সেই সিঁড়িটাই ভুলে যাবে, এমন হয় না কি!'

'তা হযতো হয না।' প্রিয়নাথ বলল, 'তবে আমাকে সিঁড়ি ভাবা ভুল। হয়তো সিঁড়ির একটা ইঁট—হযতো তাও নয।'

'এগুলো তোমাব ধাবণার কথা। সামনে গিয়ে পড়লে ঠিকই চিনতে পারবেন।'

ভুনি তার ফ্রকে হাঁটু ঢাকতে ঢাকতে বলল, 'কোন হ-বাবু, মা, যাঁর নাম কাগজে বের হয়?'

'হ্যাঁ। এককালে তোর বাবার খুব চেনাশোনা ছিল। বয়সে যদিও বড়ো, অনেকটা বন্ধুর মতো—'

লণ্ঠনের মৃদু আলোয খুব শ্রদ্ধা সহকারে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল ভুনি। তারপর বলল, 'একদিন তাঁকে নিযে এসো না, বাবা? আমরা দেখতাম, অন্যদেরও দেখাতাম!'

'বাড়িতে!' প্রিয়নাথ বলল, 'এই বাড়িতে কাউকে ডাকা যায়, মা?'

'বাড়িব দোষ দিচ্ছ কেন! নিয়ে এসো। তারপর দেখো এই বাড়িই ধুয়ে নিকিয়ে কেমন ঝকমকে ক'রে দিই। আজকাল কেউই আমাদের বাড়িতে ঢোকে না। চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে, যেন চিড়িয়াখানাব জন্তু।'

প্রিয়নাথ জবাব দিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল শুধু। ভাবল, খাঁচাটা ভাগ্যের দান; দোষ যারা দেখে তাদেব নয়।

শ্যামা বলল, 'যে-কোনো বড়ো মানুষের পায়ের ধুলোই মঙ্গল আনে সংসারে।'

একজন বড়ো মানুষকে বাড়িতে নিয়ে আসার ভাবনাটা ঘুরপাক খায় মাথায়; বদ্ধ বদ্ধ দু'টি ঘরের আনাচে কানাচে। তাঁকে নিযে আলোচনা করে শ্যামা আর ভুনি। খবরের কাগজে বেরুনো হ-বাবুর একটা ছবি কেটে দেয়ালে সেঁটে রাখে টাকু। বড়ো মানুষ—বড়ো মানুষ, অন্তর্নিহিত গুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়ে চাপা উত্তেজনা, মনে হয় পুজো আসছে। কবে, কখন, এ-সবের হদিশ থাকে না যদিও।

ঠিকানা খুঁজে একদিন সকালে হ-বাবুর বাড়িতে পৌঁছে গেল প্রিয়নাথ। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মিলিয়ে নিল নিজের কল্পনার সঙ্গে। ভাবল, বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারও আসে। এই বাড়ি তারই নিদর্শন। এতোদূর উচ্চতায় পৌঁছুতে ইঁট-সুরকির সিঁড়ি কাজ দেয় না, স্বর্গের সিঁড়িই দরকার হয় বুঝি বা। তবু, নিজেকে সেই সিঁড়িরও একটা ইঁট ভাবতে ভালো লাগল প্রিয়নাথের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগে এক দুঃসময়ে তার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিলেন হ-বাবু, টাকাটা ফেরত দেবার সুযোগ পাননি। তখনকার পঞ্চাশ টাকার দাম আজ কয়েকগুণ হবে। সে যেভাবে ভাবে, হ-বাবু নিশ্চয়ই সেভাবে ভাবেন না। এখন তাঁর অনেক টাকা। ধারের কথাটা মনে পড়লে লজ্জা পাবেন নিশ্চিত।

বাড়িতে ঢুকে হলঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব'সে থাকা লোকগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারল এরা সকলেই দর্শনপ্রার্থী ; অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ ধ'রে। হয়তো তাকেও অপেক্ষা করতে হবে।

একটি লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?'

বিনীতভাবে প্রিয়নাথ বলল, 'হ-বাবুর সঙ্গে দেখা করব একটু।'

'আপনার নাম ?'

'প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। অনেককালের চেনা, নাম বললে চিনতে পারবেন।'

লোকটি চ'লে গেল এবং ফিরে এসে বলল, 'লোক আছে। বসতে হবে।'

প্রিয়নাথ ঘাড় নাড়ল। ভাবল, ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক।

প্রায় আধঘণ্টা পরে লোকটি ফিরে এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে।

দোতলার হলঘরের কোণে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন হ-বাবু। সোফার একদিকে তাকে বসিয়ে দিয়ে লোকটি চ'লে যাবার পর মুখোমুখি হলো প্রিয়নাথ।

হ-বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার ?'

'চিনতে পারছেন ? আমি প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। মেসে একসঙ্গে থাকতাম।'

'নাম শুনে বুঝিনি।' সূক্ষ্মভাবে হাসলেন হ-বাবু, 'চেহারায় চেনা লাগছে। একটু একটু মনেও পড়ছে—'

কৃতার্থ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল প্রিয়নাথ।

'কী করা হয় এখন ?'

'আজ্ঞে, বিশেষ কিছু নয়। দু'তিনটে টিউসন করি, পোস্টাপিসে মানি অর্ডার, চিঠি লিখে দিই। পাকা কিছু আর হলো কোথায়। কষ্টেই আছি—'

কথা শেষ করার আগেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ হলো প্রিয়নাথ।

'চাকরির খোঁজে এসেছ ?'

কুঁজো-হওয়া ঘাড়ে ছোট্ট একটা ঘা লাগল প্রিয়নাথের। তার পরেই অবশ্য ভাবল, আজ তাঁর যে-অবস্থা, সম্মান, প্রতিপত্তি, তাতে এ-ধরনের ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। এরকম অনেকেই হয়তো নিত্য আসে যায় হ-বাবুর কাছে এবং তাদের অনেকেই চাকরি-টাকরি চায়। দোষ হ-বাবুর নয়। তখন চোখ তুলে বলল, 'সেজন্যে আসিনি। আমার ছেলেমেয়েদের ভারী শখ একদিন আপনাকে দেখে। যদি একদিন পায়ের ধুলো দেন আমাদের বাড়িতে—'

'ছেলেমেয়ের শখ ! নাকি নিজের ইমেজ বাড়াতে চাও ?'

'আজ্ঞে !' থতমত খেয়ে ব'লে উঠল প্রিয়নাথ, 'তা নয়। গরীবের ইমেজ কি আর বদলায় কিছুতে।'

'ঠিক। ঠিকই বলেছ।' হাসলেন হ-বাবু, 'তবে এসব শখ মেটানোর সময় কোথায়, বলো ? পৃথিবীর মজাই হলো যারা শখ মেটাতে চায় তাদের চেয়ে যারা শখ মেটাবে তাদের সংখ্যা অনেক কম। সময় কোথায় !'

প্রিয়নাথ চুপ ক'রে থাকল।

'থাকো কোথায় ?'

'সেই বাড়িতেই। আপনি গিয়েছিলেন একবার—অনেক বছর আগে—'

'বাড়িব পাশে একটা পুকুর ছিল না?'

'এখন নেই। এখন সেখানে তিনতলা বাড়ি উঠেছে।'

'ঠিকানাটা রেখে যাও।' চিন্তিতভাবে বললেন হ-বাবু, 'কথা দিচ্ছি না। সময় কোথায়! তবে ছেলেমেযের নাম ক'রে বললে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কখনো ওদিকে গেলে একবার ঢুঁ ম'রার চেষ্টা করব।'

'কবে?'

'সে কি বলা যায়! যে-কোনো একদিন। তবে—কথা দিচ্ছি না—'

না-বোঝা কিছু আশা এবং কিছু হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরল প্রিয়নাথ।

শ্যামা জিজ্ঞেস করল, 'দেখা হলো?'

প্রিযনাথ ঘাড় নাডল।

'কী বললেন গো? আসবেন?'

'আসতেও পারেন। তবে ব্যস্ত মানুষ তো! কবে আসবেন কিছুই বললেন না।'

'তোমাব কী মনে হলো?'

'আগে হ'লে বলতে পারতাম। এখন অনেক বদলে গেছেন—বড়ো মানুষই শুধু নন, দূরের মানুষও। পুরোপুরি অচেনা লাগল। ইচ্ছে হ'লে আসবেন—ঠিকানাটা নিলেন—'

'তাহ'লে নিশ্চয়ই আসবেন।'

শ্যামার ইচ্ছায় এবং ভুনি, টাকুর লাফালাফিতে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল পাড়ায়—হ-বাবু আসবেন প্রিয়নাথদের বাড়িতে। অনেকেই বিশ্বাস করল এবং আবির্ভাবের দিন, ক্ষণ সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতে শুরু করল। যারা বিশ্বাস করল না, প্রিয়নাথদের প্রতি ভালোবাসা হেতু তারা বলাবলি করল, বাজে কথা। প্রিয়নাথদের বাড়িতে আসবার মতো সময় কোথায় তাঁর! ওটা কথার কথা।

শ্যামা, ভুনিদের বিশ্বাসে চিড় ধরল না তবু। যবেই আসুন, বড়ো মানুষের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বাড়তি উৎসাহ নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল শ্যামা। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ করল প্রিয়নাথ, ঘরদোরের চেহারা ফিরে গেছে তার। পুরনো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে যা-কিছু সঞ্চয় ছিল তা-ই দিয়ে সস্তার কাপড় কিনে পর্দা বদলেছে জানলার; তাদের বিয়ের ছবির ঘুণধরা ফ্রেমটা পাল্টিয়ে লাগিয়েছে নতুন ফ্রেম। শ্রীযুক্ত এই ঘবদোর মেঝের দিকে তাকালে কেউই আর গরীব ভাববে না তাদের। মনে মনে খুশি হ'লেও একটা আশঙ্কাও পেয়ে বসল তাকে।

একদিন স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এসব যেমন ছিল তেমন থাকলেই হতো। হ-বাবু এলেই কি জীবন বদলে যাবে?'

'তা হযতো বদলাবে না। তবে মানুষেব দযা থেকে তো বাঁচা যাবে।'

'হ-বাবু এলেও দযা করেই আসবেন।'

চুপ ক'রে থেকে কিছু ভাবল শ্যামা। তাবপর বলল, 'বড়ো মানুষেব দয়ায় পুণ্য থাকে। যদি আসেন, বুঝব ভাগ্য। সকলের বাড়িতে তো আব পা পড়ে না তাঁর!'

'তা অবশ্য ঠিক।' প্রিয়নাথ বলল, 'না এলে সবাই হাসবে। এখনই হাসছে অনেকে—'

'ঈর্ষায়।'

হয়তো ভুল বলেনি শ্যামা, প্রিয়নাথ ভাবল, ঈর্ষা মানুষকে ছোট ক'রে দেয়, আলাদা ক'রে দেয়। এই চিন্তা কিছুটা বিপর্যস্ত ক'রে দিল তাকে।

কযেকদিন পরে একদিন বিকেলে তুমুল বৃষ্টি নামল। শহর-ভাসা বৃষ্টি; জল পড়তে লাগল প্রিয়নাথদের ছাদ চুঁইয়ে। বৃষ্টি থেমে যাবার পরেও বন্ধ হলো না জল পড়া। ঘরদোর বাঁচানোর জন্যে বালতি আব বাটি নিয়ে জলেব নীচে দাঁড়াল শ্যামা আর ভুনি।

শ্যামা বলল, 'আব দিন দুয়েক এই অবস্থা চললে আমরা ছাদ চাপা পড়ে মবব।'

'তা ঠিক।' প্রিয়নাথ বলল, 'মৃত্যুই দয়া। আজকাল মনে হয় শুধু মৃত্যুই পারে আমাদের বাঁচাতে।'

কথাগুলোয় অর্থ ছিল। প্রিয়নাথের দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত মুখে শ্যামা বলল, 'কী যে বলো! সারাক্ষণ অমঙ্গলের চিন্তা!'

এই সময় হঠাৎ সজোরে ধাক্কা পড়ল দরজায়।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছিটকিনি খুলল প্রিয়নাথ এবং শূন্য চোখে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করল, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বড়ো মানুষ—হ-বাবু। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যেতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'শ্যামা, ভুনি, দেখে যাও—'

'যা বৃষ্টি! তেমনি কাদা!' প্রিয়নাথ স'রে দাঁড়াতেই চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন হ-বাবু, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তা, তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'আছে—'

পুরনো সুজনি-পাতা চৌকির দিকে তাঁকে নিয়ে যেতে যেতে প্রিয়নাথ লক্ষ করল, হ-বাবুর কর্দমাক্ত জুতোর দাগ শ্যামার হাতে নিকানো মেঝেয় ছাপ ফেলে যাচ্ছে পবিষ্কাব। এতো কাদা কোত্থেকে এলো ভাবতে না ভাবতে শ্যামা ও ছেলেমেয়েরা ভিড ক'রে দাঁডাল।

'ইস্, ভুল হয়ে গেল তো! জুতোটা বাইবে খুলে রেখে এলেই পাবতাম!'

'না, ও কিছু নয়—', তাঁর পায়েব ছাপের দিকে তাকিয়ে বলল প্রিযনাথ, 'সামান্য কাদা। মুছলেই উঠে যাবে। আপনি আরাম ক'রে বসুন—'

'বসবার সময কোথায়! গাডি দাঁডিয়ে আছে, এখুনি চ'লে যাবো হে। নেহাত ছেলেমেয়েদেব নাম ক'রে বলেছিলে—'

'তবু, একটু বসুন!'

প্রিয়নাথের ইশারায় ভুনি, টাকু এসে প্রণাম কবল হ-বাবুকে।

'মঙ্গল হোক।' আলগোছে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে হ-বাবু তাকালেন ছাদেব দিকে, ঘরেব আশপাশে। বললেন, 'এটা তো শুনেছিলাম বড়লোকের পাড়া। এবকম বাড়িও আছে নাকি।'

প্রিয়নাথ বলল, 'পুরনো ভাড়াটে ব'লেই টিকে গেছি কোনোরকমে—'

বলতে বলতে চোখ পডল শ্যামার দিকে। হাত নেড়ে ডাকল শ্যামা। কাছে পৌঁছুতে বলল, 'কি বিশ্রী কাদা হয়ে গেল মেঝেটা! মুছে দেবো?'

'না, না। উনি বিব্রত হবেন। পবে করলেই চলবে। তুমি বরং একটু চা-টা করো।'

কযেক মুহূর্ত হাঁ ক'রে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্যামা বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম না' দবজাব বাইরেটা দ্যাখো। কতো লোক!'

শ্যামার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দরজাব দিকে তাকাল প্রিয়নাথ এবং লক্ষ করল, দরজাব বাইবে দাঁড়িয়ে আছেন পাড়ারই কয়েকজন; অদ্ভুত দৃষ্টি তাঁদের চোখে—কখনো হ-বাবুকে দেখছেন, কখনো মেঝের ওপর তাঁর জুতোর দাগের দিকে। স্বাভাবিক নয় ব'লেই দৃশ্যটা বিমূঢ় ক'রে দিল প্রিয়নাথকে। এঁদের কেউ কেউ তাঁদের বাড়িতে উপলক্ষ হ'লে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন দরজাব বাইবে থেকে—ভিতরে ঢোকেননি; সে ঠিক বুঝতে পারল না, আজ ওঁদের ভিতরে ডাকবে কি না। তারপর ভাবল, এই বড়ো মানুষটির আবির্ভাবের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না তারা, সেইজন্যে আয়োজনও রাখেনি কোনো। এখন ডাকলে বসতে দেবে কোথায়! তখন হ-বাবুর দিকে তাকিয়ে ভাবল, দারিদ্র্যেব সংসারে এই মানুষটির আবির্ভাবের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি না। নিজের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে সে ছুটে গেল হ-বাবুর দিকে।

হ-বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হঠাৎ।

'এরা কারা, প্রিয়নাথ?'

'পাড়া-প্রতিবেশী। আমাদের প্রিযজন, আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

'এই ভয়ই পাচ্ছিলাম। ভিড়, যেখানে যাই সেখানেই ভিড়। লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, পৃথিবীব জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের কোনো পজিটিভ কনট্রিবিউসন নেই। এরা শুধুই ভিড।'

'দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবো ?'

'না, তাহ'লে লোকের কৌতূহল বাড়বে। তোমার এখানে আসা হলো—এবার চলি—।'

কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হ-বাবু।

তখনো কোনো আপ্যায়ন ক'রে উঠতে পারেনি শ্যামা। তাঁর চ'লে যাওয়ার শব্দে ছুটে এসে বলল, 'এ কেমন আসা ! এর চেয়ে—'

'হ্যাঁ, না এলেই ভালো হতো।' কিছু বা বিরক্তি ও হতাশায় অদ্ভুত শোনালো প্রিয়নাথের গলা, 'ওঁকে ধ'রে রাখা কি আমাদের সাধ্যে কুলোয় ! যাক্‌গে, মেঝেটা কাদা হয়ে গেছে একেবারে। মুছে নাও।'

তখনই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। বিব্রত, অন্যমনস্ক প্রিয়নাথকে সম্বোধন ক'রে শ্যামা বলল, 'শুনছ, এ কেমন কাদা ! এতো ঘষছি, কিছুই তো উঠছে না !'

প্রিয়নাথ বলল, 'কাদা কাদাই। ঠিক ক'রে ঘষো, উঠে যাবে।'

'ঘষছি তো ! আর কতো ঘষব !' বিরক্ত গলায় বলল শ্যামা, 'কী যে ছাই বড়ো মানুষ ! লাভের মধ্যে শুধু ঘরদোর নোংরা !'

প্রিয়নাথ চুপ ক'রে থাকল।

কিন্তু হাজার ঘষা ও ধোয়ামোছা সত্ত্বেও উঠল না দাগগুলি। ন্যাতা ঘষে না, ঝাঁটা ঘষে না, ঝামা ঘষেও না। প্রিয়নাথের গোটা সংসার তখন সেই দাগগুলির ওপর ঝুঁকে এলো এবং লক্ষ করল, দাগগুলি দেখবার জন্যে আরো অনেকে এসে জড়ো হয়েছে তাদের পিছনে। তাদের চোখে কৌতূহল এবং বিস্ময় ছাড়াও আরো কিছু ছিল। ব্যাপারটা রটনা হতে দেরি হলো না। ক্রমশ আরো অনেকে এসে জড়ো হতে লাগল প্রিয়নাথদের দরজায়। প্রতিবেশীদের অনেকেই অনেকরকম পরামর্শ দিল এবং দাগগুলি মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুতেই কিছু না হওয়ায় সকলেই ধ'রে নিল ব্যাপারটা মোটেই মঙ্গলসূচক নয়।

সে যাই হোক, অদ্ভুত এবং অলৌকিক এই ঘটনার পর একটু অন্যরকম হয়ে গেল প্রিয়নাথদের জীবন। তারপর ক্রমশ অন্যরকম হতে লাগল। পাড়ার কারো বাড়িতে কোনো উৎসব, অনুষ্ঠান হ'লে কিংবা কোনো বড়ো মানুষের আবির্ভাব ঘটলে আর কেউই ডাকত না তাদের। প্রিয়নাথ বা শ্যামা এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও স্বভাববশত ভুনি, টাকু ও বিনি কোন বাড়িতে কী কী সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশিত হতে পাবে এবং কী ঘটনা আলোচিত হতে পারে, এই নিয়ে চাপা আলোচনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। বাড়ির দরজায় ঘা পড়লেই তারা ধ'রে নিত, বড়ো মানুষের পায়ের দাগ দেখবার জন্যে কেউ না কেউ এসেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে স'রে দাঁড়াত তারা। দর্শনার্থীরা চ'লে গেলে আবার ছিটকিনি তুলে দিত দরজায়। নিঃশব্দে।

একদিন দরজা খুলল না। তখন পুলিশ এলো। এবং দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখল, বড়ো মানুষের পায়ের দাগগুলিকে সামনে রেখে পর পর শুয়ে আছে প্রিয়নাথের পরিবারের শীর্ণ, কঙ্কালসার পাঁচটি মানুষ। কেউই জানতে চাইল না কেন এমন হলো।

তবে, অনেকেই বলল, কোনো বড়ো মানুষের আবির্ভাবের পর অনেক সময়েই এমন হয়।

লীভ ট্রাভেল

অফিসে কাজ করতে করতে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল প্রফুল্ল বিশ্বাসের। অফিসের গাড়িতেই ধরাধরি ক'রে তুলে পৌঁছে দেওয়া হয় হাসপাতালে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ ছিল। তিনদিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, একমাস হাসপাতালে এবং আরো একমাস বাড়িতে কাটিয়ে, আধখানা অবস্থায় অফিসে জয়েন ক'রে সে ম্যানেজমেন্টের কাছে অ্যাপিল করেছিল, চিকিৎসা বাবদ এই দু'মাসে তার খরচ হয়েছে সাত হাজার টাকা—এই টাকাটি তাকে সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করা হ'লে খুবই উপকার হবে। তেত্রিশ বছর একনাগাড়ে এই অফিসের সেবা করার পর এইটুকু সুবিধা কি সে আশা করতে পারে না?

অ্যাপিল করার পর পার্সোনেল ম্যানেজার রঘুবীর দত্ত ডেকে পাঠাল তাকে এবং বলল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু, জানেনই তো, আপনার গ্রেডে মেডিক্যাল অ্যালাউন্স ফিক্সড্, বছরে বারো শো টাকা। অসুখের আগেই আপনি তা ড্র ক'রে নিয়েছিলেন—'

তারপর প্রফুল্ল বিশ্বাস চুপ ক'রে আছে দেখে বলল, 'লোন নিন না?'

'লোন নিলে শোধ করার প্রশ্ন ওঠে। গত বছর বড়ো মেয়ের বিয়ের সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে বারো হাজার নিয়েছি—।' বলতে বলতেই কেমন অন্যরকম হয়ে গেল প্রফুল্ল। গলা কাঁপিয়ে বলল, 'যাদের লিমিট বারো শো টাকা তাদের সাত হাজারের অসুখ হয় কেন স্যার! এর চেয়ে মরে গেলেই ভালো হতো।'

রঘুবীর দত্ত পুরনো লোক, কম ক'রেও কুড়ি বছর তাকে এই অফিসে দেখছে প্রফুল্ল। তার মধ্যে এই পজিসনেই বছর বারো। মুখে মিষ্টি হ'লেও গলে না সহজে। ইউনিয়ন ঠেকায় কড়া হাতে। বলল, 'ইমোসানাল হ'লে চলবে কি ক'রে! মরা বাঁচা সবই ভগবানের হাতে। অফিসকে একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে তো? তেত্রিশ বছর কাজ করছে এই অফিসে এমন এমপ্লয়ির সংখ্যা তিনশোরও বেশি। আপনাকে দিলে একটা প্রিসিডেন্ট ক্রিয়েটেড হবে, তারাও চাইতে শুরু করবে।'

প্রফুল্ল বুঝতে পারল কথাটা ঠিক; সুতরাং চুপ ক'রে গেল। এমনও ভাবল, যুক্তি দিয়ে যখন অ্যাপিলটাকে দাঁড় করানো যাচ্ছে না, তখন তার উঠে যাওয়াই ভালো। পর মুহূর্তেই ভাবল, একবার উঠে যাওয়া মানেই তো অ্যাপিল তুলে নেওয়া। সাত হাজারের ভারে এখনই ঢিপঢিপ করছে বুক—হয়তো আবার একটা স্ট্রোক হবে। তখন দত্তর দিকে ঝুঁকে পড়ে মরীয়া হয়ে বলল, 'আপনি একটু ফেভার করতে পারেন না স্যার?'

'আমার ফেভারে তো কাজ হবে না। রুল ইজ রুল।' থেমে গিয়ে অ্যাপিলটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে দত্ত বলল, 'ম্যানেজমেন্ট তাকেই ফেভার করবে যে রিটার্ন দেয়, যাকে দিয়ে কাজ হবে। আপনার তো তিপ্পান্ন হয়ে গেল, আর মোটে সাত বছর। তারপর এই অসুখটা! বরং যাতে আরো সাতটা বছর এফিসিয়েন্ট থাকতে পারেন—'

সাত হাজারের দুর্ভাবনা থেকে হঠাৎই অ্যাপিল করার কথাটা মাথায় এসেছিল, অতশত ভেবে দেখেনি। অ্যাপিল করার পর মনে হয়েছিল ব্যাপারটা সঙ্গত। একটা জোরও পেয়ে গিয়েছিল মনে। রঘুবীর দত্তর শেষ কথাগুলো শুনে ঘামতে শুরু করল প্রফুল্ল।

'এখন যান।' দত্ত বলল, 'কথা ব'লে দেখি কী করতে পারি। তবে, কমিট করছি না কিছু—'

ডিপার্টমেন্টে ফিরে নিজের চেয়ারে বসতে না বসতেই শুরু হলো লোডশেডিং। এরকম প্রায় রোজই হচ্ছে; একবার আলো পাখা বন্ধ হ'লে আড়াই তিন ঘণ্টা আর চালু হয় না।

ভ্যাপসা গরম আর প্রায়ান্ধকারে কে আর কাজ নিয়ে ব'সে থাকে! প্রফুল্ল দেখল একে একে চ'লে

যাচ্ছে অনেকেই ; আধ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল ডিপার্টমেন্টের পঁচাত্তর ভাগ। তখন বেয়ারা শচীনকে ডেকে বলল, 'ক্রেডিটরস্ লেজারটা কোথায় ? দাও দেখি।'

'এখন কাজ করবেন নাকি ?'

'করব না কেন !'

শচীন বলল, 'এই গরমে কাজ করলে আবার ব্লাডপেসার বাড়বে, তারপর—'

'হার্ট অ্যাটাক হবে তো ?' ফুল শার্টের হাতায় কপাল মুছে প্রফুল্ল বলল, 'বেঁচে না ফিরলে অফিসেই মরা হতো। এফিসিয়েন্সি নির্ভর করে লয়ালটির ওপর। তেত্রিশ বছর তাই করেছি—'

'লয়ালটি আপনি দেখান।' লেজার নিয়ে ফিরে শচীন বলল, 'অফিস ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি এবার যাবো—'

কথাটা কানে তুলল না প্রফুল্ল। লেজারটা নিজের দিকে টানতে টানতে বলল, 'পার্সোনেল ম্যানেজারকে বল না ডিপার্টমেন্টটা ঘুরে যাক একবার !'

হার্ট অ্যাটাকের পর দৃষ্টিশক্তিও আচ্ছন্ন হয়েছে সম্ভবত। প্রায় অদেখা আলোয় ক্রেডিটরস্ লেজারের এনট্রিগুলোর ওপর ঝুঁকে এলো প্রফুল্ল। ভাবল, বয়সটা অ্যাকুরেটলিই বলেছে দত্ত। ডাকবার আগে নিশ্চয়ই রেকর্ড দেখে নিয়েছিল। ভাবতে ভাবতেই জোরে নিঃশ্বাস নিল এবং ছেড়ে দিল।

তিপান্ন পেরিয়ে যে দুটো ব্যাপারকে ভীষণভাবে ভয় করতে শিখেছে প্রফুল্ল বিশ্বাস, তার একটি চাকরি যাওয়া, দ্বিতীয়টি মৃত্যু। যে-লোককে মৃত্যুভয় পেয়ে বসে, অন্যান্য সব ভয়ই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবার কথা। তা সত্ত্বেও যে চাকরি যাওয়ার ভয়টাকে সে মৃত্যুরও আগে স্থান দিয়েছে তার কারণও সোজা। প্রফুল্ল জানে, হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যু হ'লে সে মারাই যাবে এবং এখনো অগোছালো তার সংসারে নেমে আসবে অভাবিত বিপর্যয় ; কিন্তু তার, অর্থাৎ মৃত লোকটির, দায়িত্ব থাকবে না কোনো। কিন্তু, হঠাৎ কোনো কারণে চাকরি গেলে মৃত্যুজনিত বিপর্যয় তো থাকবেই, উপরন্তু দায়িত্বও নিতে হবে তাকে। পার্সোনেল ম্যানেজাবের সঙ্গে কথাবার্তা ভয়টা বাড়িয়ে দিল। গত দু'বছর কোম্পানির ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে, নতুন লোক নেওয়া বন্ধ। যদি কোনো কারণে ব্যবসার অবস্থা আরো খারাপ হয় এবং ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন ওঠে, তাহ'লে কাকে রাখা দরকার কাকে নয় এ-প্রশ্নও উঠবে। হার্টের অসুখ এমনিতেই আধখানা ক'বে দিয়েছে তাকে ; সারাক্ষণই মনে হয় তার অজ্ঞাতে শরীরের ভিতর থেকে খুবলে বের ক'রে নেওয়া হয়েছে ভারী একটা কিছু। হয়তো এফিসিয়েন্সি, কিংবা মনের জোর ; হয়তো বেঁচে থাকার অধিকার। প্রফুল্ল ঠিক জানে না। এই বয়স পর্যন্ত বড়ো মেয়ে ডলির বিয়ে দেওয়া ছাড়া সে আর কিছুই করতে পাবেনি। বড়ো ছেলে সুপ্রভাত গত বছর এম-এ পাশ ক'রে এখনো বেকার। মেজ মেয়ে মলি এবার স্কুল-ফাইনাল দিল। ছোট ছেলে সুব্রত ক্লাস নাইনে। এই অবস্থায় মরা যদি বা যায়, চাকরি হারানো যায় না। আর থাকে স্ত্রী, লীলা। লক্ষ ক'রে দেখেছে, তার অসুখটার পর শরীরে টান না পড়লেও চুলে অল্পস্বল্প পাক ধরতে শুরু করেছে লীলার। মাঝে একদিন রাতে গা-ঘেঁষে এসেছিল। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রফুল্ল বলেছিল, 'ট্রেন ছাড়ার আগে ওয়ার্নিং বেল পড়ে। তার মানে ছাড়ছেই। এই অসুস্থটাও তেমনি—'

'কী সব বলছ !' লীলা বলেছিল, 'জীবন কি আর ট্রেনের নিয়মে চলে ! একটা ফাঁড়া কেটে যাবার পর আয়ু বেড়ে যায়, লাইফ নতুন ক'রে শুরু হয়—'

জবাব না দিয়ে দুর্বলতা চিনতে চিনতে পাশ ফিরেছিল প্রফুল্ল।

ভয় এবং ভাবনা প্রফুল্লকে এমনই কব্জা ক'রে ফেলল যে মেডিক্যাল এক্সপেন্ডিচাব বাবদ সাত হাজার টাকার কথাটা পার্সোনেল ম্যানেজারকে আবার ক'রে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল না। বরং যতো দিন যেতে লাগল ততোই তার মনে হতে লাগল, সাত হাজারের চেয়ে অনেক বেশি দামি চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখা এবং কোনোরকমে আরো সাতটি বছর পার ক'রে দেওয়া। কে জানে, নিয়মকানুন জানা সত্ত্বেও এই উটকো অ্যাপিলটা করা ঠিক হয়েছিল কিনা ! এসব ব্যাপারে অনেক সময়েই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। এই দুর্ভাবনায় নতুন ক'রে লাইফ শুরু করে প্রফুল্ল।

২

একদিন বিকেলে রঘুবীর দত্ত ডেকে পাঠাল। সেদিনও লোডশেডিং, ডিপার্টমেন্ট প্রায় ফাঁকা। দত্তর বেয়ারা চাণক্য ডিপার্টমেন্টের মাঝামাঝি এসে ফিরে যাচ্ছিল, কী মনে ক'রে এগিয়ে এসে বলল, 'কী ব্যাপার বিশ্বাসবাবু! বাড়ি না গিয়ে এই অন্ধকারে ব'সে আছেন।'

একটু আগেই ঘাড়ের কাছে চিনচিনে ব্যথা অনুভব ক'রে একটা অ্যাডলফিন গিলেছে প্রফুল্ল। চমকে বলল, 'কে বলেছে আমি বাড়ি চ'লে যাই!'

'কেউ বলেনি। অন্ধকারে দেখেই চ'লে যাচ্ছিলাম—।' চাণক্য বলল, 'যান, পার্সোনেল ম্যানেজার খোঁজ করছেন।'

'ও!' মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল প্রফুল্লর। তাড়াহুড়োয় জলের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বলো আসছি।'

ঘোরলাগা মাথায় চারপাশটা দেখে নিল প্রফুল্ল। না, এদিকটায় কেউ নেই। ডিপার্টমেন্টের এক কোণে জানালা ঘেঁষে চার পাঁচজন ফুটবল ম্যাচের রিলে শুনছে। আলো, পাখা চললে ওভারটাইম শুরু করবে। আলো, পাখা থাকুক না-থাকুক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শশধর চক্রবর্তী ছ'টা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত থাকেই; খানিক আগে 'ঘুরে আসছি' ব'লে সেও বেরিয়ে গেছে। তার মানে চাণক্যর আসা এবং চ'লে যাওয়াটা কেউই লক্ষ করেনি। এমন উদ্বেগের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ করল প্রফুল্ল এবং নিশ্চিন্ত হলো যেন এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াটা খুবই জরুরি। তারপর পার্সোনেল ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে ভাবল, অ্যাপিল যে কার্যকর হবে না এটা সে জানতই। অ্যাপিল করার সময় কাউকে জানিয়ে করেনি—প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটাও কারুর না জানা ভালো। এসব কথা পাঁচ কান হয়ে ম্যানেজমেন্টের কানে পৌঁছুতে দেরি হয় না। দোষের দায় তাকেই বহন করতে হবে।

'স্যার?'

'বসুন।' বেশ আগ্রহের সঙ্গে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল রঘুবীর দত্ত। বলল, 'সেদিন মরে যাওয়ার কথা বলছিলেন না! আরে মশাই, বেঁচে না ফিরলে সমস্ত গ্রীলই মিস করতেন।'

প্রফুল্ল ভেবেই এসেছিল কোনো বাড়তি কথা বলবে না। সুতরাং চুপ ক'রে থাকল।

'ভগবানে বিশ্বাস করেন না তো! এই দেখুন, আপনার কেস্‌টা স্পীড-আপ্ করতে গিয়ে শাপে বর হয়ে গেল।' বলতে বলতে টেবিলের ওপর থেকে একটা মুখ বন্ধ করা খাম তুলে বাড়িয়ে দিল রঘু দত্ত, 'নিন। প্রোমোশনের চিঠি। অফিসারস্ গ্রেডে দেওয়া হলো আপনাকে। এখন যতো ইচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হোক, কেউ আর বিল আটকাচ্ছে না আপনার। তবে বোনাসটা আর পাবেন না, তার বদলে লীভ ট্রাভেল ফেসিলিটিজ—'

রঘুবীর দত্তর মুখ আর মাথাটা বড়ো হতে হতে গোটা দেওয়ালটা আড়াল হয়ে যাবার পর প্রফুল্ল উচ্চারণ করল, 'স্যার!'

'স্যার কী মশাই! হাতটা বাড়ান, হ্যান্ডশেক করুন! তারপর চিঠিটা নিয়ে সোজা বাড়ি চ'লে যান—'

বাইরে এসে তখনো অবিশ্বাসে ভারাক্রান্ত প্রফুল্ল বিস্ময় খাম থেকে চিঠিটা বের ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। তিন লাইনের ছোট চিঠি। ম্যানেজমেন্ট খুশি হয়ে তাকে প্রোমোট করেছে অফিসারস্ গ্রেডে। এখন থেকে এই গ্রেডের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সে পাবে। এই প্রোমোশন তিন মাস আগে থেকেই কার্যকর হবে। বয়ানটা ঠিক-ঠিক মাথায় রাখার চেষ্টা করতে করতে চিঠিটা খামে ভ'রে খামটা কপালে ঠেকিয়ে বুক পকেটে রাখল প্রফুল্ল। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল ডিপার্টমেন্টের দিকে।

হঠাৎ কখন জ্ব'লে উঠেছে আলো—সম্ভবত পার্সোনেল ম্যানেজারের ঘরেই সে ফ্যান চলতে দেখেছিল। যারা রিলে শুনছিল তারা এখন ফিরে এসেছে যে যার নিজের জায়গায়। অধিকাংশই চ'লে যাওয়ায় ডিপার্টমেন্ট জুড়ে এখন যতো লোক তার চেয়ে ফ্যানের সংখ্যা বেশি। সবগুলিই ঘুরছে—মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্টের লোক এসে সুইচ অফ না করা পর্যন্ত ঘুরেই চলবে। প্রফুল্ল দেখল, রেগুলেটারটা পুরো স্পীডে চালিয়ে নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসেছে শশধর চক্রবর্তী। বাড়তি হাওয়ার

অনেকটাই তার বুকে এসে লাগল।

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা নিজের মনে তদন্ত ক'রে নিল প্রফুল্ল। এখন তার যতোবারই হার্ট অ্যাটাক হোক—অসুখ-বিসুখের সমস্ত খরচই কোম্পানি বহন করবে। তিন মাস আগে থেকে প্রোমোশন কার্যকর করার অর্থ আগের অ্যাটাক বাবদ সাত হাজার টাকাটা পেয়ে যাবে—এটার জন্যেই সে অ্যাপিল করেছিল। তা না হয় হলো ; কিন্তু প্রোমোশন পেয়ে লাভ হলো কী ! তেত্রিশ বছরের চাকরিতে এর আগে একবারই মাত্র প্রোমোশন হয়েছিল তার—পনেরো বছর আগে, যখন কেরানী থেকে সুপারভাইজার কবা হয় তাকে। ক্লারিকাল গ্রেডে ম্যাক্সিমাম টাচ করায় তার আগে গ্রেড ইনক্রিমেন্ট বন্ধ ছিল এক বছর ; পরের গ্রেডে না তুললে আর কোনোদিনই ইনক্রিমেন্ট হতো না। ওটাকে প্রোমোশন বলা চলে না। পনেরো বছর সুপারভাইজারি গ্রেডে কাজ করার পর গ্রেড ইনক্রিমেন্ট হতে হতে এখন মাইনে যে-জায়গায় এসে পৌঁছেছে, অফিসারস্ গ্রেড শুরু হয় তার কিছু পিছন থেকে। রঘুবীর দত্ত মেডিক্যাল বেনিফিট, লীভ ট্রাভেল ফেসিলিটিজের কথা বলল, কিন্তু মাইনে বাড়ছে কিনা বলল না। তার মানে বাড়বে না ; এই মাইনেতেই অফিসারস্ গ্রেডে অ্যাডজাস্ট ক'রে দেবে। এদিকে বোনাসও বন্ধ হলো ! এই বাবদ তার বছরে ক্ষতি হবে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তার মানে হরেদরে দু'বছরের মধ্যেই এখনকার সাত হাজার টাকাটা পুষিয়ে নেবে কোম্পানি। সত্যিকারের বেনিফিট পেতে হ'লে এখন তার কিংবা তার পরিবারের যে-কারও ঘন ঘন বড়ো ধরনের অসুখ হতে হবে—হার্ট-অ্যাটাক বা ওইরকম কিছু, যার ফলে মৃত্যুও হতে পারে ! এটা কী ধরনের ব্যবস্থা হলো ! ইত্যাদি ভাবনায় প্রোমোশনের যাবতীয় হিসাব মাথার মধ্যে গোল পাকিয়ে গেল প্রফুল্লর। পার্সোনেল ম্যানেজারের ঘর থেকে চিঠিটা নিয়ে বেরুনোর সময় আনন্দজনিত যে-সম্ভাবনায় সে কাঁপছিল, তার অনেকটাই গেল উবে। ভাবনার মধ্যেই সে পৌঁছে গেল একটা বিক্ষোভে।

প্রোমোশনের ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না ভেবেও এখনকার অশান্তিটা এড়াতে পারল না প্রফুল্ল বিশ্বাস। দূর থেকে দেখল ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সামনে রাখা কাগজে টিক্ মেবে যাচ্ছে শশধব চক্রবর্তী। এমনই তন্ময় যে মনে হয় না প্রফুল্লর ফিরে আসাটা লক্ষ করেছে। মাথার চুল পাতলা হযে যাওয়ার কারণে বয়সের তুলনায় ভারিক্কি দেখায় কিছুটা। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর অফিসের যে তিনজনকে সে প্রথম দেখতে পায় শশধর তাদের একজন। তখন থেকেই প্রফুল্লর ধারণা হয় লোকটি ভালো—যদিও একই অফিসে একই ডিপার্টমেন্টে একসঙ্গে দশ বছর কাজ করার পরও একটা আড়াল রেখে চলে শশধর। একে কোয়ালিফায়েড, তার ওপর ম্যানেজার, হয়তো সেই কাবণেই। তবে শশধরকেই বলা যায় ব্যাপারটা।

'শশধর, কেমন আছো ?'

'কী ব্যাপার !' হঠাৎ প্রফুল্লকে সামনে দেখে অবাক হলো শশধর, 'এসে দেখতে পেলাম না, ভাবলাম চ'লে গেছেন—'

'এখানেই ছিলাম। তাছাড়া—', শশধর বিরক্ত হচ্ছে না দেখে চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল প্রফুল্ল, 'জানোই তো, অসুস্থ শরীরে ট্রাম-বাসের জন্যে ছোটাছুটি করা কী ব্যাপার! এখন গুমটিতে গিয়ে বাসে ব'সে থাকি, যখন ছাড়ে ছাড়বে—'

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, একটা খবর নেওয়ার ছিল—।' সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে একবার আশপাশে তাকিয়ে নিল প্রফুল্ল। তারপর বলল, 'অফিসার গ্রেডে প্রোমোশন পেলে কী কী বেনিফিট পাওয়া যায় বলতে পারো ?'

'কে পেয়েছে ?'

'না, ইয়ে—', ইতস্তত ক'রে পকেট থেকে রঘুবীর দত্তব চিঠিটা বের ক'রে শশধব চক্রবর্তীর দিকে বাড়িয়ে ধরল প্রফুল্ল, 'পার্সোনেল ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়েছিল একটু আগে—হাতেই দিল। চিঠিতে তো কিছু লেখা নেই !'

প্রফুল্ল কথা শেষ করাব আগেই তিন লাইনের চিঠিটা পড়ে ফেরত দিল শশধর।

'এ তো সুখবর ! কনগ্র্যাচুলেসন। আপনাকে ওয়াবিড দেখাচ্ছে কেন ?'

শশধরকে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে দেখে প্রফুল্লও হাসল এবং বলল, 'ঠিক ওয়ারিড নয়, চিন্তিত।'

'চিন্তিত !'

'তেত্রিশ বছর চাকরিই করেছি, লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখিনি। এই হার্টের অসুখটাই সব গোলমাল ক'রে দিল। এখন কিছু পেলে ঠিক কতোটা পেলাম জানতে ইচ্ছে করে—'

শশধর চুপ ক'রে থাকল।

প্রফুল্ল বলল, 'বুঝতেই পারো ! বড়ো ফ্যামিলি, রোজগারে লোক একা।'

মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকাল শশধর। খানিক কিছু ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনার কেসটা আমি আগেই জানি ; মিস্টার দত্ত ডিসকাস করেছিলেন আমার সঙ্গে। অবশ্য, চিঠিটা পেয়ে গেছেন জানতাম না—'

'এখন তো জানলে !'

'হ্যাঁ। তবে মাইনেকড়ি খুব একটা বাড়বে ব'লে আশা করবেন না। বেনিফিট্স বাড়বে—আনলিমিটেড মেডিক্যাল, লীভ ট্রাভেল, এইসব আর কি। প্রেসটিজও বাড়বে। এখন তো আপনি অফিসার—পাঁচজনকে বলতে পারবেন—'

'তাতে আমার লাভ কী ! আনলিমিটেড মেডিক্যাল বেনিফিট পেতে হ'লে অসুখও হতে হবে—।' হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল প্রফুল্ল, 'ম্যানেজমেন্ট কি আমাকে মেরে ফেলতে চায় নাকি ?'

'ওভাবে ভাবছেন কেন ! ওটা একটা প্রোটেকসানও। যে-কোনো অসুখে চিকিৎসার জন্যে ভাবনা নেই জানা থাকলে দুশ্চিন্তা কমে যায়, অসুখও কম হয়।'

'এটা আগে পেলে অ্যাটাকটা হতো না। মেয়ের বিয়েব পর থেকেই শবীবটা ভাঙতে শুরু করে—'

'যাক গে।' আলোচনাটা শেষ করতে চাইল শশধর, 'ওই লীভ ট্রাভেল অ্যালাউন্সটাও কম নয়। নিয়মকানুন পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টই জানিয়ে দেবে। প্রোমোশন হলো, যান, এখন কিছুদিন মিসেস আব ফ্যামিলিকে নিয়ে ঘুরে আসুন কোথাও। ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন ফেযার দেবে—এনিহোয়্যার ইন ইন্ডিয়া—যাতায়াতের খরচ। ভেবে দেখুন, এই মাগগী গণ্ডাব দিনে বউ ছেলে মেযে নিয়ে ছুটি কাটানো—এটা কিন্তু কম বেনিফিট নয !'

ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথায় ঢুকতে যতোটা সময লাগে তাব আগেই মাথা নাড়ল প্রফুল্ল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'হ্যাঁ, এটা একটা সুবিধে বটে—'

৩

বড়ো ছেলে সুপ্রভাত পাড়ার রকে আড্ডা দিচ্ছিল। তাকে ডেকে পাঠিযে লীলা বলল, 'যা, মুরগির মাংস আর মিষ্টি নিয়ে আয়। কম চিনির সন্দেশ আনবি।'

অসময়ে এরকম ফবমাশ শুনে ঘাবড়ে গেল সুপ্রভাত।

'হঠাৎ !'

'হঠাৎ না তো কি ! তোর বাবার প্রোমোশন হয়েছে। এই তো ফিবলেন উনি।'

মা'র হাত থেকে বাজারের থলি আর টাকা নিতে নিতে সুপ্রভাত বলল, 'প্রোমোশনের এফেক্ট কি একদিনই ? না রোজই এরকম হবে ?'

শোবার ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেঞ্জি পরছিল প্রফুল্ল। ছেলের কথাটা কানে যেতে কিছু রাগ, কিছু বিরক্তি, কিছু অভিমান এবং কিছুটা আনন্দে বলল, 'ফাজলামিটা ভালোই শিখেছিস ! বাপ মরে গেলে এই একদিনও হতো না।'

'আঃ, তুমি থামো তো !' লীলা বলল, 'আনন্দ তো ছেলেমেয়েরাই করে। যা, তুই যা—'

'আনন্দই বটে।' লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত প্রফুল্ল বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, লীলার মুখোমুখি। শোবার ঘর ও রান্নাঘরের মাঝখানে চৌকো বারান্দায় সাধারণ খাবার টেবিল ও গোটা তিনেক চেয়ার পাতা। ওই চেয়ারের একটিতে ব'সে সকালে অফিস যাবার আগে ভাত খায় প্রফুল্ল; চা-জলখাবার খায় অফিস থেকে

ফিরে। এখন সেই চেয়ারের একটিতে বসতে বসতে বলল, 'বি-এ, এম-এ পাশ করিনি। ওই বয়সে আমাব চাকরি পাঁচ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তখন বাপের হোটেল ছিল না, আনন্দও ছিল না—'

কিছু বলার আগে লীলা দেখে নিল সুপ্রভাত ঠিক বেরিয়ে গেছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'একটা দিনও যদি গালমন্দ ছাড়ো! এই নিয়ে সাতটা ইন্টারভিউ দিল। কোথাও কিছু না হ'লে ওর কি দোষ।'

'ওকে আব দোষ দিলাম কোথায়! দোষ আমাব কপালেব। এসব ভাবলে আনন্দ থাকে না।'

বাবা বাড়ি ফেবাব সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে চা বানাতে ঢুকেছিল মলি। ওকে চায়ের কাপ হাতে এগিয়ে আসতে দেখে মুখেব কথাটা চেপে গেল লীলা। প্রতিদিনের এই সব কথায় মেয়েব যে কান নেই তা নয়। ওপর-ওপর শান্ত, এমনিতে মগজ-পাকা। ক'দিন আগে স্কুল-ফেরত ঘোষদের মেজছেলের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিল। ব্যাপারটা দেখে ফেলে সুপ্রভাত, বাড়িতে এসে চোটপাট করে। পরের দিনই ফ্রক ছাড়িয়ে শাড়ি ধবায় লীলা। ভয়টা কাটেনি। এবকম দৃশ্য দৈবাৎ প্রফুল্লব চোখে পডলে আবাব হার্ট-অ্যাটাক হবে। যেন সেই দৃশ্যটাই আড়াল করার জন্যে এমনভাবে তাকাল মলিব দিকে যাতে সে ঘরের ভিতব ঢুকে পড়ে এবং পডায় বসে। ছোট সুব্রত সুব ক'রে কী যে পড়ে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে থামে, আবাব সুর ধরে। গতবারের পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করার পর প্রোগ্রেস রিপোর্টে সই করেনি প্রফুল্ল, অফিসে গিয়েছিল না খেয়ে। কাবণ এক হ'লেও তার ও প্রফুল্লর জ্বালার জাযগা দুটো আলাদা। এখন প্রফুল্লকে দেখতে দেখতে মাথার আঁচলটা একটু টেনে নিয়ে বলল, 'তোমাব সময় আর ওদের সময়েব মধ্যে তফাত অনেক—'

প্রফুল্ল জবাব দিল না। কিছু ভাবছে, চোখদুটো মেঝের দিকে নামানো; চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। শরীরের ভিতর থেকে কিছু একটা খুবলে বের ক'রে নেওয়ার ধারণাটা মিথ্যে নয়। শুধু যে শবীরই হাল্কা লাগে তা নয়, প্রায়ই অসম্ভব ফাঁকা লাগে মাথাটাও। ওবই মধ্যে কখনো বিদ্যুৎ খেলে যায় চকিতে। এখনো মনে হলো, প্রোমোশন না দিয়ে ঐ অফিসেই ছেলেটার একটা হিল্লে ক'রে দিলে হয়তো সত্যিই কিছুদিন আয়ু বেড়ে যেতে তার। তা হবার নয়। এখন যা অবস্থা তাতে শ্মশানে মুখাগ্নির পাটকাঠি নিবে গেলেই শূন্য হাতে ফিরবে ছেলেটা। এই ভেবে, নিঃশ্বাস চেপে, ষাট পাওয়ারেব বাল্বের বিষণ্ণ আলোয় লীলার সিঁথির দিকে তাকাল প্রফুল্ল।

আঁচল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছে মাথাব কাপডটা আবাব যথাস্থানে সাজিয়ে নিল লীলা।

'হ্যাঁ গো, প্রোমোশনেব পব এখন সবাই তোমাকে কী নামে ডাকবে?'

'নাম পাল্টায় নাকি!'

'অফিসার বলবে তো?'

'ওই আর কি।'

প্রফুল্ল খুশি না অখুশি বোঝা যাচ্ছে না। লীলা একটু পড়বার চেষ্টা কবল। তাবপব বলল, 'এতোদিন তো শার্টপ্যান্ট পরেই চলল। এবার কি টাই পরতে হবে?'

'টাই!' কথাটা বুঝতে সময় লেগেছিল। বুঝে হেসে ফেলল প্রফুল্ল। বলল, 'ওসব সাহেবদেব আমলে ছিল। তাছাড়া টাই পরার লোক আলাদা হযে জন্মায়—'

মাংস নিয়ে ফিরেছে সুপ্রভাত। তাড়াতাড়ি থলিটা নামিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, প্রফুল্ল ডাকল।

সুপ্রভাত ঘুরে দাঁড়াল।

'আমাকে ডাকছ?'

'হ্যাঁ, তোকে না তো কাকে?'

এটা নতুন ব্যাপার। যতো দিন যাচ্ছে বাপ-ছেলের মধ্যে দূরত্ব ততোই বেড়ে চলেছে যেন। লীলা জানে, অনুমান করতে পারে অন্তত, দু'জনেই একই অসুখে ভোগে—ভিতরের প্রতিক্রিয়া আলাদা হ'লেও সামনাসামনি একই অস্বস্তি আড়াল ক'রে রাখে দু'জনকে। দু'জনেরই অনুযোগ অভিমান জমা হয় লীলার বুকে। কষ্ট বেশি হ'লে ওষুধ খায় হাঁপানির। রাতে শুতে যাবার আগে দুটো হোমিওপ্যাথি গুলি—পাড়ার ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বলেছিল, কলকাতার একতলা বাড়ির চাপা পরিবেশে একসঙ্গে অনেকদিন থাকতে থাকতে অনেকেরই হয় এরকম। আসল কারণটা বলা যাবে না, তাই এই কারণটা

পেয়ে পাঁচ ছ'তলা বাড়িব ওপরের তলায় থাকাব স্বস্তি অনুভব করেছিল লীলা। এই মুহূর্তে নিজে থেকেই ছেলেকে ডাকল শুনে ধ'রে নিল প্রোমোশন মন ভালো ক'বে দিয়েছে প্রফুল্লর। সুপ্রভাত তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিজে উঠে দাঁড়াল লীলা। বলল, 'বোস না এখানে! বাবার প্রোমোশনটা কি-বকম হলো শোন। আমি মাংসটা মলিকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি —'

সুপ্রভাত দাঁড়িয়েই থাকল।

দায়সারাভাবে ছেলের মুখেব দিকে তাকিয়ে আবাব চোখ নামিয়ে নিল প্রফুল্ল।

'চাকবির বাজার যে খারাপ এটা সকলেই জানে। কাগজে পড়ি দেশে বেকাবেব সংখ্যা নাকি বেড়েই চলেছে। শিক্ষিত বেকারই নাকি কয়েক লক্ষ—'

লীলা ফিরে এলো। তিনজনকে ধ'রে রেখা টানলে অসমান ত্রিভুজ। কোথাও ঠিকঠাক জোড়া না লাগায় ফাঁকফোকর দিযে ঢুকে পড়ে স্তব্ধতা।

প্রফুল্লই সেটা ভাঙার চেষ্টা করল।

'চেষ্টাটা চালিয়ে যাও। হতাশ হবার কিছু নেই।' থেমে, আরো একবাব ছেলেকে দেখল প্রফুল্ল। বলল, 'তোমাব মা প্রোমোশন বলতে একটা বিবাট কিছু বোঝে। তা নয়। অসুখের বিলটা মিটিয়ে দেবার জন্যে একটা দরখাস্ত কবেছিলাম। এমনিতে হচ্ছিল না, তাই ওপবেব গ্রেডে তুলে দিল। টাকাটা পাওয়া যাবে। এখন থেকে অসুখ-বিসুখেব খরচাটাও পাওযা যাবে।'

'ভালোই তো।'

দুশো গজ দূর থেকে ভেসে এলো সুপ্রভাতের গলা।

লীলা বলল, 'মাইনে বাডবে না?'

'মনে তো হয় না। তাছাড়া—', বোনাস বন্ধেব কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল প্রফুল্ল। লীলা ভাবতে পারে মাসেব তৃতীয় সপ্তাহে মুবগির মাংস কেনার বিলাসিতা বাদ দিলেই হতো। বলল, 'তবে গোটা ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে যাবাব সুবিধে আছে। লীভ ট্রাভেল ফেসিলিটিজ। শুনছি যাতায়াতেব ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন ভাড়া দেবে। ব্যাপারটা মন্দ নয়। ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, কলকাতাব বাইরে যে একটা ভারতবর্ষ আছে, সেটা জেনেছিলাম ভূগোলেব বইযে। কতোদিন বাইবে যাইনি কোথাও! কুড়ি বছরেরও বেশি। তোর জন্মের পর একবার পুরী গিযেছিলাম মনে আছে—'

প্রফুল্ল চুপ করতে লীলা বলল, 'কেন! একবাব ভাগলপুরে গিয়েছিলে না? তোমার ছোট শালাব বিযেতে বরযাত্রী হয়ে?'

মনে কবার চেষ্টা ক'রে প্রফুল্ল বলল, 'সেও তো অনেক বছর হবে। মলি হযেছিল কি? দিন দুযেকের জন্যে। ওটাকে বেড়ানো বলে না।'

'যাবে নাকি ছুকুর ওখানে? টাটানগব শুনেছি খুব ভালো জায়গা। ছুকুও প্রায়ই লেখে। ভাড়া দিলে সক্কলে মিলে যাওযা যেত!'

'তুমি যে কী বলো, মা!' সুপ্রভাত এবার খোলামেলা হলো, 'অফিসের টাকায় কেউ টাটানগরে বেড়াতে যায় না। যেতে হ'লে দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীর—'

'ঠিকই।' প্রফুল্ল বলল, 'গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তো ওসব জায়গায় কোনোদিন যাওয়া যাবে না। যেতে হ'লে দূরে কোথাও—'

কথা শেষ হতে না হতেই লোডশেডিং হলো। লীলা উঠে গেল লণ্ঠন জ্বালাতে। তখন প্রফুল্ল বলল, 'তোমরা তো আজকালকার ছেলে, অনেক খবর রাখো। মাথা খেলিয়ে বলো তো কোথায় যাওয়া যায়?'

মাংস রান্নার গন্ধে মেশে আর একরকমের সুগন্ধ। বেড়ানোর গল্পে আর আলোচনায় প্রফুল্ল বিশ্বাসের সংসার ক্রমশ পরিণত হয় ছোটখোটো ট্যুরিস্ট অফিসে। রঙিন সৌন্দর্যে রম্য তার চারদিক। কাশ্মীর ও দার্জিলিং থেকে নামগুলো ছড়িয়ে পড়ে শিলং, জয়পুর, সিমলা, উটি, জলদাপাড়া, নৈনিতাল এবং গোয়ায়।

লীলার ইচ্ছায় আজ অনেকদিন পরে গোটা সংসার খেতে বসেছে একসঙ্গে। প্রফুল্ল লক্ষ করল,

লণ্ঠনের আলোয় আবছায়া মুখগুলিতে ফুটে উঠেছে ষড়যন্ত্রকারীর আভা। নাকি সমস্তই রূপের আদল, যার নাগাল কোনোদিনই খুঁজে পায়নি সে! প্রফুল্ল জানে না, বুঝতে পারে না, সবই কেমন অন্যরকম লাগে। মুরগির হাড় চিবোতে গিয়ে বিষম খায় ছোট ছেলে সুব্রত, বলার কথাটা ছাড়তে চায় না তবু। কাশির দমক কেটে যাবার পর বলল, 'আমাদের ক্লাসের পবিত্র সব জায়গাগুলোতেই গেছে। এবার পুজোর ছুটিতে নাকি আন্দামান যাবে—'

এই সময় আলো জ্ব'লে উঠল এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই চুপ ক'রে গেল।

প্রফুল্ল এতোক্ষণ বিশেষ কথা বলেনি। এক ধরনের বিষণ্ণতা ক্রমশ ছেয়ে ফেলছিল তাকে। উঠতে উঠতে বলল, 'দেখা যাক—'

শরীরের ভিতর থেকে কিছু একটা খুবলে বের ক'রে নেওয়ার অনুভূতিটা মিথ্যে নয়—শোবার ঘরে এসে আলো নিবিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ার পর আবার সেটা অনুভব করল প্রফুল্ল। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ঠিক আগের মতো গভীর নয়। ক্রমশ থেমে-আসা চারদিকের শব্দের ভিতর নিজেকে খুঁজতে গিয়ে অসম্ভব দুর্বল লাগল তার। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে জ্ঞান ফেরার পর যেরকম লেগেছিল। স্তব্ধতাকে এই সময় মৃত্যুর কাছাকাছি এনে ফেলা যায়। বেঁচে আছে এটা জানার জন্যে বিছানার চাদরটা দুই মুঠোয় চেপে ধরল সে।

দরজা বন্ধ ক'রে লীলা উঠে এলো বিছানায়। হাত দিয়ে প্রফুল্লকে ছুঁয়ে বলল, 'কী হলো তোমার! হঠাৎ কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলে!'

প্রফুল্ল বলল 'ভাবছি।'

'আবার কী ভাবনা তোমার।'

পাশ ফিরে স্ত্রীর মুখোমুখি হলো প্রফুল্ল। লীলার শরীর থেকে যতোটা পারে গন্ধ টেনে নিল নাকে।

'এতোকাল শুধু চাকরি ক'রে গেলাম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বস্তায় বন্দী ক'রে ফেলে রেখেছিলাম একপাশে। বস্তা ফুটো ক'রে আজ সেগুলো বেরিয়ে পড়ল—'

'কী বলছ এসব!'

'ভুল বলিনি। ছেলেমেয়েগুলোও সবাই আমার মতো হয়েছে। নখ নেই ব'লে হাত পা গুটিয়ে রাখে। শুনলে না কতো কেউ কতো জায়গায় গেছে! আমার ছেলেমেয়েরা শুধু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছেড়ে যাওয়া দেখে—'

'তুমি যে কী পাগল।' উৎকণ্ঠার গলায় লীলা বলল, 'তুমি যেভাবে ছেলেমেয়েদের দেখেছ, ক'জন বাবা তা পারে।'

'দেখা মানে কি শুধু পেটের ভাত পাছার কাপড় জোটানো! ছেলেমেয়েদের মনে বাপ সম্পর্কে একটা ধারণা গ'ড়ে ওঠে। সেই ধারণা আমি ওদের দিতে পারিনি। আমারই দোষ!'

লীলা ঠিক বুঝতে পারে না প্রফুল্ল কী বলছে; আবেগের উৎসস্থলে একটা হাহাকার এসে তোলপাড় করে শুধু। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা না বুঝতে পারা থেকে প্রফুল্লর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'এতোদিন যখন এসব ভাবোনি, এখনো ভেবো না—'

প্রফুল্ল জবাব দিল না। টানাপোড়েনের জীবন থেকে পালাবার জায়গা বলতে লীলা—বছরের পর বছর লীলাই তার বেড়ানোর মহাদেশ। সপু, ডলি, মলি, সুবু—প্রতিটি জায়গার বৃত্তান্ত সেখানে, চাইলেই বেরিয়ে পড়া যায়। এখনো তাই; নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টায় চ'লে এলো লীলার উত্তাপের আরো কাছাকাছি।

অন্ধকারে প্রফুল্লর মুখটা খোঁজার চেষ্টা ক'রে সন্দেহের গলায় লীলা বলল, 'হ্যাঁ গো, সত্যি বলো তো, শরীরে জোর পাচ্ছ তো?'

'দেখি—'

পাহাড়ের রাস্তা। গোটা সংসার মাথায় নিয়ে টালমাটাল পায়ে এগোচ্ছে প্রফুল্ল। টাল খেলেই খাদ। নিজের সাধ্যে যতোটা পারে ঠেকা দেবার জন্যে এগিয়ে এলো লীলা। গলার যেদিকটা ঘাম বেশি

সেদিকটা পাখার দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলল, 'তুমি হাসপাতালে যাবার পব ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। আবার আনাতে হবে।'

৪

'অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন।' দিন পাঁচেক পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে ঘোরাঘুরি করার পর ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সহদেব গুহ বলল, 'মাইনে পেলেই বুঝতে পারবেন কী পেলেন না পেলেন। আমরা কি আপনার প্রাপ্য টাকা কমিয়ে দেবো!'

অনেকের মধ্যে বলা ব'লেই কথাগুলো ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আশপাশের মুখগুলিতে চাপা হাসি লক্ষ ক'রে অস্বস্তি বোধ করল প্রফুল্ল এবং আবাবও ভাবল উঠে যায়। এই ক'দিনে অফিসের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তার প্রোমোশনটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি—ব্যাপারটা এমনই, যেন হয়েছে বেশ হযেছে, না হ'লেও মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। ডিপার্টমেন্টের রমণী শীলেব একই বযস, প্রায় একই সঙ্গে ঢুকেছিল চাকরিতে। খবরটা কানে যেতে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'এতোদিন কাজকম্ম শিখেছি চাকরিতে উন্নতি করার জন্যে, হার্ট অ্যাটাক কী ক'রে হয় শিখিনি। প্রফুল্লব কাছে শিখে নিতে হবে।'

শুনে অস্বস্তিতে ঘামতে শুরু করেছিল প্রফুল্ল। জবাব ছিল না ব'লেই জবাব দিতে পারেনি। এখনো তাই হলো। প্রফুল্ল ভাবল, সহদেবের কথায় উঠে গেলেই ব্যাপাবটা পিছিয়ে যাবে। তাছাড়া মাইনে হতেও এখনো দেবি আছে বেশ কয়েক দিন ; ইতিমধ্যে, সেদিন খবরটা পাবার পর থেকে, গোটা বাড়ি হাঁফসাচ্ছে লীভ ট্রাভেলের টাকায় বেড়াতে যাবার জন্যে। এর মধ্যে ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে গোয়া, কাশ্মীব আর দার্জিলিংয়েব ট্রাভেল গাইড জোগাড় ক'রে এনেছে সুপ্রভাত—দিনে পঞ্চাশবাব অ্যাটলাসের ওপব ঝুঁকে পড়ে কোন জায়গাটা কোথায় খুঁজে বেড়ায় মলি আর সুব্রত। লীলা কিছু না বললেও ওর চোখমুখ চালচলন দেখে মনে হয় ধোঁয়া কেটে গেছে, এখন চারদিকে সুবাতাস। সেদিন রাতেব পব থেকে বিছানায় আসে গলায় বুকে পাউডার ছড়িয়ে। সেই মুহূর্তে সহদেব গুহর সামনে ব'সে থাকতে থাকতে সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগল প্রফুল্লর। দম টেনে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় অনুভব করল কন্ট্রোল নেই, নাকেব ফুটো আর মুখের হাঁ দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে গলগল ক'বে। সেই অবস্থাতেই সিদ্ধান্ত নিল। অনুনয়ের গলায় সহদেবকে বলল, 'মাইনের ব্যাপারটা না হয় পরে জানা যাবে। লীভ ট্রাভেলের নিয়মটা কি? শুনেছি ফর্ম ফিলাপ ক'রে জমা দিতে হয়?'

'লীভ ট্রাভেল!' সোজাসুজি প্রফুল্লর মুখেব দিকে তাকাল সহদেব। খানিকটা সময় নিয়ে বলল, 'ও, আপনি তো এখন অফিসার, লীভ ট্রাভেলে এনটাইটেল্‌ড্ হয়েছেন—।' বলতে বলতে থামল। তারপর বলল, 'এক কাজ করুন, বিকেলে আসুন। লাস্ট ইয়ার পে-স্কেল রিভিসনের পর কী সব ওলট-পালট হয়েছে। দেখে বলতে হবে।'

'ঠিক আছে। বিকেলেই আসব।'

প্রফুল্ল উঠে পড়ল।

পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে এগোবার সময় দেখল পার্সোনেল ম্যানেজার রঘুবীর দত্ত আসছে। প্রোমোশনের চিঠি পাবার পর এই দেখা। আগে আগে এই রকম মুহূর্তে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যেত। এখন ভাবল, অফিসাররা কেরানী নয়, সুতরাং সে দাঁড়িয়ে পড়তে, এমনকি প্রয়োজনে কথাও বলতে পারে—রঘুবীর খুশি হবে। এই ভেবে সে কোমর থেকে ঝুলে-পড়া ট্রাউজার্সটা টেনে যথাস্থানে আনবার চেষ্টা করল এবং সেই অবস্থাতেই লক্ষ করল, কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে রঘুবীর। না-চেনার ধরনটা ইচ্ছাকৃত। আগে থেকেই অভ্যস্ত হওয়ায় বুকের সামান্য দোলা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না প্রফুল্লর। অফিসাররা ম্যানেজার নয়, তফাত থাকবেই।

এতোক্ষণ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তাতে ক্লান্তিবোধ করার কারণ নেই কোনো। তবু, কাজে ফিরে প্রফুল্ল অনুভব করল কেমন একটা গোলমেলে অভিজ্ঞতা দ্রুত জায়গা বদল করছে শরীরের মধ্যে—দপদপ করছে মাথার বাঁদিক ঘেঁষে নির্দিষ্ট একটি জায়গা, ভারী লাগছে চোখের পাতা, অতিরিক্ত হাওয়ার জন্যে

ছটফট করছে বুক। হাত যতোটা জায়গা পরিক্রম করে তারই কোনোখানে আড়াল হয়ে আছে আক্রমণের পটভূমি—এই চেয়ারে, প্রায় এই অবস্থার মধ্যেই পর পর তিনটি তীক্ষ্ণ চোরা ঢেকুরের ধরনে ধাক্কা দিয়ে অতর্কিতে কাত ক'রে ফেলেছিল তাকে। তার বেশি কিছু নয়। তখন মরে গেলে মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে টের পেত না। এখন এটাই আদরের জায়গা—একই সঙ্গে তাকে এনে দিয়েছে সাত হাজার টাকা, প্রোমোশন, লীভ ট্রাভেল। তবু, সারাক্ষণই কেন মনে হয় সে আর ঠিক আগের মতো নেই, তার অজ্ঞাতে কিছু একটা খুবলে বের ক'রে নেওয়া হয়েছে শরীরের ভিতর থেকে! ক্রেডিটরস্ লেজারের এন্ট্রিগুলো আপ-টু-ডেট করতে করতে একই প্রশ্ন ফিরে এলো আবার। মন বসল না। জলের গেলাসটা টেনে চুমুক দিতেই প্রতিটি ঢোক রসগোল্লার আকারে থেমে থেমে নামতে লাগল পেটে। এরকম হবে কেন' হাসপাতাল থেকে রিলিজ হবার আগে ডাক্তার বলেছিল, সবই করবেন, কিন্তু সবকিছু থেকেই টেনসন বাদ দেবেন। দুশ্চিন্তা এলেও সেটাকে চেঞ্জ ক'রে নেবেন আনন্দে। লোভ বা তাড়াহুড়ো করবেন না কোনো ব্যাপারে। আর সবই নর্মাল—কোনটা আর কতোটা নর্মাল তা কিন্তু আপনাকেই ঠিক ক'রে নিতে হবে। এখন পর্যন্ত ডাক্তারের নির্দেশ মেনেই চলেছে সে। একটু জোর করলেই যেটা এখনই পাওয়া যায়, উত্তেজিত না হয়ে অপেক্ষা করেছে সেটার জন্যে। যে-খবরটা আজ বিকেলে দেবে বলে কথা দিল সহদেব, চাপ দিলে তিন দিন আগেই সেটা বের ক'রে নিতে পারত সে, তা না ক'রে আবার গেছে এবং তার পরেও আবার গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে আরোগ্য হয়ে ফিরে আসার কয়েক দিন পরে প্রথম যেদিন লীলা এক বিছানায় শুতে এলো, সেদিনও, সান্নিধ্য থেকে আরো অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে—হঠাৎই মনে হয়েছিল এটা স্বাভাবিক নয়। প্রোমোশনের পরে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধেগুলো সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে এই যে তার ক্রমাগত যাওয়া এবং ফিরে আসা, এটাও কি স্বাভাবিক নয়? ইত্যাদি ভাবনায় উদাসীন হয়ে গেল প্রফুল্ল। টিফিনের সময় কৌটো থেকে মাখন-ছাঁকা ছানা বের ক'রে ধীরে-সুস্থে খেতে খেতে ভাবল, না, সে স্বাভাবিকই আছে। যতোই অদম্য হোক কৌতূহল, দুপুর যতোক্ষণ না বিকেলের দিকে এগোচ্ছে, ততোক্ষণ সহদেবের কাছে খবরের জন্যে যাবে না।

বিকেলের আগেই লোডশেডিং হলো। একে একে ক্রমশ অনেকেই ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে উঠে যাবার পর শশধর চক্রবর্তীর মুভমেন্টের ওপর নজর রাখল প্রফুল্ল এবং শশধরের উঠে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আস্তে আস্তে এগুলো পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের দিকে।

সহদেব গুহও সম্ভবত ওঠার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এই সময় প্রফুল্লকে সামনে দেখে বলল, 'আজকেই জানবেন, না কালকে জানলেও চলবে?'

'তুমিই বলেছিলে বিকেলে আসতে—'

'ঠিক আছে। বসুন।'

সহদেব গম্ভীর হলো। কিঞ্চিৎ বিরক্তও। বন্ধ দেরাজের তালা খুলে একটা ফাইল বের ক'রে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে থেমে গেল। খানিক কাগজটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, 'অ্যাডজাস্টমেন্টের পর গ্রেড ইনক্রিমেন্ট নিয়ে প্রায় শ'দেড়েক টাকা মাইনে বেড়ে যাবে আপনার—'

'যাক বাবা, বাঁচালে!' সহদেব মুখ তুলতেই পরিতৃপ্তি দেখাল প্রফুল্ল। একই উৎসাহে বলল, 'আর ঐ লীভ ট্রাভেলের ব্যাপারটা?'

জবাব না দিয়ে আবার ফাইলে চোখ রাখল সহদেব। পরে বলল, 'ওটাও পাবেন। দু' বছরে একবার। লীভ ট্রাভেল না নিলে পার হেড ম্যাক্সিমাম পাঁচশো টাকা এনক্যাশও করতে পারেন। আপনি, আপনার স্ত্রী আর ষোল বছর বা তার কম বয়স পর্যন্ত তিন ছেলেমেয়ে—'

এই কথার পর প্রফুল্লর মুখের রেখা পাল্টাতে লাগল। অদ্ভুত চোখে তাকাল সহদেবের দিকে। তাকিয়েই থাকল। তারপর বলল, 'তবে যে শুনেছিলাম গোটা ফ্যামিলির জন্যে!'

'আগে ছিল। এখন নিয়মকানুন পাল্টে গেছে।'

'আমার বেলাতেই সব নিয়ম পাল্টে যাচ্ছে নাকি!'

'আপনাকে আলাদা ক'রে কোম্পানির লাভ কি?' সহদেব বলল, 'এই বাবদ যা পাবেন আগে তো

তাও পেতেন না ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে মাথা ঝোঁকালো প্রফুল্ল। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আমাব বড়ো ছেলে—তার কী হবে ? এদিকে তো বোনাসও পাবো না !'

'সব সুবিধে কি একসঙ্গে হয় !' সহদেব নড়ে বসল। হাতেব ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'এখনো সব পেপারস্ তৈরি হয়নি। আজকালের মধ্যে ফর্ম পাঠিয়ে দেবো আপনাব কাছে। ফ্যামিলি সাইজের ডিটেল্স্ রেকর্ড কবাতে হবে। আর কিছু ?'

প্রফুল্ল মাথা নাড়ল। দেখল, দেরাজ বন্ধ ক'বে বাস্তভাবে চ'লে যাচ্ছে সহদেব। তখন ফাঁকা ঘরে ব'সে থাকতে থাকতেই সে অনুভব করল, বুকেব ভিতর থেকে খুবলে বেব ক'রে নেওয়া জায়গাটা ক্রমশ ভ'রে উঠছে জলে, ভারী লাগছে শরীর। তা সত্ত্বেও সে একটা হিসেবেব দিকে এগোবাব চেষ্টা কবল এবং কোনো হিসেবই মেলাতে না পাবায় ফিরে এলো নিজের জায়গায়। এইখান থেকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হযেছিল হাসপাতালে। বাড়ি না ফিরলে হাসপাতাল থেকে শ্মশানেই যেতে হতো—চিতা নিবে গেলে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরত সুপ্রভাত। এ ক্ষেত্রে সে নিজে বাড়ি ফিবলেও ফলটা থেকে যাচ্ছে একই। লীভ ট্রাভেলের সুবিধাটা ষোলয় আটকে থাকলে ডলিও বাদ যেত, আপাতত বিযেটাই বাঁচিযে দিযেছে তাকে। মলি এখনই ষোল, স্কুলের খাতায় যদিও পনেরো। তার মানে, এই বছবটা পাব হ'লে মলিও চ'লে যাবে ঝঁড়ার ওদিকে। এ তো শালা হারাধনের অঙ্ক ! বাকি থাকে সুব্রত, তৃতীযবাবের সুযোগ আসাব আগে সেও চ'লে যাবে ধরতার বাইরে। তখনো তার চাকরি বাকি থাকবে তিন বছব। এদিকে বোনাসটাও গেল ! ভূ-ভারতে এমন কোনো দূরত্ব নেই যেখানে যেতে এবং আসতে কাটছাঁট করা প্রফুল্লর পবিবাবের পিছনে আড়াই হাজার টাকা ঢালতে হবে কোম্পানিকে। তাহ'লে তাব লাভ হলো কি ?

এইসব চিন্তা নিয়ে যখন বাড়ি ফেরে তার চেয়ে অনেক দেরি ক'বে বাড়ি ফিবল প্রফুল্ল। লীলাকে একান্তে পেয়ে বলল, 'প্রোমোশন রিফিউজ করলে নাকি চাকরি যায় ; না হ'লে তাই কবতাম—'

'কী হলো আবার ! ঝগড়াঝাটি করোনি তো !'

'কী আর হবে ! কোনোকালে যাব কিছু হয়নি, এখনো হবে না। এব চেয়ে মবে গেলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় তোমরা কিছুদিন সুখ ক'বে নিতে পাবতে—'

বলতে বলতে শোবার ঘরের অন্ধকারে পা দিল প্রফুল্ল। বিছানায শুয়ে এক পাযের গোটানো হাঁটুব ওপর আর এক পা তুলে, হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকে পড়ল গোলমেলে হিসেবের খাঁচায়।

৫

সেদিন গভীর রাতে তার প্রতি সমস্ত বঞ্চনার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে পঞ্চম সন্তানেব জন্মদানে প্রবৃত্ত হলো প্রফুল্ল বিশ্বাস। লীলাকে বলল, 'তিপান্ন বছরে পৌঁছে কোনো লোক ট্রাভেলের সমস্ত সুযোগ নিতে পারে না এটা ওদের জানা ছিল। চার বছর না যেতে সব ফেসিলিটিজ লাটে উঠবে। আমি গাডল নই। ওরা ওদের নিয়ম মেনে চলুক, আমিও জের টানব—'

স্বামীর ইচ্ছায় কোনোদিন আপত্তি করেনি লীলা। তবু আজকের গোঁ-টা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। কিছু বা বিমূঢ়, কিছু বা লজ্জিত গলায় বলল, 'এতোদিন পরে আবার ! ছেলেমেযেরা বড়ো হয়ে গেছে, লোকেই বা বলবে কি !'

'লোকের পারমিশান নিয়ে আগেরগুলো জন্মায়নি।'

বরাবরই একরোখা, একবার অধৈর্য হ'লে ফেরানো মুস্কিল। চেনা লোককেও এই সময় অচেনা লাগে লীলার—প্রফুল্ল আর তার দেখায় তফাত আছে। বেড়ানো অনেক হলো, ওকে বোঝানো যাবে না এটা ওদের থিতু হয়ে বসবার সময়। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় শেষ হয়ে আসে মহাদেশের মাটি, তার পরেই সমুদ্র। প্রফুল্ল কি এসব বুঝবে ! কোনোরকমে অনিচ্ছাটুকু আড়াল ক'রে লীলা বলল, 'আমাব বযসও কি কম হলো গো !'

'আমার জন্মের সময় আমার মায়ের বয়স ছিল উনপঞ্চাশ।' প্রফুল্ল বলল, 'তারও তিন বছব পরে

'মা গো !' ক্ষুণ্ণ গলায় বলল লীলা, 'তোমার জেদ মেটাতে আমি এখন আঁতুড়ে ঢুকি ! ওই লীভ ট্রাভেলের টাকায় তুমিই বেড়িও।'

একটুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে থাকল প্রফুল্ল, হিসেবে কোনো গোলমাল হচ্ছে কি না ভেবে নিল। তারপর স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার গলায় বলল, 'যাবে তো ফার্স্ট ক্লাসে ! এখন মেডিক্যাল বেনিফিটও দেদার, কোম্পানির টাকায় দিব্যি নার্সিং হোমে ঘুরে আসতে পারবে। অতো ভাবনার আছেটা কি !'

সাধুচরণ

কিছুদিন থেকেই মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না সাধুচরণের। কাজকর্মে মন নেই; সারাক্ষণ অন্যমনস্ক এবং কেমন যেন উদাসীন— যেটা করার সেটা না করে যেটা না করলেও চলে সেটা নিয়ে নষ্ট করে সময়। শুধু তা-ই নয়। ফাঁক পেলেই বারান্দার কোণে—যেখানে রোদ পায় কিংবা হাওয়া, গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। ভঙ্গিটা এমন যেন ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা তার মাথায়। ডাকলে সাড়া দেয় না। কখনো বা বিরক্ত হয়ে বলে, 'আসছি, আসছি, এতো ব্যস্ত হবার কী আছে! একটু জিরিয়ে নিই—'

কাজের লোক এমন এলোমেলো আর উদাসীন হলে চলে না। অনিতা অনুযোগ করে, 'এভাবে চললে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে সংসার। তুমি কিছু বলো না কেন!'

মৃগাঙ্ক গম্ভীর লোক। স্ত্রীকে স্ত্রী ছাড়াও মেয়েমানুষ ভাবে। কলেজে পড়িয়ে, নোট লিখে আর পরীক্ষার খাতা দেখে যা সময় পায় তাতে অন্যদিকে মন দেবার সুযোগ কম। মাঝে মাঝে মনে হয় সংসারটা বোঝা—একবার কাঁধে নিলে ঘাড় থেকে ভূত নামানোর জো থাকে না আর। যেমন হচ্ছে এখন। আজ গ্যাস নেই, কাল ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে হবে, পরশু ছোট শালীর বিয়ের পাকা দেখা, তার পরের দিন ক্রিমি হয়েছে মেয়ের পেটে—দাঁত কিড়মিড় করে ঘুমের ঘোরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালো লাগে না। কখনো মনে হয় পার্টি আর রাজনীতি-করা জীবনটাই ছিল ভালো। আর কিছু না হোক, আদর্শ ছিল একটা—নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডির সুখ, দুঃখ, প্রয়োজনের কথা না ভেবে ভাবা যেত বৃহত্তর এক মানবস্বার্থের কথা। মিছিলে দুরন্ত ছিল পা দুটো। স্ট্রিট কর্ণার মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে নিজের গলা শুনে নিজেকে মনে হতো সাধারণের ওপরে। সংসারে জড়ানোর পর আস্তে আস্তে সরে এসেছে এসব থেকে। বাধ্যই হয়েছে বলা যায়। এখন সারাক্ষণই ভ্যাদভেদে লাগে নিজেকে।

এর মধ্যে সাধুচরণকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার।

অনিতার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মৃগাঙ্ক বলে, 'পুরনো লোক; বয়সও হয়েছে। একটু আলসে হবেই। চ্যাচামেচি না করে একটু বুঝিয়ে বললেই তো পারো!'

'সব ব্যাপারে ফিলজোফাইজ করা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।' অনিতা বলে, 'যে-বাড়িতে পুরুষমানুষ এতো আলগা, সে-বাড়িতে ডিসিপ্লিন থাকবে না এ তো জানা কথা।'

'পছন্দ না হলে ছাড়িয়ে দিলেই পারো।'

'হ্যাঁ! তারপর তোমাদের সকলের ঝক্কি এসে পড়ুক আমার ঘাড়ে!'

গজগজ করতে করতে চলে যায় অনিতা। গায়ের ঝাল মেটায় সাধুচরণের ওপর দিয়ে।

রোজ এই অশান্তি ভালো লাগে না মৃগাঙ্কর। বিরক্ত হয়। তখন আর একটা কথাও মনে হয় তার—দোষ সাধুচরণের একার নয়। সারাক্ষণ একটা লোককে নিয়ে খিটখিট করলে শাসন থেকে তাপ যায় উবে। কথা শেষ হয় অভ্যাসে। অনিতারও বোঝা উচিত।

সেদিন সকালে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল।

ঘরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিল মৃগাঙ্ক। হঠাৎ চ্যাচামেচি শুনে বেরিয়ে এসে দেখল, রান্নাঘর আর কয়লা ভাঙার জায়গাটার মাঝখানে ছোট বারান্দায় দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে উবু হয়ে বসে আছে সাধুচরণ। গালভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল। রোদের দিকে ফেরানো ভাঙাচোরা মুখের মধ্যে চোখ দু'টিতে দৃষ্টি নেই কোনো। রান্নাঘরের সামনে দু'হাতের মুঠো শক্ত করে দাঁড়িয়ে কী বলছিল অনিতা। মৃগাঙ্ককে দেখেই চুপ করে গেল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনকে লক্ষ করল মৃগাঙ্ক। তারপর বলল, 'কী হয়েছে?'

কাণ্ড দ্যাখো !' মৃগাঙ্ককে সামনে পেয়ে অনিতার জোর বেড়ে গেল আরও। বলল, 'আটটা বেজে গেল, এখনো হাঁড়ি চড়ায়নি উনোনে ! এখন কে তোমার কলেজের ভাত দেবে, কেই বা কনির স্কুলের ভাত দেবে ! আবার চোপা করছে মুখের ওপর শরীর খারাপ, বাবুর নাকি দুর্বল লাগছে—কাজ পাববে না !'

সাধুচরণ হঠাৎ বলল, 'তোমাদের শরীর খারাপ হতে পারে, আমার পারে না !'

'দেখেছ ! লাই পেয়ে কোথায় উঠেছে !'

মৃগাঙ্ক রাগতে শুরু করেছিল আগেই। এবার বলল, 'বুঝেসুঝে কথা বলো, সাধুচরণ। কাজ করার ইচ্ছে না থাকলে ছেড়ে দাও—'

'ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। ফুটপাথে গিয়ে মরব। পনেরো বছর ধরে রক্ত চুষে হাড় কালি করেছ ! আমারও আর ইচ্ছা করে না।'

'কী বললে ! রক্ত চুষেছি !' রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না মৃগাঙ্কর। সাধুচরণের কথা শুনে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। নিশ্চয়ই অন্ধ বোধ করছিল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে একটা লাথি ঝাড়ল সাধুচরণের পিঠে। তারপর সপ্তমে গলা তুলে বলল, 'শালা নিমকহারাম ! নিকালো—আভি নিকালো—'

লাথির চোটেই উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল লোকটা। আর উঠছে না দেখে পাশে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরল অনিতা। চোদ্দ বছরের রুনিও বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। বাবা, মা ও সাধুচরণকে জুড়ে গোটা দৃশ্যটায় চোখ রেখে আতঙ্কের গলায় বলল, 'মরে গেল নাকি !'

মৃগাঙ্ক তখনো কাঁপছিল। অনিতার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'মরতে হলে বাইরে গিয়ে মরবে। এটা ভাগাড় নয়।'

এই কথার পর দু'হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল সাধুচরণ। বাঁ হাত বাড়িয়ে কষ মুছল ঠোঁটের। উঠে দাঁড়াল। ডান দিকের কপালে ছেঁচে গেছে এক ইঞ্চি মতো জায়গা। সেখানে রক্তের আভাস। নাকে আঘাত লাগার জন্যেই সম্ভবত জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে। থুথু ফেলল মাটিতে। তারপর মৃগাঙ্ক ও অনিতার দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে বলল, 'না, বাবু। এখানে মরব না।'

ওরা দেখল, হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁটের কষ মুছতে মুছতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে যাচ্ছে সাধুচরণ। ছিটকিনি খুলল দরজাব। আর কোনো কথা না বলে—এমনকি পিছনেও না তাকিয়ে, চলে গেল।

সাধুচরণ মরে বেরোলে এর চেয়ে বেশি স্তব্ধতা নামত না। এবং তা নামল অন্য কোনো ভূমিকা না করে।

অনিতা তাকিয়ে ছিল খোলা দরজার দিকে। পাশ দিয়ে হেঁটে মৃগাঙ্ক ঘরে ঢুকছে দেখে বলল, 'দরজাটা লাগাবে না ?'

মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার অনিতার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। উঁকি দিয়ে দেখে নিল বাইরেটা। তারপর দরজায় ছিটকিনি, এমনকি খিল তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল স্ত্রীর দিকে।

'হয়েছে শান্তি !'

'আমাকে বলছ কেন ! আমি কি ওকে চলে যেতে বলেছিলাম !'

'না, আমিই বলেছিলাম !'

মৃগাঙ্কর রাগ পড়েনি। এমনও হতে পারে সাধুচরণ চলে যাওয়ায় ক্ষেপে গেছে আরও। এখন চোটপাট করবে তারই ওপর। কথায় কথা বাড়ে। যা ঘটবার ঘটে গেছে ; এরপর ঘটনাটা নিয়ে বেশি রগড়ারগড়ি করলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার দায়ে আগুন লেগে যেতে পারে গোটা সংসারে। যেভাবে লাথিটা মারল এবং উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, তাতে আরও বড়ো কোনো কেলেঙ্কারি যে ঘটেনি তাই রক্ষে। লোকটা মরে গেলে এক্ষুণি খুনের দায়ে পড়ত মৃগাঙ্ক। এইসব ভাবনায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো অনিতার ; গা গুলোতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা চিন্তাও খুঁড়তে লাগল তাকে। কোনো প্রতিবাদ না করে চুপচাপ যেভাবে চলে গেল সাধুচরণ তাতে আবার লোকজন জড়ো করে ফিরে

আসবে না তো !

বান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপিয়ে দিল অনিতা।

গ্যাসের উনোনে ভাত চড়াবার জন্যে ডেকচিতে জল ফুটতে দিয়েছিল সাধুচরণ, চাল ধুয়ে সরিয়ে রেখেছিল বাটিতে। কিছুই যে করে রাখেনি তা নয়। ভাত হয়ে গেলে দরকার হতো ডাল আর মাছ ভাজার। গত রাতে ডাল বাড়তি হয়েছিল বলে তুলে রাখা হয়েছিল ফ্রীজে—সেটাই গরম করে নেওয়ার কথা। তারপর থাকে মাছ ভাজা। তেল-নুন-হলুদ মাখিয়ে কড়ায় ছাড়তে কতোক্ষণই আর লাগত ! আসলে, অনিতা ভাবল, রাগটা সে দেখিয়েছিল লোকটাকে ওইভাবে উদাসীন, রোদের মধ্যে বসে থাকতে দেখে। কিছুটা অভ্যাসেও হয়তো। এরকম ঘটনা আকছার ঘটেছে। তার মানে এই নয় যে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে আসবে এবং লাথি মারবে ! হয়তো সত্যি সত্যিই অসুস্থ ছিল লোকটা। মাস দেড় দুইয়ের মধ্যে হঠাৎই একসঙ্গে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল অনেকটা, চোখমুখ বসে গিয়েছিল, কথাবার্তা বলতই না প্রায়, সুযোগ পেলেই রোদ খুঁজত। চোপা আজই করেছিল। তারপর যা ঘটল ভাবলে কাঁটা দেয় গায়ে।

চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে অনিতা দেখল কুঁজো হয়ে বসে খাতা দেখছে মৃগাঙ্ক। অনিতার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল আবার।

অনিতা একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'কখন বেরোবে ?'

'কেন !'

'আধঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। তোমার ভাত পাবার অসুবিধে হবে না।'

মৃগাঙ্ক ঘুরে বসল।

'কাজ দেখাচ্ছ ?'

অনিতা নরম হয়ে এসেছিল। মৃগাঙ্কর কথার শ্লেষটুকু ধরতে পেরে তেতে উঠল।

'অতো খোঁচা দিয়ে কথা বলার দরকার নেই কোনো !'

'খোঁচা খাবার হলে ঠিকই খাবে।' মৃগাঙ্ক বলল, 'সাতসকালে অশান্তি ; পান থেকে চুন খসলেই চ্যাচামেচি ! তুমি যা ব্যবহার করো তাতে কোনো লোকই টিকবে না।'

অনিতা গুটিয়ে নিল নিজেকে। মৃগাঙ্কর গলায় ঝাঁঝ আছে, জোর নেই কোনো। যুক্তি দিয়ে নিজেকে দাঁড় করাতে পারছে না বলেই এইসব পাশ কাটানো অজুহাত। খানিক চুপ করে থেকে ওখান থেকে সরে যাবার আগে বলল, 'লাথিটা না মারলেই পারতে।'

মৃগাঙ্ক জবাব দিল না। বাবা মা'র কথার মাঝখানে ও ঘর থেকে এ ঘরে চলে এসেছিল রুনি, সম্ভবত আর একটি দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে। চোখমুখ থমকানো, দু'জনেই চুপ করে গেছে দেখে বলল, 'আমি গিয়ে দেখব সাধুদা কোথায় গেল ?'

মৃগাঙ্ক জানলার দিকে তাকাল। আব্রু রাখার জন্যে তলার ফ্রেম থেকে তিন ফুট পর্দা লাগিয়েছে অনিতা। রাস্তা দেখা যায় না। সাধুচরণ যাবার পর কেটে গেছে পনেরো মিনিটেরও বেশি। অনেকটা সময়। এর মধ্যে দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে, ক্রোধ বাড়া কিংবা কমা। অন্যমনস্কভাবে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে শেষের সম্ভাবনাটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল মৃগাঙ্ক। তেমন কোনো মতলব থাকলে এরই মধ্যে ফিরে আসত লোকটা। একটু খাপছাড়া স্বভাবের মানুষ ছিল সাধুচরণ, কিছু বা আত্মভোলা। অনিতা বা রুনি ওকে দেখবার অনেক আগে থেকেই দেখছে মৃগাঙ্ক। পার্টি অফিসের লাগোয়া ছোট রেস্তোরাঁয় ফাইফরমাশ খাটত। রুনির জন্মের আগে মৃগাঙ্কই ডেকে এনেছিল বাড়িতে। চব্বিশ ঘণ্টার লোক। এই বাড়িতেই জোয়ান থেকে এগোচ্ছিল ক্রমশ বুড়ো হওয়ার দিকে, যদিও বয়স কতো কোনোদিনই ঠিক ঠিক ধরতে পারেনি মৃগাঙ্ক। আজ সকালে ওর রোদ-পড়া শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বারেকের জন্য মনে হয়েছিল বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা। তখনো লাথি মারার প্রয়োজন হয়নি।

টেবিলের তলায় হাত বাড়িয়ে যে-পায়ে লাথি মেরেছিল সেই পায়ের হাঁটুতে হাত বুলিয়ে অস্বস্তি কাটাতে চাইল মৃগাঙ্ক। পিছনে না তাকিয়েও বোঝা যায় অনিতা তখনো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। তখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখার দরকার নেই। তিন কুলে একা, যাবে কোথায় !'

'সাধুদাব অসুখ ছিল ।' রুনি সেই জায়গাটায় দাঁড়াল, যেখান থেকে মৃগাঙ্ক ও অনিতাব দূরত্ব সমান। বলল, 'পেটে জ্বালা করে, সারাক্ষণ মাথা ঘোরে—কাল বলেছিল আমাকে—'

কথাগুলো মৃগাঙ্ক বা অনিতা কার উদ্দেশে বলা, দু'জনের কেউই তা বুঝতে পারল না। সুতবাং পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল তাবা।

তখন তিনজনেরই স্তব্ধতা চিনে দেওয়ার সময়। জায়গা ছেড়ে যাবার আগে অনিতা বলল, 'রুনি, তুই আজ স্কুলে যাবি না। আমি একা থাকতে পাবব না।'

সাধুচবণ ফিরল না।

কোনোরকমে নাকে মুখে গুঁজে কলেজে বেরুবার আগে শেষ যেখানে বসেছিল সাধুচরণ সেখানটায় তাকিয়ে মৃগাঙ্ক লক্ষ কবল বোদ সরে গেছে . উঠোনেব শ্যাওলায় রঙ ধরেছে কালো। নির্দিষ্ট কিছু মনে পড়ল না। ঘড়িতে সময় দেখে অনিতাকে বলল, 'কোনো দরকাব থাকলে ফোন করো। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।'

মৃগাঙ্কর পিছনে পিছনে দবজা লাগাতে গিয়ে মাও মেয়ে দু'জনেই বাস্তাব দিকে তাকিযে থাকল কিছুক্ষণ। রাস্তা ও রাস্তার অনুষঙ্গ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না তাদেব। সম্ভবত মৃগাঙ্ক কখন ঘুবে গেল বড়ো রাস্তার দিকে, তাও নয়।

দবজা বন্ধ করতে কবতে অনিতা বলল, 'আজ মাসের আঠাবো তারিখ। আঠারো দিনের মাইনে নিতেও ফিবে আসবে নিশ্চয়ই—'

রুনি অনিতাকে দেখল। যা বলতে যাচ্ছিল তা বলাব আগেই ঠোঁট কেপে গেল অল্প। তাবপব বলল, 'বিছানাটা না হয আমবা দিয়েছিলাম। জামা কাপডগুলো তো ওরই। ওগুলো নিতেও—'

মেয়েকে থেমে যেতে দেখে অনিতা নিজেও থেমে গেল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর কী মনে হয ?'

রুনি জবাব দিল না। ঘরের দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'আমি বাথরুমে ঢুকছি। কেউ ডাকলে দরজা খুলো না। আমি খুলব।'

সাধুচবণ ফিবল না।

দুপুর নাগাদ বাসনের ফেরিওলার হাঁক রাস্তার শেষ প্রান্তে মিলিযে যাবার পর বেল পডল দরজায। অনিতা ও রুনি পাশাপাশি শুযেছিল বিছানায়। অল্প তন্দ্রার মতো এসেছিল অনিতার ; সুতবাং আওয়াজটা রুনিই শুনল আগে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। তার পরে অনিতাও। মেযের হাত চেপে ধরে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'শুনলে তো বেল বাজছে !'

রুনিকে ব্যস্ত হতে দেখে অনিতা বলল, 'যাবি ! আগে দেখে নিলে হতো না।'

'দেখার মতো দশটা জায়গা থাকলে দেখা যেত।' রুনি বলল, 'এতো যাদের ভয় তারা এমন কাণ্ড করে কেন !'

বসার ঘরে একটা জানলা আছে, সেটা সদরের দিকে নয়। থাকলে নিরাপত্তা বাডত। অভাবে ম্যাজিক আই যতোটুকু দেখায় তাব বেশি দেখা যায় না কিছু। বেশি রাতে কেউ এলে 'কে' 'কে' কবতে হয়। জবাব পেলে গলাব স্বর বুঝে যেটুকু চেনা যাবার যায়, না হলে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায থাকে না কোনো। এই মুহূর্তে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই মেয়েকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে চোখে বাত দেখল অনিতা, ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুক—ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সেই বিস্ফোরক মুহূর্তটির জন্যে।

যা ভেবেছিল তাই। দরজা খুলেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রুনি, 'মা, সাধুদা !'

সাধুচরণ একা নয়। সঙ্গে জনা চারেক বিভিন্ন বয়স ও চেহারার লোক। ওদেব কাউকেই গুণ্ডা বা মাস্তান বলে মনে হলো না। তখন নিঃশ্বাস ছেড়ে রুনির পাশে গিয়ে দাঁড়াল অনিতা এবং দেখল, পিছনের দু'টি লোকের কাঁধে দু'হাতের ভর দিয়ে যীশুখৃষ্টের ধরনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধুচরণ। চোখদুটো বন্ধই বলা যায়, কাঁধ-ছেঁড়া ও দোমডানো হালকা নীল জামায় ছিটানো রক্তেব দাগ, ধুতিটা

এলোমেলো হয়ে লুটোচ্ছে রাস্তায়।

যে-লোকটি সামনে দাঁড়িয়েছিল অনিতা ও রুনির দিকে তাকিয়ে সেই কথা বলল প্রথম। 'এ আপনাদের লোক ?'

বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়ল রুনি।

'বাজারের সামনে বসে রক্তবমি করছিল।' লোকটি বলল, 'ঠিকানা বলতে নিয়ে এলাম—'

ওরা চুপ করে থাকল।

'আপনাদের লোক এমন অসুস্থ জানতেন না !'

'কী করে জানব !' রক্তবমি শুনেই অনিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাধুচরণেব এই অবস্থায় তার পক্ষে যে-কোনো অজুহাত দেখানো সম্ভব, প্রতিবাদ হবে না। তবু কথাগুলো বলাব আগে মেয়ের মুখে সম্মতি খুঁজল। তারপর বলল, 'বাজারে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছিল। ফেরার নাম নেই দেখে আমরাও ভাবছিলাম। আগে তো কখনো এমন হয়নি !'

বলার পরই অনিতা বুঝতে পারল লোকগুলি তার কথায় বিশ্বাস করেছে। সাধুচবণের ভঙ্গিতেও কোনো পরিবর্তন নেই দেখে ও সাহস পেল আরও। বলল, 'ওকে ভিতরে নিয়ে আসুন—'

'যাও হে, ভিতরে নিয়ে যাও—'

অনিতা ও রুনি সরে দাঁড়াতে ধরাধরি করে সাধুচরণকে ঘরের ভিতবে এনে বসিয়ে দিল পিছনেব লোক দু'টি। তারপর আবার বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে। প্রথম লোকটি, যে তখনো দাঁড়িয়েছিল ফুটপাথে, অনিতার চোখের দিকে তাকাতেই বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল অনিতাব। দৃষ্টিটা চেনা। সন্দেহ। মুখ আড়াল করার জন্যে আলগোছে আঁচলটা টেনে গলা মুছবার চেষ্টা করল অনিতা। পা দু'টির দিকে মাথা ঠেলে দিয়ে সাধুচরণ তখন ধুঁকছে। লোকটি বলল, 'কেস্ খারাপ। তাড়াতাড়ি ডাক্তাব দেখান—'

লোকগুলি চলে যাচ্ছে দেখে প্রথম সুযোগেই দরজাটা বন্ধ করে দিল অনিতা। বন্ধ দরজার পিঠে ঠেস দিয়ে হাঁফ-ধরা গলায় বলল, 'রুনি, দ্যাখ কী হয়েছে !'

'শুনলে তো রক্তবমি করছিল !' ঈষৎ বিরক্ত গলায় কথাগুলো বলে হাঁটু গেড়ে সাধুচরণের পাশে বসে পড়ল রুনি। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'সাধুদা, কী হযেছে ?'

একবার এপাশে একবার ওপাশে মাথা নাড়িয়ে কী বলার চেষ্টা করল সাধুচরণ, বোঝা গেল না কিছুই। তখন অনিতাও ঝুঁকে এলো ওব সামনে।

'আশ্চর্য ! কী হয়েছে বলবে তো !'

তখনই একটা কাণ্ড করে ফেলল সাধুচরণ। গোটা শরীরটা অনিতার সামনে মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে কেঁদে উঠল ডুকরে, 'শরীরে বড়ো কষ্ট মা ! এখানেই মরতে দাও আমাকে—'

অনিতা নিজেকে সরিয়ে নিল।

'আচ্ছা নাটক শুরু করল দেখছি ! কী করা যায় বল তো।'

'আগে ওকে শোয়াই তো !' রুনি বলল, 'নাটক-নাটক করছ কেন। নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছে ! সত্যি কথা জানলে ওই লোকগুলো আজ আমাদের ছেড়ে দিত না।'

'সেটা তোর বাবাকে বলিস।'

গলায় ঝাঁঝ ফুটলেও সাধুচরণকে তুলে ধরবার জন্যে মেয়ের পাশাপাশি এসে দাঁড়াল অনিতা। রান্নাঘরের পাশে পার্টিশনের আড়াল দেওয়া সাধুচরণের শোবার জাযগায় তক্তপোষের ওপর ওকে শুইয়ে দিয়ে তেলচিটে বালিশটা ঠিকঠাক করে গুঁজে দিল মাথার নীচে।

এবার সত্যিই আঁচল তুলে ঘাড়, গলা মুছবার দরকার হলো অনিতার।

'রুনি, তোর বাবাকে একটা ফোন করবি নাকি ? যদি ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে হয় !'

'তুমি করো।'

'তাহলে তুই এখানে থাক। একটু দুধটুধ খায় কি না দ্যাখ, যদি চাঙ্গা হয় কিছুটা।'

অনিতা চলে এলো। ব্যস্তভাবে টেলিফোনের রিসিভার তুলে মৃগাঙ্কর কলেজের নাম্বার ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল, যদি কিছু হয়ে থাকে তার সঙ্গে আজকের সকালের ঘটনার সম্পর্ক নেই কোনো। যদি

এমন হয় যে সাধুচরণের এই অবস্থার জন্যে আজকের সকালের ঘটনাই দায়ী, তাহলেও তার নিজের দায়িত্ব থাকছে না কিছু। লোকটার সঙ্গে কাজ নিয়ে খিটিমিটি আজই প্রথম লাগেনি। লাগত, মিটেও যেত। আজকের ঘটনার সঙ্গে বাড়তি জড়িয়ে আছে মৃগাঙ্কর লাথি মারা। দায় মৃগাঙ্কর। রেগে গেলে হিতাহিত ভুলে যায় লোকটা। এইভাবে কোনোদিন তাকেও লাথি মারতে পারে।

মৃগাঙ্ককে পাবার পর অনিতা বলল, 'শোনো, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো।'

'কেন!'

'সাধুচরণ ফিরে এসেছে—'

'কখন!'

'এই তো খানিক আগে। তবে অবস্থা ভালো নয়।'

'তার মানে!'

'বাজারের সামনে বসে রক্তবমি করছিল। কয়েকজন লোক এসে পৌঁছে দিল বাড়িতে—'

'সে কী!'

অনিতা চুপ করে থাকল। মৃগাঙ্কও। তারপর মৃগাঙ্ক বলল, 'লোকগুলো কিছু বলল?'

'কী বলবে!'

'ওই লাথি মারার ঘটনাটা! বলেছে নাকি?'

'না। সেসব বলেনি।'

মৃগাঙ্ক চুপ করে গেল। একটু থেমে বলল, 'ঠিক আছে, আমি-আসছি—'

অনিতা বলল, 'একজন ডাক্তারও নিয়ে এসো—'

'দেখছি।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে খানিক দিশেহারা চোখে শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল অনিতা। তারপর ভাবল, বমি করতে করতে কেউ কিছু জানবার আগেই রাস্তায় মরে পড়ে থাকলে এই ঝক্কি পোহাতে হতো না। মৃগাঙ্ক লাথির ব্যাপারটা নিয়েই চিন্তিত, জ্বালার কথাটা ভাবছে না। এখন কতোদিন ভোগাবে তার ঠিক কি! তবে এটা ঠিক, সেরে উঠলেও এই লোককে আর রাখা যাবে না বাড়িতে। রক্তের রোগ অনেক সময় ছোঁয়াচেও হয়।

ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা কতোদূর গড়ালো তা দেখতে গেল অনিতা।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যখন বাড়িতে এলো মৃগাঙ্ক তখন ছায়া নামতে শুরু করেছে। সাধুচরণও কিছুটা চাঙ্গা। ওকে দেখতে দেখতে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস চাপল মৃগাঙ্ক। ইশারায় অনিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছিল ডাক্তারকে বলবার দরকার নেই কোনো।'

'যদি ও বলে!'

'ও বলবে না।' মৃগাঙ্ক বলল, 'আঠারো কুড়ি বছর ধরে দেখছি, লোকটা বেইমান নয়। তা ছাড়া, বাঁচতে হলে এখন ওর বেইমানি করা চলবে না।'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল ওরা। তারপর ফিরে এলো নিঃশব্দে।

'ভালো নয়।' দেখেশুনে ডাক্তার বললেন, 'সিম্পটম দেখে মনে হচ্ছে খারাপ ধরনের আলসার। একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি, ওষুধও। যদি তারপরেও বমি করে—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়ল। বিমর্ষ মুখে অনিতাও।

সেদিন অনেক রাতে সাধুচরণের রোগপাণ্ডুর মুখের কাছে ঠাণ্ডা দুধের বাটি তুলে ধরে মৃগাঙ্ক বলল, 'ভয় পেও না, সাধুচরণ। ভালো হয়ে যাবে—'

'ভালো আর কী হবো, বাবু!' সঙ্কুচিত গলায় সাধুচরণ বলল, 'নিখাকি রোগ। দেশগাঁয়ে দেখেছি অনেক লোক এই রোগে মরে—'

মৃগাঙ্ক অনিতার দিকে তাকাল, তারপর পার্টিশনের বাইরে দাঁড়ানো রুনির দিকে। ঈষৎ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'যত্নে সবাই ভালো হয়। তুমিও হবে। কাল সকালে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। সেখানে বড়ো ডাক্তার আছে—'

সাধুচরণ জবাব দিল না। শীর্ণ মুখের মধ্যে জ্বলজ্বলে দু'টি চোখ ; এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মৃগাঙ্কর দিকে। তারপর হঠাৎ ভাঙাচোরা গলায় বলল, 'লাথিটা আগে মারলেন না কেন, বাবু ! রোগটা আগে ধরা পড়লে হয়তো বেঁচে যেতাম !'

আলমের নিজের বাড়ি

ঢাকার আকাশ ছেড়ে বাংলাদেশ বিমানেব বোয়িংটা কলকাতার দিকে স্থির হতেই ভাবনাগুলো ফিরে এলো আবার।

'সব কিছুর মতো ফেবাবও একটা সময থাকে. সেই সময়টা পার হয়ে গেলে মনে হয় আর আসা হলো না—', শেষ চিঠিতে লিখেছিল রাকা, 'মনে হচ্ছে তোমার বেলাতেও তাই হবে। এর মানে এই নয় যে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'বে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বা মন ভালো নেই। এর মানে শুধু এই যে প্রত্যেক চিঠিতে আসছি আসছি ব'লে কামান দাগার কোনো মানে হয় না।' এইসব এবং আরো কিছু কথা, এতোদিন পরে হুবহু সবকিছু মনে থাকার কথা নয়। আলমের মনে হয়েছিল বেশ কয়েক বছব কলকাতায় থাকতে থাকতে কলকাতার ভাষাটা দিব্যি রপ্ত ক'রে ফেলেছে রাকা। যেখানে যেমন দরকার, জানে শ্লেষ ও সম্পর্ক কী ক'রে আড়াল ক'রে বাখতে হয। শুধু বুঝতে পারেনি 'যে-মাটি যে-শিকড়ের জন্যে তৈবি' কথাগুলোব মানে। দ্বিধা যাতে সংশয় বা সন্দেহে পরিণত না হয় সেইজন্যে বারবাব পড়েছিল লাইনদুটো। ধারণায় পৌঁছুতে পারেনি।

বাকা মেযে। পরে ভেবেছিল, কোথাও না কোথাও একটু আড়াল রাখবেই। স্বাধীনতা যতো তাড়াতাড়ি পাওযা যায়, সংস্কাবও কি মুছে ফেলা যায ততো তাড়াতাড়ি? এর মধ্যে বুঝে নেওযাব ব্যাপার আছে। আলম নিজে বুঝতে না পারলে রাকারও বোঝানোর দায়িত্ব নেই।

জবাবে লিখেছিল, 'তাপ বাড়লে হেঁয়ালিটাও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এটাই যদি কারণ হয় তাহ'লে আলাদা। তা না হ'লে তোমার চিঠির অনেক কথাই বুঝতে পারিনি। যে-মাটি যে-শিকড়ের কথাগুলোর মানে কি? আমি যা ভাবছি তাই হ'লে ভুলে যেও না আমার জন্ম কলকাতায়—পার্ক সার্কাসেব যে-বাড়িব ঠিকানায পৌঁছুবে এ চিঠি, সেই বাড়িতেই। তাহ'লে কি আমাব শিকড কলকাতায় নয়? তুমি কি জানো, রাকা নামের যতো মেয়ে কলকাতায় আছে তার চেয়ে বেশি আছে ঢাকায় এবং তাদের কেউই এখানে বেমানান নয়? তবে রাকা যতোদিন না ঢাকায় আসছে ততোদিন আলমকেই ছুটতে হবে কলকাতায, তার নিজের বাড়িতে—'

এইসব এবং এই ধরনের আরো কিছু কথা, যা শুধু চিঠিতেই সম্ভব। তবু ভাষাও তো পারে শব্দের অর্থ জুড়ে জুড়ে বক্ত-মাংসের একটা আদল তৈরি করতে—আদলটাকে সম্পূর্ণতা দিতে। আবেগ এমনই ব্যাপাব যে পারলে নিজের চিঠি নিজেই বাহক হয়ে রাকার হাতে পৌঁছে দিত আলম।

জবাব আসেনি। মাসখানেক অপেক্ষা ক'রে আবার একটা চিঠি দিয়েছিল আলম। মাত্র কয়েক লাইন। তাতে জবাব না-পাওয়ার কথা ছিল, আর ছিল কলকাতায় মৈত্রী সংসদের সেমিনারে আমন্ত্রণ পাওযাব কথা। পুরুষেবও অভিমান ব'লে যদি কিছু থাকে, রাকা টের পাবে।

এবার জবাব এলো অন্য হাতের লেখায়। খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ খুলতেই দেখল যা সন্দেহ করেছিল তাই—রাকা নয়, স্নেহমাসীমা। প্রথম তথ্য, রাকা কলকাতায় নেই। থাকলেও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, রিসার্চের কাজকর্মও এগোয়নি বিশেষ। চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না সব সময়। তাহ'লেও আলম যেন মাঝে মাঝে তাদের খোঁজ-খবর দিয়ে চিঠি দেয়। শেষে, সেমিনারের ব্যাপারে মেসোমশাই খুব খুশি হয়েছেন, ইত্যাদি।

বাকা যে কলকাতায় নেই কিংবা এই চিঠিটার কথা জানে না, স্নেহর চিঠি পড়েই তা অনুমান করতে পেরেছিল আলম। সন্দেহ চাপা দিয়েছিল যুক্তি দিয়ে। মে-জুন ছুটির সময়, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। লতায়-পাতায় জড়ানো ওদের আত্মীয়ের সংখ্যাও কম নয়। সেই ছেচল্লিশ সাল থেকে শাখা-প্রশাখা

ড়াতে ছড়াতে পৌঁছে গেছে নানা দিকে—দিল্লি, পুণা, পাটনা, আহমেদাবাদে। বেড়াতে ভালবাসে। হঠাৎ খেয়ালে এর কোনো একটা জায়গায় চ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। ধাঁধা ওই সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে া কথাগুলো নিয়ে। অসুবিধে হলো, রাকা কিংবা স্নেহমাসীমা কারুব কাছেই কথাগুলোব ব্যাখ্যা চেয়ে াঠানো যায় না।

পোড়া সিগারেটের গন্ধ নাকের কাছে আনাগোনা করতেই নিঃশ্বাসেব ভার টেব পেল আলম। ছেড়ে. াবার টেনে নিয়ে, সহজ হবার চেষ্টা করল।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দূরত্ব পেরোতে হাজার হাজাব ফিট উচুতে উঠতে হয না। এখান থেকে নীচে াকালে অস্পষ্ট হ'লেও গাছপালা-নদী-মাঠময় বাস্তবেব পটভূমি চোখে পড়ে—কিছু কংক্রিটেব াঠামোও। এতোক্ষণ সরলবেখায় ওড়াব পব হঠাৎই দুলতে শুরু করেছে প্লেনটা। আকাশেব নীল ক্রমশ আড়াল হয়ে যাচ্ছে মেঘে। ভিতবেব তাপেও সামান্য পবিবর্তন অনুভব কবল আলম। আগস্টেব শেষ। এই সময় বৃষ্টি-বাদলা লেগেই থাকে। হয়তো ঝড়ও আছে বাইবে। এই সময়েই টুং ক'রে বেল বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্ব'লে উঠল বেল্ট বাঁধাব সঙ্কেত, তাবপরেই হোস্টেসেব সাবধান-কবা গলা। পাশের সীটে ব'সে সিগাবেট জ্বালিযে এতোক্ষণ সেমিনাব পেপাবে চোখ বোলাতে ব্যস্ত ছিল ফিরোজ। এখন অ্যাটাচি বন্ধ কবতে কবতে বলল, 'পৌঁছে গেলাম নাকি ?'

'এখনো মিনিটি পনেবো।' ঘড়ি দেখে বলল আলম, 'এতো লো ফ্লাইটে বাম্প কবরেই।'

' বলতে না বলতে প্লেনটা ঢুকে পড়ল ঘনবদ্ধ সাদা মেঘের ভিতবে। তবে যতোটা বাম্প কবরে মনে হয়েছিল তা নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দেখা গেল আকাশ, ধোযাটে ভাব কাটিযে পরিষ্কাব হচ্ছে ক্রমশ।

'এই যে আকাশ, এটা ইণ্ডিয়ার।' আবার বেল বাজিয়ে সঙ্কেত নিবে যাবার পব ফিরোজ বলল, 'এব ওপব আমাদের যাকে বলে নাগরিক অধিকার নেই।'

পাশে তাকিয়ে ফিরোজকে দেখে নিল আলম। তক্ষুণি দেবার মতো কোনো জবাব মুখে এলো না। আপাতত ঠাট্টা ক'বে বললেও ফিরোজ যে খুব সিবিয়াস, সেটা বোঝাই যায়। সেমিনারে যোগ দেবাব আমন্ত্রণ পৌঁছুবাব পব থেকেই বিষয়েব ভিতব প্রতিপক্ষ খুঁজে চলেছে ক্রমাগত। যেন তা না কবলে যুক্তিগুলোকে নিজেব পায়ে দাঁড কবানো যায় না। কাল অনেক বাত পর্যন্ত এই নিযে তর্ক কবেছিল। দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্যে বিশ্বাস করে ফিরোজ। বলেছিল, মৈত্রী ভালো, তবে ওটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহাব কবাব বিপদ আছে। খালি গায়ে না-থাকাব জন্যেই জামা পবা—তাব মানে কিন্তু এই নয যে জামাব কাট থেকে বং পর্যন্ত সবই হবে এক। তাহ'লে স্বাতন্ত্র্য কোথায়! অসুবিধে হলো, ফিরোজ যেভাবে ভাবে, আলম নিজে সেভাবে ভাবতে পাবছে না। কাট আব বঙের স্বাতন্ত্র্য? এমনও হতে পাবে, আবো গভীব কিছু বলার চেষ্টায় আছে ফিরোজ, যেটা ওব নিজেব কাছেই খুব স্পষ্ট নয়। এখনো সে আমার-তোমাব দিকে এগোচ্ছে শুনে বলল, 'কথাটাব কি কোনো মানে আছে? ধৈর্য ও সময় থাকলে এই দূরত্বটা আমবা হেঁটেই পার হতে পাবতাম। তাহ'লে ব্যাপাবটা খুব সহজ হয়ে যেত। শত্রু যেখানে নেই সেখানে মৈত্রী নিয়ে আলাদা ক'বে সেমিনাব কবাব দবকাব হতো না।

আলম জানে না সে নিজে কতোখানি স্পষ্ট। মুঠোয ধবা বাদামি লাইটাবটা জ্বালবে ব'লে দিযে। সিগাবেট ধরাবাব জন্যে নয।

'কী বলতে চাও?'

'সুযোগটা নিলাম কলকাতায আসতে চাই ব'লে।' আলম বলল, 'না হ'লে এই সেমিনাব-টেমিনারেব ব্যাপাবগুলো আগাগোড়াই আমার ধোঁকা ব'লে মনে হয়। এক ভাষা, এক পোশাক, একই বকম খাওযা-দাওযা আব আবহাওযা। তফাতটা বাজনৈতিক। এব মধ্যে অন্য কথা আসছে কোত্থেকে?'

'দু' দিনের সেমিনার পাঁচ মিনিটে শেষ ক'বে দিও না। এক দিস্তে কাগজের পেপার তৈবি করেছি দু'বাত্তির জেগে—।' ফিরোজ এইভাবেই জবাবটা তৈরি করল, মূল প্রসঙ্গে পৌঁছুবাব আগে সময় নিল যেন। তারপর ঝোঁক দিয়ে বলল, 'তফাতটা বাজনীতিবও নয়। ধর্মেব। এড়িয়ে যেতে চাইলেও পাববে কি?'

প্লেনটা সম্ভবত নামতে শুরু করেছে। এই সময়েব স্তব্ধতা বেশি, কিছু বললে আশপাশের যাত্রীদেরও কানে যেতে পারে। ওটা চাপানো ব্যাপার—অন্য সময় হ'লে বলতে পারত, জিগির হিসেবে সবচেয়ে অন্ধ ব'লেই সবচেয়ে বিশ্বাস্য। আমরা ধনী-দরিদ্র, শাসক-শোষিতের সম্পর্কটা যতো না বুঝি তার চেয়ে বেশি বুঝি ধর্মের সম্পর্ক। এতে দায়িত্ব থাকে না, বাস্তব থেকে পালানোও সহজ হয়ে ওঠে কিন্তু, ভাবল, এসব ব'লে লাভ আছে কিছু? সব প্রশ্নের জবাব থাকে না, দিতেও ইচ্ছে করে না এমনকি হতে পারে যে, ঠিক যে-কথাগুলো যে-ভাবনাগুলো এই মুহূর্তে তার মনে এলো, ঠিক এইভাবে একই কথা, একই ভাবনা রাকারও মনে এসেছিল—তাই নিজে না লিখে জবাব পাঠালো স্নেহর মাধ্যমে। নাকি ভাষা মানেই অক্ষর, আবেগ মানেই নারায়ণ শিলা ছোঁয়া নয়!

নিজের প্রশ্নে বিভ্রান্ত আলম নিজেই পড়ল দ্বিধায়। রাকার মনের অনেকটাই সে জানে; সবটা জানে না।

ফিরোজ অবশ্য এসব মানবে না। তার ধাঁচ আলাদা। আপাতত ল্যান্ডিং-এর পজিসনে টান-টান হয়ে ব'সে চ'লে গেল অন্য কথায়।

'আলম, সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে থাকছ না?'

'বলেছি তো খারাপ দেখায়।'

'একসঙ্গে থাকলেও গিয়ে দেখা ক'রে আসতে পারতে।' ইতস্তত ক'রে বলল ফিরোজ, 'যাঁদের কথা বলছ তাঁরা তো তোমার আত্মীয়ও নন?'

'তুমি আমি কি আত্মীয়? তবু কোনোদিন যদি ঢাকা ছাড়ি, আবার ঢাকায় ফিরলে তোমার বাড়িতেই উঠব—'

প্লেনের চাকা টারম্যাক ছোঁয়ার চাঞ্চল্যে দু'জনেই খেই হারিয়ে ফেলল কিছুক্ষণের জন্যে। দাঁড়িয়ে-ওঠা যাত্রীদের ভিড় থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কথাটার জের টানল আলম

'তুমি যে একেবারেই একা থাকছ তা নয়। আজকের রাতটা পেরোলে কাল সকালেই এসে পড়বেন রহমান সাহেব। এদিকে মিশনের খানচৌধুরী তো আছেনই—'

ফিরোজ চুপ ক'রে থাকল।

খানিক আগেই সম্ভবত বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো চারদিকে ভিজে ভাব ছড়ানো। ছলছলে হাওয়া। হাল্কা রোদ্দুরে ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে আর্দ্রতা। সমস্তই গায়ে মেখে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। কাস্টমস এনক্লোজারের দিকে এগোতে এগোতে অস্পষ্ট স্মৃতি ছুঁয়ে গেল আলমকে। এখন যেদিকে হাঁটছে, তিন বছর আগে ঠিক তার উল্টোদিকে এয়ারক্রাফটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভিজিটর্স্ গ্যালারির দিকে তাকিয়ে রাকাকে খুঁজেছিল সে। রাকা তো ছিলই, এসেছিলেন স্নেহ আর অনন্তও। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েনি। পাশাপাশি একসঙ্গে জড়ো হয়ে আছে বহু লোক—যারা বিদায় জানাতে আসে তাদের প্রত্যেকেরই মুখে একই আদল। ওরই মধ্যে থেকে উঠে আসা একটি সাদা হাতের আন্দোলন চিনিয়ে দিয়েছিল রাকাকে। দৃশ্যটা সহ্য হয়নি। প্লেন ছেড়ে দেবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওই বিদায়ের দৃশ্য ছাড়া স্মৃতি জুড়ে আর কিছুই ছিল না। আজ মনে হচ্ছে কতোক্ষণেরই বা দূরত্ব—পঁয়তাল্লিশ মিনিট, বড়ো জোর এক ঘণ্টা। এই এক ঘণ্টার দূরত্ব পেরোতেই টানা তিনটে বছর কেটে গেল তার!

পুরনো ছবির টানে এখনো চোখ চ'লে গেল গ্যালারির দিকে। অবশ্যই রাকার খোঁজে নয়। ববং সন্দেহে। আসছেই এই খবরটার সঙ্গে দিন, ক্ষণ, ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে দিন সাতেক আগে একই সঙ্গে ডাকে দিয়েছিল দুটো চিঠি—প্রায় একই বয়ানে। একটা রাকাকে, অন্যটা স্নেহমাসীমাকে। কোনো কারণে একটা হারিয়ে গেলে অন্যটা ঠিকই পৌঁছুবে এই ভাবনায় যতোটা না তার চেয়ে বেশি নিজের যুক্তিতে পরিষ্কার থাকবার জন্যে। শুধুই কলকাতা তো কারও ঠিকানা হতে পারে না! শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া, এয়ারপোর্ট থেকে সে পার্ক সার্কাসের দিকেই যাবে। এর বেশি আর কী লেখা যায়! এই মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে রাকার কি মনে পড়বে না, আজ সকালে আলমের ঠিকানা ঢাকা নয় কলকাতা!

এই ভাবনাতেই রঙিন হয়ে উঠল আলম। রাকা নেই জেনেও দৃষ্টি চ'লে গেল ব্যস্ততা ও ভিড়ের

ওপারে।

খানচৌধুরী নিজেই এসেছিলেন এয়ারপোর্টে, সঙ্গে মৈত্রী সংসদের দু'জন। এর মধ্যে সুদেব বসুকে চিনতে পারল আলম। এই রকমই একটি সম্মেলন উপলক্ষে গতবার গিয়েছিলেন ঢাকায়। জিয়াউর নিহত হওয়ার কারণে সম্মেলন বাতিল হয়ে যায় সেবার। গাড়িতে শহরের দিকে যেতে যেতে সেই গল্পই করছিলেন ফাঁপিয়ে। ফিরোজ শ্রোতা নয়, আলমও নয়। পুরনো গল্প। খানচৌধুরীও জানেন। চতুর্থ ব্যক্তি শুনতে পারে। এরই মধ্যে প্রসঙ্গ পাল্টে পাকিস্তান হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ওদিক থেকে কতোজন এদিকে এসেছেন তার হিসেব দেওয়া শুরু হলো। হিসেবে ভুল ধরতে শুরু করেছে ফিরোজ। এরপর হয়তো গোটা সেমিনারটাই উঠে আসবে এই গাড়ির মধ্যে!

বিরক্ত হয়ে আলম বলল, 'ফিরোজ, দাও দেখি একটা সিগারেট—'

'হঠাৎ।'

'প্রায় তিন বছর পরে কলকাতায় এলাম! একটু চাগিয়ে দেখি!'

সুদেব থেমে গেলেন। আলমকে লক্ষ ক'রে বললেন, 'কলকাতা তো আপনার চেনা জায়গা?'

ফিরোজের বাড়ানো লাইটারের আগুন থেকে অপটু হাতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আলম বলল, আমার জন্মভূমি।'

এরপর তলিয়ে যাওয়া যায় নিজের মধ্যে। জন্মভূমিই মাতৃভূমি কিনা এই প্রশ্নে প্রায়ই উদ্বাস্তু লাগে নিজেকে। এখনো লাগল।

পরের প্রসঙ্গটা এলো একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে। শেখ মুজিবের নামে তখন কলকাতা পাগল। মনুমেন্ট ময়দানের একটা মিটিংয়ের কথা তুললেন সুদেববাবু, সুচিত্রা মিত্র গান গেয়েছিলেন সেখানে। আলমের মনে পড়ে গেল। বলল না তখন সে কলকাতায়, ওই মিটিংয়েরই পিছনে দাঁড়িয়ে শুনেছিল সদ্যঘোষিত একটি দেশের নাম—যে-দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণাই তখন তার ছিল না। সেই দেশেরই তকমা আজ তার বুকে।

আরো কিছু দূর এগিয়ে পাল্টে গেল আকাশ। জোলো হাওয়ার সঙ্গে নেমে এলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। জানলার ধারে বসার সুবিধে এই, অনায়াসে মুখ ভাসিয়ে রাখা চলে প্রতিদ্বন্দ্বী হাওয়ায়। নজরুল ইসলাম এভিনিউ থেকে সি-আই-টি রোড, বাঁ দিকে চ'লে গেল সল্ট লেকের রাস্তা। এর পরেই এসে পড়বে মানিকতলা, নারকেলডাঙা। ক্লাসে রোল কল করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াচ্ছে এক একজন—প্রতিটি মুখই চেনা। সিরসিরে অনুভূতি ছড়িয়ে যায় গোটা শরীরে। চেনা ব'লেই এদের একান্ত ক'রে পাবার জন্যে এয়ারপোর্ট থেকে আলাদা ট্যাক্সি ধরতে চেয়েছিল আলম। হলো না খানচৌধুরীর পীড়াপীড়িতে। ফিরোজকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার তাকে এগিয়ে দেবে পার্ক সার্কাসের ঠিকানায়। আজ শনিবার, এখন এগারোটা—পৌঁছুতে পৌঁছুতে বারোটা। চিঠি পৌঁছে থাকলে নিশ্চয়ই অপেক্ষা ক'রে থাকবে রাকা। গেটের কাছে কাঠচাঁপার গাছটা এই বৃষ্টিতে কিছু-না-কিছু গন্ধ ছড়াবে। অবাক হবে চিঠি না পৌঁছুলে। তিন বছর পরের রাকা নিশ্চয়ই তিন বছর আগের মতো নেই। আলমও অবাক হতে পারে। গঙ্গার ইলিশ ভালো না পদ্মার, তর্ক চলতে পারে এই নিয়ে। পদ্মাপারে গিয়েও যে গঙ্গার ভক্ত থেকে গেছে আলম, এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতে পারেন অনন্ত মেসোমশাই। স্বাদটাও সংস্কারের মতো, বলেছিলেন একদা, একবার পেলে বিছুটির জ্বালাও সয়ে নেয়। আজ কিংবা কাল—এখানে থাকতে থাকতে—রাকাকে জড়িয়ে আলম যদি এই ধরনের কথা তোলে, খুব কি অবাক হবেন অনন্ত? বা স্নেহ?

আলম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পাঁচজনের মধ্যে এমন চুপচাপ থাকাটা অভদ্রতা। তবু, স্মৃতিই টেনে রাখে।

হুট ক'রে একদিন ডাক্তারি পেশা থেকে রিটায়ার করলেন বাবা। চেম্বার বন্ধ হলো—নিতান্তই না-গেলে নয় এমন ছাড়া কলে বেরুনো বন্ধ করলেন। তখনো শক্তপোক্ত, প্র্যাকটিশও ছিল ভালো। অভিমানই কাজ করেছিল মনে হয়। ধাক্কাটা এসেছিল ক্রমশ, বছরের পর বছর ধ'রে। আলম এসব জেনেছে অনেকদিন পরে।

তার আগের বছর দাদা গেল গ্লাসগোয় এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। 'পারলে থেকে যেও ওখানেই —,' বাবা বললেন, 'খাতায় কলমে কোনো অসুবিধা নেই, এখানেও চাকরি পাবে। তবে, মনের দিক থেকে বেকার হয়ে যেতে পারো।' এই ধরনের কথা —যতো না সোজা তার চেয়ে বেশি রহস্যময়। ফাঁকা চেম্বারে কম্পাউণ্ডার সাহেবকে সামনে বসিয়ে বোঝাতেন অনেক তত্ত্ব। পার্টিশান হয়েছে দু'ভাবে। এক রাজনৈতিক, আর এক মানসিক। দ্বিতীয়টায় মাউন্টব্যাটেন সই মারেনি। আগে একই স্টেথ্‌স্‌কোপ লাগাতাম রাম আর জামালের বুকে। সেদিন আর নেই। আমার পেশেন্টদের মধ্যে এখন রাম নেই, রহিম আছে ; যদু নেই, জামাল আছে ; কানাই নেই, করিম আছে। রাম, যদু, কানাইরা সব চ'লে গেল ডাক্তার গুপ্তর কাছে। একই কলেজের এম-বি দু'জনে, একই মানুষের অ্যানাটমি শিখেছি। কাটা-ছেঁড়া সেই মানুষের গায়ে নামের লেবেল ছিল না।

মনে পড়ে, বড়ো কাঁসার থালায় এক পাহাড় ভাত নিয়ে খেতে ব'সে মা'র সঙ্গে গল্প করছেন বাবা। সেইখানেই ভাঙলেন খবরটা। বালিগঞ্জে চেম্বার নিয়েছেন ডাক্তার গুপ্ত। এদিকে পেশেন্ট কম, ওঁর চিকিৎসায় আর জামাল, করিমের আরোগ্য হয় না। ওরা আসে আমার কাছে। ওদের সংখ্যাও কমছে অবশ্য। যে যেমন পারছে চ'লে যাচ্ছে পাকিস্তানে। কেউ পুবে, কেউ পশ্চিমে। আমরাও গেলে পারতাম। মনের মধ্যে একটা রোগ টের পাচ্ছি—

এতোদিন পরে ঠিকঠাক মনে পড়ে না কথাগুলো। শুধু মনে পড়ে নির্জনতায় ঘেরা বাবার নিঃসঙ্গ মুখ ; ক্রমশ চুপচাপ হয়ে যাওয়া মাকে। চনমনে, ব্রণ-ওঠার বয়সে বোন দুটোর বিষাদ। নৈঃশব্দ্যে ঘেরা নিষ্প্রভ বাল্‌বের আলো। তার পরেই যুদ্ধ। বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ। প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন ডাক্তার গুপ্ত। ঢাকা ছেড়ে সপরিবারে চ'লে এসেছেন অনন্তশেখর। আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ওদিকে ধানমণ্ডিতে পড়ে আছে বাড়ি, জমিজমা। 'আপনিও তো যাবার কথা ভাবছিলেন ডাক্তার সাহেব ? ভাবলাম পরামর্শটা দিই। যদি একান্তই যাওয়া সাব্যস্ত করেন, পাল্টা-পাল্টি ক'রে নিলে কেমন হয় ?'

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল বাবার মুখ। পরে বলেছিলেন, 'কপালে যদি থাকে, তাই হবে। ভেবে দেখি। নিয়ে আসুন একদিন অনন্তবাবুকে —'

ফিরোজ নেমে গেল হোটেলে। সঙ্গে খানচৌধুরী ও সুদেববাবুরা। প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হবে বলেছিল, হয়তো আরো কেউ-কেউ আসবে। রাত্রে ডিনার। খানচৌধুরীর অনুরোধে মাথা নাড়লেও আলম জানে না শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে কি না। গাড়িটা হোটেল ছেড়ে এগোতে অস্বস্তিকর একাকিত্বে ছেয়ে গেল মাথা। তাহ'লে এতোক্ষণ সে একা হবার চেষ্টা করেছিল কেন ? একতরফা স্মৃতিতে ! গন্তব্য ধরা দিতেই তেড়ে আসছে সংশয় ?

আলম জানে না। এই মুহূর্তেও তার ও গন্তব্যের মাঝখানে দাঁড়ানো দ্বিধাটাকেই চিনতে পারছে শুধু।

তিন বছরে অনেকটা বদলে গেছে কলকাতা। রাকা কতোটা বদলেছে অনুমান করতে গিয়ে নিজের বদলটা পরিমাপ করতে পারেনি। যে-কোনো আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের মুখই প্রতিফলিত হয়—ভালো বা মন্দগুলো এতোই চাক্ষুষ যে চিরে দেখার দরকার পড়ে না। গতকালের বদল আজ ধরা যাবে না। পরের দিন মিশে যাচ্ছে আগের দিনের সঙ্গে ; মনও বাড়ছে জড়াজড়ি ক'রে। চেহারা ও মন একসঙ্গে দুটোরই বদল সে'ই ধরতে পারবে সময় যার অতীত ও বর্তমানকে আলাদা ক'রে রেখেছে। সময়ের ব্যবধান থেকেই আলম ধরতে পারল, এই অঞ্চলের রাস্তায় এতো খোদল কখনো ছিল না, কিংবা দেয়ালে এতো লেখাও। আবছা হয়ে এসেছে 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'। এক নজরে মনে হয় মসৃণতা থেকে খাবলানো অংশগুলো অক্ষর হয়ে ফুটে উঠেছে দেয়ালে। মানুষও রাস্তা—পারাপারের চাপে বদলে যায় ক্রমশ, চট ক'রে ধরা যায় না।

ভিতরে ভিতরে বাবা যে সত্যিই এতোটা বদলে গিয়েছিলেন সেটা বোঝা গেল ডাক্তার গুপ্ত যেদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন অনন্তশেখরকে। ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু বিনিময় চলে তার বেশি এগোলেন না। বললেন, 'পাল্টা-পাল্টির কথা শুনেছি। ঢাকার বাড়ি, জমিজমার নকশা, ফিরিস্তি কিছু এনেছেন কি ?'

'আজ্ঞে না তো !' বললেন অনন্তশেখর, 'দলিলটা আছে। মোটামুটি হিসাব দিতে পারি।'

'মোটামুটি হিসাবে কাজ হয় না।' সোজাসুজি অনন্তশেখরের দিকে তাকালেন বাবা, 'শুনুন মশাই, আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি। আজ আমারটা দেখুন। পছন্দ হ'লে বলবেন। তারপর চলুন ঢাকায়—আপনারটাও দেখব। খাটিয়ে রক্তের দাম কম নয়। চারটি বছর লেগেছিল এই বাড়ি শেষ করতে। এই তল্লাটের প্রথম দোতলা। শেষ না ক'রে ঢুকিনি। ছাদ তো নয়, উঠোন। মহাত্মাজী মারা যাবার পর শোকসভা হয়েছিল ছাদে। সভা ভাঙার পর বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল কেমন ! শীতের রাতে নতুন ঢালাই করা ছাদে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আকাশটা কতো বড়ো—'

ড্রাইভারকে বলেছিল আস্তে চালাতে যাতে ঠিক জায়গায় বলতে পারে এবার বাঁয়ে, এবার ডাইনে। সহজ হতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে দৃষ্টি। যেখানে একতলা থাকার কথা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা ; মোটর গ্যারাজের রূঢ়তায় চাপা পড়ে যাচ্ছে ফুলের বাগান , নতুন সাইনবোর্ড ব'লে দিচ্ছে পুরনো ফেলাই যায়। তবে নিজের বাড়িটা চিনতে বাধা হচ্ছে না কোনো। হবেও না। 'একই বাড়িতে দু'বার জন্মায় না কেউ—', একবার বলেছিল বাকাকে, 'একমাত্র আমি ছাড়া।' সে অন্তত এইভাবেই ভেবেছিল।

পাল্টা-পাল্টি যা হবার হয়ে গেল মাস দুয়েকের মধ্যে। আলম গেল না। এম-এ পড়ছে তখন। বেঁকে বসার আগে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিল নিজেকে, বাবার সমস্যা তার নয়। মা'র সমস্যা বাবা। বোন দু'টিকে গোনা হলো জিনিসপত্রের সঙ্গে। আলম যাবে কেন !

'পড়বে যে, থাকবে কোথায় ?' বাবা বললেন, 'হস্টেল খুঁজে নিও।'

নিজেদের বাড়িতে ব'সে অনন্তশেখরের সামনে এই আলোচনায় নিজেই ঝাঁকুনি খেলো আলম।

'আলম এখানেই থাকবে।' অনন্তশেখর বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে গেলে কথা ছিল। কিন্তু কলকাতায় থেকে অন্যত্র থাকবে, এটা হয় না। তা ছাড়া—', বাবাকে চুপ থাকতে দেখে ঝরঝরে হয়ে উঠল অনন্তশেখরের গলা, 'দায় আমার ছিল, ডাক্তারসাহেব, আপনার নয়। মাথা গোঁজার এই আশ্রয় ক'রে দিলেন আমাকে, আপনার ছেলেকে একটু আশ্রয় দিতে পারব না ! আমারও ছেলে রয়েছে। দু'জনে মিলেমিশে থাকতে পারবে—'

'আশ্বস্ত হলাম।' বাবা বললেন, 'কী জানেন, অনন্তবাবু, ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। মিলেমিশে কি আমরাও ছিলাম না ! আপনি তো কোনো আঘাতের কথা বলেননি ! অস্বস্তিটা এলো কেন ? পাল্টা-পাল্টি হলো তাই বক্ষে। তবে আমার ছেলেকে রাখার সিদ্ধান্ত আপনিই নিলেন। আবেগটা বুঝি। পরে যেন আফসোস না হয় !'

সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া। কাকভোরে স্টেশনে যাবার আগে ছাদে উঠে নামাজ পড়লেন বাবা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় পিছনে তাকাননি। বাবাকে অনুসরণ করতে করতে ওই বয়সেই আলম ভেবেছিল, মানুষের ধারাবাহিকতা থাকে রক্তে, ঠিকানায় নয়।

ছাদেই চিলেকোঠা। বাড়ি বদল হয়ে যাবার পরেও নিজের ঘরটি বদলায়নি আলমের। একদিন সন্ধ্যায় হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এলো রাকা। তার আগেই অবশ্য গোলমাল কানে পৌঁছেছে আলমের। রাকা বলল, 'বাইরে খুব গণ্ডগোল, ঘরবাড়ি পুড়ছে। দাদা ফোন ক'রে বলল তুমি যেন বাড়ি থেকে না বেরোও—'

মুখের কথাগুলোর চেয়ে রাকার মুখ তখন অনেক দামি। বিস্ময় আড়াল না ক'রে আলম বলেছিল, 'তুমি আজ শাড়ি পরেছ !'

রাকা নিজেকে দেখল। আগের কথা ভুলে বলল, 'খারাপ লাগছে ?'

আকর্ষণে ভালো কিংবা খারাপ থাকে না—যা অপ্রত্যক্ষ তা-ই শুধু হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ। রাকাকে তা বোঝানো যাবে না। দৃষ্টিতে যা বুঝিয়েছিল তার বেশি আর এগোয়নি আলম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খোলা ছাদে রাকার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করেছিল কিছু দূরে আকাশে ক্রমশ দগদগে হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের আভা। গোলমেলে চিৎকারে মিশে যাচ্ছে আক্রমণ ও আর্তনাদ, কোনটা কার তফাত করা যায় না। শব্দই ক্রমশ পরিণত হয়েছিল নৈঃশব্দ্যে। অনেকক্ষণ পরে রাকা বলেছিল, 'এখানেও এই।'

আলম কিছু বলেনি। তবে হঠাৎই মনে হয়েছিল তার, জোড়-পুতুলের ধরনে এই যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা, এর দাম কতোটুকু ! আর কিছু নয়। এরপর ব্যস্ত স্নেহমাসীমা যখন ডেকে নিয়ে গেলেন রাকাকে, তখনো তার কাছে অন্য কিছু মনে হয়নি।

'এই, এই রোকো—'

আচমকা নির্দেশে গাড়ি থেমে যাবার পর চেপে রাখা নিঃশ্বাসটাকে ছড়িয়ে দিল আলম। দবজা খুলে, স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে এলো বাইরে। ড্রাইভারকে ছেড়ে দেবার আগে নিশ্চিত হতে চাইল এই সেই বাড়ি কি না। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, সন্দেহের কারণ আছে কি ? ছোট গেটেব দেয়ালে লাগানো শ্বেতপাথরের ফলকে পরিষ্কার হবফে লেখা—অনন্তশেখব সান্যাল। বাবা চ'লে যাবার মাসখানেকেব মধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছিল আগের নামটা। কোনো আবেগের ব্যাপার ছিল না। অনেকেই জানত না বরাবরের মতো দেশ ছেড়ে চ'লে গেছেন ডাক্তারসাহেব। উটকো রোগীরা এসে প্রায়ই কডা নাডত দবজায় ; বিশ্বাস করত না সহজে। নাম বদলের পরামর্শটা শেষমেষ আলমই দিয়েছিল, নিজেকেও ক'বে নিয়েছিল অনন্তশেখরের কেযার অফ। সেজন্যে নয়। খটকা লাগল কাঠচাঁপার গাছটাকে অদৃশ্য হতে দেখে। ঠিক সেই জায়গায় পাঁচিলের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে গ'ডে উঠেছে নতুন ঘব, মিষ্টির দোকান। সাইনবোর্ডে 'মধুব'। আগে রাস্তার নামের সঙ্গে কাঠচাঁপা গাছঅলা বাড়ি বললেই চিনে নিত লোকে। এখন নিশ্চয় চেনে মিষ্টিব দোকানের নামে। রাকা কোনোদিনই এসব কথা লেখেনি। ওটাও আবেগেব ব্যাপার নয় ; হয়তো কারণ ছিল। 'বাড়িতে জায়গা এতো, কিন্তু ঘর কম—', কোন কথায় একবাব বলেছিলেন অনন্তশেখর, 'প্ল্যানিংটা ঠিক হয়নি।' শুনে মনে মনে হেসেছিল আলম। পাল্টা-পাল্টির আগে এ-কথা শুনলে নিশ্চিত রফায় রাজি হতেন না বাবা। গাছটা লাগিয়েছিলেন এমন জায়গায় যাতে দোতলার শোবার ঘব কিংবা নীচে বসার ঘরের জানলায় দাঁড়ালেই সোজাসুজি দৃশ্য হয়। অনন্তশেখরকে এসব কথা বলাব মানে ছিল না। হয়তো দোকান তুলে ফাঁকা জায়গাটার সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রয়োজনই স্বভাব শেখায়।

গাড়িটা চ'লে যাবার পরেও বন্ধ গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল আলম। বাড়িটাই দেখছে। দোতলার জানলার গরাদ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা-- চেক-চেক লুঙ্গির ওপর ফতুযা চড়ানো ; গাল ও চিবুক জুড়ে ঈষৎ লাল্‌চে দাড়িতে মেঘের আলো। বৃষ্টি পডছে কাঠচাঁপা গাছের মাথায়।

হারানো গন্ধ ফিরে পাবার ইচ্ছায় ভারী হযে এলো নিঃশ্বাস। বাবা নয, হলদে পর্দা। মাথায়, কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমে আসায় আকাশে তাকাল আলম। মেঘ। তখন মনে পড়ল, এরায়পোর্ট থেকে গোটা বাস্তাটাই সে এসেছে বৃষ্টিব মধ্যে দিয়ে। ভাবল, এসব নিয়ে ভাবনায় আবেগ ছাড়া আব কিছু নেই। গেট পেরিয়ে সিঁড়ি, তারপরে ঢাকা বারান্দা, দরজা। কলিং বেল টিপলেই দরজা খুলবে। রাকা ? না, সেরকম প্রস্তুতি এখন আর মনে নেই। হয়তো মেসোমশাই, হয়তো স্নেহমাসীমা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবার বেল টিপল আলম। সাড়ে বারোটা খুব বেশি বেলা নয়। তাছাড়া সে যে আসছে এটাও তো জানা কথা।

দরজা খুললেন স্নেহ। এঁটো হাত একপাশে আড়াল করা। কিছু অবাক, কিছু বা বিব্রত দৃষ্টিতে তাকালেন আলমের দিকে।

'ও, আলম !'

বরাবরের ভঙ্গিতে প্রণাম করার জন্যে ঝুঁকে এলো আলম।

'চিঠি পেয়েছিলেন ?'

'ভেতরে এসো।' জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন স্নেহ, 'খেতে বসেছিলাম— ! বোসো—'

স্যুটকেসটা একপাশে নামিয়ে রাখল আলম। সাজানো বৈঠকখানায় বসবার জায়গার অভাব নেই। তবু, ভিতরে যাবার পর্দার দিকে তাকিয়ে আশা বদলে গেল অস্বস্তিতে।

'আপনি খেয়ে আসুন, মাসীমা। আমি বসছি।'

'সেই ভালো।' এতোক্ষণে হাল্‌কা হাসি ফুটল স্নেহর ঠোঁটে, 'ততোক্ষণে তোমার মেসোমশাইয়েরও খাওয়া হযে যাবে।'

কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে থামলেন স্নেহ। স্যুটকেসটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চা খাবে তো ?'

'খাবো। আপনি আগে সেরে নিন।

'তুমি বসছ না কেন ? বোসো !'

যে-দরজা পেরিয়ে ভিতরে গেলেন স্নেহ, সেই দরজা দিয়ে তিন বছর আগেও সটান ভিতরে চ'লে যেত আলম। তবে কেউ না কেউ দরজা খুলে দিতই। ফেরার সময় রাকা—অবশ্য অন্য কোনো সময়ে কতোবারই আর সে ফিরেছে ! এখন সেখানে ফিবে এলো হলদে পর্দা। এমনও হতে পাবে, পর্দা সবিয়ে এর পর যে আসবে সে স্নেহমাসীমা বা মেসোমশাই নয়—বাকাই। যতোক্ষণ কেউ না আসছে ততোক্ষণ অপেক্ষা। স্নেহর হাত এটো না থাকলে এই সময়টাও কমিয়ে আনা যেত। আলম অন্য কিছু ভাবল না।

ডান দিকের দেয়ালে গান্ধীজীর বড়ো ছবিটা আছে এখনো। শোকসভার দিন রাতে ছাদ থেকে নেমে এসেছিল এই ঘরে। তিন-চার বছর বয়স থেকে একই ভঙ্গিতে ছবিটা দেখছে আলম। মুখোমুখি দেযালে হবিণেব শিং। তবু সক একটা সুতো চোখ এড়ালো না। ওই জায়গাটা শাশ্বত নয। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের পাশে দাঁড়িয়ে লডেছিল একজন। তার বংশধররা থাকত মুর্শিদাবাদে। ওইখানেব দেয়ালে টাঙানো অয়েল পেন্টিংয়ে ধরা অচেনা মানুষটির দিকে আঙুল তুলে ঠাকুবদাদার বাবাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। বহরমপুরেব বাড়ি থেকে উত্তরাধিকাব সূত্রে পাওয়া। তাঁব ছেলে কবত হাকিমি। হাকিমেব ছেলে হলো ডাক্তার। ঢাকাব জমিতে বাবাব কবরের ওপব মাটি ছডাতে ছডাতে অন্যমনস্কভাবে ইতিহাসে ঢুকে পডেছিল আলম। হবিণেব শিং অন্য কিছু ভাবতে দিল না।

'কী খবর, আলম !'

অনন্তশেখর। পর্দা সরিয়ে পুরোপুবি ভিতবে আসবাব আগেই প্রশ্নটা এলো।

'ভালো, মেসোমশাই।' চটপট প্রণাম সেরে আলম বলল, 'আপনাকেই যেন একটু অন্যবকম দেখছি !'

'কী দেখছ ? স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে ?'

'পাত্‌লা হযে গেছেন অনেক।'

'হবে হয়তো। শরীব ভালো যায না প্রাযই।'

ধুতির তুলনায় গেঞ্জিটা ময়লা ; দেখে মনে হয়, হাতেব কাছে যা পেযেছেন তাই পবেই চ'লে এসেছেন অনন্তশেখর। বাস্তাব দিকের বন্ধ জানলাটা খুলে দিযে সোফায এসে বসলেন।

'মা, বোনেরা— সবাই ভালো আছেন ?'

আলম মাথা নাডল।

স্নেহ ফিবে এলেন। মনে হয শাড়িটাও বদলে এসেছেন। অন্যমনস্কতায় বদল নেই কোনো। ঠিক মনে পড়ল না আগের শাড়িটা কোন বঙেব ছিল।

'শুনেছিলাম আসছ।' ভাবনা থেকে উঠে এসে বললেন অনন্তশেখব, 'এখানে উঠবে জানাওনি তো ?'

'এ আবাব কী বকম কথা !' আলম প্রশ্নটা ভালো ক'রে বুঝে ওঠাব আগেই ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন স্নেহ, 'কলকাতায় এলে আব কোথায় উঠবে।'

স্নেহ এতোই স্পষ্ট যে নিজেব বিব্রত ভাব এড়াতে পাবলেন না অনন্তশেখব। অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'সে-কথা বলিনি।'

'এসো আলম, হাতমুখ ধোবে তো ?' এই মুহূর্তেব সমস্ত অস্বস্তি থেকে তাকে বাঁচানোব জন্যে এগিয়ে এলেন স্নেহ, 'চা হয়ে যাবে এখুনি—'

আলম উঠে দাঁড়াল। স্নেহকে অনুসরণ ক'রে ভিতরে যেতে যেতে ভাবল, তিন বছরের ব্যবধান স্বাভাবিকতার অনেকটাই নষ্ট ক'রে দিতে পাবে। তিন বছর না আবো বেশি ? এমনও হতে পাবে, চিঠিতে দেওয়া খবরগুলো পুরোপুরি পৌঁছয়নি অনন্তশেখরের কাছে—বুড়ো মানুষ, অন্যভাবেই ভেবে নিয়েছিলেন। এ-ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ফেরানোর কিছুটা দায় তারও।

পরিষ্কার তোয়ালে বের ক'রে রেখেছেন স্নেহ। সোপকেসও। হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'স্নান করবে না কি ?'

'না। ক'রে এসেছি সকালে।'

'ভাতটাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে নিও বরং—।'

বাস্তা দেখানোর ধরনে উঠোনে নেমে এলেন স্নেহ, 'ঐ বাথরুম। নতুন ফীটিংস লাগানো হয়েছে। তুমি চেনো তো?'

আলম হাসল। সময়ের হিসেব করলে আলম যতোদিন ধ'রে এই বাড়ির সমস্ত অলিগলি চিনেছে, স্নেহ তার অর্ধেকও চেনেননি। অধিকারের কথা আলাদা। অবশ্য, বেসিনের ওপর মুখ পেতে চোখে, কপালে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ভাবল আলম, উঠোনের লাগোয়া এই বাথরুমটা তার পক্ষে নতুনই। চিলেকোঠা থেকে আটটা সিঁড়ি নামলেই দোতলা, বাথরুম। প্রায় তার একার জন্যেই। মাঝে মাঝে অবশ্য শ্রীমন্তদাও ব্যবহার করত; ক্বচিৎ রাকাও। একদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'ঘর জামাইও এতো আদর পায় না। আমরা মরি ভাগাভাগি ক'রে, তোমার সব ব্যবস্থাই একার!' তখনো জানা ছিল না ঢাকা থেকে হঠাৎ মৃত্যুর খবর আসবে বাবার; তারপর ক্রমশ কলকাতার কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে চ'লে যেতে হবে ঢাকায়। ঠাট্টার জবাবটাও তাই চট ক'রে এসে গিয়েছিল মুখে। রাকাকে প্রস্তুত হবার সময় দিয়ে আলম বলেছিল, 'যা পাবার তা একা পাওয়াই ভালো। আরো ভালো হতো যদি আদবটা একটু কম পেতাম।' রাকা যে বোঝে না তা নয়। ঠাট্টার জের পৌঁছেছিল তার চোখের তারায় আর কানের লতিতে। সামলে নিয়ে বলেছিল, 'কথায় যারা জগৎ মারে, তারা শ্বশুরের গলা ধাক্কাও খায়।'

স্মৃতিই হাসিয়ে রাখল। একই গলা স্বরসুদ্ধ ফিরিয়ে দিল রক্তমাংসের গোটা দৃশ্যটাতে—ইচ্ছে করলেই এখন রাকাকে ছুঁতে পারে আলম। স্মৃতিই বাড়িয়ে দিল উৎকণ্ঠা।

খেতে ব'সে ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারল না আলম।

যত্নে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখছেন না স্নেহ। তাঁরই আড়ালে হয়ে যাচ্ছে আড়াল। ভাতের থালায় গরম ভাপ দেখেই আলম বুঝতে পারল, তার চা খাবার ফাঁকে ভাত ফুটেছে নতুন ক'রে, বাড়তি ভাজাগুলোও থালা সাজানোর জন্যে। খাবার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এটা ওটা পরিবেশন করছেন নিজে, সেই সঙ্গে কথাও।

তোমার সেই চিলেকোঠা এখন ঠাকুরঘর হয়েছে। শ্রীমন্ত দিল্লিতে বদলি হবার পর বসার ঘরের পাশের ঘরটাকে গেস্টরুম করা হলো। গেস্ট আর এ-বাড়িতে আসবে কে! মাসখানেক আগে জলপাইগুড়ি থেকে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে।' বলতে বলতে হঠাৎই খেয়াল হলো যেন, বললেন, 'খাওয়া কমে গেছে, না খাচ্ছো না?'

'না, ঠিকই খাচ্ছি।' চোখ তুলে স্নেহকে দেখল আলম, ধৈর্যের শেষ পর্যন্ত সময় নিল। তারপর বলল, রাকাকে দেখছি না, মাসীমা! কলেজে নাকি?'

'এই দ্যাখো, বলতেই ভুলে গেছি তোমাকে।' জগ থেকে গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতে স্নেহ বললেন, 'রাকা তো দিল্লিতে, শ্রীমন্তর কাছে। আজ কিংবা কাল ফেরার কথা। তুমি আসছ জানে। আজ ট্রেনের সময় চ'লে গেছে, মনে হয় কাল সকালেই আসবে। দিল্লি থেকে ট্রেনের টিকিট পাওয়া যা ঝামেলা—!'

চোখ নামিয়ে প্রায়-শূন্য থালার দিকে তাকাল আলম। শেষ হয়ে যাওয়া খাওয়াটাই আবার শুরু ক'রে বলল, 'কোন ট্রেনে আসবে? কাল্‌কায়?'

'মনে তো হয় তাই—'

এর পরের প্রশ্নটা খুঁজে পেল না আলম। কিংবা বয়স্ক গলার কাশির শব্দই চুপ করিয়ে রাখল তাকে।

বসার ঘর থেকে উঠে এলেন অনন্তশেখর। মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, 'কী যেন সেমিনারের কথা শুনেছিলাম। তা তোমাদের বিষয়টা কি?'

অস্পষ্টভাবে অনন্তশেখরের কথাগুলো কানে তুলল আলম। জবাব দেবার ব্যস্ততা নেই কোনো। আলগোছে বিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে ভাবল, কালকা মেল সকালেই এসে পৌঁছয় হাওড়ায়। এই সেদিনও—কলকাতায় থাকতে থাকতে—ইউ-জি-সি'র ইন্টারভিউ দিয়ে বার দুয়েক নিজেও ফিরেছে সে। কাল সকালে ফিরলে রাকা এখন ট্রেনে। তার মানে এখনো আঠারো-উনিশ ঘণ্টা।

সময়েব ভাব নিঃশ্বাসে মিশে যেতে হাত থেমে গেল। চাপা ঢেঁকুবের সঙ্গে মিশে ছড়াতে লাগল বুকেব ভিতরের খালি জাযগাগুলোয়। সুবিধে এইটুকু, কাল ববিবার, অপেক্ষা করার সময় থাকবে। স্নেহকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে কাল স্টেশনে যাবে কি না।

অনন্তশেখর অপেক্ষা করছেন তখনো। হাতেব তেলোয় মুখ পাতা—ধরনটা বিচিত্র ; গাল ও চিবুকে সাদা ছোট ছোট দাড়ির বিন্দু।

'কালচারাল এক্সচেঞ্জ বলতে পারেন।' আলম বলল, 'আলোচনার মাধ্যমে একটা বিনিময়, যাতে দু'দেশের লোক পরস্পরকে আরো ভালোভাবে চিনতে পারে—আবো কাছাকাছি আসতে পারে—'

'তা না হয় হলো।' নিজের ধরনে বললেন অনন্তশেখর, 'কিন্তু, তেলে জলে মিশ খায় কখনো ? খেলে তোমার বাবাও কলকাতা ছাড়তেন না, আমিও ঢাকা ছাড়তাম না !'

কোন কথার উত্তবে কী বলবেন জেনেই যেন আলোচনায় নেমেছেন অনন্তশেখর। অস্বস্তিব মধ্যেও হাসি পেল আলমের। অনন্ত আর কিছু বলেন কি না শোনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বলল, 'মেসোমশাই, আমবা তেলজলের কথা বলি বটে—কারণ দিনের পর দিন এইভাবেই বলানো হয়েছে। কিন্তু কেউই জানি না কোনটা তেল আব কোনটা জল ! একদিন হয়তো বুঝতে পারব দুটোই জল কিংবা তেল—'

'বুঝি না বাবা এ তোমাদের কোন ধরনের ব্যাখ্যা।'

'এখন আর বুঝে কাজ নেই।' এতোক্ষণ চুপচাপ থাকার পর স্নেহ বললেন, 'তুমি হঠাৎ উঠে এলে কেন ! আলম উঠুক। বেচারা ক্লান্ত। এখন ওকে একটু শুয়ে ব'সে কাটাতে দাও—'

আঠারো-উনিশ ঘণ্টার দূরত্ব পাঁচ-সাত মিনিটে কমানো যায় না। বিষাদ চেপে বসে আবো। বোধহয় ঠিকই আঁচ করেছেন স্নেহ, ক্লান্তি আসছে—বিশ্রামেব নামে টান-টান হ'লেই যদি কেটে যায় আঠারো ঘণ্টা, তার চেয়ে সুখের আর কিছু নেই।

আলম উঠে পড়ল। অনন্তশেখবের সঙ্গে কথা বলবার সময়েই গুছিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। এখন বলল, 'বাতে খাবো না, মাসীমা।'

'ও মা, কেন।'

'ওখানে কথা দিয়ে এসেছি, ডিনার আছে। ফিরতেও বাত হবে হয়তো—'

স্নেহ তাকিয়ে আছেন। স্থির। দৃষ্টিটা সহ্য না হওয়ায় হাত মুখ ধুতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল আলম।

বসার ঘরের পাশে গেস্টরুম। স্নেহই বর্ণনা দিয়েছিলেন। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুম আসতে লাগল ঝড়ের গতিতে। শুধু অনুভব করা যায়। কাল্‌কা মেলের গতিতে ? পাশ ফিরে জুত হতে গিয়ে হাসির মধ্যে আচ্ছন্ন হযে পড়ল আলম। এটা চিঠির ভাষা হতে পাবে, সামনা-সামনি উপমা হিসেবে অচল। তখনই বৃষ্টি নামল বড়ো বড়ো ফোঁটায়।

ডেকে দিলেন স্নেহ।

'কোথায় যাবার আছে বলছিলে না ?'

বাইরে তাকিয়ে আলম দেখল সন্ধে হয়ে গেছে, হযতো তার চেয়ে কিছু বেশি এগিয়ে গেছে সময়। বৃষ্টিভেজা, সোঁদা একটা গন্ধ পেল নাকে। কাঠচাঁপার নয। তবে বৃষ্টিও নেই। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে জ্বালা ; অনেক বেলায় খাবার জন্যে হতে পারে। স্নেহ আলো জ্বালতে টেবিলের ওপর থেকে রিস্টওয়াচটা টেনে আনল চোখের সামনে। প্রায় সাতটা। ঘুমের মধ্যেই আরো বারো-তেরো ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো।

পিঠ টান ক'রে জড়তাটুকু কাটিয়ে নিল আলম।

'অনেকক্ষণ ঘুমোলাম, মাসীমা। একটু দেরিই হয়ে গেছে—'

স্নেহর সঙ্গে চোখাচোখি হতে বুঝল তার অন্যমনস্কতার সুযোগে তাকেই লক্ষ করছিলেন স্নেহ। এখন সরে যেতে যেতে বললেন, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও। চা আনছি।'

স্নেহ নয়, রাকার গলা। হয়তো এইভাবেই বলত, ব'লেও ছিল। ধারাবাহিকতা থেকেই যায়—সূত্রগুলো যদিও মনে পড়ে না ঠিকঠাক।

আবো কিছুক্ষণ পবে ট্রামরাস্তাব দিকে এগোতে এগোতে একই কথা ভাবল আলম। মেঘলা আকাশের ধোঁয়া লেগে আছে চারদিকের আলোয়। শনিবাবের সন্ধেয ভিড় থাকে না ট্রামে-বাসে। তা ছাড়া, একটিই ঠিকানা নিয়ে এসেছিল এখানে—নিজের বাড়িব , আর-আব ঠিকানা মনে করতে গেলে ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা দৃশ্যের ধরনে দ্রুত ও এলোমেলো হযে যায় স্মৃতি। সম্পর্কে ঢুকে পড়ে অপরিচয়। এই ভালো, উদ্দেশ্যহীনভাবে চৌরঙ্গির ট্রামে উঠে আলম ভাবল, ফেরার সময় না হওয়া পর্যন্ত থামতে থামতে গড়িযে যাওয়া। তাবপরে ফেরা ; তারও পরে আরো কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তবে সেটা খুব কঠিন নাও হতে পারে। ঘুম যতো তাড়াতাড়ি আসবে ততোই দূরত্ব কমে আসবে বাকাব সঙ্গে। নিজের বাড়ি বলতে যে-আবেগ চঞ্চল ক'রে রাখত সারাক্ষণ, কখনো বুঝতে পারেনি রাকাই পরিণত হয়েছে সেই বাড়িতে। অ্যানাটমি খুঁজলে গা-হাত-পা-মাথার বদলে নমনীয় হয়ে উঠত জানলা-দরজা-সিঁড়ি-চিলেকোঠা !

স্নেহই খুলে দিলেন দরজা। আলম জানে কোথায় বাথরুম, কোথায় গেস্টরুম। ঘরে ঢুকে দেখল, জলের গ্লাস, টর্চ, মৌরির কৌটো সবই চমৎকার গুছিয়ে রেখেছেন মাসীমা। অনুযোগের সুযোগ নেই কোনো।

'আর কিছু লাগবে ?'

'না।' আলম হাসবার চেষ্টা কবল, 'এরপর ঘুমোলেই সকাল—

'তোমাব সেমিনাব তো সোমবার থেকে ?'

আলম ঘাড় নাড়ল। না বললেও একটা কথা তখনো বলার ছিল ; বলল না। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙে তার। ইচ্ছের কথাটা সকালেই বলা যেতে পারে। ভাবল, তখনো সময় থাকবে।

স্নেহ তখনো তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আলম বলল, 'কিছু বলবেন, মাসীমা ?'

'না।' গলার স্বরে আচমকা ভাব। নিজেকে ফিরে পেযে স্নেহ বললেন, 'তুমি শুয়ে পড়ো, বাবা। আমি যাচ্ছি—'

আলোটা নিবিয়ে দিল আলম। দুপুবের টানা ঘুমের পরেও শবীরে এই আরো ঘুমের আলস্য কেন বোঝা যায় না। তবে উপায় না থাকার চেয়ে এই ভালো। ভাবতে ভাবতে হাই তুলল আলম,হাত চাপা দিল চোখে। আচ্ছন্নতার মধ্যেই টেব পেল আশপাশের শব্দগুলো নিঃশব্দ হয়ে আসছে ক্রমশ। ঘুম এইভাবেই আসে।

'আলম ?'

আচ্ছন্নতাব মধ্যেই শব্দটা বিঁধে গেল কানে—ছড়িযে পড়ল গোটা শবীরে। স্বরটা চেনা হ'লেও অনুভূতিটা অচেনা। নিজেকে স্বাভাবিক করাব সময় নিতেই জবাব দিল না আলম।

'আলম কি ঘুমিয়ে পড়েছ ?'

'না, মাসীমা।'

'আমি একটু আসব ?'

এবার নিজেই উঠে আলো জ্বালল আলম। পর্দাটা সরিয়ে স্নেহকে ভিতরে আসার জায়গা ছেড়ে দিল।

'কিছু বলবেন ?'

'না !'

অকারণেই ওর বিছানার বালিশটা ঠিকঠাক ক'রে দিলেন স্নেহ। আধ-খাওয়া জলের গ্লাসের ওপর ঢাকনিটা চাপা দিয়ে বললেন, 'এ-বাড়িতে আরশোলা কম নেই। কিছুদিন আগেই পেস্টিসাইডস্-এর লোক এসেছিল, কী সব ওষুধ ছড়িয়ে গেল। দু'চার দিন। আবার যে কে সেই !'

আলম অনুমান ক'রে নিল, এ-কথা বলবার জন্যেই এখানে আসেননি স্নেহ। ইতস্তত ক'রে চেয়ারটা এগিয়ে দিল সে।

'অনেকদিন পরে আজ আপনাব হাতের রান্না খেয়ে মনটা ভ'রে গেল।'

'কী আর খেলে ! সামান্য মাছ ভাত। বাজার সকালেই হয়ে গিয়েছিল।'

আলম চুপ ক'রে থাকল। এর পরের কথা চালানোর দায়িত্ব স্নেহর।

'তোমার মেসোমশাইয়ের সামনে বলতে পারছিলাম না কথাটা—', থেমে-থাকা থেকে হঠাৎই অন্য গলায় ব'লে উঠলেন স্নেহ, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। বাকাকে নিয়ে তোমার মনে যদি কোনো ইচ্ছে থেকে থাকে, সেটা ভুলে যেও। দোষটা আমার মেয়েরই—সে অন্যায় করেছে—'

আলম পুরোপুরি স্তম্ভিত হবার আগেই আঁচলে আড়াল-করা হাত বের ক'রে একটা খাম এগিয়ে ধরলেন স্নেহ।

'তোমার চিঠি। বাকা দিয়ে গেছে—'

স্নেহর মুখের দিকে তাকিয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ভাঁজ-করা কাগজটা বের করল আলম। বাকারই লেখা—'আমার ব্যাপারে তুমি যতোটা সিরিয়াস, তোমার ব্যাপারে—আমার ধারণা ছিল আমিও ঠিক ততোটাই। তোমার শেষ চিঠিটা পেয়ে যখন মানে বুঝলাম, তখনই ওলট-পালট হয়ে গেল সব। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখলাম, তোমাকে আসতে লিখেছিলাম তুমি আসতে পারবে না জেনেই। তোমার উদ্দেশ্য তো তা নয়—তুমি আমাকে উপড়ে নিয়ে যেতে চাও। তোমার কাছে আমি কতো যে কৃতজ্ঞ! কিন্তু, আলম, সে-মনের জোর আমার নেই। কী একটা বাধা আছে—কী একটা লাগছে কোথায়! সেটা যে কী বুঝিয়ে বলতে পারব না। এই বাধার দেয়ালটা ভাঙবার মতো জোর যখন পাচ্ছি না, তখন দেয়ালটা আরো উঁচু করবার দরকার কি! এই বাধাটার জন্যেই তোমার আমার ঠিকানা বদল হয়ে গেল, আমাদের আগে আরো অনেকের হয়েছে। বাধাটা না থাকলে হয়তো কোনোদিনই পরিচয়ের সুযোগ হতো না আমাদের—এই অক্ষরের পর অক্ষর সাজানো ভালোবাসারও দরকার হতো না। তোমার মতো একজন সৎ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলতে পারতাম না জেনেই পালিয়ে যাচ্ছি। এই চিঠির ভাষাটাও একটু রোমান্টিক লাগতে পারে—তারও কারণ হয়তো এই যে তোমাকে ভালোবাসি। পালিয়ে যাচ্ছি, তার কারণ তোমার ভালোবাসাটা আরো খাঁটি। যে-কষ্ট তোমার হবে, আমার তা হবে না। যদি পারো ক্ষমা কোরো। যদি পারো খোঁজ-খবর নিও। যদি চিঠি দাও জবাব দেবো। তা ছাড়া, মিথ্যে জেনেও তো আমরা অনেক বিষয়কে সত্য ক'রে জিইয়ে রাখতে ভালোবাসি! বাসি না?'

মাঝামাঝি এসেই নিঃশ্বাস সহজ করতে শুরু করেছিল আলম। এখন চিঠিটা ভাঁজ ক'রে ভ'রে নিল খামে। ছেঁড়া কাগজের একটা ছোট্ট ফালি পড়ে গিয়েছিল মেঝেয়, সেটাও তুলে নিল ঝুঁকে। অনায়াসে হাসল স্নেহর দিকে তাকিয়ে।

'বাকা কিন্তু ভাষাটা খুবই সুন্দর শিখেছে, মাসীমা! এতো সুন্দর লেখে!'

'জানি না বাবা কেন এ-কথা বলছ!' স্নেহ বললেন, 'তুমি আসছ শুনেই কেমন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল!'

আলম জবাব দিল না।

'শুয়ে পড়ো। কর্তাকে বলেছি কাল ইলিশ আনতে। বাঁধবো তোমার জন্যে।'

আলম হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন গঙ্গার ইলিশ খাইনি।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে থেমে দাঁড়ালেন স্নেহ।

'আলোটা নিবিয়ে দেবো?'

'আপনি ভাববেন না। আমিই নিবিয়ে দেবো।'

'তোমার তবু আসার সুযোগ আছে। আমাদের তো সে-রাস্তাই বন্ধ। জন্ম কর্ম সবই ওখানে—মাঝে মাঝেই টানে। বিশেষ ক'রে তোমার মেসোমশাইয়ের। দশ বছর হয়ে গেল, নিজেদের বাড়ি-ঘর-বলতে সবই এখন এখানে। তবু যে কেন নিজেদের উদ্বাস্তু লাগে!'

স্নেহর কথা যেখানে শেষ হলো সেইখানেই নৈঃশব্দ্যের শুরু। রাত কম হয়নি। টেবিলের ওপর খুলে রাখা রিস্টওয়াচটা তুলে দেখল, সাড়ে বারোটা। অনেকক্ষণ পরে পরে এক-একটা গাড়ি যাচ্ছে, তার শব্দ। বাড়ির সামনে দিয়ে একটা রিকশা গেল ঠুং-ঠুং ঘণ্টি বাজিয়ে। ধ'রে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল আলম। আলো নিবিয়ে বিছানার ওপর বসল।

নে, এখন সে কী করবে। মানুষের ধাবাবাহিকতা তার রক্তে ; ঠিকানায় নয়। অনেকদিন আগে এবং বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবার আগে ছাদে উঠে নামাজ পড়েছিলেন বাবা—সে অন্তত সেই দৃশ্যেব সাক্ষী ছিল। সব হারানোর পরেও যে-বিশ্বাসে নতজানু হয়েছিলেন বাবা, তাব তো সে-বিশ্বাসও নেই। চোখেব কোণে জমে-ওঠা জলবিন্দুটুকুও এই বাতের অন্ধকারে সে নিজেই মুছে নিতে পারে।

স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে আলম বলল, তুমিও কিছু কম সৎ নও, রাকা।

বিবেক

গাড়ি থেকে নামতে নামতে জহর বলল, 'গাড়ি গ্যারাজ কোরো না এখন। আমাকে বেরুতে হবে এক্ষুনি।'

ড্রাইভারের কেতা অনুযায়ী গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল জনার্দন। জহর নামবার পর শরীর ঠেলতে ঠেলতে জহরের স্ত্রী সীতাও নেমে এলো। সামনে পুজো। দুপুরে, জহর যখন অফিসে এবং অন্যত্র যাবার উপলক্ষ নেই, গাড়িটা চেয়ে নিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে গিয়েছিল বাজার করতে। ফেরার সময় অফিস থেকে তুলে এনেছে স্বামীকে। বাজার-করা প্যাকেটগুলো এখন তার বুকে ধরা।

সীতা নামবার পর দরজাটা বন্ধ ক'রে জনার্দন বলল, 'স্যার আজ একটু ছুটি পেলে ভালো হতো।'

জহর সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল, পিছনে সীতা; ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তার মানে!'

'আমার ছোট মেয়ের জ্বর।' জনার্দন মাথা চুলকে বলল, 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো —'

'সেটা আগে বলোনি কেন? আগে বললে অন্য কোনো ড্রাইভারকে বলতাম। এখন আমার জরুরি কাজ, এখনই তোমার যাবার তাড়া!'

সীতা এসে দাঁড়াল জহরের পাশে। পড়ো-পড়ো একটা প্যাকেট আগলে ধ'রে চাপা গলায়, যাতে দূরে দাঁড়ানো জনার্দনের কানে কথাগুলো না পৌঁছয়, বলল, 'একটু আস্তে বলো না!'

জনার্দন চুপ ক'রে আছে। অন্য কিছু না পেয়ে এইমাত্র বন্ধ করা দরজাটা আবার খুলে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে সাইড গ্লাস তুলতে লাগল। মুখে ঈষৎ থমথমে ভাব।

কোনো কোনো ব্যাপারে স্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলে জহর। হয়তো বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোরে বলেছিল কথাগুলো, এই ভেবে আগের চেয়ে নরম গলায় বলল, 'জ্বর মানে তো ইনফ্লুয়েঞ্জা? কাল সকালে দেখালেও চলবে। কাল বরং একটু দেরিতে এসো।'

জনার্দন মুখ তুলল। দ্বিধাগ্রস্ত।

'একটা বেলা আপনি নিজে ড্রাইভ করতে পারবেন না, স্যার? আমি বাড়িতে ব'লে এসেছিলাম —

'আমি পারব কি না সেটা তোমার জানার ব্যাপার নয়। থাকতে হয় থাকো, যেতে হয় যাও —

জহর দাঁড়াল না আর। তার আগেই কাঠের সিঁড়িতে পা রেখেছিল সীতা। ভঙ্গিতে দ্রুত ওপরে ওঠার চেষ্টা।

আঠারো বছরের মেয়ে বাগিণী লম্বায় তার চেয়ে চার ইঞ্চি বড়ো হয়ে ওঠার পর থেকে নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছে সীতা। ছেচল্লিশ বয়সটাকে টেনে কুড়ি কিংবা বাইশে নামানো যায় না। কোমর, গলা ও কনুইয়ের আবছা ভাঁজ ও দাগগুলোকে মসৃণ করা সহজ নয়। স্তন ভারী হ'লেও টান-টান ভাবটা নেই আর, ইদানীং পাছাও ভারী হয়েছে। তবু ওরই মধ্যে নিজেকে একটু আধটু মানানসই নিশ্চয়ই ক'রে তোলা যায়। সেই চেষ্টায় যেসব ব্যাপারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে সীতাকে, তিন ইঞ্চি প্লাটফর্মের চপ্পল ব্যবহার তার একটি। ইচ্ছে আছে এবার যোগাসন শুরু করবে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সীতার দোতলায় ওঠা শব্দময় হয়ে উঠল।

মেজাজ খারাপ থাকার কারণেই শব্দটা কানে লাগল জহরের। পিছন থেকে তাকিয়ে মনে হলো সীতা নয়, অন্য কেউ —পারস্পেকটিভের গোলমালে চৌকো লাগছে। আজকাল যতোটা পারে একা বেরোয় জহর। সীতাও আলস্য বোধ করে; সঙ্গী হবার জন্যে জেদ করে না।

গত আষাঢ়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে তাদের পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী। দিনটিকে পঁচিশ বছর আগেকার সেই দিনটিতে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে জহর টের পেয়েছিল, দাম্পত্য-সম্পর্ক একটি অভ্যাস মাত্র, শরীরের

উদ্দাম কখনোই সঞ্চারিত হয় না তাতে। সম্পর্ক অথবা শরীরের কথা ভাবতে গেলে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। তিপ্পান্ন ছুঁই-ছুঁই বয়সেও সে যেরকম তরুণ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত —এ-বছরই তাকে বোর্ডে নমিনেট করেছে কোম্পানি— তাতে আর একটি মেয়েমানুষ জুটিয়ে নেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। তাহ'লে সীতাকে কমোডিটি এবং কমোডিটির লাইফস্প্যান ফুরিয়ে গেছে ব'লে ভাবতে হয় এবং ফেলেও দিতে হয়। সেটা কবতে গেলে বিবেকে লাগে। জহরের বিবেক অত্যন্ত প্রখর ; সত্যি বলতে, এ-পর্যন্ত তাব ধাপে ধাপে সাফল্য অর্জনের সবটাই বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা চালিত। শুধুই শরীর ঢ্যামঢেমে ব'লে বাতিল করতে হবে স্ত্রীকে —এরকম অন্যায়ে সায় দেয়নি তার বিবেক। বরং মেনে নেওয়া থেকে সম্পর্কটাই গ্রহণ করেছিল সে। তা ব'লে সীতার প্লাটফর্ম স্টাইলের জুতো এবং সিঁড়ি ওঠার বেয়াড়া শব্দটাকেও দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত ক'রে মেনে নিতে হবে এমন ভাবা যায় না।

নীচে থেকে তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে আরো পাঁচ সিঁড়ি ওপরে দোতলার দিকে বাঁক নেওয়া সীতার উদ্দেশে ঈষৎ বিরক্ত গলায় জহর বলল, 'এতো দৌড়ানোর কী আছে ! বাড়ির পরে তো আর কিছু নেই !'

'ওমা ! দৌড়লাম কোথায় !' পিছন ফিরে জহরের দিকে তাকিয়ে অসন্তুষ্টির কারণটা অনুমান করতে পারল সীতা এবং অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'জুতোয় শব্দ হ'লে আমি কী করব !'

'না, তুমি আর কী করবে !'

সীতা দাঁড়িয়ে পড়ায় এবং জহর উঠে আসায় পাশাপাশি হলো দু'জনে। বাকি চারটে সিঁড়ি উঠল এক সঙ্গে। বালীগঞ্জ পার্কে কোম্পানির দেওয়া এই ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর কেটে গেছে সাত-আট বছর। এখনকার কথা আলাদা। সেইসব গোড়ার দিকে—যখন এতোটা ভারী হয়ে ওঠেনি সীতা, কিংবা জহরও এতোখানি ব্যস্ত—তাদের প্রতিযোগিতা ছিল কতোটা নিঃশব্দ হয়ে এই বাড়ির আরো পাঁচটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সভ্যতা শেখানো যায়। তখন অবশ্য পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর অভ্যাস ছাড়াও ছিল আরো অনেক কিছু।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সীতা বলল, 'রাগটা তো ড্রাইভারের ওপরে। শুধু শুধু আমাকে কথা শোনাচ্ছ কেন !'

কলিং বেলে চাপ দিল জহর। সীতার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'লোকগুলো এতো ইরেস্পন্‌সিবল ! লাস্ট উইকে নিজের জ্বর ব'লে কামাই করল একদিন। আজ মেয়ের জ্বর ! অজুহাতের অভাব নেই কোনো—'

'যাঃ ! এভাবে বোলো না।' সীতা স্বামীকে দেখল, সকালে কামানো গালের পেলবতা এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা। বিক্ষিপ্তভাবে চিকচিক করছে কয়েকটা সাদা বিন্দু। দেখতে দেখতেই বলল, 'মেয়ের জ্বরের কথাটা আমাকে ও আগেই বলেছিল। কিড্‌নি ইনফেক্‌শান—'

'তোমাকে কী বলেছিল সেটা ইমপর্ট্যান্ট নয়।'

দরজা খুলল কৌশিক। সি-এ ফাইনাল দেবে এ-বছর। পড়াশুনা করার জন্যে এখন যতোটা পারে বাড়িতেই থাকে। মাথায় জহরের সমান, স্বাস্থ্যেও। স্যান্ডো গেঞ্জিতে চোখে পড়ে হাতের পেশীর সৌন্দর্য। রাত জাগার ফলেই সম্ভবত অল্প ক্লান্তির ছাপ ফুটেছে মুখে। ডান গালের জুলপির পাশে দু'তিনটি ব্রণও অস্পষ্ট নয়।

সীতা বলল, 'তুই উঠে এলি ! নৃসিংহ কোথায় ?'

'এই তো, আসছি ব'লে বেরুলো। কোথায় যে গেল !' কৌশিক বলল, 'আমিও চা খেতে পারছি না !'

এই কথায় চোখাচোখি হলো সীতা ও জহরের। ছেলের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে সীতা বলল 'আচ্ছা, আমি ক'রে দিচ্ছি। রাগিণী ফিরেছে ?'

'হ্যাঁ। বাথরুমে।'

জহর আগের কথায় থেমেছিল ; কথাটা শেষ করল অফিসের পোশাক ছাড়তে ছাড়তে।

এখন ছ'টা। সাড়ে ছ'টা, বড়ো জোর পৌনে সাতটার মধ্যে বেরুতে হবে তাকে। তার আগে দাড়ি কামাতে হবে, সময় পাওয়া সাপেক্ষ স্নানটাও ক'রে নেওয়া দরকার। লোকটা, সত্যি বলতে, শুধু মেজাজই খারাপ ক'রে দেয়নি, একটা ঘিনঘিনে ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে শরীরে। আগের কোম্পানিতে লকআউট হবার পর হত্যে দিয়েছিল একটা চাকরির জন্যে। ওখানে পার্মানেন্ট ছিল না, এখানেও পার্মানেন্ট হবার সুযোগ নেই কোনো। তবে গাড়িটা ভালো চালায় এবং আদব-কায়দায় ভদ্র দেখে নিজের গাড়িতেই জুতে নিয়েছিল জহর। ইদানীং মনে হচ্ছে বদলে যাচ্ছে একটু-একটু ক'রে। গতকালই গাড়িতে পোড়া বিড়ির টুকরো খুঁজে পেয়েছিল জহর।

চায়ের জল চাপিয়ে এসে যতো দ্রুত সম্ভব কাপড় বদলাতে লাগল সীতা। ব্লাউজ বদলালো দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে। এটা ওর পুরনো অভ্যাস।

'এ লোকগুলোর কনসেন্স্ ব'লে কিছু নেই। কাজ ক'রে টাকা রোজগার করতে হয় ব'লেই একটা কাজ করা। হোয়াট দে ল্যাক ইন ইজ অ্যান অ্যাটিচ্যুড টুওয়ার্ডস্ ওয়ার্ক! অফিসে বললেও পারত। আমি অন্য ড্রাইভার নিতাম!'

'যাক্‌গে—।' রাগিণী বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। লীভিং রুম থেকে ওর 'তোমরা ফিরেছ!' শুনে, জবাব না দিয়ে, সীতা বলল, 'কনসেন্স্-টেন্স ওদের বেলায় খাটে না। লোকটা তো খারাপ নয়। অফিসের বাঁধা ড্রাইভারের চেয়ে এরকম পার্সোনাল ড্রাইভার অনেক ভালো। তা ছাড়া—'

দরজায় বেল পড়ায় উৎকর্ণ হলো সীতা। শাড়ি জড়ানো শেষ হয়েছে ততোক্ষণে। আঁচলটা কোমরে গুঁজে বলল, 'কে এলো, রাগিণী?'

'জনার্দন।' দরজা বন্ধ ক'রে ওদের ঘরের বাইরের পর্দা পর্যন্ত এসে রাগিণী বলল, 'বাবা, ড্রাইভার বলল ও নীচেই আছে—'

'কী বলবে এবার! স্রেফ চাকরি যাবার ভয়ে।' স্বামীকে লক্ষ করতে করতে সীতা বলল, 'বেচারা! মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিল!'

জহর বাথরুমে ঢোকার উদ্যোগ করছিল। খানিক চুপ ক'রে থেকে বলল, 'সাফারি স্যুটটা বের ক'রে রাখো।'

'নিজে তো আজকাল ড্রাইভ করা ছেড়েই দিয়েছ! মাঝে মধ্যে বেরুলেই তো পারো? এর পর অভ্যাস চ'লে যাবে।'

'ড্রাইভ করাটা কিছু নয়।' ঈষৎ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে জহরকে। বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বলল, 'কলকাতায় আজকাল যা হয়েছে! পার্কিংয়ের জায়গা পেতেই এক ঘণ্টা লাগে। অন্য ঝামেলা—'

জহর একটু থামল, তারপর বলল, 'আমার প্রব্লেম আমাকেই বুঝতে হয়।'

কোনো-কোনো সময়ে সীতাও এইভাবে বলে। যে-সমস্যা একার নয়, দু'জনের কিংবা আরো অনেকের, তা-ই হয়ে ওঠে একার। কিংবা শুধুই আলোচনার বিষয়ও হঠাৎ কোনো একটি কথায় বাঁক নেয় সমস্যায়। একবার সমস্যার ভিতর ঢুকতে পারলে নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যায় আড়াল। লুকানো যায় নিজেকে। যে-কোনো ব্যাপারেই আছে দুটো দিক—জহর সব সময়েই ভাবে, হয় আক্রমণ, না হয় আত্মরক্ষা। শুধু জীবন নয়, পেশা থেকেও সে শিখেছে অনেক। আত্মরক্ষার জন্যেই মাঝে মাঝে শানিয়ে নিতে হয় আক্রমণ।

কথা থামিয়ে ইচ্ছাকৃত নৈঃশব্দ্য ডেকে আনল জহর। একবেলা ছুটি দেওয়াটা কিছু নয়; কিন্তু বেশ কিছুদিন কাজ ক'রেও যদি লোকটা বুঝতে না পেরে থাকে জহরের সময় ও ব্যস্ততা মূল্যবান এবং পরিকল্পিত, তাহ'লে অবশ্যই ভুগতে হবে তাকে। এখনই মনে পড়ল, সকাল ন'টায় যখন ডিউটিতে আসে জনার্দন, তখনই জানত বিকেলে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে হবে মেয়েকে। তখনো বলতে পারত। বোধহয় ধ'রেই নিয়েছিল, জহর আপত্তি করবে না। এই ধ'রে নেওয়ার ব্যাপারটা ঢুকে পড়েছে এদের কালচারে—অবশ্য কালচার ব'লে যদি কিছু থাকে, এবং রক্তে। এতো বছরের অভিজ্ঞতায় এখন আর অস্পষ্ট লাগে না কিছু। অফিসেও দেখেছে, কতোগুলো বাঁধাধরা অজুহাতের ওপর নির্ভর ক'রে কাজ করে লোকগুলো—আমি ভেবেছিলাম, কী ক'রে বুঝব, ভুল তো মানুষই করে, ইত্যাদি। যাদের

খেসারত দিতে হয় তারাই বোঝে। যে-কোনো ব্যাপারেই কারেক্ট অ্যাটিচ্যুড না থাকলে কিছুই চলে না ঠিকঠাক। দে টেক এভ্‌রিথিং ফর গ্রান্টেড—দে ডিজার্ভ্ টু বি পানিশ্‌ড্। যদি গুরুতর কিছু হতে তাহ'লে অবশ্যই লোকটা আজ কাজে আসত না।

জহর আরো বিরক্ত এবং গম্ভীর হতে লাগল ক্রমশ। আর কিছুক্ষণ পরেই লায়ন্‌স্ ইন্টারন্যাশনালের মাসিক সমাবেশে বাণিজ্যে সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে প্যানেল ডিসকাসনে বক্তৃতা দিতে হবে তাকে। দুপুর থেকেই সেজন্যে প্রস্তুত করছিল নিজেকে। তুচ্ছ কিন্তু ঘ্যানঘেনে এই ঝামেলাটা ক্রমশ মনোঃসংযোগ নষ্ট ক'রে দিল তার।

যেতে যেতে বৃষ্টি নামল ঝিরঝিরে। কিছুদূর যাবার পরেই বৃষ্টির রেণু জমে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল সামনের কাচ। সামনে কী আছে না আছে দেখা যায় না ভালো ক'রে। পিছনের সীটে ব'সে কিছুটা বিরক্ত হয়ে জহর ভাবল কোথায় যাবে তার নির্দেশ দিলেও সে এমন কিছু বলেনি যাতে মনে হতে পারে দেরি হয়ে গেছে, সুতরাং প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত গাড়ি চালানো দরকার। মনে হচ্ছে আরো ঝেঁপে নামল বৃষ্টি। কিছু দেখা যাচ্ছে না-ই শুধু নয়, পিছল রাস্তায় হঠাৎ ব্রেক কষলে স্কিড্ করতে পারে গাড়ি। অস্পষ্টতার মধ্যে দেখল, প্রায় হেডঅন হতে হতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল একটা মিনিবাস।

'কী ব্যাপার, জনার্দন! ওয়াইপার চালু করছ না কেন!'

'আমি দেখতে পাচ্ছি—'

সোজা কথার জবাব। বলার ধরন থেকেই জহর বুঝতে পারল লোকটি ক্ষুব্ধ। তার কাজ গাড়ি চালানো—জহরের নির্দেশ অনুযায়ী যেখানে যাবার নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ধ'রেই নিয়েছে, সে দেখতে পেলেই হলো—জহরের ভাবনার কারণ নেই কোনো। বেপরোয়া ভাবটা নিশ্চয়ই ছুটি না পাবার জন্যে। এটাও এক ধরনের অবাধ্যতা।

ভিতরে ভিতরে রাগছিল জহর। আরো দু' এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলল, 'ওয়াইপার চলছে না?'

এবার আর জবাব দিল না জনার্দন। পরিবর্তে, গাড়িটা হঠাৎ দাঁড় করালো রাস্তার ধারে। জহর লক্ষ করল, ড্যাশবোর্ডের পাশের বাক্স থেকে ওয়াইপার দুটো বের ক'রে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে জনার্দন। ভিজতে ভিজতেই বনেটে ঝুঁকে লাগিয়ে নিল রাবার দুটো। ঝাড়ন নিয়ে কাচের গায়ে লেগে-থাকা জল বা বাষ্প মুছে ফিরে এলো গাড়িতে। কাঁধ, পিঠ, অনেকটাই ভিজেছে। জল গড়াচ্ছে কানের পাশ দিয়ে।

'এগুলো আগে ক'রে রাখো না কেন!' কিছু বলবে না ভেবেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না জহর। বলল, 'এরপর কাল বলবে নিজেরই জ্বর!'

'বৃষ্টি তো এই নামল।' জনার্দন বলল, 'আপনি চলুন না, স্যার! আমার জন্যে ভাববেন না!'

আয়নায় যে-মুখ ফুটে ওঠে তাতে একই সঙ্গে ক্রোধ এবং হাসি। ঠোঁট দু'টি চাপা থাকার জন্যে ঘৃণাও মিশেছে মনে হয়। পাশে তার নিজের মুখের আধখানা। দৃষ্টি সামনে থাকলেও চোখের ভিতর চোখ ব'লে যদি কিছু থাকে তাহ'লে জনার্দন তাকেই দেখছে। এই মুহূর্তে তার এবং জনার্দনের মধ্যে তফাতটা স্পষ্ট বুঝতে পারল জহর। আয়নার পরিধি থেকে দূরে যাবার জন্যে চোয়াল শক্ত ক'রে স'রে গেল বাঁদিকে।

গ্র্যান্ডের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আবার দরজা খুলে দাঁড়াল জনার্দন। জহর নেমে এগিয়ে যাবার মুখে পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল, 'খুব দেরি হবে, স্যার?'

জহর থেমে দাঁড়াল।

'কেন!'

জনার্দনের মুখে একটু আগে দেখা রুক্ষতা নেই। বরং বিনীত। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'দেড় দু'ঘণ্টা সময় পেলে আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারতাম।'

পিছন থেকে হর্ন দিচ্ছে অন্য একটা গাড়ি। মেট্রো রেলের কাজকর্মের জন্যে এমনিতেই চওড়া কমে গেছে রাস্তার, তার ওপর পিক আওয়ার্স্ কাটেনি এখনো। এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে জ্যাম কাটিয়ে পর পর দু'টি ডাবল ডেকারকে এগিয়ে আসতে দেখে অধৈর্য বোধ করল জহর এবং গুছিয়ে কিছু ভাববার

আগেই পৌঁছে গেল সিদ্ধান্তে। কতোক্ষণ লাগবে সে নিজেও ঠিক জানে না। তাছাড়া, ইতিমধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যাতে আগের ডিসিসন বদলাতে হবে তাকে। অ্যাট টাইম্‌স্ ইউ নীড টু বি টাফ্—বাজি হয়ে ঘাড় নাড়লে জনার্দন ধ'রে নেবে ডিউটিতে থাকার সময় এইভাবে যাওয়া-আসাটাও তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। পরে সুযোগ নিতে পারে।

'তুমি এখানেই থাকো।' জহর দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি যে-কোনো সময় বেরিয়ে আসতে পারি। এদিকে লক্ষ রাখবে।'

পিছনে তাকানো দরকার হয় না। হোটেলের ভিতরে ঢুকে কার্পেটের ওপর পায়ের জুতোর চাপ পড়তেই নিজেকে ফিরে পেল জহর। এখনকার হাঁটা-চলার ধরনটা আলাদা। এখন অবশ্যই সে সীতার স্বামী নয়, কিংবা, জনার্দন তার গাড়ির ড্রাইভার নয়। এমনকি সে যে কৌশিক ও রাগিণীর বাবা, সেটাও না ভাবলেও চলে। একার পরিচয়ে ফুটে ওঠে আলাদা ধরনের ব্যক্তিত্ব। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস না কী যেন ক্লিশে আছে একটা—ভাবনাটা পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে নিজের মনে স্বচ্ছন্দে হাসল সে এবং ভাবল, শক্তি আসে মানুষের ভিতর থেকে, নিজের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও অহঙ্কারবোধ থেকে, দায়িত্ব ও বিবেকবোধ থেকে। এগুলির অভাব শৈথিল্য আনে আত্মবিশ্বাসে। তখনই শুরু হয়ে যায় গোলমাল—কোনটা করা উচিত, কোনটা না, কিংবা, যেগুলো করা উচিত তার মধ্যেও ঠিক কোনগুলো আগে করা উচিত—এসব বিষয়েও নষ্ট হয়ে যায় সমস্ত চিন্তা। ইদানীং যেটাকে আমরা নিরাপত্তার অভাব ব'লে বর্ণনা করছি—আসলে তারও মূলে আছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। আত্মিক সঙ্কটও বলা যায়। নৈতিক সঙ্কটের জন্ম এই আত্মিক সঙ্কটে। সমাজের নীতি কোনো আলাদা নীতি নয়—বিভিন্ন ব্যক্তির নীতিবোধজনিত ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয় সমাজের নীতি ও দায়িত্ববোধ। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সেগুলি কীভাবে কতোটা প্রয়োজ্য হবে না হবে—তারও নির্দেশ আসে সমাজ থেকে। যে-সমাজের কাঠামো বা মানসিকতা পরিচ্ছন্ন ন্যায়-নীতি-বিবেক দ্বারা চালিত হয় না, সেখানে শিল্পনীতির ভিতরেও দুর্নীতি, অস্পষ্টতা এবং দায়িত্বহীনতা থাকতে বাধ্য। তবে, আশার কথা, সমাজবদ্ধ হয়েও কোনো কোনো মানুষ যেমন বিদ্রোহ করে সমাজেরই বিরুদ্ধে, তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এমন বিদ্রোহী দেখা দিতে পারে। একটি কি দু'টি ব্যতিক্রম থেকেই সৃষ্টি হতে পারে অসংখ্য ব্যতিক্রম। আমেরিকায় র‍্যাল্‌ফ্ নাদার যখন পণ্যের ভোক্তা বা কনজিউমারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে পণ্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন—তখন তিনিও ছিলেন একা। এখন আর তা নয়। এখন বিশ্বের সর্বত্রই—এমনকি ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই আন্দোলন। আসলে যেটা দরকার তা হলো প্রত্যেকেরই নিজের দিকে তাকানো এবং নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করা, আমি যা করছি সেটাই ঠিক কি না। প্রশ্নে সততা থাকলে উত্তরটাও আসবে যথাযথ হয়ে। সেজন্যে কম্যুনিস্ট কিংবা ক্যাপিটালিস্ট কোনো আদর্শের দিকেই তাকাতে হবে না।

সমাবেশ ভিড় কম হয়নি। চেনা এবং অচেনা, বলতে উঠে দু'রকম মুখই প্রত্যক্ষ করেছিল জহর। বলতে উঠেই সে বুঝতে পেরেছিল বিষয়টা সম্পর্কে মনে কিছু প্রস্তুতি থাকলেও নির্দিষ্ট কোনো বক্তব্যে পৌঁছুনোর ঠিকানা জানা নেই তার। সেইজন্যেই শুরু করেছিল ছাড়া-ছাড়া, আলগা কিছু কথাবার্তা দিয়ে। কিছু দূর এগোবার পর বুঝতে পারে শ্রোতারাও বুঝবার জন্যে ব্যস্ত নয় খুব ; বক্তব্যের চেয়ে বলার ধরনটাই তাদের টানছে বেশি। স্টাইলটা রপ্ত করতে পারলে এমনিতেই এসে যায় আত্মবিশ্বাস—তখন মোটামুটি ধারাবাহিকতা রেখে যা হোক কিছু বলা যায়। হাততালির শব্দ গোনা যায় না, তবু বহর দেখে জহর অনুমান ক'রে নিল বাকি তিনজন বক্তার চেয়ে সে অনেক বেশি সফল।

সেমিনারের পর ককটেলে ঘিরে ধরল কেউ কেউ। তাদেরই কোম্পানির আর একজন ডিরেক্টর, মিস্টার ব্যানার্জি নিজে আসতে পারেননি, পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রী ও মেয়েকে। অন্যরা স'রে যাবার পর মেয়েকে দেখিয়ে মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'রিমা খুব ইম্‌প্রেস্‌ড্ আপনার লেকচার শুনে। ও কিছু প্রশ্ন করতে চায় আপনাকে।'

'বেশ তো, করুক।' মিসেস ব্যানার্জির বয়স কম না স্বাস্থ্য ভালো প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিকঠাক ধরতে পারল না জহর। এর আগেও দেখেছে বার দুয়েক, মিস্টার ব্যানার্জির পাশাপাশি—এমন খোলা দৃষ্টিতে

নয়। ওঁকে দেখতে দেখতেই জহর বলল, 'অবশ্য উত্তর দিতে পারব কিনা জানি না।'

'অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো কোয়েশ্চেন নেই। আপনি এতো ডিফারেন্ট ফ্রম আদারস্!' বলতে বলতে আঁচল ফেলল এবং গোছাল রিমা, সিল্কের শাড়ি এসব ভঙ্গিতে চট ক'রে তৎপরতা এনে দেয়। বলল, 'একটা সিলি কোয়েশ্চেন করছি। আপনি কি কম্যুনিস্ট?'

'কম্যুনিস্ট!'

মেয়েকে ইতস্তত করতে দেখে মিসেস ব্যানার্জি বললেন, 'আপনারা আলাপ করুন। আমি আপনার জন্যে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে আসি।'

যেতে হলো না অবশ্য। গোল ট্রে-তে হুইস্কির গ্লাস সাজিয়ে ঘোরাফেরা করছিল বেয়ারা। সামনে আসবার পর মিসেস ব্যানার্জিকে তুলতে দিয়ে, নিজেও একটা গ্লাস তুলে নিল জহর, 'চিয়ার্স', বলল, 'কম্যুনিস্ট-টম্যুনিস্ট বুঝি না। আমি মানুষ বুঝি।'

কথাগুলো বলতে পেরে খুশি হলো জহর। চুমুক দিতে দিতে হঠাৎই মনে পড়ল তার, জনার্দন চ'লে যেতে চেয়েছিল। এক হিসেবে লোকটার প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রচ্ছন্নভাবে হ'লেও ন্যায়-নীতি-বিবেক ইত্যাদির যে-লাইনটা সে নিল তার উসকানি এসেছিল ওই লোকটারই ব্যবহার থেকে। দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগ শুধু বাণিজ্য-জগতের ওপরতলার মানুষদের বিরুদ্ধে কেন—এ-প্রশ্নও তুলতে যাচ্ছিল, সামলাতে পারবে না ভেবে চেপে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। এখন সাড়ে আটটা। জহর চ'লে যাবার কথা ভাবল—সত্যি বলতে ককটেল ছাড়া এখন আর উপলক্ষও কোনো। তবু ইচ্ছেটাকে টানতে পারল না বেশিদূর। ক্রোধ ও হাসি মেশানো একটি মুখ ভেসে উঠল তার চোখে—খুঁটিয়ে দেখলে ঘৃণাও চোখে পড়ে। আর কিছু না ভেবে স্বচ্ছন্দ হবার জন্যে দ্বিতীয় গ্লাসটির দিকে হাত বাড়াল সে।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ নীচে নেমে জহর বুঝতে পারল রাত একটু বেশিই হয়ে গেছে। আচ্ছন্নতা ছিলই, তার ওপর বৃষ্টিতে ঝাপ্সা লাগছে চারদিক। প্রায় ফাঁকা রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ পরে পরে ছুটে যাচ্ছে মোটর কিংবা বাস। আশপাশে আরো তিন-চারজন দাঁড়িয়েছিল। তারা গাড়িতে উঠে চ'লে যাবার পর গাড়ি নিয়ে এলো জনার্দন।

'ঘুমুচ্ছিলে না কি!' জহর বিরক্ত হয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—'

'ঘুমোবো কেন, স্যার! আপনি তো এই নামলেন!' জনার্দন বলল, 'আপনি হুঁশে নেই। তাই মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ!'

'কী বললে!'

সম্ভবত এতো জোর গলায় কখনোই কথা বলে না জহর। দরজা খুলে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়েছিল জনার্দন। বলল, 'আসুন, স্যার। উঠে পড়ুন। আপনি ভিজছেন!'

জহর স্থির হলো না তবু। বাস্টার্ড কথাটা উচ্চারণ করার ইচ্ছেটা চিনল শুধু, বলল কি না নিজেও বুঝতে পারল না। তারপর বলল, 'ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম ড্রাঙ্ক!'

'আসুন, স্যার। গাড়িতে উঠুন—'

'বিকেল থেকেই লক্ষ করছি তুমি উল্টোপাল্টা করছ! তোমার মতো হাজারটা ড্রাইভারকে আমি গাড়ি চালানো শেখাতে পারি—'

'স্যার!'

যা করার নয় জহর হঠাৎ তা-ই করল। জনার্দনের খুলে-ধরা দরজা দিয়ে না উঠে গাড়ির পিছন ঘুরে চ'লে গেল সামনের দিকে, দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভারের সীটে।

উল্টোদিক থেকে তাড়াহুড়ো ক'রে জনার্দনও উঠে এলো গাড়িতে। সেল্ফ্ দেবার পর জহর যখন গীয়ার তুলছে, ব্যস্ত গলায় বলল, 'স্যার, আপনি হুঁশে নেই। আমাকে চালাতে দিন—'

'কে চালাবে না চালাবে সেটা আমি ঠিক করব।' ক্লাচ ছাড়ার গোলমালে বেয়াড়াভাবে দুলে উঠল গাড়িটা, বন্ধ হয়ে গেল। আবার স্টার্ট করতে করতে জহর বলল, 'আমি কারুর ওপর ডিপেন্ড্ ক'রে চলি না। আমরা চাকরি ভালো না লাগলে তুমি নিজের রাস্তা দেখে নিতে পারো!'

জনার্দন চুপ ক'রে থাকল।

এক দমকে অনেকটা এগিয়ে গেল গাড়িটা। অ্যাকসিলারেটরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ দিচ্ছে জহর। রাস্তা ফাঁকা ব'লেই বাঁচোয়া। তা না হ'লে বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় এমন বেপরোয়া গাড়ি চালালে যে-কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বিপজ্জনক কিছু। সামনের কাচে জল জমছে দেখে ওয়াইপারটা চালু করার চেষ্টা করল জহর—ডান হাতে স্টীয়ারিং, বাঁ হাতটা ঘোরাফেরা করছে ড্যাশবোর্ডের ওপর। নাগাল পাচ্ছে না। জহর কী চায় অনুমান ক'রে ওয়াইপারের সুইচটা চালিয়ে দিল জনার্দন। সামনে পার্ক স্ট্রিট। চৌরঙ্গি রোড থেকে যেভাবে বাঁ দিকে টার্ন নিল জহর, তাতে এক চুলের এদিক ওদিকে ফুটপাথে ওঠা থেকে বেঁচে গেল গাড়িটা। তটস্থ হয়ে জনার্দন দেখল, রাস্তায় নামবার জন্যে ছাতা মাথায় যে-লোকটা আসছিল, চকিতে পিছনে স'রে গেল সে। পাঁচ সেকেন্ড আগে হ'লেই চাপা পড়ত লোকটা।

'স্যার—'

'শাটাপ!' জহরের চোখ সামনে, আরো একটু এগিয়ে উল্টোদিকে থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্যাক্সিকে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'কথা বলবে না। যা বলার কাল সকালে বলবে—'

বৃষ্টিটা ধ'রে আসছে। হেড লাইটের আলোয় পরিচ্ছন্নভাবে দেখা যায় না কিছু—চকিত একটা গাড়ি কিংবা পথচারী ভেসে উঠেই ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে আবার। এভাবে হেডলাইট জ্বেলে রাখাও ঠিক নয়, উল্টোদিকের গাড়ির ড্রাইভারের চোখে ধাঁধা লাগতে পারে। জহরের পক্ষেও বিভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয় কিছু।

ক্যামাক স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে পিছনে গাড়ির হর্ন শুনে জনার্দন মরিয়া হয়ে বলল, 'কী পাগলামি করছেন! স্ট্রেট লাইনে গাড়ি চালান!'

'কী বললে!'

পিছনের গাড়িটা ডান দিকে অনেকটা জায়গা নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর জনার্দনের হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনে রাস্তা পার হচ্ছে তিনজন। সঙ্গে একটি বৃদ্ধাও আছে মনে হয়। দূরত্ব এক ফার্লংয়েরও কম। যদি এই স্পীডে চলে, তাহ'লে—বিশেষত ওই বৃদ্ধাটির যা হাঁটার গতি—নির্ঘাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হবে।

দু'এক মুহূর্ত সময় নিল জনার্দন। তারপর চিৎকার ক'রে উঠল, 'ব্রেক—ব্রেক—'

এবং তখনই বুঝতে পারল, ব্রেকে পা দেবার পরিবর্তে অ্যাকসিলারেটরেই আরো বেশি চাপ দিয়েছে জহর; গাড়ি ও গতির প্রচণ্ড ধাক্কায় বৃদ্ধাটিকে চাপা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভ্রূক্ষেপহীন। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল কাণ্ডটা।

মৃত্যু আটকানো যাবে না। উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা নিয়ে পিছনে তাকাল জনার্দন, ভালো ক'রে দেখতে পেল না কিছু। শুধু এটুকু দেখল, বৃদ্ধার সঙ্গে আরো যে দু'জন ছিল তারা ঝুঁকে পড়েছে রাস্তায়, সম্ভবত আরো দু'একজনও। দূর থেকে এগিয়ে আসা একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো ক্রমশ থেমে আসছে জটলার ওপর।

'ছিঃ! কী করলেন, স্যার! একটা লোককে—'

জনার্দন কথা শেষ করার আগেই জহর বলল, 'লেগেছে!'

'চাপা দিলেন। নিজে বুঝতে পারছেন না!' জনার্দন বলল, 'গাড়ি থামান। দেখুন হাসপাতালে দিতে হবে কি না! ইস্!'

কী হয়েছে না হয়েছে জহর নিজেও সম্ভবত আঁচ করতে পারছিল। স্পীড না কমিয়েও এগিয়ে এলো খানিকটা। এমনভাবে, যেন স্টীয়ারিংটা ওর হাতে নেই। ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'মরে গেলে পুলিস কেস হবে। দাঁড়ানো চলবে না।'

অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে বেশ কিছুদূর চ'লে আসার পর ডান দিকে টার্ন নিল জহর। আয়নায় তাকিয়ে দেখল পিছনে কোনো গাড়িটাড়ি আসছে কি না। কিছুটা নিশ্চিত হয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে আস্তে আস্তে গাড়িটা দাঁড় করালো সে—এমনভাবে, যাতে মনে হতে পারে হোটেল থেকে এতোটা রাস্তা

বেপরোয়াভাবে গাড়ি ড্রাইভ করার যে-ঝুঁকি সে নিয়েছিল, তার পিছনে ক্রোধ এবং মদ্যপানজনিত আচ্ছন্নতার চেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো এবং কাউকে চাপা দেওয়ার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এখনই তার মনে পড়ল, পিছু ধাওয়া না করলেও আর যারা ছিল তাদের যে-কেউই নাম্বার নিয়ে থাকতে পারে। সে-ক্ষেত্রেও কেস এড়ানো যাবে না।

কপালে ঘাম ফুটে উঠল জহরের। মুখে কিছু করতে পারা হাসি। এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। ওয়্যারলেস মারফত খবর পেলে যে-কোনো জায়গায় ইন্টারসেপ্ট করতে পারে পুলিশ।

'অ্যাক্সিডেন্ট করার জন্যে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে না।' জনার্দনের মুখে ঠিক কোন ধরনের অভিব্যক্তি ফুটেছে অনুমান করার চেষ্টা ক'রে জহর বলল, 'যখন দেখতে পাই তখন আর কিছু করার ছিল না!'

জনার্দন চুপ ক'রে আছে দেখে পরের কথাগুলোও খুঁজে নিল জহর। শূন্য দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার ও বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। আমার শরীর ভালো লাগছে না। যা হবার হয়ে গেছে—তুমিই চালাও এবার।'

অল্প ইতস্তত করল জনার্দন। সময় নিল বুঝতে। তারপর কোনো প্রশ্ন না ক'রে হ্যাণ্ডেল ঘোরালো দরজার—গাড়ির পিছন ঘুরে ঠিক সেই জায়গাতেই এলো, বাধ্য ড্রাইভারের মতো যেখান থেকে স্বচ্ছন্দে পালন করা যায় জহরের নির্দেশ।

কথায় কাজ হয়েছে দেখে নিজেও নেমে এলো জহর। সাধারণত সে পিছনের সীটে বসতে অভ্যস্ত। হঠকারিতার কারণে আজই যা একটু অন্যরকম হয়ে গেল।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সীটের পিছনে মাথা হেলিয়ে সাইড গ্লাসটা নামিয়ে নিল জহর। এই মুহূর্তে বৃষ্টি-জানানো ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শটুকু তার চেয়ে বেশি আর কারুরই দরকার হতে পারে না। এখনই তার নিশ্চিন্ত হবার সময়। খোলাখুলি কথা না বললেও জহর জানে, জনার্দন ফাঁস করবে না কথাটা। বিকেলের এবং তার পরবর্তী ঘটনাও ভুলে যাবে। হয়তো রফা করবার জন্যে আড়ালে দর-কষাকষি করবে কিছুটা। এই ধরনের লোকের বিবেক থাকে না—প্রয়োজন এবং প্রলোভন, দুটোকে এক জায়গায় মেলাতে পারলে এরা খুন পর্যন্ত করতে পারে।

একবার ভাবতে শুরু করলে অনেক কিছুই ভাবা যায়। জহরও ভাবছে। হঠাৎ আলোর আবির্ভাবে সন্দেহবশত একবার পিছনে তাকাল সে। হেডলাইট জ্বেলে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি। তখন ঘাড় কাত ক'রে তীব্র আলোর ঝাঁঝ থেকে মুখ আড়াল করতে করতে দেখল, নিয়মমাফিক ডান দিক থেকে ওভারটেক ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। সন্দেহ করার কারণ নেই কোনো।

জহর আশ্বস্ত হলো এবং ভাবল, কেউ নাম্বার নিয়ে থাকলে কিংবা কেস হ'লেও কি বিশেষ কিছু ভাবনার আছে তার? সকলেই জানে, গাড়িটা তার হ'লেও ড্রাইভারই চালায়। এখনো চালাচ্ছে। অ্যাক্সিডেন্ট ক'রে থাকলে ড্রাইভারই করেছে। পৃথিবীতে কেউই নিশ্চয় এমন মূর্খ নয় যে ভেবে নেবে, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে একটি নিরীহ মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের হাতে স্টীয়ারিং তুলে নিয়েছিল জহর।

পতন জনিত

বুকে ব্যথা এবং তার পরে ই সি জি রিপোর্টে ইস্‌কিমিয়া ধরা পড়ায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল যামিনী হালদার। ওষুধপত্র এবং খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে যা যা নির্দেশ দেওয়া উচিত তা দেবার পর আর যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন ডাক্তার তার মধ্যে প্রধান হলো চর্বি এবং ওজন কমানো। এ বিষয়ে নির্দেশটিও ছিল খুব পরিষ্কার—এখনকার চুয়াত্তর কে জি-টাকে যে করেই হোক কমিয়ে নামাতে হবে ছেষট্টিতে। খাওয়াদাওয়া কন্ট্রোল করা ছাড়াও ওজন কমানোর প্রকৃষ্ট উপায় শারীরিক পরিশ্রম বাড়ানো। যামিনী ভেবে দেখল, সাতাশ বছর ধরে বিবাহিত, আটচল্লিশ বছর বয়স্কা স্ত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যৌনসংসর্গ করা এবং কোনো কোনো রবিবারে শখ করে বাজারে যাওয়া ছাড়া দৈহিক পরিশ্রম বলতে যা বোঝায় তা সে কোনোদিনই করে না। সময়ও পায় না। চুয়ান্ন বছর বয়সে সিক ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে ঘোষিত একটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সে, সুতরাং গাড়ি চড়ে; অফিসে অধিকাংশ সময়েই মীটিং করে, সুতরাং মাথা ঘামায়। এবং যেহেতু বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কাছাকাছি অনেকগুলি মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংয়ের একটির ছ'তলায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকে, সুতরাং ওঠানামার জন্যে লিফ্‌ট ব্যবহার করতে পারে এবং একবার ফ্ল্যাটে ঢুকলে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বাইরে বেরোয় না আর। এর কোনোটিতেই দৈহিক পরিশ্রমের সুযোগ নেই।

বেঁচে থাকার আগ্রহ থেকে এরপর প্রতিদিন ভোরে মর্নিংওয়াকে বেরুনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যামিনী।

স্বামীর স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তায় এখন রাতে শোবার আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখে যামিনীর স্ত্রী চম্পাবতী। ভোর সাড়ে চারটে থেকে পৌনে পাঁচটার মধ্যে নীচে নামার জন্যে লিফ্‌টের বোতাম টেপে যামিনী। রিচি রোড, মনোহরপুকুর রোড হয়ে হাঁটে লেকের দিকে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফেরে, তখন রোদ উঠে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে মাল্টিস্টোরেডে।

আশিটি ফ্ল্যাট-বিশিষ্ট এই বিশাল বাড়িতে যামিনী হালদার এবং তার পরিবার ছাড়াও আরো উনআশিটি ফ্ল্যাটে থাকে সমসংখ্যক পরিবার। মাথা গুনলে সমবেতভাবে তাদের সংখ্যা চার শো, সাড়ে চার শো'র কম নয়। নীচে, অফিসঘরের পাশে, টানা দেয়ালে পর পর সাজানো আশিটি লেটার-বক্সের গায়ে একই ধরনের হরফে লেখা নামগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে—অবশ্যই যদি কখনো কেউ সেই চেষ্টা করে—কিছু দূর গিয়েই গুলিয়ে যায় নাম ও পদবিগুলি। লিফ্‌টে ওঠানামার সময় কিংবা বিল্ডিংয়ে ঢুকবার কিংবা বিল্ডিং থেকে বেরুবার সময়, কিংবা পুজোটুজো হলে, দেখা যায় নানা আকৃতি, রূপ ও বয়সের অসংখ্য মেয়ে-পুরুষকে। তারা এই বাড়িতেই থাকে; কিন্তু কে কোথায় থাকে এবং কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া তা বোঝা যায় না ঠিক। গত ইলেকশনের সময় আশিটি ফ্ল্যাটের দরজায় দরজায় ঘুরে কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট প্রার্থনা করতে সময় লেগেছিল পুরো এক বেলা। বামফ্রন্টের যে-দলটি এসেছিল, শোনা যায় কয়েকটি ফ্ল্যাট ঘুরে দেখার পরই অজ্ঞাত কোনো কারণে তারা হতাশ হয় এবং সময় নষ্ট না করে ফিরে যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যারা এখানে থাকে তাদের মধ্যে আছে দু'জন সাংবাদিক, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জাজ, একজন প্রাক্তন এম-এল-এ, একজন লটারিতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং একজন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতার রক্ষিতা। এদের চিনলেও এখানে যামিনী হালদারের চেনা মুখের চেয়ে মুখ চেনা সম্পর্কের সংখ্যা বেশি, আরো বেশি অচেনা সম্পর্ক। এক সময় তার ধারণা হয়েছিল তাকেও অনেকেই চেনে। পরে ভেবেছিল, সে যেহেতু বেশি সংখ্যককেই চেনে না, সুতরাং তাকেও যে অনেকেই চিনবে তার ঠিক কি? এর পরেই সে

নিরপেক্ষ হয়ে যায় এবং ক্রমশ বুঝতে পারে, সে একাই নিরপেক্ষ নয়।

সেদিন ভোরবেলায় অ্যালার্মের শব্দ শুনে উঠে মুখহাত ধুয়ে মর্নিংওয়াকে বেরুবার জন্যে তৈরি হলো যামিনী। পাঁচটা বাজতে তখনো দেরি আছে কিছুক্ষণ। সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে। কার্তিকের মাঝামাঝি। শীত পড়েনি, তবে একটা ছ্যাঁকছেঁকে ভাব টের পাওয়া যায় হাওয়ায়। আলো জ্বলছে সিঁড়ি ও ল্যান্ডিংয়ে। লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল যামিনী। লিফ্‌টটা বোধ হয় নীচে। যতোবার বেল টিপল ততোবারই ফিরে এলো একটা ঘটাং-ঘটাং শব্দ, ইন্ডিকেটরে 'আপ' সাইন ফুটল না। নিশ্চয়ই কেউ নীচে নেমেছে এবং ইচ্ছায় কিংবা ভুল করে দরজাটা লাগায়নি ঠিকঠাক। এটা ঝি-চাকরদের ওঠানামা করার সময়। লিফট্‌ম্যান আসে ছ'টা, সাড়ে ছ'টায়; তার আগে যে যেমন খুশি যথেচ্ছ হয়।

বিরক্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল যামিনী হালদার এবং এর আগেও যেমন অনেকবার ভেবেছে তেমনি এখনো ভাবল, শহরের মাঝখানে তথাকথিত পশ্ এলাকায় মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংয়ের ফ্ল্যাট না কিনে শহরতলিতে সম্পূর্ণ নিজের জন্যে একটা বাড়ি করলে ভালো হতো। অধিকার জন্মদিনের কেক নয় যে ভাগ করে মুখে দিলেও স্বাদটা একই থাকবে।

চারতলার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে একটি ফ্ল্যাট থেকে মাঝবয়েসী একটি লোককে বেরুতে দেখল যামিনী। আগেও দেখেছে, তবে এখনই—পিছনে বন্ধ হওয়া ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটে চোখ পড়ায় বুঝতে পারল, লোকটির নাম অশোক কুণ্ডু। অন্য নামটি, অর্থাৎ রুচিরা কুণ্ডু, এর স্ত্রী হলেও হতে পারে। অশোক কুণ্ডুর স্বাস্থ্য ভালো; সাদা ট্রাউজার্সের ওপর মাখন রঙের স্পোর্টস্ শার্ট, পায়ে কেড্‌স। যামিনীর মুখোমুখি হয়েই কথা শুরু করে দিল।

'লিফ্‌ট পেলেন না?'

'না। নীচে কেউ দরজা খুলে রেখেছে—'

'প্রায়ই হচ্ছে এরকম।' অশোক কুণ্ডু বলল, 'মেন্টেনান্স বলে কিচ্ছু নেই এখানে—যে যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। হোপলেস্! এ নিয়ে কিছু একটা কবা দবকাব।'

কী করা দরকার সে-বিষয়ে যামিনীর কোনো মতামত নেই দেখে চুপ করে গেল অশোক কুণ্ডু। প্রায় পাশাপাশি বাকি সিঁড়িগুলি নামতে লাগল নিঃশব্দে।

নীচে এসে দেখল লিফ্‌টের দবজাটা ঠিকই খোলা। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে জনা তিনেক ঝি এবং দু'টি চাকর। এটা বাড়ির পিছন দিক। ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি গাড়ি। ওরই মধ্যে কোনো একটি গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা চলছে; স্টার্ট হতে হতেও শব্দটা থেমে যাচ্ছে বার বার। আলোর স্বল্পতার ক ণে এর বেশি দেখা যায় না। ভোরবেলাব একবকম নিজস্ব নৈঃশব্দ্য থাকে; সামান্যতম শব্দও তখন কানে লাগে বেশি।

যামিনী গেটেব দিকে যাবার জন্যে বাঁদিকে ঘুরল এবং না তাকিয়েও বুঝল, অশোক কুণ্ডুও আছে পিছনে। সম্ভবত এই লোকটিও বোজই মর্নিংওয়াকে বেরোয। যদি সঙ্গী হয়ে ওঠে তাহলে আলাপও করতে হবে, এই আশঙ্কায় একটু থেমে অশোককে এগিযে যাবার সুযোগ করে দিল যামিনী। তখনই দেখল, উল্টোদিক থেকে ভীষণ ব্যস্তভাবে দৌড়ে আসছে বিল্ডিংয়ের ওয়াচম্যান; তার পিছনে ব্যস্ত-সমস্তভাবে একটি ঝি।

যামিনী কিছু ভাববার আগেই থেমে দাঁড়াল অশোক এবং জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে!'

'একটা লাশ পড়ে আছে, স্যার!'

'লাশ!'

'মেয়েছেলের লাশ গো!' সঙ্গের ঝি-টি কিছুবা আতঙ্কিত গলায় বলল, 'ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ে!'

'কোথায়!'

যামিনীর প্রশ্নের সাড়া দেবার জন্যে কেউই দাঁড়াল না। ওয়াচম্যানের পিছনে পিছনে ডানদিকে এগোচ্ছে অশোক কুণ্ডু। যারা জটলা করছিল, তারাও। মেয়েমানুষের লাশ শুনলেই খবরের কাগজে বেরুনো অনেক কাহিনী মনে পড়ে। যামিনীও এগোলো। এবং দশাটি অবলোকন করে স্তম্ভিত হয়ে

গেল।

এটা বাড়ির উত্তর দিক। জলের পাম্প, গারবেজ ডাম্প এবং ঝি-চাকরদের টয়লেট থাকায় সাধারণত যাতায়াতের জন্যে ব্যবহার করা হয় না। গাড়ি বেরোয় এবং ঢোকে উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে। এক দেড় বছরের মধ্যে বার দুয়েকের বেশি যামিনী এদিকে এসেছে কি না সন্দেহ। আজই চোখে পড়ল, এদিকে একটি দু'টি গাঁদা ও নয়নতারা গাছও আছে। নয়নতারা গাছের দিকে মাথা এবং জলের পাম্পের দিকে পা, দেখল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে সত্যিই পড়ে আছে একটি লাশ। তবে মেয়েমানুষ বলতে যা বোঝায় এটি তা নয়। একটি পরিপূর্ণ যুবতী—বাইশ থেকে বত্রিশ যে-কোনো বয়স হতে পারে। একটি হাত কোমরের নীচে চাপা পড়া, অন্য হাতটি দূর দিয়ে ছড়ানো ; কব্জির পাশে কয়েকটি ভাঙা চুড়ির টুকরো। মাথাটা অল্প হেলে আছে বাঁদিকে। খোলা চোখের তারার একটি স্থির হয়ে আছে আকাশের দিকে, অন্যটি নিরুদ্দিষ্ট। খয়েরি ব্লাউজের ওপর দিকের বোতাম ছিঁড়ে প্রায় অনাবৃত করে দিয়েছে বাম স্তনটিকে। একটি পা সামনের দিকে টান-টান করে ছড়ানো, অন্যটি হাঁটুর কাছে মুড়ে ত্রিভুজাকৃতি। সবচেয়ে যা বিসদৃশ, নীল ও খয়েরিতে মেশানো ডুরে শাড়িটা সায়াসমেত উঠে গেছে কোমর পর্যন্ত—সেই কারণেই প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে নাভির নীচে থেকে সম্পূর্ণ নিম্নাঙ্গ। নিজের অভিজ্ঞতায় কোনো যুবতী নারীর এই দেহ যামিনী প্রত্যক্ষ করেছে অন্তত কুড়ি বছর আগে, নিজেরই স্ত্রীর মধ্যে। সুতরাং রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল তার। আরো ভালো করে দেখার আগে কমাল বের করে অভ্যাসবশত চাপা দিল নাকে।

'কে ?' প্রথম দেখার জড়তা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল অশোক কুণ্ডু, 'এই বিল্ডিংয়ের ?'

'আমি চিনি না, স্যার।' ওয়াচম্যান বলল, 'কী করে বলব।'

অশোক আশপাশে দেখল। তাকাল ওপরে। নীচে থেকে তিনটি ব্যালকনি বাদ দিলে চতুর্থটি তার। বেরুবার সময়েও ঘুমোতে দেখেছে রুচিরাকে। এখান থেকে সটান দেখা যায় চৌদ্দতলা পর্যন্ত। বারান্দাগুলির কোনোটিতে গ্রীল আছে, কোনোটিতে শুধুই রেলিং। নীল শাড়ি ঝুলছে একটি বারান্দা থেকে। ছ'তলা ও সাততলার বারান্দায় ফুল ফুটে আছে ঢের। কোথাও একটি মুখ চোখে পড়ল না। তখন পাশের উঁচু পাঁচিলটার দিকে তাকাল। ওদিকটায় বেকারি আছে একটা। বাসি ময়দার গন্ধে সারাক্ষণ ভুরভুর করে হাওয়া। মাঝখানে আট-দশ ফুট বাদ দিয়ে উঠছে আর একটি মাল্টিস্টোরেড। এরই মধ্যে উঠে গেছে সাত আটতলা। ওরই তিনতলায় খালি গায়ে গামছা-পরা একটি লোক উঠে এসেছিল। এদিকে কয়েকজনকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি ঝুঁকে তাকাল এবং ফিরে গিয়ে আরো জনা দুয়েককে ডেকে আনল।

যেদিক থেকে যামিনীরা এসেছিল সেদিক দিয়েই আরো একটি লোক হেঁটে এসে দাঁড়াল। লোকটির গায়ে অফিসের পোশাক, হাতে একটি ব্রীফকেস। যামিনী চেনে অল্প। হাওড়ার দিকে কোনো ফ্যাক্টরিতে অফিস—রোজ সকালে রিচি রোডের মোড়ে গিয়ে অপেক্ষা করে অফিসের বাসের জন্যে। নামটা বোধহয় প্রলয় তরফদার। যামিনীর পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে মৃতদেহটি লক্ষ করতে করতে বলল, 'স্টার্ক নেকেড, কি বলেন !'

যামিনী জবাব দিল না। তখন প্রলয় বলল, 'অফিসে বেরুচ্ছিলাম। শুনলাম একটা মেয়েমানুষ মরে পড়ে আছে। তাই চলে এলাম। মার্ডার নয় তো ?'

অশোক কুণ্ডু চিন্তিতভাবে তাকাচ্ছিল এদিক ওদিকে। কথাটা কানে যাওয়ায় বলল, 'তার আগে জানা দরকার এই বিল্ডিংয়েরই কেউ কি না। বাইরে থেকে এনেও ফেলে যেতে পারে।'

'তাহলে নেকেড করে ফেলে রাখবে কেন ?' কথাটা বলতে পেরে খুশি হলো প্রলয় এবং বাড়তি আগ্রহে বলল, 'মনে হচ্ছে রেপ্ কেস।'

'থামুন মশাই !' ধমকের গলায় অশোক বলল, 'রেপ্‌টা পেলেন কোথায় !'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল প্রলয়, 'অবশ্য নাও হতে পারে—'

'পুলিশে জানানো দরকার।'

ততোক্ষণে ঝি, চাকর, কাজের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সকালের এই সময়টায় একে একে এসে জোটে ফুরনের লোকজন। ওদের দিকে তাকিয়ে অশোক জিজ্ঞেস করল, 'কে আগে দেখেছে ?'

ঝি-দের মধ্যেই একজন বলল, 'বিমলাদি—'

'আমি কোথায় দেখলাম আগে !' যে-মেয়েমানুষটি ওয়াচম্যানের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসছিল সে বলল, 'মিছে কথা বোলো না বাছা ! বাবু, লাশটা এখানেই ছিল। বেশ অন্ধকার তখন—আমরা বাথরুমে যাচ্ছিলাম— ।' বলতে বলতে ঠাস করে কপাল চাপড়ালো বিমলা, 'হায় মা গো ! কে এমন সব্বোনাশ করল গো !'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ব্যস্ত গলায় বলল অশোক, 'দারোয়ান, সেক্রেটারিকে খবর দাও।' ওয়াচম্যান তখনই ছুটল।

বিমলাকে বয়স্কা বলা যায়। পাক ধরেছে চুলে। সিঁথিই বুঝিয়ে দেয় বিধবা, পোড়-খাওয়া মুখে হজম করে নেওয়ার প্রশান্তি। গায়ে একটা ছাইরঙা চাদর জড়ানো। দারোয়ান চলে যাবার পর অশোককে লক্ষ করে বলল, 'একেবারে বেআব্রু হয়ে পড়ে আছে ! কী ভাগ্য ! প্রাণ থাকলে তো লাজলজ্জা টের পাবে ! বাবু, শাড়িটা নামিয়ে দেবো ?'

'খবরদার। কিচ্ছু করবে না। আগে পুলিস আসুক।'

'বডি কি অবস্থায় ছিল সেটা জানা ভাইটাল ব্যাপার। তাই না ? সত্যিই তো, শাড়িটাই বা ওপরে উঠে গেল কী করে ?'

যামিনী দেখল, জনসংখ্যা বাড়ছে ; সেই সঙ্গে কথা এবং প্রশ্নও। আরো কারও গলা শুনে ওপরে তাকাল সে। তিনতলাব ফ্ল্যাট থেকে রেলিং ধরে ঝুঁকছে একজন মহিলা। যেভাবে গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে তাতে মনে হয় জমায়েতটাই চোখে পড়ছে তাব, মৃতার শরীর নয়। হতেই পারে। প্রত্যেক ফ্লোরেই আছে ব্যালকনি, ওপর থেকে তাকালে দৃষ্টির অনেকটাই আড়াল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মহিলার পাশে একটি পুরুষ এসে দাঁড়াল। যামিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে জিজ্ঞেস করল, 'ভিড় কেন, মশাই ? কী হয়েছে ?'

জবাব না দিয়ে যামিনী নিজেও সরে গেল আড়ালে। ব্যাপাবটা যদি পুলিস কেস হয়, ভাবল, তখন তাকে নিয়েও টানাটানি হতে পারে। কে আগে আবিষ্কার করেছে জানা নেই ; তবে, ঝি-টি বাদ দিলে, প্রথম যে দু'জন মৃতদেহটি দেখে, তার মধ্যে সেও একজন। মনে হয় এ নিয়ে অশোক কুণ্ডুর সঙ্গে গোপনে একটা আলোচনা করে নিলে ভালো হতো। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, তেমনি পুলিসেও ; জেরবারে অস্থির করে তুলতে পারে। এই ভাবনায় তার নিঃশ্বাস দ্রুত হলো। বুকের বাঁদিক চেপে ভাবল, এরপর মর্নিংওয়াকেব যৌক্তিকতা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে তাকে। এসব ঘটনা রাত্রেই ঘটে এবং চোখে পড়ে সকালে।

যামিনী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেটা মৃতার পাযেব দিক। সরে যেতে, ওকে পাশ কাটিয়ে সেই জায়গাটা দখল করল প্রলয় তবফদার। খুব নিবিষ্টভাবে লাশটিকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'পোস্টমর্টেম হলে দেখবেন, নির্ঘাত রেপ্ কেস।' বলতে বলতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রলয়ের। আলগোছে ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আজ আর অফিস যাওয়া হলো না। আফটার অল, একসঙ্গে থাকি—উই আর এ ফ্যামিলি। শেষ পর্যন্ত কী হয দেখা দরকার।'

এই সময় ওয়াচম্যান ফিরে এলো হাঁফাতে হাঁফাতে। সেইভাবেই বলল, 'সেক্রেটারিবাবু আসছেন। গেট বন্ধ করে দিতে বললেন। উনি পুলিসে ফোন করছেন—'

'ঠিক আছে। যাও। কোনো বাইরের লোক ঢুকতে দেবে না।'

লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরা, টাকমাথা, মোটাসোটা একটি লোকও এসে পড়েছিল এর মধ্যে। নাম না জানলেও মুখ চেনা। যামিনী যখন অফিসে বেরোনোর জন্যে গাড়িতে ওঠে, তখন মাঝেমধ্যে এই লোকটিকেও গাড়িতে উঠতে দ্যাখে। প্রায় সময়েই স্যুট থাকে গায়ে। লুঙ্গি-পরা অবস্থায় এই প্রথম দেখল। লোকটি মাথার দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল , জুত না হওয়ায় মৃতার পায়ের দিকে সরে এলো এবং যে-দৃষ্টিতে এব আগে প্রলয় তরফদার লক্ষ করেছিল, সেই একই দৃষ্টিতে দেহটিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ঘাড় তুলে ওপরে তাকাল—যতোদূর উঁচু অব্দি তাকানো যায়।

'জাম্প করেছে মনে হচ্ছে—'

'এই বাড়িবই ?—চেনেন ?'

'চিনলে তো বলতেই পারতাম। আমি জাম্প করার কথা বলছি—'

'জাম্প করলে চেস্ট-এর ওপর পড়ত। উন্ড থাকত। কোথাও ব্লিডিংয়ের চিহ্ন নেই। এইভাবে ফ্ল্যাট হয়ে—'

'কেন, মশাই! ক্যামাক স্ট্রিটে সেই যে মেয়েটি জাম্প করেছিল ইলেভেনথ ফ্লোর থেকে, তার শরীরেও উন্ড ছিল না কোনো!'

'চোখের দিকে তাকান। মনে হয় স্ট্র্যাঙ্গলড্—'

অন্তত পঁচিশ জন এসে জড়ো হয়েছে এখন। ওপরেও বিভিন্ন ব্যালকনিতে অনেকে। পাঁচিলের ওদিকে অসমাপ্ত নতুন বিল্ডিংয়ের ছাদেও লোকসংখ্যা আগের চেয়ে বেশি। কোথা থেকে একটি বোলতা উড়ে এসে ঘুরতে লাগল মৃতদেহটার চারপাশে। এই সময়েই যামিনী হঠাৎ লক্ষ করল, তার আঠারো বছরের ছেলে দিবাকর আর একটি ছেলের সঙ্গে এসে ওদিকটায় দাঁড়াল এবং খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকল লাশটির দিকে। সঙ্গের ছেলেটির মুখে চাপা হাসি। দিবাকরকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে কানের কাছে কিছু বলবার পর দিবাকরও হাসতে শুরু করল।

আজ আর মর্নিংওয়াকে যাওয়া হবে না। এখন আলো বেশ পরিষ্কার। রোদও উঠে গেছে। না-বোঝা অস্বস্তিতে এবং দিবাকরের সঙ্গে চোখাচোখি হবার আশঙ্কায় যামিনী পিছু হটতে শুরু করল। তাকে আর দেখা যাবে না এমন একটা জায়গায় পৌঁছে, পিছন ফিরে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে। ইন্ডিকেটরের তীরটা নীচের দিকে। ছ'সাতজন নামল একসঙ্গে। সবচেয়ে পিছনে সেই লটারিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রমথ চাটুজ্যে। যামিনীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'স্যুইসাইড তো ?'

'কী করে বলি।' অনেকক্ষণ পরে কথা বলল যামিনী, 'পড়ে আছে দেখলাম—'

'ফেটাল জাম্প।' সন্দিগ্ধভাবে হাসল প্রমথ, কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে ধরে নিতে হবে স্যুইসাইড। সাড়ে তিনটে নাগাদ আমার স্ত্রী টয়লেটে গিয়েছিল। মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে গেলে যে রকম শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ শোনে একটা—'

'টায়ার ফাটার শব্দ!'

'হ্যাঁ।' যামিনীকে লিফটে ঢোকার সুযোগ দিয়ে প্রমথ বলল, 'শুনছি এইটথ ফ্লোরের প্রসন্ন চৌধুরীর মেয়ে। কালই নিয়ে এসেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। তবে, মশাই, কাল না পরশু কে জানছে। মেয়েটি শুনলাম খুবই স্বাস্থ্যবতী। স্ক্যান্ডাল আছে কিনা দেখুন—'

লিফটম্যান নেই। হয়তো জটলায় গিয়ে ভিড়েছে। ওপর থেকে লিফটের জন্যে ঘন ঘন বেল দিচ্ছে কেউ। কিছুটা বিমূঢ়ভাবে প্রমথর সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে লিফটের দরজা বন্ধ করল যামিনী এবং নম্বর টিপে ওপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে ভাবল, খানিকটা চুল কপালে লেপটে থাকায় মেয়েটি বিবাহিতা কি না লক্ষ করেনি। তবে ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলোর রঙ ছিল সাদা। শাঁখা ?

মর্নিংওয়াকে বেরুনোর আগে চা করে দিতে হয় অশোককে। তারপর আবার ঘুমোতে গেলেও ঘুম হয় না রুচিরার। তবে বিছানার আয়তন বড়ো হয়ে যাওয়ায় মধুর আলস্যে হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগে না। আচ্ছন্নতার মধ্যেই একটা আন্দাজ থাকে সময়ের। অশোক ফেরার আগেই শৈল আসে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে এবং দ্বিতীয় দফার চা-টা করে, রুটি দিয়ে চা গিলে বেরিয়ে যায় অন্য ফ্ল্যাটে কাজ করতে। চোখের সামনে সারাক্ষণ ঝিয়ের আনাগোনা পছন্দ করে না অশোক। শৈল ফিরে আসে বেলার দিকে এবং ধীরেসুস্থে অন্যান্য কাজ করতে করতে বিল্ডিংয়ের গল্প করে রুচিরার সঙ্গে।

দশ বছর বিয়ে হবার পরও বাচ্চা হয়নি রুচিরার। চাকরিও করে না। সুতরাং সময় কাটে না। মাঝে মাঝে আকাঙ্ক্ষা করে দুপুরের নিভৃতে—যখন বাড়ি থাকে না অশোক—কেউ আসুক এবং তাকে একটি বাচ্চা উপহার দিক। দেড় বছর এই বিল্ডিংয়ে থাকতে থাকতে বুঝেছে এসব আকাঙ্ক্ষার মানে হয় না

কোনো। কেউ না কেউ সব সময়েই চোখ রাখছে তার ওপর। একই কারণে চোখ এবং কান, দুটোই সারাক্ষণ খাড়া করে রাখে রুচিরা।

দরজায় বেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচিরা বুঝতে পারল শৈল এসেছে এবং তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

'দেরি করলি ?'

'দেরি কি গো, বৌদি ! বিল্ডিংয়ে কী হচ্ছে খবর রাখো কিছু !'

শৈলর চোখমুখ রীতিমতো উত্তেজিত। ঘুমচোখে যতোটা সম্ভব আঁচ করার চেষ্টা করল রুচিরা। কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কী হয়েছে !'

'একটা জোয়ান মেয়েছেলে উদোম হয়ে পড়ে আছে নীচে।'

'সে কি ! কে !'

'বলছে তো ন'তলার চৌধুরীবাবুর মেয়ে—'

রুচিরা শৈলর দিকেই তাকিয়ে থাকল এবং ভাববার চেষ্টা করল ন'তলার চৌধুরী বলতে কোনজন একজন প্রায়-বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মনে পড়ল। ভদ্রলোক সম্পর্কে যেটুকু তথ্য জানা আছে তা এইরকম—বিপত্নীক, একমাত্র ছেলে সপরিবারে কানাডায় থাকে এবং বছরে একবার কিছুদিনের জন্যে এসে থাকে বাপের কাছে। একটি মেয়েও আছে বলে শুনেছে, বিবাহিতা ; কিন্তু, চোখে দেখেনি কখনো। ভাবতে ভাবতেই কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠল তার।

'কোথায় পড়ে আছে ?'

'ঐ তো। তোমাদেরই নীচে। দ্যাখো না বারান্দায় গিয়ে—'

শৈল কথা শেষ করতে না করতেই ব্যালকনির দিকে ছুটল রুচিরা এবং ঝুঁকে তাকাল নীচে। বেশ কিছু সংখ্যক মাথা চোখে পড়ল তার, কয়েকটি মুখও। একজন ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাতে চিনতে পারল রুচিরা—সেই লটারি-পাওয়া লোকটা। কিন্তু শৈলর বর্ণনামতো কোনো জোয়ান মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখল না। সে আরো ঝুঁকল এবং অবশেষে নয়নতারা গাছের সামনে একটি মুখের কিয়দংশ দেখতে পেল। হাত নেড়ে কাকে কি বোঝাচ্ছে লটারি-পাওয়া লোকটা। ওই লোকটা সরে গেলে আড়ালও সববে—হয়তো আরো কিছু দেখা যাবে।

'অতো ঝুঁকো না, বাপু ! শেষে নিজেও পড়বে।'

ঝাঁটা হাতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল শৈল। নিজেও ঝুঁকল সামান্য। কিছু দেখতে না পেয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই ঝাঁট দিতে শুরু করে বলল, 'বাবুরা সব চোখ বড়ো করে গিলছে—'

'মেয়েরা নেমেছে ?'

'নেমেছিল তো। দূর থেকেই পালাচ্ছে। যা ভিড় !'

ঝাঁট দিতে দিতে অনেকটা এগিয়ে গেছে শৈল। রুচিরা পরের প্রশ্নটা খুঁজল ; না পেয়ে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে ড্রইংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাদাবাবু বেড়িয়ে ফিরলে জানা যাবে।

'ও মা ! দাদাবাবু তো ঐখানেই গো। দারোয়ানকে বলল সেক্রেটারিবাবুকে খবর দিতে—পুলিস ডাকতে বলল—'

রুচিরা ধমকালো অল্প। বাবুরা চোখ বড়ো করে গিলছে এবং অশোকও আছে সেখানে, দুটো ঘটনাকে কোনখানে মেলাবে বুঝতে পারল না। তখন ভাবল, গেলা এবং সেক্রেটারিকে খবর দেওয়া কিংবা পুলিস ডাকা এক ব্যাপার নয়।

'কী হয়েছিল, শুনলি কিছু ?' সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল রুচিরা, 'ন'তলা থেকে ঝাঁপ দিল নাকি ?

'সে কী করে বলি, বৌদি !' শৈল শোবার ঘরে ঢুকল এবং ব্যস্ত হাতে ঘর ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে বলল 'একজন বাবু বলছিল রেক্ করে ফেলে রেখে গেছে—'

'রেক্ ! রেক্ কী !'

'ওই যে গো—', দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে রুচিরা। ওর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় শৈল বলল, 'রেক্ বোঝো না! মেয়েমানুষের ওপর জোর করে না !'

'তাই বল, রেপ্—'

'ওই হলো। আমি কি আর ইংরাজি বুঝি!' শৈল অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝাঁটাটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে, হাতে কুটো তুলতে তুলতে বলল, 'সবাই বলছে ঝাঁপ দিয়েছে। লটারিবাবুর বউ নাকি সাড়ে তিনটের সময় বাথরুমে গিয়েছিল—মোটরের চাকা ফাটার শব্দ শুনেছে। মরণ আর কি! বাথরুমে গেছিস যা, বলো বৌদি, সময়টা কেউ মনে রাখে!'

বাসন মাজার জন্যে রান্নাঘরে ঢুকল শৈল। কলের জল ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দাদাবাবু কি উঠবে এখন? চায়ের জল বসাবো কি না বলো?'

'বসা। বাড়িতেই যখন আছে, এসে পড়বে এখুনি।'

শৈল চুপ করে গেলে বাসনের নড়াচড়ার শব্দ হয়। রুচিরা অধৈর্য বোধ করল এবং আবার এগিয়ে গিয়ে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকল। অবস্থাটা আগেরই মতো। তবে ভিড়টা ছড়িয়ে গেছে মনে হয়। এর মধ্যে অশোককে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। হঠাৎ একটি পুলিস চোখে পড়ল তার। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বলল, 'পুলিস এসে গেছে মনে হচ্ছে—'

'আসবে না! দ্যাখো কি কেলেঙ্কারি বেরোয় আবার!' শৈল বলল, 'ঝাঁপ দেবার দরকার হবে কেন! রাতের বেলায় লিফ্‌টে কে কী পাচার করছে কে দেখছে! দারোয়ান তো ঘুমোয় সারা রাত। জেগে থাকলে একটা সোমত্ত লাশ পড়ে আছে দেখতে পেত না!'

'হ্যাঁ, তাই তো! এই যদি দারোয়ান হয়—!' রুচিরা বলল, 'সেদিন তোর দাদাবাবু এয়ারপোর্ট থেকে ফিরল। প্লেন দেরি করেছিল। রাত সাড়ে বারোটা। গেট টপকে ঢুকতে হয়েছিল।'

'তবে!'

বাসন-মাজা শেষ করে ঝাড়ন চেপে চায়ের কেটলি **নামাল** শৈল। পটে গরম জল ঢালতে ঢালতে বলল, 'আমাদের বেমলাদি, কতো আদিখ্যেতা! বলে কি না শাড়িটা নামিয়ে দেবো! দাদাবাবু মানা করল—'

রুচিরা কথাগুলি শুনল এবং শুনল না। হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ধরনে বলল, 'তুই চা-টা কর। আমি আসছি—'

বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপল রুচিরা। দরজা খোলার পর, সামনে নীলাকেই দেখে, উত্তেজিতভাবে বলল, '**শুনেছ**!'

'শুনলাম তো। কী কাণ্ড, ভাই!' উদ্বিগ্নভাবে নীলা বলল, 'কর্তা নীচে গিয়েছিল। এই ফিরছে। ইস্, এই বয়সের একটা মেয়ে—'

'রেপ্ করেছিল না কি!'

'কী!' অতিশয় বিস্ময়ে রুচিরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ হতবাক তাকিয়ে থেকে নীলা বলল, 'দোহাই। আর এসব গল্প কোরো না। আমার গা গুলোচ্ছে—'

রুচিরা অপ্রস্তুত বোধ করল। নীলার আচরণের আকস্মিকতায় কিছুটা বিরক্তও। বিমর্ষ মনে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দেখল রান্নাঘরের মেঝেয় থেপ্‌সি গেড়ে বসে রুটি চিবোচ্ছে শৈল। আর কিছু না বলে সে শোবার ঘরে ঢুকল। বিছানা তাকেই তুলতে হয়।

শৈল বেরিয়ে যাবার আগেই ফিরে এলো অশোক। বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা চাইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ দেয়নি?'

'না।'

'ও, গেট তো বন্ধ।' সামনে রুচিরা। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, 'স্যাড ব্যাপার। ন'তলার মিস্টার চৌধুরীর মেয়ে ঝাঁপিয়ে সুইসাইড করেছে। শুনেছ বোধহয়—'

'**শুনলাম**।' রুচিরা এখন অনেক সংযত; অশোককে চেনে। বলল, 'কোন মেয়েটি? আগে দেখেছ কখনো?'

'না। শুনলাম শ্বশুরবাড়িতে টরচার করত। মিস্টার চৌধুরী কাল রাত্রেই নাকি নিয়ে এসেছিলেন

নিজের কাছে। ভদ্রলোক একেবারে ডেজড্।'

'তাহলে যে বলছে রেপ করেছিল কেউ?'

'কে বলেছে?'

'কে আবার। শৈল। নীচে শুনেছে—'

মুখ চোখ পাল্টে গেল অশোকের। দুঃখিত মুখে এখন ক্রোধের ছায়া। ভুরু কুঁচকে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

'ঝিয়ের মুখে ঝাল খাওয়ার স্বভাবটা পাল্টালো না তোমার!'

'বললে কি করব।'

'তুমি শুনতে চাও বলেই বলেছে। এটা যে কোন ধরনের কালচার।'

রুচিরা আগেই তটস্থ হয়েছিল। অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিল মেঝের দিকে।

'কতোবার বলেছি! এখন তুমি কী মন্তব্য করেছ সেই নিয়ে পাঁচ কান হোক। লোকে হাসুক। তুমি—', কথা হারিয়ে কাঁপতে লাগল অশোক। চোয়াল শক্ত করে বলল, 'ক্রমশ ভালগার হয়ে পড়ছ।'

'দ্যাখো—', অসহায় গলায় রুচিরা বলল, 'সকালেই গালাগালি কোরো না।'

'শাটাপ!'

তখনই বেল বাজল দরজায়। চা-টা সরিয়ে রেখে নিজেই উঠে গেল অশোক।

লিফটম্যান জগন্নাথ। বলল, 'স্যার, সেক্রেটারিবাবু নীচে ডাকছেন আপনাকে—'

'ঠিক আছে, বলো আসছি।'

সাড়ে আটটা নাগাদ দাড়িটাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল যামিনী হালদার। হঠাৎ চিনচিন করে উঠল বুকের বাঁদিকে। কী হচ্ছে ঠিকঠাক বুঝতে পারলেও অনুভূতিটা ধরে রেখে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে। না, ঘাম দিচ্ছে না। বার দুয়েক নিঃশ্বাসটাকে জোরে টেনে এবং ছেড়ে যখন আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো, তখন অফিসের পোশাক না পরে পায়জামা পাঞ্জাবিটাই গায়ে চড়াল সে এবং ভাবল, এখন না হলেও পরে কিছু হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে একটা অঘটন ঘটিয়ে তুলে লাভ নেই কিছু। মরতে চাইলেই মরা যায়, কিন্তু নির্ভাবনায় বেঁচে থাকা হয়তো সহজ নয় ততো। সেজন্যে যা যা করার করতে হবে। তাছাড়া, আজ এমন কোনো জরুরি কাজ নেই যে কাঁটায়-কাঁটায় পৌঁছুতে হবে অফিসে। চোখের সামনে যা ঘটে গেল তার স্মৃতিমুক্ত হবার জন্যেও চাই কিছুটা অবসর। সময়মতো একটা ফোন করে দিলেই হবে। সেরকম মনে হলে আজকের দিনটা ছুটিও নিতে পারে।

এইসব ভাবতে ভাবতে লিভিংরুমে চলে এলো যামিনী। এইমাত্র খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। সেটা হাতে নিয়ে ফ্যান চালিয়ে সোফায় এসে বসল। তবে কাগজই পড়ল না। অতো উঁচু থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করার আগে পঁচিশ বছরের মেয়েটি কী ভেবেছিল কিংবা কী কী ভাবতে পারে—সে-সম্পর্কে একটা অনুমানে পৌঁছুবার চেষ্টা করতে লাগল। ঝাঁপ দেওয়াটা, হয়তো, ঘটনা মাত্র; হয়তো ঘটনাটা ঘটবার অনেক আগেই শরীরের খোলস ছেড়ে চলে গিয়েছিল মেয়েটা। অবশ্যই সুন্দরী। এবং স্বাস্থ্যবতী। চার বছর আগে এম-এ পাশ করার পর রিসার্চ করতে শুরু করেছিল, তখনই বিয়ে হয়ে যায়। অবশ্যই আজকের দিনটিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে!

এসব ভাবতে ভাবতেই অদ্ভুত এক বোধে ছেয়ে যেতে লাগল যামিনীর মাথা। হঠাৎই মনে হলো, এর আগে কাউকে সে মৃত্যুর পরে চেনেনি। চেনবার জন্যেও কখনো কখনো দরকার হয় ঘটনার।

খবর শুনে চম্পাবতী গিয়েছিল প্রসন্ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে। ফিরে এলো বয়স বাড়িয়ে!

'তুমি বসে আছো! অফিসে যাবে না?'

'যাবো। দেখি একটু। শরীরটা—', বলতে গিয়েও থেমে গেল যামিনী এবং কাগজে চোখ রেখে, স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়েই কোনো প্রশ্ন আসতে পারে সন্দেহে ব্যস্তভাবে বলল, 'কেমন দেখলে?'

'দেখার আছেটা কি।'

মুঠোয় ধরা ভিজে ও দোমড়ানো রুমালটা সেন্টার টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলে ফেলা

কথাটার সঙ্গে যুক্ত বাড়তি নিঃশ্বাসটা ঝরিয়ে দূরের দিকে তাকাল চম্পাবতী। আকাশ ঝলমল করছে রোদ্দুরে। শীত আসন্ন বলেই তাপ নেই তেমন। চম্পাবতী তাকাল বলেই যামিনীও তাকাল এবং বহু দূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতার দিকে তাকিয়ে ভাবল, মেয়েটি রাত্রেই এসেছিল। সুতরাং আকাশ দেখার সুযোগ পায়নি। গতকাল এই সময় মৃত্যুর সিদ্ধান্ত মনে ছিল কিনা জানবার উপায় নেই। গভীর রাতে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে অবশ্যই আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে। তখন আকাশটা কেমন ছিল জানা যাবে না।

'মাথা ঠুকে ঠুকে কপালটা ছেঁচে ফেলেছেন।' চম্পাবতী বলল, 'বিয়ে-থা যতোই দাও, সন্তানের শেষ আশ্রয় বাপ-মা। সেই আশ্রয় দিতে গিয়েই এটা হলো।'

'ভাগ্য!' যামিনী বলল, 'মেয়েটা তো গেল। এখন ভাগ্যের জের ওঁকেই টানতে হবে। সত্তরের ওপর বয়স। একটা অ্যাটাক হয়ে গেছে—'

বিষয়টি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাতেই সম্ভবত, দু'জনেই চুপ করে গেল একসঙ্গে। অনেকক্ষণ পরে চম্পাবতী বলল, 'এই রোদ্দুরে অতোগুলি পুরুষের চোখের সামনে ওইভাবে পড়ে আছে মেয়েটা। একটা চাদর-টাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় না!'

'পারলে দেওয়া যেত।' স্ত্রীর আচমকা কথায় ছোট্ট একটা ঘা খেল যামিনী। মনে পড়ল, সে নিজেও পুরুষ এবং দিবাকর সেই যে নীচে নেমেছে, এখনো ফেরেনি। সকালেই বুঝেছিল দৃশ্যটা যতোক্ষণ সামনে থাকবে ততোক্ষণ অনেকেই ফিরবে না। কিছুটা পাশ কাটানোর ধরনে, কিছুটা অসহায়তা মিশিয়ে বলল, 'এসব কেসে বিশেষ কিছু করার থাকে না। পুলিস এসেছে, এরপর যা করার ওরাই করবে।'

'আমার নিজেরই অপমান লাগছে।'

ডান হাতের ব্লাউজের হাতায় নাক ঘষে হাত বাড়িয়ে রুমালটা তুলে নিল চম্পাবতী। সামনের দু'টি দাঁত ঠোঁটে বসিয়ে আর-কিছুর অভাবে ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে আবার সেই আকাশের দিকেই তাকাল উজ্জ্বলতা যেখানে বেসামাল হয়ে উঠছে ক্রমশ।

যামিনী উঠে দাঁড়াল।

'আমি একবার ঘুরে আসি। আর কে আছে ওখানে?'

'অনেকে। ওঁর এক বোন এসেছে। ছেলেকেও কনট্যাক্ট করার চেষ্টা হচ্ছে—'

'এখানের?'

'তোমাদের এম এল এ, সুধাংশু রায়। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম কী?'

'নির্মল গুপ্ত?'

'হ্যাঁ।' চম্পাবতী সহজ হলো। বলল, 'পুলিস কমিশনার না কাকে ফোন করছিল—যদি পোস্টমর্টেম এড়ানো যায়—'

'পারবে কী!'

যামিনী হালদার চটিটা পায়ে গলালো এবং দরজা খুলে বেরুতে উদ্যত হলো।

'দিবাকরকে পাঠিয়ে দিও। এতো কৌতূহল ভালো নয়।'

খানিক লিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা করল যামিনী। কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ছ'তলা থেকে সাত তলায় উঠল। তারপর দম নিয়ে, আবার পা বাড়াল আটতলার সিঁড়ির দিকে। ভয়ই সাবধান করে দিচ্ছে। আত্মরক্ষার ভাবনাটা থাকলে আত্মহত্যা করা সহজ হয় না। ভাবতে ভাবতে ন'তলায় উঠে এলো সে। দেখল, প্রসন্ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। যামিনী দরজা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই সুধাংশু রায় বেরিয়ে এলো।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'এই আর কি—একটু—'

'ওঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। রেস্টলেস্ হয়ে পড়ছিলেন—', মোটামুটি চেনা থাকার সুবাদে যামিনীর পিঠে হাত রাখল সুধাংশু, 'একটু নীচে চলুন না? ও-সি আসছে, বডিটা নিয়ে কথা বলতে হবে।'

এবার লিফট পাওয়া গেল এবং দু'জনে নামতে লাগল।

'আমার স্ত্রী একটা কথা বলছিলেন—'

'কী ?'

'পুলিস যা কববে করুক। এখন বডিটা ঢেকে দেওয়া হোক। আফটাব অল, এতোগুলি চোখেব সামনে—'

যামিনী থামল এবং সুধাংশু ঠিক বুঝছে না দেখে বলল, 'একেবাবে নেকেড—'

'মরা মানুষের আবাব নেকেড কি, মশাই ! সেক্স অ্যাপিল আছে নাকি!' সুধাংশু কেন বিরক্ত প্রকাশ করল বোঝা গেল না, হয়তো স্বভাবে। কথাটা উড়িয়ে দেবার গলায় বলল, 'অদ্ভুত চিন্তা আপনাদের। এরপর শুনব পেত্নীরও সেক্স আছে।'

মুহূর্তের জন্যে রক্ত দুলে উঠল যামিনীর। ভাবল, প্রাক্তন এম এল এ'র চেয়ে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দাম বেশি। এই সূত্রেই সুধাংশুকে রুচি নিয়ে খোঁচা দিতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। তখনই মনে পড়ল রাজনীতির লোকেবা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে। সত্যিই তো, মেয়েটি মরে গেছে ; যে যেভাবেই দেখুক, সে কিছুই দেখছে না। তাকে এখনো বাঁচতে হবে।

এসব ভেবে সুধাংশু বাবের পিছনে পিছনে লিফ্ট থেকে বেরিয়ে এলো যামিনী এবং অভ্যাসবশত রুমাল চাপা দিল নাকে।

আবাব ভিড়ের মধ্যে পৌঁছে যামিনী দেখল মৃতদেহটি পড়ে আছে একইভাবে। শুধু সকালে যা দেখেছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে ভিড়। আগে দেখেনি, এখন দেখল, মেয়েটির নাক ও মুখের কষ বেয়ে নির্গত হচ্ছে লাল আঠার মতো কী একটা পদার্থ। সেখানে অনেকগুলি মাছি ওড়াউড়ি করছে ...হ, আবার উড়ে যাচ্ছে। ওপর থেকে অনেকেই ঝুঁকে আছে এখনো। নীচের ও আশপাশের ...কগুলির মুখে এখন আর প্রশ্ন নেই কোনো, বরং ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং মুখে চাপা হাসি নিয়ে কেউ ...উ অন্য আলোচনায় ব্যস্ত। মেয়েটির চারদিকে দু'হাত দূরত্ব রেখে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে দু'জন পুলিস। দূরে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে একজন ইন্সপেক্টর।

যামিনী দিবাকরকে খুঁজল। দেখতে পেল না।

সুধাংশুর সঙ্গে ভিড়ের দিকে আবো একটু এগিয়ে যেতেই হাসির কারণটি স্পষ্ট হলো।

দূরের পুলিসটির সঙ্গে চেঁচিয়ে কী বচসা করছিল বিমলা ঝি। গায়ের চাদরটা এখন তার হাতে। সুধাংশুকে দেখেই এগিয়ে এলো কাছে।

'ও এম এল এ বাবু, কষ্ট দেখুন মেয়েটার ! আহা, মরেও শান্তি নেই। মাছি বসছে মুখে। দিন না এই চাদরটা ওর গায়ে বিছিয়ে !'

হঠাৎ ঘটনায় বিব্রত হয়ে যামিনীর মুখের দিকে তাকাল সুধাংশু। তারপর ইতস্তত করে তাকাল ইন্সপেক্টরের দিকে।

'কী, অনেকক্ষণ তো হলো ! দিন না ঢাকা দিয়ে ?'

'হয় না, স্যার।' ইন্সপেক্টর বলল, 'ফোটোগ্রাফার আসেনি এখনো। ফোটো তোলা না হলে ঢাকা দেবার নিয়ম নেই—'

'ও হরি, এর বেলায় নিয়ম নেই !' কেউ কিছু বুঝবার আগেই মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল বিমলা, 'আর তিন ঘণ্টা ধরে ভদ্দরলোকেরা যে তারিয়ে তারিয়ে ন্যাংটা মেয়েমানুষ দেখছে, সেটা কার নিয়ম গো বাছা !'

এ কথার পর কেউই কোনো কথা বলল না। এমনকি, আগের ঘটনার জেরে যারা হাসতে শুরু করেছিল, তারাও থেমে গেল হঠাৎ। যামিনী দেখল, হাতের চাদরটা নিয়ে একটু বা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বুড়িটা। ভিড় পাতলা হচ্ছে।

যে নেই

'একটাই দুঃখ থেকে গেল---', অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর মহীতোষ বলল, 'ছেলেটা পর হয়ে গেল।'

কণ্ঠস্বরে নিঃশ্বাস মেশানো। আগের কথাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে ততোক্ষণে।

তখনো রাত হয়নি বেশি। লোডশেডিং চলছে। হঠাৎ টি-ভির শব্দ থেমে গেলে অন্ধকারে পাড়া গাঁ হয়ে ওঠে চারদিক। মনে হয় ঝিঁঝিও ডাকে। চাপা গরমে হাপসে ওঠে শরীর।

একতলা বাড়ির ডিজাইনটাই এমন যে তিনটি কিংবা চারটি ঘরের সব ক'টিকেই ছুঁয়ে আছে বারান্দা। প্রথম ঘরটা অবশ্য ঘর নয়, তিনদিকে দেয়াল ও একদিকে ভিতরে ঢোকার দরজা নিয়ে আড়াল তৈরি হয়েছে একটা—ছোট জায়গায় চারটে বেতের চেয়ার এবং একটি বেঁটে টেবিল পাতা গেছে কোনোরকমে। তৃতীয় ঘরটির পরেও একফালি দেয়ালের আড়াল বারান্দাকে প্যাসেজ করে দেয়। ওর পাশেই রান্নাঘর। ওখান থেকে বারান্দা দেখা যায়।

চাঁদের আলোয় তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল মহীতোষ। খালি গা। তক্তপোষের ওপরেই একটু তেরছা হয়ে বসে স্বামীর পিঠ ডলে দিচ্ছে সীতা। ওখানে এসে বসার আগে টি-ভিতে জাতীয় প্রোগ্রামে মণিপুরী নাচ দেখছিল।

ক্ষীণ গলায় সীতা বলল, 'পর হয়ে যাবে কেন! নিজের ছেলে।'

'হ্যাঁ। নিজেরই ছেলে।' সেই একই নিঃশ্বাস মেশানো গলা। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আটকে য মহীতোষ বলল, 'বারো বছর অদর্শনে স্ত্রী বিধবা হয়। বনবাস হয়েছিল চোদ্দ বছর। এর কতো বছর হলো?'

সীতা চুপ করে থাকল। সম্ভবত আগের কোনো জায়গাতেই থেমে দাঁড়িয়ে ছিল, সময়ের হিসেব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই সময়। এমনও হতে পারে, অদর্শন এবং বনবাস কোনটা কতোখানি ভয়াবহ ঠিক করতে পারছিল না তা। একজনের বয়স সত্তর এবং আর একজনের বাষট্টি—সেই মুহূর্তে পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে থাকায় চাঁদের মেঘাচ্ছন্ন আলোয় জমিদারের বাগানের মধ্যিখানে অবহেলায় পড়ে থাকা যে-কোনো স্ট্যাচুর মতো দেখাচ্ছিল দুজনকে।

স্ট্যাচু যে নয় তা বোঝা যায় মহীতোষের গলা পরিষ্কার করা কাশি শুনে।

খেই হারিয়ে যেখানে শুরু করেছিল সেইখানেই ফিরে এলো সীতা।

'পর হয়ে যাবে কেন!'

'তুমি বুঝবে না আমি কেন বলছি, কী বলছি।'

'ফিরছে না বলেই তো!' সীতা গলা চড়ালো অল্প, 'এরকম অনেক ছেলেই ফেরে না আজকাল। এক একজনের এক একটা জায়গা স্যুট করে যায়। বড়ো হয়েছে, ওর ভালোমন্দ এখন ও-ই বুঝবে। তাছাড়া—'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সীতা। পা দুটো নামিয়ে নিল তক্তপোষ থেকে। মহীতোষের পিঠ থেকে হাত তুলে অন্য হাতটার সঙ্গে জড়িয়ে কোলের ওপর এমনভাবে রাখল যাতে বাড়ি ও পাঁচিলের আড়াল টপকে কোনাকুনি চাঁদের আলো এসে পড়ে ওর কোলে। ডানদিকে হাঁটুসমেত দুটি রোগা পা দেখা যাচ্ছে এখন, তার পাশে চেয়ার-সদৃশ ভঙ্গিতে সাদা শাড়ি জড়ানো দুটি পা। চেয়ারে আলগা হয়ে পড়ে আছে বিচ্ছিন্ন দুটি হাত।

মহীতোষ পা নাচাতে শুরু করল। ঘাম কিংবা মশাজনিত অস্বস্তিতে মৃদু চাপড় মারল পিঠে এবং প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই স্থির হয়ে গেল আবার।

'মানুষ কি শুধু সন্তানের ভালোই চায়, না সন্তানকেও চায়?'

নিজেকে প্রশ্ন করাব ধবনে কথাগুলো উচ্চারণ করল মহীতোষ। থেমে থেমে, এমন এক ধরনে যাতে বিস্ময়ও থাকে। বুঝতে না পারা থেকেই ফুটে ওঠে স্বগতোক্তি।

সীতাও জবাব দিল না। তখন অন্ধকারটাই ঘন হয়ে এলো আরও।

'কিছু প্রত্যাশা থেকেই যায়। দেখতে ইচ্ছে করে। যা দিয়েছি তার বদলে পেতে ইচ্ছে করে কিছু। এই আর কি—'

মহীতোষ থামল। পা নাচাতে শুরু কবল আবার। তারপর বলল, 'একটা অ্যাটাক হয়েছে। আব একটা হবো হবো করেও হলো না। এবপব তো যে-কোনো দিন—'

কথা এবং পা নাচানো দুটোই এক সঙ্গে বন্ধ হলো মহীতোষের। হাতদুটো কোল থেকে অদৃশ্য হওযায ধবে নেওযা যায সীতা ফিরে গেছে সেবায। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন।'

গলাটা চেনা। খানিক আগে এই গলাতেই মানুষ কী চায় না চায় নিযে প্রশ্ন তুলেছিল মহীতোষ।

তাবপর দুজনেই চুপ কবে গেল।

অনুতোষ এসব কথাবার্তা নিজেব কানে শোনেনি। আলো ফিরে আসে রাত দশটায়। তারও কিছুক্ষণ পবে টিউটোবিযালে পড়িযে বাড়ি ফেবে সে। বাথরুমে যায়। স্নান সেরে খাবার টেবিলে বসতে টের পায নৈঃশব্দ্য এ বাড়িতে যখন তখন আসে এবং একবার এলে নড়তে চায় না সহজে। আড মাছের ঝোলেব সঙ্গে গরম ভাত মেখে মুখে তুলতে তুলতে হাতটা থেমে এলো তার।

'বসুন বেশি পড়েছে মনে হচ্ছে!'

চম্পা মাথা নাড়ল, অজুহাত দেখালো না। স্বামীব মুখোমুখি বসে খেতে লাগল নিঃশব্দে।

'চুপচাপ কেন?'

'কেন আবার।'

চম্পা পিছনে তাকাতে অনুতোষও তাকাল। জানলা দিয়ে বারান্দায় দাঁড়ানো সীতাকে দেখা যায়। আকাশ দেখছে।

সামানা ভুরু কোঁচকালো অনুতোষেব। কারণ খুঁজল। অম্বলের ঢেঁকুর নামানোর জন্যে কখনোসখনো পায়চাবি কবে মা। মহীতোষ বাথরুমে গেলে পাহারা দেয়। প্রথম অ্যাটাকটা বাথরুমেই হযেছিল। অজ্ঞাত কাবণে সেদিন দরজাটা বন্ধ কবেনি মহীতোষ। জোরে বালতি ছিটকানোর শব্দ হতেই ওরা ছুটে গিযেছিল বাথরুমে। ছেলে কোলে করার ধরনে বাপকে তুলে ঘরে এনেছিল অনুতোষ। বাঁচার ইচ্ছেয় মহীতোষ তখন তাব হাতটাকেই চেপে ধরে এবং জ্ঞান হারায়।

বাত্রে অনুতোষ চিৎ হবাব পর পুবো ঘটনাটা বর্ণনা করল চম্পা। রান্নাঘরে বসে থাকতে থাকতে সে যা শুনেছে এবং দেখেছে, আগাগোড়া সমস্তই। চাঁদের আলোও বাদ দিল না। অনুতোষ শুধুই শুনে যাচ্ছে দেখে বলল, 'রসুনেব আর দোষ কী। একে ভ্যাপসা গবম, তার ওপর এইসব কথা। শুনলে কার না গা জ্বলে।'

অনুতোষ হাসল। বালিশটা ঠিকঠাক মাথার নীচে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'তোমার রাগ করার কী আছে। ছেলেব জন্যে মন খাবাপ করতে পারে। বয়স হলে এসব চিন্তা হয়ই।'

'সেজন্যে নয়।' দ্বিতীয় চেষ্টায় আক্রমণে উঠে এলো চম্পা, 'এমনভাবে ফিলজফি আউড়াতে লাগলেন যেন খুব কষ্টে রাখা হয়েছে। প্রত্যাশা! কী কথা! প্রত্যাশা পূরণ করতে করতে যে নাজেহাল হচ্ছে, কই, তার কথা তো এতো বছরে একবারও বলতে শুনলাম না!'

চাপা বলেই তীক্ষ্ণ শোনালো চম্পার গলা। অন্ধকার শূন্যের দিকে তাকিয়ে অনুতোষ অনুমান করল ও এখন ব্লাউজের বোতাম লাগাচ্ছে। অভিমানের কারণেই হাত দুটো কাজ করছে দ্রুত। অনুতোষ কিছু না বললে এরপব পাশ ফিরে শোবে। জের কতোক্ষণ চলবে সে জানে না।

ভাবতে ভাবতেই হাই উঠল অনুতোষের। সত্যি, অনেকদিন দাদাকে দেখিনি—এরকম একটা কথা এসে গিয়েছিল মুখে; বলতে গিয়েও সামলে নিল। কিছু কথা কথাই থাকে, নিয়ে যায় না কোথাও। টালিগঞ্জের এই বাড়ি থেকে বার্মিংহামের দূরত্ব আন্দাজ করা যায় না। তবে, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারা

যায় চম্পাকে। পাশের ঘরে বিশুকে। তার পাশের ঘরে মহীতোষ ও সীতাকে। হয়তো এই সিকোয়েনসেই।

পরের হাইটা গলার মধ্যে চেপে রাখতে রাখতে অনুতোষ বলল, 'মানুষ এইরকমই। যা পাওয়া যায় সেটাকেই প্রাপ্য বলে ধরে নেয়।'

'একই রক্ত। অন্যরকম হবে কেন?'

চম্পা পাশ ফিরে শুলো।

পরের দিন কলেজে যাবার জন্যে বাসে উঠে লোডশেডিং ডেকে আনল অনুতোষ। চম্পা যেখান থেকে দেখেছে এবং শুনেছে তার চেয়ে অনেক কাছে দাঁড়িয়ে দুজনকে লক্ষ করতে করতে ভাবল, বাবার কথাগুলো ঠিক হলেও হতে পারে। একটা বয়সের পর মৃত্যুভয় আসে। বঞ্চনার কথা মনে পড়ে। অভাব না থাকলেও হিসেব করতে গিয়ে মনে হয় একটা সোর্স আনট্যাপড থেকে গেল। হয়তো সেটাই ছিল আসল সোর্স। যদি তা না হতো তাহলে যেভাবে বাঁচা হলো তার চেয়ে আর একটু অন্যরকমভাবে বাঁচা যেত। খুঁতটাই তখন দুঃখ এবং অভিমান হয়ে দাঁড়ায়।

বাবা যেভাবে ভাবে মা সেভাবে ভাবে না। সম্ভবত এটা উচ্চাশা না থাকার ফল। মা'র ভাবনা জায়গা খালি হয়ে যাওয়া নিয়ে, কিংবা, সম্ভাবনা নিয়ে। মাস দুয়েক আগে যখন দ্বিতীয়বার বুকে ব্যথা উঠল বাবার এবং প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ল, তখনো একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। ই-সি-জি করবে বলে ডাক্তার যখন প্যাড বাঁধছে বাবার হাতে, তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে মা বলেছিল, 'দাদাকে একটা খবর দিবি তো?'

নিশ্চয়ই কিছু একটা অনুমান করে নিয়েছিল মা। অনুতোষ বলেছিল, 'দেখি—'

গ্রাফ দেখে ডাক্তার বলল, 'হার্টে তেমন কিছু হয়নি। উইল-টুইল হতে পারে।'

এই কথা শুনে প্রশ্নটা ভুলে যায় মা। অবশ্যই স্বস্তিতে। মহীতোষের কিছু হলে একটা জায়গা খালি হতো। স্বামীর অভাব ছেলেকে দিয়ে মেটানো যায় না। তবু, এক বাদ দিয়ে আরও এক যোগ হলে সংখ্যাটা একই থাকত।

সম্পর্কের হিসেব কি এইভাবেই হয়? প্রশ্নটা বিষণ্ণ এবং অমনোযোগী করে তুলল অনুতোষকে।

আঠারো বছর আগে কী একটা স্কলারশিপ নিয়ে দাদা যখন ইংল্যান্ডে গেল, তখন আলাদাভাবে কিছু মনে হয়নি তার। বলতে কি, পাকা দশ বছরের ব্যবধান থেকে পরিতোষকে কোনোদিনই ছুঁতে পারত না সে। তিন বছরে যার ফেরার কথা সে যখন পাঁচ বছরেও ফিরল না এবং তারপর—ইতিমধ্যে বার দুয়েক ঘুরে যাওয়া ছাড়া—সাত-আট বছরেও না, বাবা ও মা তখন পিছু হটতে শুরু করে। ভাটা পড়ে চিঠি লেখার উদ্যমেও। সম্ভবত তখনই ওদের খেয়াল হয় সামনে যতো দূর চোখ যায় শুধু শূন্যতা থাকলেও পিছিয়ে আসা রাস্তায় ঘরবাড়ি উঠে গেছে ইতিমধ্যে। পরিতোষ এবং অনুতোষের মাঝখানের দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, অনুতোষের পরেরটিরও। এবার অনুতোষের কথা ভাবা দরকার।

এর কিছুদিন পরে চম্পা আসে বাড়িতে।

দু বছরের মাথায় বিশ্বতোষ জন্মালে বুড়ো-বুড়ির হিসেব মিলে যায় এবং বেলেঘাটা থেকে টালিগঞ্জের এই বাড়িতে উঠে আসে ওরা। প্রায় নিঃশব্দে। 'বিশুর মুখটা, বৌমা—', মা শুধু বলেছিল একদিন, 'বসানো তোমার ভাসুরের মতো।' চম্পা পরিতোষের ছবি দেখেছিল, পরিতোষকে নয়। আড়ালে অনুতোষকে বলেছিল, 'যতো সব আদিখ্যেতা। ভাসুরের মতো! তোমার গালের তিলটা পর্যন্ত উঠে এসেছে, সেটা খেয়াল করেনি কেন!'

ছেলে হবার পর চম্পা বুঝতে পেরেছিল তার শিকড় কোথায়। এও বুঝেছিল, অনুতোষের ওপর কর্তৃত্ব তারই।

একদিন গভীর রাতে, অনুতোষ যখন ওর বুক থেকে নেমে যাচ্ছে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ইনসিওরেন্স, এ-সবের নমিনি কে?'

সদ্য-পাওয়া সুখের অনুভূতি থেকে রূঢ় হতে পারেনি অনুতোষ। বিচ্ছিন্ন হতে হতে বলেছিল, 'এসব ভাবছ কেন!'

'কেন ভাবব না! যে নেই তার কথা চিরকাল ভেবে যেতে হবে নাকি!'

থাকা-না-থাকার ব্যাপারটা তখন গুলিয়ে যাচ্ছে অনুতোষের মাথায়। ধমক দিতে গিয়েও দেয়নি। এটা তারও দুঃখের জায়গা। ভাবতে ভাবতে বলেছিল, 'জলজ্যান্ত একজনকে নেই বললেই পাশ কাটানো যায় না।'

'থাকা মানে তো শুধু নামে, চিঠিতে, ঠিকানায় ! দায়-দায়িত্বে নয়। আমার একটা হয়েছে, আরও হবে হযতো। যদি মেয়ে হয় ?'

'হলে ভাববো।'

'দুটো বোন তো শুনেছি তোমার ঘাড় দিযেই পার করিয়ে নিয়েছে !'

'আমারও দায-দায়িত্ব ছিল।'

'তার ছিল না !'

চম্পাকে সবানো যায়, ফেরানো যায় না। এব পর থেকেই যতোটা সম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল অনুতোষ। সে গম্ভীর হযেছিল বলেই চম্পাও হযেছিল। মাঝে মাঝে যখন কথা উঠত, তখন কথা ওঠার আগেই 'যে নেই' শব্দ দুটো মাথায় ফিট করে নিত অনুতোষ। এভাবে ভাবলে বডো রকমের দুর্ঘটনা এডানো যায়। লক্ষ কবত, উল্টো দিক থেকে দুজনেব ওপর নজর রাখছে চম্পা। তখনো রিটায়াব করেনি বাবা। মা বাহান্নোয।

প্রথম ক্লাসটা সেরে স্টাফরুমে চলে এলো অনুতোষ। পরের পিরিয়ডটা অফ। সময়পাবে। পুরোনো চামডাব ফোলিও ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে পরিতোষের ঠিকানাটা খুঁজতে খুঁজতে ভাবল, অঙ্কটা জটিল। বাবা-মা ভাবছে, আছে ; চম্পা ভাবছে, নেই। কারণগুলো যদিও আলাদা। যে নেই সে প্রতিপক্ষ হতে পারে না ' চম্পার যুদ্ধটা তাহলে কার সঙ্গে !

বোঝা যায় না। খুব আবছাভাবে চিন্তা করল অনুতোষ, দাঁডাতে হলে দু দলেব মাঝখানে তাকেই দাঁডাতে হবে।

এই ভেবে বহুদিন পবে পরিতোষকে চিঠি লিখতে বসল সে। বাবা-মা'র, বিশেষত বাবার, শবীবের অবস্থা জানিয়ে যতো শীঘ্র সম্ভব একবার আসতে লিখল। একই রক্ত, সেদিন রাগেব মাথায বলেছিল চম্পা। এখন ঠাণ্ডা মাথায় নাম সই করতে করতে নিজেও অনুভব করল, একই রক্ত। শুধু গালের তিল দিয়েই পার্থক্য টানা যায় না।

কাছাকাছি পোস্টাপিসে গিয়ে, খাম কিনে এবং ঠিকানা লিখে চিঠিটা নিজেই ডাকে দিল অনুতোষ। তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। ভাষা যা ফোটায় অনুভূতিও কি তা পারে ! তাহলে পবিতোষ সম্পর্কে তার মনে কোনো আবেগ নেই কেন ? অথচ, চিঠিটা সই করাব সময় সে আব একরকমভাবে ভেবেছিল। কেন ? ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলো কলেজে।

তারপর থেকে সাত-আটদিন পার করে প্রতিদিনই অপেক্ষা করতে লাগল সে।

দিন কুড়ি পরেএকদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পর চম্পা বলল, 'টেবিলের ওপর চিঠি আছে। পড়ে নিও।'

'দাদার' ?'

'নিজেই দ্যাখো।'

পরিতোষেরই। মা-কে লেখা। সামনেব মাসের সাত তারিখে আসছে—চেষ্টা করবে মাসখানেক থাকতে, ইত্যাদি। অনুতোষ হিসেব করে দেখল, চিঠির বয়ান ঠিক হলে সামনে মাত্র দশদিন। নিঃশ্বাস নিতে নিতে চিঠিটা আরও একবার পড়ল সে এবং আবার হিসেবের মধ্যে যেতে যেতে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল।

'কী বুঝলে ?'

'ভালোই তো।'

'নিশ্চয়ই। ভালোই তো !'

শ্লেষ কখনো কখনো চোখেও উঠে আসে। অনুতোষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দেখে চম্পা বলল, 'আসার কথাটা যে তুমিই লিখেছিলে তাব ছিটেফোঁটা মেনশন নেই কোথাও। তোমার নাম নেই, আমাদের

কথাও নেই। হয়েছে!'

অনুতোষ ভাবল, একই রক্ত তারপর, মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করায়, জীবনে প্রথম মিথ্যে বলার দিকে এগিয়ে গেল।

'আমিই মানা করেছিলাম চিঠির রেফারেন্স দিতে।'

'তুমি, আমি, বিশু—আমরা শুধুই রেফারেন্স।'

চম্পার কথা শেষ না হতেই লোডশেডিং হলো। তখন দুজনেই চুপ করে গেল এবং প্রায় হঠাৎই লক্ষ করল, ক্ষীণ চাঁদের আলোয় বারান্দার তক্তপোষের ওপর এসে বসছে দুজনে। কী যেন আছে ওদের বসার ধরনে। শীত ছুঁয়ে গেল অনুতোষের পিঠে।

আড়াল থেকে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় চম্পা বলল, 'এখন কনফিডেন্স এসে গেছে। এখন আর ওসব বলবে না।'

অনুতোষ সাড়া দিল না।

পরের দিন সকালে কলেজে বেরুনোর সময় অনুতোষ দেখল, বসার ঘরে বেতের চেয়ারে বসে ঠায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে মহীতোষ। চোখাচোখি হতে অনুতোষ নিজেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কলেজ যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'চিঠিটা দেখিয়েছে বৌমা?'

অনুতোষ ঘাড় নাড়ল। এর পরের প্রশ্নটা কী হতে পারে অনুমান করতে না পেরে নড়বড়ে লাগল নিজেকে। চম্পা বলেছিল কনফিডেন্স এসে গেছে। কথাটার মানে কী বুঝতে পারেনি। তবু সতর্ক হয়ে অনুতোষ বলল, 'সামনের সাত তারিখে তো?'

'দেখতে দেখতে কেটে যাবে।' গলা পরিষ্কার করার জন্যে কাশল মহীতোষ, 'তিনটে মোটে ঘর। ও থাকবে কোথায় বল তো?'

'কেন!'

প্রশ্নটা যেখানে শেষ হলো সেইখানে দাঁড়িয়েই সীতাকে দেখতে পেল অনুতোষ। হয়তো আগেই এসেছিল, সে খেয়াল করেনি।

'তোর বোধহয় মনেই নেই কিছু।' সীতা বলল, 'শেষ যেবার এসেছিল, তখন আমরা বেলেঘাটায়। ওখানেও তিনটে ঘর ছিল। তবে, তোর তখনো বিয়ে হয়নি।'

অনুতোষ কিছু বুঝল, বাকিটা না বুঝেই এগোবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এখনো তো দেরি আছে!'

'তা আছে।' মহীতোষ বলল, 'তবে এসব আগে থেকেই ভেবে রাখা ভালো। গোছগাছ করতেও তো সময় লাগে।'

অনুতোষ জবাব দিল না। বেরিয়ে যেতে যেতে কী ভেবে আরও একবার পিছনে তাকাল সে। স্পষ্টই দেখা যায়। মহীতোষের পাশের খালি চেয়ারটায় এখন সীতাও এসে বসেছে। দুজনেরই চোখ রাস্তার দিকে। বসার ঘরে এইভাবে এর আগে কখনো দুজনকে একসঙ্গে দেখেছে কি না মনে করতে পারল না।

দৃশ্যটা লেগে থাকল চোখে।

ইচ্ছে করেই সেদিন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রাত করে বাড়ি ফিরল অনুতোষ। যতোটা থাকে তার চেয়ে বেশি গম্ভীর মুখ। আলো নেবানো থাকায় জ্যোৎস্নায় খাঁ খাঁ করছে বারান্দার তক্তপোষটা। দেখতে দেখতে নিজেদের ঘরে ঢুকল সে, জামাকাপড় বদলালো, বাথরুমে গেল। ফিরে এসে দেখল টেবিলে খাবার সাজিয়ে হাতে চিবুক পেতে বসে আছে চম্পা! অন্যদিন যেমন চনমনে দেখায় তেমন নয়। একটু ভারী ; কিছু বা অন্যমনস্ক। তখন বলল, 'আমার জন্যে বসে থাকো কেন! খেয়ে নিলেই পারো!'

'কবে নিয়েছি!'

অনুতোষ এগোলো না আর। কাল থেকেই কেমন নিরস্ত্র লাগছে নিজেকে। কোন কথা কোনদিকে

এগোবে এবং ফিরে আসবে, বুঝতে পারছে না ঠিকঠাক। দশদিনের একটা দিন আজই চলে গেল। ভাবতে ভাবতে আবার বারান্দার দিকে তাকাল সে।

জ্যোৎস্না অবারিত। চম্পা তাকেই দেখছে।

অস্বস্তি বোধ করায় ভাতের থালার ওপর ঝুঁকে এলো অনুতোষ। মাংসের বাটিটা উপুড় করল পাতে।

প্রথম গরসটা মুখে তুলেই কেমন কাঁপুনি এলো শরীরে। চোয়াল নাড়া থামিয়ে তাকাল চম্পার দিকে এবং বিরক্ত গলায় বলল, 'এতো নুন কেন।'

'এখন এইরকমই চলবে।'

'তার মানে।'

চম্পা হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'আমি কী বলব! তোমার মা আজ হেঁশেলে ঢুকেছিলেন। বললেন মাংস রাঁধবেন। কতো বছর পরে গো?'

শব্দ দুটো আগেই ফিট করে নিয়েছিল মাথায়। চোখে চোখ পড়ার ভয়ে এখন দৃষ্টিটাও নামিয়ে নিল অনুতোষ। নিঃশ্বাস নিল এবং ছাড়ল। তখন অনুভব করল আরও একটা ভার ধাক্কা দিচ্ছে ঘাড়ের পিছনে।

চম্পা যেভাবে ভাবে সে সেভাবে ভাবে না। তবু, স্বাদটা লবণাক্তই।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণে চোয়াল নাড়তে শুরু করল সে।

জাতীয় পতাকা

বৃষ্টি নেমেছিল দুপুরে, বিকেলের দিকে কলকাতা ভাসল। দু'দিকের জল রাস্তার মাঝখানটাকে ছোট করতে করতে একূল-ওকূল হয়ে এক সময় উঠে এলো ফুটপাথে। বিকেলের আগে থেকেই এই জায়গায় আলু, পেঁয়াজ, পেঁপে, ঢ্যাঁড়শ, চিচিঙ্গা, পটল নিয়ে বসে সবজির কারবারীরা, চাল, ডাল কি বড়ির কারবারীরাও বাদ যায় না। আখের রসের গাড়ি, ছিট-কাপড়ের ফেরিওলা কি চাকি বেলনার পসরাও থাকে মাঝেমধ্যে। এসব থাকে বলেই কেনাকাটার ভিড়ও থাকে। আজও ছিল। কিন্তু ঘন মেঘের বৃষ্টি যে এমন একটানা চলবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব, ঘুণাক্ষরেও কেউ তা টের পায়নি। হালকা ঝড় মেশানো বৃষ্টির দাপট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি, বাস, মোটরের যাতায়াত কমে এলো। যাত্রী না থাকায় কেশাও উধাও। মানুষজন কখনো আছে কখনো নেই। ঢাকা তোলা ম্যানহোলে পাছে কারও পা হড়কায় সেজন্যে বাঁশের লগিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে গুঁজে রেখেছে কেউ। এখন বৃষ্টিটা ধরে এলেও থামেনি পুরোপুরি। ফুটপাথের জল গোড়ালি ভিজিয়ে দেয়।

একদিকে রেস্তোরাঁ, অন্য দিকে ওষুধের দোকান। মাঝখানে পঞ্চানন দাসের টেলারিং এবং অর্ডার সাপ্লাই শপ। দোকানে ঢোকার জন্যে দু'থাক কাঠের সিঁড়ি। তারই এক ধারে বসে জলে পা ডুবিয়ে বৃষ্টি দেখছিল হাজারি মণ্ডল। কলকাতা শহর বলে কথা, এখানে যে অনেক কিছু হয়—এমন কি জ্যান্ত গোখরোর মাথাও মুখের মধ্যে পুরে ডুগডুগি বাজিয়ে দিব্যি পয়সা রোজগার করে মানুষ, তা বুঝতে কিংবা দেখতে বাকি নেই তার। বৃষ্টিও দেখেছে। গাঁয়ের দলের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে গোলাপকে নিয়ে যেদিন শেয়ালদা স্টেশনে নেমেছিল, সেদিনও বৃষ্টি ছিল ঝিরঝিরে, জষ্টির শেষ কি আষাঢ়। দু'ধারে কঞ্চিতে লাগানো নবদ্বীপ কৃষক কল্যাণ সমিতির ফেস্টুনের পিছনে গ্রাম থেকে আসা অন্যান্য পুরুষ ও মেয়েমানুষের সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাবার সময়েই অল্প গা ভিজিয়ে থেমে যায় বৃষ্টি। এই তার প্রথম কলকাতায় আসা। গোলাপেরও। সে তো তবু নৈহাটি পর্যন্ত এসেছিল একবার, অনেক ছোটবেলায়। গোলাপ কখনো গাঁয়ের চৌহদ্দি পেরোয়নি। কলকাতা দেখতে দেখতে কখন নেমেছে বৃষ্টি, কখনই বা থেমে গেছে খেয়াল করেনি। তার পরেও দেখেছে কখনো সখনো। জল জমে, নেমেও যায়। অবাক হয়নি। আজই দেখল নদী হয়ে উঠেছে কলকাতা।

অকর্মণ্যের ঢেঁকি সেজে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতেই হাজুর চোখে পড়েছিল গাঢ় সবুজ একটা ডাব ভাসছে জলে। তাড়াহুড়োয় ঝুড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে ফেলে গেছে কেউ! তা সে আর কী করবে! ডাবটা কুড়িয়ে এনে পরিতৃপ্তি ভরে পুরো জলটাই গলায় উপুড় করেছিল হাজু। আইসক্রীম খাবার কাঠের চামচও কুড়িয়ে পেয়েছিল একটা—সেটা দিয়ে কুরে কুরে ভিতরের শাঁসটুকু চেঁছে জিব বুলিয়ে চেটে নিচ্ছিল এখন। দুপুরে ছোলার ছাতু খেয়েছিল কাঁচালঙ্কা দিয়ে, তবে এক টাকার মাত্র—ডাবের শাঁস চাখতে চাখতেই টের পাচ্ছিল হজম হয়ে গেছে সব। এটা ওটা কাজ না করলে পয়সা জোটে না। তখন উপোস। কলকাতায় আসবার পর গোড়ার দিকে এমন হয়েছে অনেকবার। তখন যে-চোখে সে ট্রাম, বাস কিংবা বিশাল বাড়ি, ঝলমলে দোকান আর রাস্তার ভিড় দেখত, সেই চোখেই দেখত মানুষগুলিকেও।

একইরকম কঠিন-কঠিন মুখ সব। হাজারি মণ্ডল যে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে, সেটা মানুষজনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারত না হাজু। জানত না কীভাবে কথা বলতে হয় এদের সঙ্গে। বড়ো ঘড়িঅলা বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে একদিন সে দেখল পথচলতি এক পেন্টুলুন-পরা বাবুর কাছে ভিক্ষে চাইছে একটি হ্যাংলা চেহারার লোক। বাবুটি লোকটিকে না দেখেই ব্যাগ খুলে পয়সা দিল তার হাতে। এর পর সেও সাহস করে হাত পাতে একজনের সামনে এবং পেয়ে যায় পয়সা। তখন থেকেই হাজু

বুঝে যায় সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ালে কেউ না কেউ দিয়ে দেয় কিছু। আস্তে আস্তে কথাও বলতে শিখে যায় সে।

'কী হাজু! কার ডাব হাতালে?'

গলার স্বর শুনে ব্যস্তভাবে পিছনে তাকাল হাজু। টেলারিং শপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কখন যে পঞ্চাননবাবু তার প্রায় পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি। খানিকটা জড়োসড়ো হলো সে। ডাবের শূন্য খোলাটা জলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দেখল অল্প জল ছিতরে আবার যেমন-কে-তেমন ভাসছে সেটা। জিনিসটা শুঁকে দেখতে একটা নেড়ী নেমে পড়েছিল রাস্তায়। জল দেখে উঠে এলো।

'হাতাইনি বাবু। ভাসছিল। শাঁস খাবো ভেবে তুলেছিলাম। দেখলাম গোটা।'

'আজ তোমার কপাল ভালো।'

'হ্যাঁ, বাবু।'

হাজু উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি ধরে যাওয়ায় আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে জল। সিবসিব করছে গোড়ালির আশপাশ। কেমন যেন অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। একে আকাশ মেঘলা, তার ওপর বিজলিও গেছে সম্ভবত। দোকানের ভিতরে মোমবাতি জ্বেলে সেলাই মেশিনে প্যাডেল করে যাচ্ছে বড়ো কারিগর গুলুবাবু। এক গাদা কমলা, সাদা আর সবুজ রঙের কাপড় ডাঁই করা রয়েছে নীচে। মেশিন থেকে কমলা ও সাদার জোড় নেমে আসছিল।

খানিক অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল হাজু। ঘবঘর শব্দ উঠছে মেশিনে। সাদার মাঝখানে গোল মতন নকশা। চেনা লাগছে খুবই। দু'দিক থেকে দু'রঙের কাপড় টেনে মাঝে মাঝে জোড় ঠিক করে নিচ্ছিল বড়ো কারিগর।

'গুলুবাবু, নমস্কার।'

কথাগুলো বড়ো কারিগরকে বললেও জোড় করা হাত দুটি পঞ্চাননবাবুর দিকেই তুলল হাজু। মেশিনে প্যাডেল করতে করতে ভিতর থেকে মুখ তুলে হাসল গুলুবাবু।

'নমস্কার, নমস্কার। এখানে কী মতলবে?'

'মতলব নাই কোনো। ওদিকের, ওই সিনেমার কাছে ফার্নিচারের দোকান—বাবু সকালে বলেছিল বিয়ের ফার্নিচার পৌঁছে দিতে হবে কালীঘাটে। বৃষ্টি দেখে বলল পালিশ নষ্ট হবে। কাল সকালে যেতে বলল।'

'কালীঘাট যাবি! চিনিস জায়গাটা?'

'চিনি বটে।' উৎসাহ পেয়ে হাজু বলল, 'মন্দিরের পাড়ায়। গেছিলাম একদিন মন্দিরে। পুজো দিলাম—'

পঞ্চাননবাবু কিংবা গুলুবাবু কেউই তার কথায় কান দিচ্ছে না দেখে একটু থামল হাজু। তারপর বলল, 'একাকী যাবো না। আরও মাল যাবে—অন্য কুলি যাবে—'

'তা যা। মজুরি নিবি ভালো করে। দশ টাকার কম নয়। ফেরার বাস ভাড়াও চেয়ে নিবি।'

এই সময় বিজলি ফিরে এলো হঠাৎ এবং চারদিক থেকে একটা চাপা স্বস্তির শব্দ উঠল। কাজ থামিয়ে আঙুল মটকাতে শুরু করেছিল গুলুবাবু। মেশিন ছেড়ে উঠে এসে ফুঁ দিয়ে নেবাল মোমবাতি দুটো।

পায়ের তলায় ক্রমশ জল সরে যাওয়ার অনুভূতি টের পাচ্ছিল হাজু। তাকিয়ে দেখল ফুটপাথ থেকে সত্যিই জল নেমে গেছে অনেকটা। নতুন করে না নামলে আর দু'দশ মিনিটে পরিষ্কার হয়ে যাবে হয়তো। রাস্তার জল এখনো স্থির দেখালেও যেখানে ম্যানহোলে ন্যাকড়া বাঁধা লগি লাগানো সেখানটায় চরকির মতো দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে জল। ঘূর্ণিতে মানুষ পড়ার মতো ঘুরছে একটা পুঁইয়ের ডাঁটি। নিশ্চয়ই টানছে ভিতরে। শালপাতা, ছেঁড়া কাগজ, ময়লা এবং শাকসবজির টুকরোসহ খুচরো জঞ্জাল এঁটে আছে ইতস্তত। ডাঁশ উড়ছে। এখানে ওখানে যারা অপেক্ষা করছিল তাদের কেউ কেউ নেমে পড়েছে ফুটপাথে।

পঞ্চাননবাবু বৃষ্টি দেখছিলেন। যেখানে ছিলেন সেখান থেকে নেমে এসে সামনে হাত বাড়িয়ে

ইলশেগুঁড়িতে কতোটা জোর পরীক্ষা করলেন। তারপর দোকানেব ভিতব তাকিয়ে বললেন, 'ছাতাটা দাও তো হে। ভদ্রলোক বোধহয় চলেই গেলেন—'

জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে পঞ্চাননবাবুর মুখেব উদ্বেগ লক্ষ করল হাজু। মাঝারি চেহারার মানুষটি, গোলপানা মুখ, রঙ খুব ফর্সা। কী যেন ভাবেন সব সময়। বড়ো কারিগর বলেছিল এই ব্যবসাটা কিছু নয়, আছে বলেই চালাচ্ছেন বাবু। হাজু এব বেশি জানে না। তবে মানুষটি যে দয়ালু তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। গোলাপ যেদিন হারিয়ে গেল সেদিনই তাকে টাকা দিয়েছিলেন একটা। বউকে খুঁজতে খুঁজতে দিশেহারা হাজু চলে এসেছিল এখানে। বাবু, আমার পরিবারকে খুঁজে পাচ্ছি না, আপনারা খুঁজে দেন। বৃত্তান্ত শুনে পঞ্চাননবাবু বললেন, চৌরাস্তায় যাও, ওখানে পুলিশ আছে। তাদের বলো। পুলিশ বলে, ভাগ শালা, হারামি। যা, লালবাজারে যা।

পুরনো ঘা। টিপলে ব্যথা করে। মন-কেমন-করা হাহাকারে ঝিমঝিম করে গোটা শরীর।

ভেবেচিন্তে কথাটা বলেই ফেলল হাজু।

'বাবু, একটা কাজ দেন না!'

উদাসীন ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে কারিগরের হাত থেকে ছাতাটা টেনে নিলেন পঞ্চাননবাবু।

'এখানে কী কাজ করবে! আমার দর্জির দোকান। এখানে কি মুটে মজুবের কাজ হয়!'

হাজু চুপ করে থাকল।

'বলেছিলাম দেশে চলে যাও। ট্রেন ভাড়া দিয়ে দেবো—', ছাতা খুলতে খুলতে বললেন পঞ্চাননবাবু, 'ডাবের খোলা চেটে কদ্দিন চলবে!'

হাজু তখনো হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাঁ হাতটা পাঞ্জাবির বুক পকেটে ঢুকিয়ে কী খুজলেন পঞ্চাননবাবু। এক টাকার একটা নোট বের করে ওব হাতে দিয়ে বললেন, 'রোজ রোজ কি ভিক্ষা দেওয়া যায়।'

জল বাঁচিয়ে পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করলেন পঞ্চাননবাবু।

কথাগুলো কানে লেগে থাকল হাজুর। সে কাজ চেয়েছিল, বদলে যা পেল সেটা ভিক্ষাই। বলা যাবে না সে কাজই চেয়েছিল, ভিক্ষা নয়। পেট মানে না বলেই হাতটা সক্রিয় হয়ে ওঠে কেমন। আর, দেশে ফেরা? হাজু শেয়ালদা স্টেশন চেনে, কতোটা আব রাস্তা! কিন্তু, গোলাপকে ছেড়ে একা গেলে মুখ দেখাবে কী করে! যদি গোলাপ ফিরে আসে!

'বউয়ের খবর পেলি?'

সামান্য অন্যমনস্ক ছিল হাজু। গুলুবাবুর আচমকা প্রশ্নে মুখ কাঁচুমাচু করল। এসব প্রশ্ন শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু, দোষটা তারই। গোলাপ হারিয়ে যাবার পর জনে জনে গিয়ে কথাটা নিজেই বলেছিল সে। তখন থেকেই জানাজানি হয়ে যায়। সবাই কি আর পঞ্চাননবাবু! কেউ কেউ মজাও পায়। বড়ো কারিগর অবশ্য চেনা হয়ে গেছে।

গুলুবাবু বিড়ি ধরাল। মেশিনের গায়ে লাগানো টুলটা টেনে নিয়ে এসে দরজার সামনে বসতে বসতে বলল, 'সোনাগাছিতে গিয়ে খোঁজ কর। দ্যাখ্ রাণ্ডি হয়ে গেল কি না!'

কথাটা ধাঁ করে লাগল কানে। হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতির ওপর কাঁধ ছেঁড়া শার্ট, জলে ভিজে লেপটে আছে গায়ে। শার্টের নীচে পাঁজরের হাড়ে অপমান ছুঁয়ে গেল হাজুর। কোনোরকমে রাগ আড়াল করে বলল, 'খারাপ কথা বলবেন না, বাবু। গোলাপ আমার বউ বটে। খারাপ মেয়েছেলে নয়।'

'তোর বউ বলেই কি খারাপ!' বিড়িতে টান দিয়ে গুলুবাবু বলল, 'এটা কলকাতা শহর। বয়সের মেয়েমানুষ পেলেই ঝেড়ে দেবে। তাই বলছিলাম—'

হাজু জবাব দিল না। দেশ গাঁয়ে কেউ এরকম কথা বললে ছেড়ে কথা বলত না সে। ঝাঁপিয়েই পড়ত হয়তো। সেবার, মনে পড়ল, গোলাপকে নিয়ে গিয়েছিল রাসের মেলায়। ভর সন্ধেয় কুপির আলোয় জামার মাপ নিতে গিয়ে এক বেপারী হাত দিল গোলাপের বুকে। কী আজব লোক সব! গোলাপ ফোঁস করে উঠতেই লোকটার টুঁটি টিপে ধরেছিল হাজু। সেটা আর এটা এক কথা নয়। কিন্তু, গুলুবাবু তো গাঁ-গঞ্জের মানুষ নয়, কলকাতার লোক; হাজু বেকায়দায় পড়েছে বলেই কি এমন বেফাঁস

কথা বলবে। গোলাপ বাগুি হয়ে গেল!

রাগটা চেপে গেল হাজু। বলল, 'বুবানগরটা কোনদিকে?'

'বুবানগর। ও, বরানগর? সে এখানে না কি! কেন রে?'

'ওর মাসী থাকে বলেছিল—'

'বরানগরে!' গুলুবাবুর লম্বাটে, গাল ভাঙা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ফোটা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'যা, চলে যা সেখানে। একেবারে দিল্লি চলে যা না কেন। ওখানেও তোর বউয়ের মেসো আছে। শালা রে! কী আকাট গাড়ল লোক তুই। বাবুই বলেছিল ভালো কথা। ফিরে যা। এখানে থাকলে না খেয়ে মরবি।'

'মরলে মরব!'

হাজু চলে যাবার উপক্রম করছিল। ওকে বিরক্ত দেখে ডাকল গুলুবাবু।

'শোন না পাগলা। রাগ করিস কেন?'

বৃষ্টি এখন একেবারেই নেই। ডাঙা দেখা যাচ্ছে রাস্তার মাঝখানে। ক্রমশ বেশি লোকজন চোখে পড়ছে রাস্তায়। দুটো কুকুর গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে এগোচ্ছিল পুবদিকে। হাজুর সামনে এসেই খ্যাঁক করে উঠল একটা। হাজু সরে এলো। এক সুন্দরী মেয়েমানুষ যাচ্ছে লেবু পাতার সুগন্ধ ছড়িয়ে, লম্বা এক খড়ের টুকরো আটকে আছে তার পায়ের চটিতে। হাঁ করে সেই মেয়েমানুষের চলে যাওয়া পা দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওপরে চোখ তুলল হাজু। জমাট মেঘে থমকে থাকা আকাশটা নেমে এসেছে ঘড়িঅলা বাড়ির মাথায়। সেই সময় এক সঙ্গে জ্বলে উঠল রাস্তার আলোগুলো।

'কী বলবেন বলুন?'

'গেলাসটা নিয়ে যা। চা নিয়ে আয়। একটা ভাঁড় চেয়ে নিবি তোর জন্যে। বিস্কুট খাবি নাকি?'

হাজু হেসে ফেলল। গ্লাস আর টাকা নিয়ে গেল রেস্তোরাঁয়। ফিরে এসে ভাড়ের চায়ে নোনতা বিস্কুট ডুবিয়ে খেতে খেতে ভাবল, পঞ্চাননবাবু বলেছিলেন আজ তার কপাল ভালো। হয়তো তা-ই। এই বৃষ্টিতে কাজ পেত না কোথাও। সেটা অনুমান করে কম খেয়েছিল দুপুরে। সকালের মজুরি থেকে বেঁচে গিয়েছিল দু'টাকা। দুই আর পঞ্চাননবাবুর দেওয়া এক নিয়ে তিন হলো। বিস্কুটও জুটে গেল চায়ের সঙ্গে। চাইলে রেস্তোরাঁর বাবুরাও চা দেয় এক ভাঁড়—সেটা পাওনা আছে এখনো। দরকারে বস্তা ভর্তি খালি ভাঁড় আর এটোকাঁটা নিয়ে সিনেমা হলের পিছনে জঞ্জালের গাদায় ফেলে দিয়ে আসে সে। তখন পয়সাও পায়। আজ রাতে মাছভাত খেয়ে ঢাকা বারান্দার নীচে শুতে যেতে পারবে।

হাজুর মুখের তৃপ্তি লক্ষ করতে করতে গুলুবাবু বলল, 'যে-বাবুরা তোদের মিছিলে নিয়ে এসেছিল তাদের-অফিসে গিয়ে বল না কেন?'

'কাকে বলব। একা আসি নাই। তা শ খানেক মেয়েপুরুষ এসেছিল বটে। ওরা কি চিনে রেখেছে কাককে। হাজারি মণ্ডলকে চিনবে কেন বাবু।'

'জোর করে চেনাবি। বলবি লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তুইও ছিলি মিছিলে। তোদের কৃষক কল্যাণ সমিতির নাম বলবি। তারিখটা মনে আছে?'

চা শেষ করে ভাঁড়টা ফুটপাথের ধারে নামিয়ে রাখল হাজু। ভাবল কিছু।

'ওদেরও কাউকে চিনি না, বাবু। আসার সময় অতো বুঝি নাই। হাতে হাতে দশ টাকা খোরাকি দিল। বলল, কলকাতা দেখাবে। চিড়িয়াখানা, মনুমেন্ট দেখাবে। রাতের গাড়িতে ফিরিয়ে দেবে—'

'আর তুইও চলে এলি বউ নিয়ে!'

গুলুবাবু আবার মেশিনে গিয়ে বসল। গম্ভীর মুখ। মাথা ঝুঁকিয়ে পা চালানো শুরু করল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাজু দেখল, কমলা ও সাদা রঙের কাপড়ের সঙ্গে এবার সবুজ কাপড় জুড়ছে গুলুবাবু।

'কী সিলাই করছেন?'

'দেখে বুঝছিস না।'

'হ্যাঁ। ফেলাগ।'

'হ্যাঁ রে পাগলা, ফেলাগ।' গুলুবাবুর গলায় শ্রাচ্ছিল্য। আবও একটি বিড়ি ধরিয়ে, জ্বলন্ত দেশলাই

কাঠিটা নেবাতে নেবাতে পুরু কাচের ভিতর দিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল হাজুর দিকে, 'তোদেব জাতীয় পতাকা। সামনে পনেরোই আগস্ট। স্বাধীনতা দিবস। লোকে ঝাণ্ডা তুলবে।'

বলতে বলতে থামল গুলুবাবু। তারপর আবার মেশিনে প্যাডেল করতে করতে বলল, 'তোকেও দেবো একটা। বউ গেল, পরনের কাপড়ও যাবে। কাঁধে নিয়ে ইনকেলাব জিন্দাবাদ জয়হিন্দ করিস। এখন যা—কাজ করতে দে—'

টেলারিং শপের সামনে থেকে সরে এসে সময় আন্দাজ করবাব চেষ্টা করল হাজু। এখন বিকেল নয়, সন্ধেও নয়। তবে আকাশে ঘোর লেগে থাকলে সন্ধেই মনে হয়। বৃষ্টিব পরে গুমোট ভাব কেটে গেছে অনেকটা। চারপাশে শান্ত হয়ে আছে সর্দি-লাগা হাওয়া। মোড়ের পানের দোকান থেকে দুটো বিড়ি কিনে একটা পকেটে রেখে দড়ির আগুনে অন্যটা ধরিয়ে নিল হাজু। তারপব রাস্তা পার হয়ে বাস গুমটির পাশ দিয়ে হেঁটে চলে এলো মনুমেন্টের নীচে। জায়গা খুঁজে বসল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও কয়েকজন বসে আছে চত্বরে। কাছেই ফুচকাঅলাব সামনে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে ক'জন। এক ছোকরা মতো বাবু তার পাশের মেয়েছেলেটাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল। লাজলজ্জার বালাই নেই কোনো। মেয়েছেলেটাকে দেখে বউ বলে মনে হয় না। কেমন যেন ক্ষয়া-ক্ষয়া,গা-গতর দেখানো রুক্ষ চেহারা। বাণ্ডি হয়তো। কলকাতায় এসে দেখছে এরকম, এই মেয়েছেলে নিয়ে কচলানোব বাতিকটা। রাণ্ডিবও অভাব নেই। রাতে ঢাকা বারান্দাব নীচে সে যখন বসে কিংবা শুয়ে থাকে একা, হঠাৎ কখনো চোখে পড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এক-একটা জোয়ান কিন্তু ন[illegible]টে চেহাবার মেয়েছেলে। কাল একজনকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে গেল। মুখ কিংবা হাবভাব দেখে চেনা যায়। তাদের গাঁয়েও বেশ্যা ছিল, তবে এরকম মিলেমিশে একাকার হয়ে নয়—জেলে পাড়াব পিছনে নদীব গা-ঘেঁষে কয়েক ঘব। আগে ভোট দিত না। এখন ভোটেব সময় দল বেঁধে এসে লাইন দেয়। একবাব সে গোলাপকে বেশ্যা চিনিয়ে দিয়েছিল।

বড়ো একটা নিঃশ্বাস ফেলল হাজু। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে দিল দূবে। আবাব নিঃশ্বাস নিয়ে ওপবে তাকাল। মেঘ কেটে ক্ষীণ, হলদেটে একটু আলো ফুটেছে আকাশে। ওটা বুঝি চাঁদ ওঠাব জায়গা? হবেও বা।

দেখতে দেখতেই মনটা কেমন এলোপাথাড়ি হয়ে গেল হাজুর। অনেকদিন হয়ে গেল, কোথায় যে চলে গেল গোলাপ! গুলুবাবু যেমন বলল তেমনি সত্যি-সত্যিই কেউ ওকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়ে বাণ্ডি করে দিল না তো! কোথায় ওই সোনাগাছি জায়গাটা, একদিন সত্যিই কি যাবে সেখানে গোলাপকে খুঁজতে? না কি অন্য কোথাও ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেটেরে ফেলল কেউ! এই জায়গায়, এই মনুমেন্টের নীচে সকাল, দুপুর, সন্ধে এবং রাত্তিরে অনেকটা পর্যন্ত সে ঠিকই এসে বসে থাকে রোজ—তার খোঁজে এলে গোলাপ নিশ্চয়ই কখনো না কখনো খুঁজে পেত তাকে। এইখানে ওকে বসিয়ে রেখেই তো খাবার আনতে গিয়েছিল সে। বলেছিল, যাস্‌নি কোথাও। তখন বিকেল, আলো ছিল চারদিকে, লোকজনও কম ছিল না। মিছিল করতে এসে হাজার হাজাব মানুষের ভিড়ে আগের দিনই দলছাড়া হয়ে পড়েছিল তারা। এই জায়গাটা সকলের চেনা, ভেবেছিল এইখান থেকেই আবার কুড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের। না হলে, যে করেই হোক, নিজেরাই ফিরে যাবে। ফিরে এসে দেখল, নেই।

চোখ দুটো জলে ভরে গেল হাজুর। ক্রমশ হাঁটু জোড়া করে তার ওপর মুখ পেতে একা দুঃখে ডুবে গেল সে। চেয়েচিন্তে, ভিক্ষে করে কিংবা মজুরি খেটে এ পর্যন্ত কোনোরকমে টিকে থাকতে পারলেও বুঝতে পারে ক্রমশ জোর কমে যাচ্ছে হাড়ে, ফাঁক বাড়ছে পাঁজরের ফাঁকে, খোদল তৈরি হচ্ছে পেটে। মাঝে মধ্যেই দুর্বল লাগে বড়ো। দু'টি খাবারের জন্যে রোজ রোজ এই হা-পিত্যেস কবে থাকার জীবন ভালো লাগে না। জমেও না কিছু। এরপর রোগবালাই হলে যাবে কোথায়! না, গাঁয়ে ফিরবে না। তাহলে কি কলকাতার রাস্তাতেই হাপ্‌সে মরবে সে!

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙল ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে। কখনো থামে একটু, শুরু হয় আবার। বৃষ্টি মাথায় ফার্নিচারের দোকানে গিয়ে হাজু শুনল, কুলির মাথায় যাবে না। ত্রিপল ঢেকে সব মাল এক সঙ্গে তুলে দেওয়া হচ্ছে ট্রাকে।

'মাল তোলার লোক লাগবে না, বাবু ?'

'সে তো ট্রাকের লোকই তুলবে। ওখানে নামিয়েও দেবে। কন্ট্রাক্টের কাজ।'

হাজুর মাথায় হাতুড়ি পড়ল। লোভে পড়ে আড়মাছের ঝোলের সঙ্গে একটু বেশি ভাত খেয়ে ফেলেছিল কাল। পুরো টাকাটাই খরচ হয়েছে। বড়ো আশা ছিল কালীঘাটে মাল পৌঁছে দশ টাকা না হোক পাঁচ টাকা ঠিকই পাবে। এদিকে বৃষ্টিও নেমেছে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় না আজ আর রোদ উঠবে।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ! বললাম তো হবে না।'

'হাঁ, বাবু। শুনেছি।'

হাজু তখনো নড়ছে না দেখে ফার্নিচারের দোকানের লোকটি বলল, 'পরে খোঁজ নিও। দেখব অর্ডারের দেখা নেই, এদিকে মাল তোলার লোক বাড়ছে। এই নাও পঞ্চাশ পয়সা। সাত সকালে এসেছ, চা খাবার জন্যে দিলাম।' মাটিতে গড়ানো শব্দটা কুড়িয়ে নেবার আগে সামান্য দ্বিধা বোধ করল হাজু। এও তো দয়া, এবং ভিক্ষা। তাহলে কি ক্রমশ ভিখারি হয়ে যাচ্ছে সে !

বৃষ্টি থামল না। বরং বাড়তে লাগল ক্রমশ। দুপুরের পর থেকে এমন জোরে নামল যে দ্রুত ফাঁকা হতে লাগল রাস্তা। ট্রাম চলা বন্ধ হলো, বাস নেই, সন্ধে হতে না হতেই নেমে এলো রাতের স্তব্ধতা। দোকানপাট আগেই বন্ধ হতে শুরু করেছিল। বিজলি বন্ধ হয়ে রাস্তাও ঘুটঘুটে প্রায়।

খিদের জ্বালায় দু'কান কাটা হয়ে পঞ্চাননবাবুর দোকানে গেল হাজু। দরজা বন্ধ। পাশের ওষুধের দোকানেও কোনাকুনি তালা টানা। রেস্তোরাঁয় লোক নেই। অল্প ফাঁক দরজার ভিতর দিয়ে হাজু দেখল টেবিলের ওপর উল্টো করে চেয়ার তোলা—লণ্ঠনের আলোয় মেঝেয় বসে তাস খেলছে রেস্তোরাঁর দুটি ছোকরা।

ফাঁকের ভিতর মুখ গলিয়ে হাজু ডাকল, 'ও ভাই !'

'আ-রে তু ! কী মাংছিস এখন ?'

'কিছু খাবার দেবে ? দাও না ! সারাদিন পেটে পড়ে নাই কিছু !'

'এখন কী খাবার মিলবে ! সব তো বন্ধ ! তু আগে আসবি তো !'

'দয়া করো ভাই !' ছেঁড়া শার্ট তুলে নিজের গর্তে ঢোকা পেট দেখিয়ে হঠাৎই কেঁদে ফেলল হাজু 'ভগবান মেরে দিয়েছে। বড়ো ক্ষুধা ! দাও না কিছু !'

দু'জনেই হাজুর দিকে তাকিয়ে থাকল অবিশ্বাসের চোখে। তারপর একজন হাতের তাস ফেলে নিঃশব্দে উঠে গেল ভিতরে। কাগজে মোড়া বাসী পাঁউরুটির কয়েক টুকরো এনে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'যা, লিয়ে যা। আর কিছু নেই। ইস্‌মে তো কুত্তার ভি পেট ভরবে না !'

একটা স্লাইস বের করে তখনই মুখে পুরে দিল হাজু। গিলতে লাগল গোগ্রাসে।

দরজা টানতে টানতে ছোকরা জিজ্ঞেস করল, 'জল ভি চাই কী ?'

হাজুর চেনায় ভুল হয়নি কোনো। প্লাস্টিকের মগ থেকে ঢেলে দেওয়া জল আঁজলায় নিয়ে ঢকঢক গিলতে গিলতে কৃতজ্ঞচিত্তে সে ভাবল, মানুষ থাকলে দয়াও আছে। তখন চোখেমুখে একাকার হয়ে সে বলল, 'আর একটু জল দেবে তো ?'

'হাঁ। পী যা। রাস্তায় ভি জল আছে পুরা। কত্তো জল খাবি খেয়ে নে।'

পরের দিনও না ; বৃষ্টি থামল তার পরের দিন। অভুক্ত পেটে ঘুম হয় না ভালো। আশপাশ করে শরীর। ভোরের আগেই বৃষ্টিধোয়া আকাশে আলোর আভাস টের পেল হাজু। দেখতে না দেখতে মাজা বাসনের ধরনের রোদ উঠল আকাশে। জল সরে গিয়ে চকচকে পিচ বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। মনটা হঠাৎই ভালো হয়ে গেল হাজুর। হে ভগবান, আজ তাহলে পস্তাতে হবে না।

পঞ্চাননবাবুর দোকান আজ আগেই খুলেছে। জনা দুয়েক অচেনা লোক বসে আছে ভিতরে। উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল হাজু। দেখল, ভিতরের ঘর থেকে থাক বাঁধা রঙিন কাপড়ের বোঝা এনে মেঝেয় ফেলছে গুলুবাবু। কথা বলছে লোকগুলির সঙ্গে। চিনতে পারল, সেই পতাকাগুলো। গুলুবাবুর সাকরেদ ছোকরা কাবিগরটিকেও দেখতে পেল বেশ ক'দিন পরে।

বাস্তা পেরিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল হাজু। পতাকার বাণ্ডিল নিয়ে লোকগুলো চলে যেতে ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক গুলুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল সে।

'বাবু, নমস্কার।'

'এই যে, হাজু।' গুলুবাবু বলল, 'কাজকাম করবি না কি?'

'কী কাজ, বলেন না! কবে দিব।'

হাজু ভিতরে ঢুকে পড়ল।

'বৃষ্টি সব মাটি করে দিল। কাল স্বাধীনতা দিবস। যে কবেই হোক মালগুলো খালাস করে দিতে হবে আজ। তবু ভালো, সকাল থেকেই খদ্দের আসছে—'

হাজুর হঠাৎ মনে পড়ল, ট্রাম গুমটির পাশে রেলিংয়ের ধারে সকালেই একটা লোককে পতাকা সাজিয়ে বসতে দেখেছিল সে। তাহলে কালই স্বাধীনতা দিবস!

গুলুবাবু ও তার সাকরেদের জন্যে চা বিস্কুট এনে দিয়ে নিজের ভাগটাও পেয়ে গেল হাজু। তারপর পতাকার বাণ্ডিল সাজাতে বসল। ছোট, বড়ো, নানা মাপের পতাকা। কোনোটা খদ্দরের, কোনোটা সিল্কের। ডজন গুনে বাঁধা হচ্ছে পরিযাল দিয়ে। গুলুবাবুরাও হাত লাগিয়েছে। এক ফাঁকে ধমকানো গলায় বলল, 'নতুন পুরনো মিশিয়ে ফেলবি না রে শালা! ঝামেলা হয়ে যাবে—'

'অ্যাতো পুরনো মাল কেন, বাবু!'

'একদিনের ভালোবাসা। রাত কাবার হলে বেচে দেয় অনেকে। হাফ দামে আমরাও কিনে নিই ব্যাপারীদের কাছে। কেন, পুরনো বলে চেনা যাচ্ছে খুব?'

'না, বাবু। একেবারে নতুন লাগে বটে।'

খদ্দের আসছে, যাচ্ছে; ডজনে ডজনে মাল খালাস হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হাজু জানত না, এই দোকানে তাক বোঝাই ঠাসা ছিল এমন অসংখ্য পতাকা। স্বাধীনতা দিবস—কথা দুটো শুনতে ভালো। মনে পড়ে, তাদের গাঁয়ের পঞ্চায়েত অফিসেও পতাকা উঠত এইদিনে। প্রাইমারি স্কুলের ছেলেদের নিয়ে পতাকা হাতে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেত বতন মাস্টার। এবারেও হাঁটবে হয়তো। তা এইরকম হৈ-হুল্লোড়ে ব্যাপার নয়। কী হয় পতাকা তুলে? সে জানে না। এটুকু বোঝে, কথা দুটো শুনতে ভালো।

পঞ্চাননবাবু দোকানে এলেন খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবি পরা একটা কোঁকড়া চুলের বেঁটে মতন লোককে সঙ্গে নিয়ে।

'বাবু, নমস্কার।'

'হ্যাঁ। নমস্কার।' নিজে যেমন উদাসীন তেমনিই গলা পঞ্চাননবাবুর। কারিগরকে বললেন, 'ওহে, অধীববাবু এম-এল-এ'র মালটা দিয়ে দাও। তিনশো টাকার চালান হবে।'

হাজু দেখল, গুলুবাবুর হাত থেকে বড়ো মাপের একটা সিল্কের পতাকা নিয়ে আগাপাস্তালা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে বেঁটে লোকটা। তিনশো টাকা দাম এটার! বাপ রে! তবে এম-এল-এ বাবু বলে কথা। হতেই পারে। চটপট একটা হিসেব কষে নিল হাজু। ফেরত দিলে এর দাম হবে দেড়শো টাকা। জিনিসের দাম বাড়ে, কমে না। যদি ফেরত আসে তাহলে সামনের বছরও হয়তো তিনশো টাকায় বিক্রি হবে।

দিনটা ভালোই কাটল হাজুর। দুপুরে খোরাকি বাবদ তিন টাকা দিয়েছিলেন পঞ্চাননবাবু। গলির ভোজনালয়ে কুচো ট্যাংরার ঝাল দিয়ে এক পেট ভাত খাওয়া হলো তাতে। সন্ধেবেলায় আরও পাঁচটা টাকা পেল সে।

এখন তার চলে যাবার কথা। তবু নড়ল না হাজু। দোকান থেকে বেরিয়ে আশপাশে ঘুরঘুর করে পঞ্চাননবাবুর বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা করতে লাগল। আজ আকাশ পরিষ্কার। ফুটফুট করছে ছোট, বড়ো অংসখ্য তারা। রাস্তার ওপর দিয়ে একটা পরিত্যক্ত কাগজের ঠোঙা উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে যেতে দেখে বুঝল হাওয়াও আছে।

টুলে বসে বিড়ি টানছে গুলুবাবু। তাল বুঝে সামনে এসে দাঁড়াল হাজু।

'কী রে ! আবার কী ?'

'না, বাবু। কিছু নয়।' হাজু ইতস্তত করল একটু। তারপর ঘাড় চুলকে বলল, 'সিদিন সোনাগাছি বলছিলেন। জায়গাটা কোনদিকে ?'

প্রশ্ন শুনে অন্যরকম হয়ে গেল গুলুবাবুর চোখ। প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'সোনাগাছি ! শালার পেটে ভাত জোটে না—সোনাগাছি যাবে।'

হাজু কুঁকড়ে গেল।

'না, বাবু। সেজন্যে নয়।'

'যা। ভাগ এখান থেকে—'

হাজু সরে এলো। গুলুবাবুকে বলা ঠিক হলো কিনা জানে না। পাঁচ কান কবলে পঞ্চাননবাবুর কানেও পৌঁছুবে। তখন বিপদ বাড়তে পারে।

বিড়ি ধরিয়ে সাত-পাঁচ ভাবনা নিয়ে আস্তে আস্তে মনুমেন্টের দিকে হাঁটতে লাগল সে। কপাল একবার পুড়লে ঘা সারলেও দাগটা থেকে যায় ; বিপদ ওই দাগ চিনেই আসে। কখন আসবে, কোনদিক দিয়ে, সে আর কী বুঝবে !

ওখানে বসে এদিক-ওদিক তাকালেও নির্দিষ্ট কিছু দেখছিল না হাজু। ভার লাগছিল মাথাটা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, দূরে, উত্তরদিকে, একটা বাড়ির ছাদে বাঁশের ডাণ্ডা তুলছে দুটো লোক। জায়গাটা ঠিক কোথায় এখান থেকে তা আন্দাজ করতে না পারলেও জ্যোৎস্নার আলোয়, আবছায়ায় ওরা যে পতাকাই তুলছে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না হাজুর। আরও অনেকক্ষণ স্থির চোখে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। লোক দুটি অদৃশ্য হবার পরও তার দৃষ্টি আটকে থাকল ওখানে।

একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিল বুকে। কিসের এবং কেন বুঝতে পারল না ঠিক। তখন উঠে দাঁড়াল। উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিক ঘোরাঘুরি করে, অল্প যা হোক খেয়ে নিয়ে ফিরে এলো শোবার জায়গায়। একা হলেই মনে পড়ে যায় গোলাপের মুখ। গুলুবাবু বলেছিল কাল স্বাধীনতা দিবস, ছুটি। তার মানে কাজ-কাম জুটবে না। সঙ্গে এখনো দুটো টাকা আছে অবশ্য। তা থেকে পরশু সকালের জন্যেও বাঁচাতে হবে কিছু। না, কাল আর ভাত জুটবে না। তবে পথের বাবুদের কাছে ভিক্ষে করলে এসেও যেতে পারে কিছু।

সারারাত ফুটপাথে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল হাজু। ঘুম এলো না। জ্যোৎস্নার আলোয় নিঝুম হয়ে আছে চারদিক, বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর এলানো ছায়া হাঁটতে হাঁটতে থমকে গেছে এক এক জায়গায়। ছায়া পেরিয়ে জ্যোৎস্নায় গিয়ে দাঁড়ালে পোড়া কপাল, রোগা, হাড় জিরজিরে হাজারি মণ্ডলকেও সুন্দর লাগবে হয়তো। চেহারাটা কেমন দাঁড়াল দেখা হয়নি অনেকদিন। এসব ভাবতে ভাবতেই জ্যোৎস্নার ভিতরে ক্রমশ অন্ধকার ঢুকে পড়তে দেখল হাজু।

তখন উঠে দাঁড়াল সে। ছায়া ও অন্ধকার খুঁজে হাঁটতে শুরু করল। দৃশ্যটা গেঁথে আছে মাথায়। দোতলা সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। অস্ফুট অন্ধকারের মধ্যে রাতের হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে পতাকাটা—সিল্কের বলেই সে ওড়ায় ভার নেই কোনো। এম-এল-এ বাবু যেটা কিনেছিল তার চেয়ে ছোটই হবে। তা হলেও অনেক দাম। সকালে বেচতে পারলে ভালো ; না হলে গুলুবাবুর কাছে বেচে দেবে অর্ধেক দামে। সেও অনেক টাকা। আশপাশে তাকিয়ে বাড়ির পিছন দিকটায় চলে এলো হাজু। মাঝে রাস্তা থেকে এগনো গলি মতন জায়গা। লোকজন কেউ আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য এতো রাতে কে আর জেগে থাকবে !

নিঃশ্বাসের এলোমেলো ভাবটা সইয়ে নিল হাজু। গাঁয়ে খেজুর রস পাড়তে গাছে উঠত প্রায়ই। এখনো মোটা পাইপ বেয়ে পা ঘেঁষটে উঠতে শুরু করল সে। জোড়ের জায়গায় পা রেখে আরও কতোটা উঁচুতে দেখে নিল চোখ তুলে। আরও হাত সাত-আট উঠলে গাঁট পাওয়া যাবে। তারও ওপরে রেলিং। দরজার পাশ দিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে। পাইপ বেয়ে রেলিং পর্যন্ত ওঠাই যা কষ্টের। ফাঁকের বদলে মাঝে মাঝেই দেয়ালে আটকে যাচ্ছে আঙুলগুলো। বৃষ্টিভেজা শ্যাওলার পিছলে যতোটা সম্ভব ঠেকিয়েও পা ধরে রাখা যায় না ঠিক। রেলিংয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও পা পিছলে

নিকটা নেমে এলো হাজু। দম নিয়ে আবার উঠতে লাগল ওপরে। এবং উঠেও এলো।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হাজু। জোড়া মুঠোয় দু'চারবার নাড়াচাড়া করতেই ছিঁড়ে গেল বাঁশের দড়ি। আড়ে বাঁশটা নামিয়ে দ্রুত হাতে সিল্কের পতাকাটা খুলে নিয়ে কোমরে গুঁজল সে। তারপর নামতে শুরু করল। সেই আগের রাস্তা : সিঁড়ির পরে লোহার পাইপ।

এই সময়েই হঠাৎ কুকুরের চিৎকার শুনে থমকে গেল সে এবং ভয়-ভাবনায় তাকিয়ে দেখল, পাশের দোতলায় গাড়ি বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে গাঁক গাঁক করছে বড়ো একটা কুকুর। অন্ধকারে জ্বলছে চোখ দুটো। মুহূর্তের মধ্যেই আরও কয়েকটা কুকুরও চিৎকার জুড়ে দিল। অসহায় চোখে নীচে তাকিয়ে হাজু দেখল রাস্তা থেকে পিল পিল করে এগিয়ে আসছে কুকুরগুলো। ডাকছে তারস্বরে। ওদিকের দোতলার জানলা থেকে হঠাৎই একটা টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'চোর—চোর—'

ভয়ে দিশেহারা হাজু কী করবে বুঝে পেল না। এখন যেখানে সেখানে থেকে ওপরে ওঠাই সহজ ; নীচে নামলে ছিঁড়ে খাবে কুকুরগুলো। ঘেমে, গলা শুকিয়ে, কী করবে না করবে তা ভাবতে পারার আগেই ওপরের লোহার সিঁড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো দু'তিন জন লোক। আবারও 'চোর—চোর' চিৎকার উঠল। ঘাড় বেঁকিয়ে নীচে তাকিয়ে হাজু দেখল একজন দু'জন করে জড়ো হচ্ছে আরও লোক। বড়ো একটা ইঁটের টুকরো এসে তার আঙুল ছেঁচে যেতে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল সে। ওপর থেকে তার মাথা লক্ষ করে নেমে আসা একটা লাঠি এলোপাথাড়ি ধাক্কা মারছে দেয়ালে, নাগাল পাচ্ছে না। এসব দেখতে দেখতে চোখে টর্চের আলো সইয়ে নিয়ে কাতর গলায় হাজু বলল, 'আমি চোর নই, বাবু। হাজারি মণ্ডল। মারবেন না আমাকে—'

শেষ করতে পারল না কথাটা। তখনই আরও বড়ো একটা লাঠির ডগা সজোরে আঘাত করল তার মাথার মধ্যিখানে। অব্যর্থ হাতে ছোঁড়া পাথর এসে লাগল চোখের নীচে। যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করার আগে আরও কয়েকটা ইঁটের আঘাত সহ্য করল হাজু এবং অনুভব করল বৃষ্টির জল সরে যাওয়ার পরিবর্তে অনুভূতির মতো রক্ত পিছলে যাচ্ছে তার মাথা ও মুখের ওপর দিয়ে। অন্ধকার ঢুকে পড়ছে মাথায়। একই সঙ্গে কুকুর ও মানুষের চিৎকার শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতে টুপ করে খসে পড়ল সে।

হাজারি মণ্ডলের দেহ ঘিরে জল্পনাকল্পনার মধ্যেই ভোর হয়ে এলো। তখন কারও কারও মনে পড়ল, মৃত হোক বা জীবিত, যে-কোনো অবস্থাতেই লোকটিকে পুলিশের হাতে দেওয়া দরকার। শুধু একজন বলল 'হারামির বাচ্ছা ঝাণ্ডাটা ধরে আছে কেমন। যেন কতো বড়ো শহীদ!'

১৩৯২/আ- বা প (শা)

মুখগুলি

চিঠিটা নিয়ে এসেছিল ড্রাইভার। গেটের কাছে ডাক-পিওনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে-ই দিয়েছে উল্টেপাল্টে দেখে বিনীতা বলল, 'এ যে দেখছি তোমার মতো হাতের লেখা!'

দিবাকব প্রায় তৈরী। টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস কবল, 'কার চিঠি?'

'তোমাব। বাংলায় অ্যাডড্রেস!'

ইনল্যান্ড লেটার কার্ডটা হাতে নিয়ে সামান্য ছায়া দুলে গেল দিবাকরের মুখে। আড়ে বিনীতার দি তাকিয়ে ভাঁজ খুলল সে। এবং পড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'পরম কল্যাণীয় স্নেহের বাবা দিবাকর,

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। বৌমাব পায়েব ব্যথা নিশ্চয় সেরে গেছে। বিপলু, টুংকা নিশ্চ ভালো আছে। ওদের অনেকদিন দেখি নাই। তোমাকেও দেখি নাই। তোমার শরীব ভালো তো সাবধানে থাকবে।

আমার খবরাখবর কুশল। এরা যত্ন করে। আশপাশের অনেকেব সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। গল্পগুজ হয়। তবে কৌশল্যাদি নামের একজন পরশু মারা গেছে। ওর ছেলে বিলেতে থাকে, মেয়ে বাচ্চা হব জন্যে হাসপাতালে। তাই কেউ আসেনি। এরাই কালো গাড়িতে শ্মশানে নিয়ে গেল। শ্মশানে নি যাবার পর জামাই এসেছিল। বলেছে বাড়িতে শ্রাদ্ধ করবে।

তুমি একদিন এসো ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এর মধ্যে পরমেশ এসেছিল রানিকে নিয়ে। কমলালে আপেল এনেছিল। ভাস্করও এসেছিল। তোমার অনেক ক্ষ্যামতা, ওকে একটা ভালো চাকরি খুঁ দাও।

আর কি! দেবী লিখেছে অশোককে নিয়ে আসবে। শুভঙ্কর কি কলকাতায বদলি হলো? আ মেজবৌমাকেও চিঠি দিলাম।

আর কি! মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তোমরা সকলে সুখে থাকো। আশীর্বাদ জেনো। আশিস নিও

ইতি তোমার মা

চিঠি থেকে চোখ তুলে জানলার দিকে তাকাল দিবাকর। বহুদূর ব্যাপ্ত বাড়ি, জলের ট্যাঙ্ক, টি-ভি অ্যানটেনা ও গাছগাছালির দৃশ্য প্রতিদিনই যা দেখায় তার চেয়ে বেশি কিছু দেখালো না। শুধু একবক শূন্যতা অন্যমনস্ক করে দিল তাকে।

বিনীতার দৃষ্টি তারই দিকে।

'কার চিঠি?'

'মা-র।'

'দেখি!'

চিঠিটা এগিয়ে দিল দিবাকর। নটটা ঠিকই ছিল, আয়নার দিকে তাকিয়ে আরও একবার ঠিকঠা করে নিল। বিনীতাও প্রতিফলিত তার ঢিলেঢালা পোশাকে। শেষ করার দ্রুততা ফুটেছে ওর মু দিবাকর জানে না কৌশল্যাদি কে, কেমনই বা দেখতে ছিলেন তিনি। একই অন্যমনস্কতা থেকে ভাব মুখাগ্নি করার দায় সন্তানদেরই থাকে, এ ক্ষেত্রে কে করল! ভাবতে ভাবতে চোখের ডানদিকে হঠ শুরু হওয়া চুলকানির জায়গাটায় আঙুল বোলালো দিবাকর। বাহান্ন বছর বয়সে শুধু জুলপিতেই পা ধরে না, চলে যাওয়া রোদের স্মৃতির মতো মৃত্যু-ভাবনাও উঁকি দিয়ে যায় মাঝে মাঝে।

'ভালোই তো আছে মনে হচ্ছে।'

বিনীতা 'আছেন' না বলে 'আছে' বলল ; শব্দটা কান এড়ালো না দিবাকরের। এটা তার অফিসে বেরুবার সময়। ঠিক দশটায় মিটিং। এখন সাড়ে ন'টা। এখনই বেরুলে সময় মতো পৌঁছুতে পারবে। তখন নিজেকে এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, 'খাবাপ থাকবেন কেন !'

'উনি থাকতে থাকতে রানিদের টিকি দেখা যেত না। এখন ঠিকই যেতে পাবছে।' বিনীতার গলায় শ্লেষ। দিবাকরকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'পনেরো দিন বেখেই বোঝা নামানোর তাড়া ! ওরা ধবেই নিয়েছিল দায়িত্বটা তোমার একাব।'

অ্যাটাচিটা হাতে তুলে নিল দিবাকর। যেতে-যেতে বলল, 'এখন এসব আলোচনা কবে লাভ কী !'

অফিসে যাবাব বাস্তায এবং তারপবেও অনেকটা সময অসমান অক্ষবগুলোর মাযায জড়িয়ে থাকল দবাকব। ফিকে হতে হতে শেষের দিকে হালকা হয়ে উঠেছিল শব্দগুলো, শেষ পর্যন্ত বেশ দাগিয়ে লেখা। দিশি ডটপেন, কালি শুকিয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। ওখানে বিফিল পাবে কি না জানা নেই। যদিও না পায়, মা কি নিজে হাতে ভরতে পাববে ? না, কেউ না কেউ নিশ্চযই থাকবে ! দিবাকর এইভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইল এবং ভাবল, কী ভাগ্যিস সেদিন একসঙ্গে অনেকগুলো ইনলাণ্ড আর পোস্টকার্ড কিনে দিয়ে এসেছিল।

'এগুলো তো দিলি !' সুধা বলল, 'হ্যাঁ রে, চিঠিগুলো লিখব কাকে ?'

'কেন, আমাদের ! তোমার ছেলেমেয়েদের !'

'ও হরি, তুইও যেমন !' সুধা তাব স্বভাব থেকে নডল না, 'চিবকাল তোদেব মুখগুলোই চিনে রেখেছি, ঠিকানা আর নিজে কবে লিখেছি যে জানব ! কখনো তো একা থাকিনি।'

মা-র মুখে আলগা একটুখানি হাসি। বুঝতে পাবলে অনেক কিছুই বোঝায়। ওই হাসিই একা শব্দটিকে আড়াল কবে দেয। তবু চিনতে অসুবিধে হযনি দিবাকরের। পাছে আবাব ওই হাসি দেখতে য সেই ভযে মাথা না তুলে একজনেব ঠিকানা চার পাঁচবাব কবে লিখতে লিখতে টের পায় তার স্মৃতি এখনো প্রখব—ব্যস্ততা এবং শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা আলাদা করে বাখলেও ঠিকানাগুলো ভোলেনি। শুধুই ব্যস্ততা ? অনিচ্ছা ? ঠিকঠাক বুঝতে না-পারা অপরাধবোধ থেকে তাডাতাডি সুধার সামনে থেকে চলে যাবার আগে দিবাকরের মনে পডেছিল একটা কলমটলমও দেওয়া দরকার। নিজেবটা দামি এবং নষ্ট হতে পারে ভেবে ড্রাইভারের কাছে ডটপেন চেযে দিয়ে এসেছিল সুধাকে।

এই ঘটনা অন্তত মাসখানেক আগেকাব হবে। এর মধ্যে তার কিংবা তাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। বিনীতাও যেতে পারত, কিন্তু এ নিয়ে সে উচ্চবাচ্য করেনি। বিনীতা করেনি বলে দিবাকরও করেনি। কথায় কথা বাড়ে। আজকাল সে অশান্তি ভয় পায। দিবাকর খুশি হলো সুধাকে তাবা দেখতে না গেলেও বোন-ভগ্নীপতি রানি-পরমেশ গিয়েছিল, ছোট-ভাই ভাস্করও গিয়েছিল। দেবযানীও লিখেছে যাবার কথা। কেউ না গেলে মা নিশ্চয়ই আরও একটু একা হয়ে পডত।

দুপুবে লাঞ্চরুমে গিয়ে মনে পড়ল সুধা সম্ভবত খেতে ভালোবাসত। যতোদিন ছোট ছিল, কিংবা তিন ভাই দুই বোন যখন একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে, বাবাও বেঁচে, ততোদিন ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। মা থাকতো, মা-ই বেড়ে দিত তখন। কথাটা ওঠে পরে—বিধবা হবার শোক কাটিয়ে যখন ছেলেমেয়েদেব কাছে ভাগাভাগি করে থাকতে শুরু করল। ইতিমধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল একটা ! মেদ কমানোর জন্যে ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল কম খেতে। ভাস্কর কিছুদিন বেখেছিল কাছে। ওর বউ উমা বিনীতাকে বলেছে, 'এতো খেলে আবার হার্ট অ্যাটাক হবে। গিযে দেখে এসো, দিদিভাই, আবার ওজন বেড়েছে।'

খাবার কথা খাবার সময়েই ওঠে। রিপোর্ট শুনে মুখ তুলে দিবাকর বলল, 'বিধবা মানুষ। কতো আর খাবে ! যখন না খেয়ে থাকত তখন উমা আসেনি এ বাড়িতে। ভাস্কর জানতে পারে—'

বিনীতা জানে ভাস্কর বললে দিবাকর এভাবে নিত না। উমা বাইরের লোক। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আসলে তা নয়। তিন মাস রাখল, এখন চায় আর কেউ রাখুক।'

সুধা এর পর শাটল কক হয়ে গেল। কোর্টের দু'দিকে পাঁচ ছেলেমেয়ে ও তাদের সংসার র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে। আকাশতোলা হয়ে ঘুরে বেড়ায় সুধা। কখনো বালিগঞ্জে, কখনো ভবানীপুরে, কখনো বাগবাজারে, কখনো বিষডায। শুভঙ্কর জামশেদপুরে বদলি হবার পর বিনীতা বলেছিল, 'দায়টা কিন্তু

তোমাদেব, ছেলেদের। মেয়েরা স্বামীদেব ইচ্ছেয় চলে। না বললে না। যদি একই ছেলে হতো শুভঙ্কব তাহলেও বদলি হতে হতো। তখন মা-কে রাখত কোথায়!'

সুধা কি জানত এসব? আঁচ করেছিল কখনো? মনে তো হয় না। কিংবা, করলেও জানবার উপায় ছিল না। র‍্যাকেট যেদিকে ঠেলবে শাটল কক সেদিকেই যাবে।

খিদিরপুরের এই ওল্ড এজ হোমের খবরটা শুভঙ্করই দিয়েছিল। ওদেব এক কোলিগের জ্যাঠামশাইকে রেখেছে ওখানে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসারবা চালায়। মাসে মাসে টাকা গুনে দিলেই হবে।

গোলটেবিলে বিচার হয়ে গেল সুধার। কোনো অনুযোগ করেনি। সেদিন অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ঘরের দরজায় দাড়িয়ে দিবাকর দেখেছিল, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি কুকড়ে শুয়ে আছে মা। মিলিত সিদ্ধান্ত। কাল চলে যাবে।

সকালে দু'পিস টোস্ট আর চা, দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারি, এক পিস মাছ কিংবা ডিম, বিকেলে চা, বিস্কুট; রাতে রুটি, তরকারি, ডাল। এব বেশি আব কিছু লাগে না। দিবাকর আলাদাভাবে দুধেব টাকা দেবাব কথা বলায় আপত্তি করেছিল হোম থেকে, যেখানকাব যা নিয়ম। তা ঠিক, দিবাকর ভেবেছিল, অন্যরা পাবলে সুধাও পাববে। এটা অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপাব।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে কথাটা তুলল বিপলু, মুরগির মাংসের গন্ধের মধ্যে।

'ঠাকুমা তো মাছ, ডিম খায় না। তার বদলে কিছু দেবে না?'

বিপলুব মুখে তাবই অসহায়তা। দিবাকর বুঝতে পাবল না প্রশ্নটা তাকেই কিনা। চুপচাপ বিনীতাব দিকে তাকিয়ে দেখল বিনীতাও তাকিয়ে আছে তাব দিকে, প্লেটেব ওপর হাতটা নামানো। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কবে উঠে গেল।

বিছানায় এসে বলল, 'খোঁজ খবর কবলে হযতো আরও ভালো কোনো জাযগা পাওয়া যেতো এতো তাড়ার কী ছিল।'

পাশ ফিরতে ফিরতে দিবাকব বলল, 'শুযে পড়ো!'

বিকেলেব মধ্যে অবশ্য কিছু ইনল্যান্ড কিনে আনালো দিবাকব। একটা ডটপেনও। অফিসের কাজ ফেলে নতুন কবে ঠিকানা লিখল অনেকগুলো। আপেল, কমলালেবুব কথা মনে পড়লেও কিনল না রানি-পরমেশের দেওয়া ফলগুলো শেষ করে না থাকলে নতুনগুলো পচবে। ববং আব একদিন দেওয়া যেতে পারে। চিঠিতে কি তারিখ ছিল? মনে পড়ছে না। অক্ষবগুলো ফিকে হয়ে এসেছিল শেষের দিকে। তখন দাগাতে হয়। এসব ভাবতে ভাবতে বিস্কিট নিল দু' প্যাকেট।

হোমের বারান্দায় সাবি সারি বেতেব চেয়াব। যারা বসে তাদের বেশির ভাগই বৃদ্ধা। জন দুযেব বৃদ্ধকেও চোখে পড়ল, বেডাব বাইবে ডালপালা মেলা বটগাছেব দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। কিছু দেখছে কি না বোঝা যায় না, এমনই অভ্যস্ত। ওদেব মধ্যেই জাযগা আছে সুধাব। কয়েকটা চেয়ার শূন্য। দূব থেকে মনে হলো ডান দিক থেকে চতুর্থ চেয়ারে মা, তাকে দেখে নড়ে উঠল সামান্য চেহারায় কি বুড়িয়ে গেছে আবও?

কাছে গিয়ে দেখল, ভুল। সুধা নেই। একইবকম মুখগুলি; অবসন্ন তৎপরতায় চোখ তুলে কেউ কেউ তাকাল তার দিকে। ওই দৃষ্টি কিছুই বোঝায় না। সে পৌঁছুনোব আগে হযতো শব্দ ছিল ওখানে—এই মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য সন্দেহ এনে দেয়।

অফিসে বলতে ওরা ডেকে দিল।

এতো কাছে পেয়ে আর কখনো এমন দূরত্বপূর্ণ মনে হযনি মাকে। সারাদিনেব এলোমেলো চিন্তাধারাই এমন করল কি না কে জানে, গলায় একটা কাঁটাফোটা অস্বস্তি টের পেল দিবাকর। সম্পর্কে জড়-শিকড় গুলিয়ে ফেলে ভাবল, সম্পর্কটা বস্তুত কতো কাছের!

'ও মা, তুই! শেষবেলায় ভাতঘুম পেয়েছিল। ওরা বলল ভিজিটাব এসেছে।' ঘুমেব চিহ্নমাত্র নেই সুধার মুখে, চকচক করছে ছোট হয়ে আসা চোখ দুটো। ওরই মধ্যে হেসে বলল, 'মজার জাযগাতে এসেছি বটে। পেটের ছেলেকেও ভিজিটাব বলে!'

প্রায় দেড় মাস পরে মাকে মা বলতে গিয়ে গলায় খোঁচাটা টের পেল দিবাকর। সুতরাং, বলল না।

'কেমন আছ ?'

'ভালো। তুই কেমন ? শুকনো লাগছে।'

ইতিমধ্যে বেঞ্চিতে বসেছিল দিবাকর। চটপট কথা জোগালো না মুখে। উল্টোদিকে কালো, রোগা, সস্তা পাড়ের শাড়ি পরা দু'টি মেয়ে বসে। সম্ভবত ওরাও অপেক্ষা করছে।

'হ্যাঁ রে, তোর শরীর ভালো তো ?'

'তোমার কথা বলো।'

'ভালোই তো। বললাম না ! দেখে মনে হচ্ছে না ?'

এ প্রশ্নের পর একটু ক্ষণের জন্যে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। তা না করে বাইরেই তাকিয়ে থাকল দিবাকর। রোদে চমক নেই, সামনের দেয়ালটা উঁচু হওয়ায় কোথাও ছায়া পড়েছে কি না বোঝা যায় না। কতকগুলি বেতের চেয়ার মনে পড়ল তার, কয়েকটি নিঃসম্পর্কিত মুখ। ওদের মধ্যে সুধাকে ফেলে তফাত আছে কি না বোঝা যেত।

'চিঠি পেলাম আজ সকালে।' দিবাকর বলল, 'এই নাও আরও খাম। ঠিকানা লিখে দিয়েছি আগের মতো। এই ডটপেনটা নতুন। আগেরটা শুকিয়ে গেছে মনে হলো—।' দিবাকর থামল এবং বলতে পারছে ভেবে আবার বলল, 'ওষুধগুলো খাচ্ছ তো ঠিকঠাক ? ডাক্তার আসে ?'

অনেকক্ষণ পরে সুধার সঙ্গে চোখাচোখি হতে অদ্ভুত অনুভূতি ছেয়ে গেল দিবাকরের শরীরে। মা হাসছে। একজনের কথা লিখেছিল, কৌশল্যাদি, এখনই মনে পড়ে গেল।

'আমার জন্যে ভাবিস না। আমি খুব ভালো আছি।'

'তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।'

'দাঁড়াই-ই না ! এতোক্ষণ শুয়েছিলাম।'

'রানিরা এসেছিল, লিখেছিলে। ভাস্করও।' দিবাকর বলল, 'অফিসফেরতা এলাম। না হলে ওদেরও নিয়ে আসতে পারতাম।'

সুধার হাত দানে ভর্তি। বলল, 'একটা প্যাকেট হলেই তো হতো। বিপলু, তার জন্যে নিয়ে যা একটা—'

'থাক।'

দিবাকরকে উঠতে দেখে সুধা বলল, 'বৌমার কথা তো বললি না কিছু ! ভালো আছে তো ?

'হ্যাঁ, ভালোই আছে।' দিবাকর ঘড়ি দেখল এবং বলল, 'চলি তাহলে। সাবধানে থেকো।'

দিবাকর এগোচ্ছে। স্বস্তিতে জড়িয়ে যাচ্ছে অচেনা বোধ। সুধা বলল, 'অফিসে একবার দেখা করে যাবি ? ওরা আজ বলছিল—'

'বেশ, যাবো।'

রাত্রে বৃষ্টি নামল ঝেপে। শব্দের ঝাঁ-ঝাঁ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। এখন চেঁচিয়ে কথা বললেও শুনতে পাবে না কেউ।

'কী ব্যাপার ! সন্ধে থেকেই দেখছি চুপচাপ !'

সুধার সঙ্গে যেখানে কথার শেষ সেখান থেকেই নৈঃশব্দ্য তুলে এনেছিল গলায়। সময় নিয়ে দিবাকর বলল, 'কী বলব !'

বিনীতা চুপ করে থাকল।

'ভাস্কর, উমা কেউ কথা বলেছিল এর মধ্যে ?'

'বললে জানতে না !'

ঘুম না হওয়ার অস্বস্তি থেকে এবার বিছানায় উঠে বসল দিবাকর। বিনীতার হাত চোখের ওপর আড়াআড়ি টানা। দেখতে দেখতে বলল, 'এ মাসের হোমের টাকাটা ভাস্করের দেবার কথা ছিল। দেয়নি এখনো। মা রোজগার করে না !'

'তুমি গিয়েছিলে ?'

দিবাকর জবাব দিল না। এই টানাপোড়েনের মধ্যে নিজের অবস্থান কোথায় ভেবে নিল একটু। তারপর বলল, 'ওদের ফোন কোরো কাল। বোলো। না দিলে আমাকেই দিতে হবে।'

'তোমার ভাই, তুমিই বোলো। আমাকে জড়াচ্ছ কেন!'

'কে কাকে জড়াচ্ছে কিছুই বুঝি না!' হতাশা থেকে যুদ্ধে ফিরে এলো দিবাকর, 'ভাগাভাগির ডিসিসনে তুমিও সায় দিয়েছিলে—'

'আমি যদি অন্য কথা বলতাম তোমারা মেনে নিতে!'

তখন অন্ধকার এগিয়ে এলো। দিবাকর ভাবল, শেষ বিকেলের আলোয় হোমের বারান্দায় জরাগ্রস্ত, স্তব্ধ যে-মুখগুলি দেখেছিল তাদের চোখে দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু নিশ্চিত তারা তাকিয়ে ছিল গেটের দিকে, গেটের বাইরে রাস্তা ও চরাচরের দিকে। অপেক্ষা কি শুধু মানুষের জন্যেই থাকে!

ক'দিন পরে সুধার চিঠি এলো আবার।

'পরম কল্যাণীয় স্নেহের বাবা দিবাকর,

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। বৌমা, বিপলু টুংকা নিশ্চয় ভালো আছে। তোমার দেওয়া বিস্কুট খেয়েছি। রোজ এ-বেলা ও-বেলা একটা করে! একদিন চারুদিকে দিলাম। চারুদির ছেলে ব্যারিস্টার। মেম বউ, ইংরিজি বলে। একদিন এক হাঁড়ি চমচম পাঠিয়েছিল। আমিও খেলাম একটা। তোমার বিস্কুট এখনো কয়েকখানা আছে। কৌটোয় রেখেছি, না হলে পিঁপড়ে ধরছিল।

আজ এখান থেকে একজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ওনার নাম গিরীনবাবু। প্রস্রাব করতে গিয়ে পড়ে যায় বাথরুমে। আর জ্ঞান ফেরেনি। আমি কখনো কথা বলিনি। ডাক্তারবাবু নাকি বলেছে প্যারালিসিস। চারুদি আমার কাছে এসে খুব কাঁদল। বলল গিরীনবাবু আর চারুদি নাকি একই দিনে এসেছিল এখানে। সে আর কি করা যাবে!

যাই হোক, আমার সব কুশল। এর মধ্যে দেবী এসেছিল অশোককে নিয়ে। উমা, ভাস্কর এসেছিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে। শুভঙ্করের চিঠি পেয়েছি। বলেছে, কলকাতায় আসবে, দেখা করবে তখন।

আর কি! টুংকা, বিপলুর কি আজকাল পরীক্ষা হয়?

তোমরা আশীর্বাদ জেনো। ইতি

তোমার মা।'

এতোদিনে চেনা হয়ে গেছে চিঠি। গোপন কিছু নয় ভেবে টুংকাই খুলেছিল। দিবাকর অফিস থেকে ফেরার পর দিল।

'ঠাকুমার ল্যাংগুয়েজের পিকিউলিয়ারিটি লক্ষ করেছ, বাবা?'

ধোঁয়াটে চোখ তুলে দিবাকর বলল, 'কেন!'

'নয!' স্কার্টে হাত বগড়ে টুংকা বলল, 'আজকাল পরীক্ষা হয় সেনটেনস্টার মানে কী হয় বলো।'

দিবাকর অ্যাটাচিটা এমনভাবে নামালো যেন বুক থেকে পাথর নামাচ্ছে। কানে টুংকার গলা। চোখে অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি আমি খাবো পেড়ে। কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে মা বলল, 'এইটুকুতেই ঘুমে কাদা। তুই কী করে বড়ো হবি খোকা!' স্মৃতিতে এক হাতে চিবুক টিপে ধরা, অন্য হাতে মাছের ঝোলমাখা ভাতের গরস মুখে ঠুসে দিচ্ছে মা। তখন হালকা হবার জন্যেই গলার নটটা আগে খুলল।

'ঠাকুমা তোমাদের মতো স্কুলে যায়নি, লেখাপড়া শেখেনি—'

দিবাকরের স্বরে কিছু ছিল। খুব মন দিয়ে ওকে লক্ষ করল টুংকা। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি আজকাল বড্ড টাচি হয়ে গ্যাছো, বাবা। আমি ডিস্রেসপেক্ট করে কিছু বলিনি!'

বিনীতার জামাইবাবুর প্রস্টেট অপারেশন হয়েছে। দেরিতে নার্সিংহোম থেকে ফিরে বলল, 'তোমার মায়ের চিঠি এসেছে। পেয়েছ তো?'

ছেলেমেয়েরা ঘরে। সামনে অন্ধকার। সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হয়েছিল বাবার। শব্দটা সেখান থেকে খাপছাড়াভাবে তুলে নিয়েছিল মা। না হলে গিরীনবাবুর পক্ষাঘাত হয়েছে লিখত, প্যারালিসি লিখত না। খাওয়া, থাকা, দেখাশোনার জন্যে মাসে আটশো টাকা কম নয়। হোমের

সুপারিনটেনডেন্ট বলেছিল, 'দু'হাজার টাকা দিতে হলেও লোকে আসতো। জেনারেশন চেঞ্জ করে গেছে, অ্যাটিচুডও। আপনাদের পাঁচটা অ্যাডড্রেস, তিনটে টেলিফোন নাম্বার। আপনারা কেন এনেছেন ?'

পিছনে আলোয় দাঁড়ানো বিনীতাকে অনুমান করে নিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কবল দিবাকর।

'উনি আছেন কেমন ?'

'জামাইবাবু ? ভালো।' বিনীতা সামনে এসে বলল, 'দু' একদিনের মধ্যে ছেড়ে দেবে।'

'সকালে বললে না কেন ! আমিও যেতে পারতাম।'

'আজকাল তোমাকে কিছু বলতে ভয় হয়।'

দিবাকর চুপ করে থাকল।

'একটা কথা বলব ?'

এখন বিনীতার দিকে না তাকিয়ে উপায় নেই। দিবাকরও তাকাল।

'তোমার মায়ের বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে—'

'কেন !'

দিবাকরের প্রশ্নে রাগ আছে কিনা বুঝে নিয়ে বিনীতা বলল, 'এই যে প্রত্যেক চিঠিতে এ গিয়েছিল সে গিয়েছিল, এই হয়েছে সেই হয়েছে বলে লিখছেন—এগুলো মনে হয় বানানো ; সত্যি কথা নয় !'

দিবাকর নড়ে বসল।

'তার মানে !'

'আজ রানি ফোন করেছিল। তোমার বোন। মা-র খোঁজ করছিল। আমি বললাম তোমরা তো গিয়েছিলে দেখা করতে। তুমি, পরমেশবাবু ! শুনে আকাশ থেকে পড়ল। পরমেশবাবু নাকি ট্যুরে ট্যুরেই কাটাচ্ছেন মাসখানেক। কমলালেবু, আপেল—কতো কথাই লিখেছিলেন ! রানি বলল আমি বসিকতা করছি। মা-র চিঠি ও-ও পেয়েছে, তাতে নাকি লিখেছেন আমি প্রায়ই যাই ! কী কাণ্ড !'

গ্রামের পরিবেশ হলে গালে তিনটে আঙুল রাখত বিনীতা। গলার স্বর সেইরকমই। দম নিয়ে বলল, 'খোঁজ নিয়ে দ্যাখো যা লিখছেন তার কতোটা সত্যি কতোটা মিথ্যে !'

'মা-র খোঁজ নেবার জন্যে রানি এখানে ফোন করেছিল কেন !'

'তা আমি জানি না।'

বিনীতা উঠছিল। দিবাকর বলল, 'এবার ফোন করলে বোলো মা-র একটা ঠিকানা আছে। সেটা কলকাতা শহরেরই মধ্যে।'

প্রশ্নগুলো থেকে গেল। খুঁজতে গিয়ে যা পেল সেগুলো উত্তর নয়। একা বসে থাকায়, বিছানায়, প্রায় ঘুমের মধ্যে, এমন কি অফিসেও, কাজের মধ্যে, দিবাকর দেখতে লাগল সেই ভিজিটর্স্ রুম, কেউ না কেউ গেছে। কিছু-না-কিছু তুলে দিচ্ছে সুধার হাতে। সত্যি বলেই এসব দৃশ্যে বেমানান লাগে না নিজেকে। ভাবল, চিঠির জোগান আছে বলেই লিখছে, না হলে লিখত না। তা হলে বানিয়ে লিখবে কেন ! মানুষই কমলালেবু, আপেল, চমচম খায়। মানুষই প্রিয়জনের অপেক্ষায় থাকে। প্যারালিসিসও মানুষেরই হয়। মানুষই মরার পর শ্মশানে যায়। মানুষই মানুষের অভাবে কাঁদে। এসবও কি তাহলে মিথ্যে !

সত্যি কি না তা জনে জনে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। দিবাকর সিদ্ধান্ত নিল, চিঠিগুলোই ফ্যাসাদ। সুতরাং, আর সে খাম, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড জোগাবে না। এসব ভেবে ক্রমশ সে নিজের ভিতরে ঢুকে গেল। ব্যস্ত জীবনযাপন তার ; সময় যে কীভাবে কেটে যায় টের পায় না ঠিকঠাক। সুধাকে আলাদা করতে গিয়ে সে নিজেই আলাদা হয়ে পড়ল।

একদিন বিকেলের দিকে খুব ব্যস্ত মিটিংয়ের মধ্যে ফোন করল বিনীতা।

'তুমি কি কিছু শুনেছ ?'

'কী !'

'হোম থেকে জানায়নি কিছু ?'

'মানে !' অন্য গলায় দিবাকর বলল, 'কী জানাবে !'

বিনীতা সম্ভবত উত্তরটা জানে না। একটু থেমে বলল, 'রানি এসেছে। পরমেশবাবু নাকি ফোন পেয়ে হোমে দৌড়েছেন। আমাদের জানাতে বলেছেন। তোমাকে অনেক চেষ্টা করে পেলাম।'

এটা দিবাকরের রিসিভার নামিয়ে রাখার সময়। সেই একই অনুভূতি, যেভাবে এতোদিন অ্যাটাচি নামিয়ে রেখেছে।

'আমি যাচ্ছি।' বিনীতা বলল, 'তুমি চলে এসো।'

বিনীতা চলে যেতেই ভাস্কর এলো।

'তোমাদের অফিসের ফোন পাওয়া যে কী ব্যাপার!'

'কী শুনেছিস !'

'জানি না।' ভাস্করকে এখন মা-র ছোট ছেলের মতো লাগছে। ঢোক গিলে বলল, 'পরমেশদা তোমাকে জানাতে বলল। আমিই চলে এলাম।'

উৎকণ্ঠার মধ্যেই দায়িত্ব ফুটছে। গাড়িতে উঠে হাত চেপে ধরল ভাস্কর।

'আমি খুব বড়ো অন্যায় করে ফেলেছি, দাদা ! এতোদিনে একবারও মাকে দেখতে গেলাম না।'

'কেন ! টাকা দিতে গিয়েছিলিস !'

'না। পিওনের হাতে—'

এখন কাঁদছে সীটের গায়ে মাথা নামিয়ে। দিবাকর দ্বিধায়। কেউই যদি না গিয়ে থাকে তাহলে চিঠির পর চিঠিতে সুধা তার ছেলেমেয়েদের জড়ো করত কেন ? প্রশ্নটা প্রশ্নেই থেমে থাকল। ভাস্করকে দেখতে দেখতে দিবাকর বলল, 'মা জানতো তুই গিয়েছিলি। আমাকে লিখেছিল। তা ছাড়া, কী হয়েছে তা-ই তো জানিস না এখনো !'

দিবাকর মুখ ফিরিয়ে নিল বিকেলের দিকে। হোমে যেতে হয় চাকায় ধুলো উড়িয়ে। তখন মনে হয় মেঘ করেছে। সামনে সুধা। দূরত্বপূর্ণ। পেটের ছেলেকে ভিজিটর বলায় একদিন খুব মজা পেয়েছিল।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাসীন ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে পরমেশ। তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বলল 'দুপুরে খাবার পর বুকে পেন হয়েছিল। ডাক্তারও এসেছিল। কিছু করতে পারেনি। ওরা সব ভেতরে।'

ভাস্কর এগিয়ে গেল।

দিবাকর একলা দাঁড়িয়ে। সামনে তাকিয়ে দেখল, হোমের বারান্দায় সারি সারি বেতের চেয়ার অস্পষ্ট মুখগুলি তাকিয়ে আছে গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে রাস্তা। ধুলো উড়লে মেঘ ঘনাতো, সঙ্গে হতো তাড়াতাড়ি। আজও হবে। দেখা হলো না ওখানে বসলে মাকে কেমন লাগত !

গাঢ় নিরুদ্দেশে

ট্রেন ছাড়বে সেই সাড়ে ন'টায় ; তবু সাতটা, সাড়ে-সাতটা থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল নীপা।

ইতিমধ্যে একবার তাড়া দিয়েছিল দেবাশিসকে। মেকনে কালোয় কিছু বা রহস্যময় সিল্কের শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে লিভিং রুমে এসে দেখল ভঙ্গিতে তখনো কোনো নড়াচড়া নেই দেবাশিসের। চা খেতে খেতেই টেনে নিয়েছিল কী একটা ম্যাগাজিন, চোখ এখনো সেখানেই। মনে হয় তন্ময়, সামান্য চিন্তিতও। দু' আঙুলের ভাঁজে পুড়তে থাকা সিগারেটের ছাইয়েব বহবই এরকম ভাবায়। বিবক্তও কি ?

দু'এক মুহূর্ত স্বামীকে লক্ষ করে নীপা বলল, 'তুমি তৈরি হবে না ?'

'এতো তাড়া কেন !' অসাবধানে সিগারেটেব ছাইটা ট্রাউজার্সের ওপরেই পড়ল। চোখ তুলে দেবাশিস বলল, 'যাবে তো ফার্স্ট ক্লাসে, রিজারভেসনও আছে। সাড়ে আটটায় বেরুলেই চলবে।'

'সাড়ে আটটায় ! তারপর জ্যামে পড়লে !'

'ছ'টায় বেরুলেও জ্যামে পডতে পারো।' দেবাশিস একটু থামল এবং বলল, 'আজকাল হাওড়া স্টেশনে যেতে অতো সময় লাগে না।'

ব্রা-র হুকটা ঠিকঠাক লাগেনি। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবায় পিছনে হাত বাড়িয়ে ব্লাউজ টানল নীপা। কথাগুলো সাবলীলভাবে বললেও গাম্ভীর্য টাল খায়নি দেবাশিসের। ইদানীং এরকমই দেখছে ওকে ; সাইত্রিশ-আটত্রিশেই পঞ্চাশের মতো। এবারের যাওয়াটা ঠিকঠাক হবার পর থেকেই যেন ফ্লেকসিবিলিটি কমে গেছে ঘাড়ের। এব পবে বেশি কিছু বললে কথা কাটাকাটিতে পৌঁছুতে পারে।

মনঃস্থিব করতে সময় নিল নীপা। তাবপব বলল, 'যেতে ভালো না লাগলে বলো। বমেনকে ফোন করে বলে দিই আমাকে তুলে নিয়ে যেতে। ও তো এই রাস্তা দিয়েই যাবে—'

নীপার কথায় কিছু ছিল হয়তো, অস্পষ্ট হাসল দেবাশিস। সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'ট্যাক্সিতে উঠে একাও যেতে পারো। স্বাধীন জেনানা, আর কাউকে দরকার হবে কেন !' স্ত্রীকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'বাতের ট্রেনেও কি এতো সেজে যেতে হয় নাকি ! দামি শাড়িটা নষ্ট হতে পারে—'

আট বছর আছে একসঙ্গে। দেবাশিস তাকে যতোটা চেনে নীপাও তাব চেয়ে কিছু কম চেনে না ওকে। জানে কোনটা ওর বলার কথা, কোনটা শুধুই লেজুড়। এখনো বুঝল শাড়ির প্রসঙ্গটা কাজেব নয়, আসলে সাজটাই ঢুকেছে মাথায়। এর আগের কথাগুলো বলেছিল রমেনকে উহ্য বেখে। বমেন তার পাখোয়াজী ; তানপুরা, পাখোয়াজ নিয়ে সঙ্গেই যাচ্ছে। গানে-বাজনায় এক ধবনের পবস্পর-নির্ভরতা আছে অবশ্য, তার বেশি নয়। দেবাশিস হয়তো অন্যরকম ভাবে।

নিজেকে আড়াল করতে করতে নীপা বলল, 'সারাক্ষণ শুধু সাজতেই দেখছ আমাকে !'

বলেই নিজেকে মেয়ে বলে চিনতে পারল নীপা। রবীন্দ্রনাথের কিছু গান যেমন তার ভীষণ প্রিয়, প্রসঙ্গ থাক না থাক খেয়াল খুশিতে ইচ্ছে করে গাইতে, প্রায় অভ্যাসে, তেমনি, সাজগোজ নিয়ে কেউ টুকলেই এই কথাগুলো অবিকল বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। অবশ্য তখনই তার মনে হলো, দেবাশিসের কথাগুলো শুধুই ঠেস দেবার জন্যে নাও হতে পারে। শাড়িটা নিশ্চয়ই দামি, রাতটা কাটাতে হবে ট্রেনে, এই শাড়ি পরেই শোয়াবসা সবকিছু—সকালে আর শ্রী বলে থাকবে না কিছু সাধারণ নীল-সাদাটা সকাল থেকে মনে মনে বেছে রাখলেও এই যে একটু আগেই মত বদলালে শাব বেছে নিল এই শর্টকালারের শাড়িটা, তার পিছনে নিজেকে যা স্বাভাবিক তার চেয়ে আরও এ ালো করে সাজিয়ে তোলার ইচ্ছেও কাজ করেনি কি ?

নীপা আয়নার সামনে এলো। সে সুন্দরী নয়, তার গায়ের রঙও শ্যাম-ঘেঁষা। তা হলেও, আকর্ষণ

বিচারে এর পরের মাপকাঠিগুলো তার পক্ষেই রায় দেয়। পরিচয় লুকোলে এই টান-টান চেহারা আর মাপা স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে কেউ কি বলবে বয়সটা তার তিরিশই! আট বছর আগে যখন গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেছিল, তখন কাগজে কি ফলাও করে লেখেনি তাকিয়ে দেখার মতো সপ্রতিভ এই নবাগতা গায়িকা-অভিনেত্রী মঞ্চে থাকবার জন্যেই এসেছেন। এই যে সপ্রতিভতা—নাকি আরও কিছু?, এর চেয়ে বেশি আর কী দিতে পারে সৌন্দর্য! তখনো ভাবেনি পাড়ার অভিনয় থেকে তুলে যে-দেবাশিস তাকে মঞ্চে এনেছিল, বিয়ের ফাঁসে টেনে সে-ই আবার মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেবে তাকে। ঈর্ষা? নাকি অন্য কোনো জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছিল দেবাশিস? এক জট খুলতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল নতুন জটে, যাতে তারই প্রবোচনায় একেবারে অন্যরকম গান গাইতে গাইতে ক্রমশ আবার মঞ্চে এসে দাঁড়াবে নীপা? গানে গানে তার বন্ধন যাক টুটে,...জীবন তোমার সুরের ধারায় সেথায় পড়ুক লুটে! তখন, সত্যি, গলায় উঠে আসা নিঃশব্দ গুঞ্জন থামিয়ে নীপা ভাবল, কে জানত সম্পর্কের ভিতরেও ক্রমশ ঢুকে পড়বে আর একরকম সম্পর্ক, টানাপোড়েন—গ্রুপ থিয়েটারের একদা দাপুটে অভিনেতা দেবাশিস মিত্র এখন স্টেজে দাঁড়িয়ে কী করছে না করছে তা নিয়ে কোনো কৌতূহল থাকবে না তার, আর দেবাশিসও কোনো-কোনো অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলবে, প্রেম পূজা প্রকৃতির দাড়িনাড়া চাতুরিতে ন্যাকামি যতোটা আছে তার সিকি ভাগ আর্ট থাকলেও বাঙালি মেরুদণ্ড কাকে বলে চিনত। অবশ্য তারা স্বামী-স্ত্রী।

যেন সেটা বুঝবার জন্যেই ক্লিপের আগায় বাঁদিক-ঘেঁষা সিঁথিতে সরু সিঁদুররেখা টানল নীপা। সংস্কার? হয়তো। এবং গুনগুনিয়ে উঠল। শাড়ির মেরুনের সঙ্গে ম্যাচিং খয়েরি টিপটা জায়গায় বসাতে বসাতে দেখল, চওড়া কাঁধে স্যাণ্ডো গেঞ্জির ওপর পাটভাঙা গেরুয়া পাঞ্জাবি চড়াচ্ছে দেবাশিস। পুরুষালি পুরুষ; প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে মঞ্চে ঢুকছে গলার গমক জানিয়ে। নীপা তাকিয়ে। আজকাল ও পাজামার পরিবর্তে ট্রাউজার্স পরে।

'কী গান বলতে পারো?'

'এ পরীক্ষাটা যে-কেউই দিতে পারে।' নিচু মুখে পাঞ্জাবির ঝুল ধরে টানতে টানতে দেবাশিস বলল, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে—। মনোনীতা হবার অপেক্ষায় বিয়ের কনে, পাড়ার লাগাতার সাইকেল চালানোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, এমনকি হঠাৎ খদ্দের ধরে ফেলা মযদানে দাঁড়ানো বেশ্যাও—'

আত্মবিশ্বাস মেশানো হতাশার ধরন, নীপা এইভাবেই বুঝে নিল। জযটা তারই, না হলে আটটা বাজতে না বাজতে নিজেকে তৈরি করে নিত না দেবাশিস। সব ঠিকঠাক চললে সামনের তিনটি রাত দুটো দিন দেখা হবে না তাদের। কাল, এই সময়, এলাহাবাদে, সামনে মাইক নিয়ে, তানপুরা আর পাখোয়াজের সঙ্গতের মধ্যে, সম্ভবত সে মঞ্চে থাকবে। ঘটনাটা মনে থাকল, অন্তত এই গানটা সে গাইবে না।

'তবু একবারও বললে না নীপা নামের কেউ একদিন গেয়েছিল গানটা, আর জলের দিকে তাকিয়ে তুমি ভাবছিলে কখন গান শেষ হবে, কখন জাপটে ধরবে আমাকে—'

পিছন থেকে হঠাৎই এগিয়ে এসে দু'হাতের বেড়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় নীপা বলল, 'বলো, ঠিক বলেছি কি না!'

'এতো খুশি যে!'

আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল দেবাশিস। দৃষ্টি নীপারই ওপরে।

নীপা বলল, 'সত্যি খুশি দেখছ?'

'অভিনয়ও হতে পারে।'

'না, তা নয়।' বাইশ থেকে তিরিশে পৌঁছে গেল নীপা, দ্রুত। বলল, 'জানো কার সঙ্গে একই স্টেজে গান গাইব কাল?'

'তন্ময় চৌধুরী, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে শ্যামাসঙ্গীতের আমদানি করেছে—'

'যাঃ! এভাবে বোলো না!' নীপা এখন শান্ত। আবার আয়নার দিকে মুখ করে ঘাড় বেঁকিয়ে আঁচল ঠিক করল। তারপর বলল, 'তন্ময়দা যাচ্ছে নতুন বিয়ে করা বউকে নিয়ে হনিমুন করতে—'

নীপা সরে যেতে এগিয়ে গিয়ে চিকনি তুলে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত হলো দেবাশিস। উৎসাহ দেখালো না।

'অপরেশবাবু।' গভীর গলায় নীপা বলল, 'বন্দ্যোপাধ্যায়—'

'অপরেশ ব্যানার্জি। এইসব ফালতু ফাংশানেও উনি যান নাকি।'

'যাবেন না শুনেছিলাম। আজ টিকিট দিতে এসে ওরা বলল যেতে রাজি হয়েছেন। ওঁর কোন আত্মীয়ের চিঠি নিয়ে দেখা করেছিল, সেইজন্যেই হয়তো—'

'তার মানে হলে লোক না জোটা পর্যন্ত তোমাদের গাইতে হবে। তারপর উনি, উনিই সব। এসব ফাংশানে তোমার যাওয়া উচিত নয়। অবশ্য—', আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে দেবাশিস বলল, 'আমি এসব বলবার কে!'

দু'পায়ে ঠিকঠাক দাঁড়িয়েছে মনে হলেও মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে দেবাশিস। অপরেশের নাম নীপা এর আগে বলেনি, হয়তো সেইজন্যেই। একটু পরেই বেরুতে হবে তাদের, এটা ঝগড়া করার সময় নয়। কিন্তু, লুকিয়ে খোঁচা দেবার জন্যে সময় অসময় বুঝবার দরকার হয় না।

নীপা পাল্টা দেবার কথা ভাবল না। হাতে পারফিউমের শিশি, গলার নীচে স্প্রে করতেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। বলল, 'পাগল তো ওই একজনই করতে পারেন। ভাবলে গা সিরসির করে, এই সেদিনও ওঁর অটোগ্রাফ নেবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। আর আজ—'

'এক ট্রেনে—একই মঞ্চে—'

'তুমি সব ব্যাপারেই এমন সারকাস্টিক কেন।' ভুরু তুলে তাকাল নীপা, 'কারুর কাউকে ভালো লাগতে পারে না!'

'পারে। কখনো কখনো নিশ্চয়ই পারে।' বলার ঝোঁকে এখন শব্দগুলোকে ছেঁকে তুলছে দেবাশিস। নীপার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'সুযোগ যখন পেয়েছ তখন এই ভালো লাগাটাকে কাজেও লাগাতে পারো। উনি তো শুনেছি বেডিওর অ্যাপ্রুভিং কমিটিতে আছেন, তোমাকে বি-হাই করার উমেদারিটাও করে নিতে পারো এই সুযোগে—'

কিছু বা বিরক্ত, জবাব না দিয়ে বাথরুমে গেল নীপা। দেবাশিস তাকে রেবিয়ারিস্ট ভাবে। ফিরে এসে জল খেল। ফ্ল্যাটটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল ঘুরেফিরে। রান্নাঘরের দিকে গিয়ে কিছু নির্দেশ দিল প্রৌঢ়া কাজের লোকটিকে। এই তিনদিন সংসারের দায়িত্ব তার, দেবাশিসের হেফাজতও। অবশ্য এটাকে যদি সংসার বলা যায়! একসঙ্গে থাকা, যখন থাকা তখনই দেখা হওয়া এবং কথা বলা, হঠাৎ-হঠাৎ চলে আসা এক রাশ স্তব্ধতা; রাতের বিছানায় কখনোসখনো শরীর নামক দুটি পাথরের ঘষাঘষিতে যে বন্য আগুন জ্বলে ওঠে তা চকমকিই, নিভতে দেরি হয় না। গানে নির্বাসন না নিয়ে সে যদি গ্রুপ থিয়েটারেই থেকে যেত, দেবাশিসের সঙ্গে সঙ্গে, জীবন কি অন্যরকম হতো তাহলে?

আবার ঘরে ফিরে দেখল, বড়ো স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেবাশিস।

'প্রায় দু'মণ ভারী! মাত্র তিনদিনের জন্যে এতো কি ঠেসেছো?'

'আমার ভার আরও বেশি না।'

কথাটা বলে পায়ে চটি গলিয়ে এবং হ্যান্ডব্যাগটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক লঘুতায় দেবাশিসের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করল নীপা। না পেয়ে বলল, 'ভয় নেই। গৃহত্যাগ করব না।'

'তাহলে গৃহ আছে!' এবারও বলার জন্যেই বলা। কাছাকাছি পেয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে আলতো ভঙ্গিতে নীপার পিঠে রেখে দেবাশিস বলল, 'এই স্যুটকেস নিয়ে ট্যাক্সির জন্যে ছুটোছুটি করতে হবে। সুতরাং—'

নীপা ঘড়িতে চোখ রাখল। সোয়া আটটা।

কপাল ভালো, বাড়ির নীচেই এক ভদ্রলোক নামছেন ট্যাক্সি থেকে। সময়মতো পৌঁছুতে পারার সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত হয়ে নীপা ভাবল, এরকম কখনোসখনোর উপলক্ষে এখনো তাকে পৌঁছে দেয় দেবাশিস। তার নিরাপত্তার কথা ভেবে, যেহেতু স্ত্রী, নাকি অন্য কোনো কারণে? এই তিনদিন, যখন সে দূরে থাকবে, কোনোভাবেই যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না, তখন তার সম্পর্কে কোন কথা ভাববে

দেবাশিস, কী করবে ? নাকি এটা শুধুই ওর দায়িত্ব পালন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, তার বেশি কিছু নয়—ক্রমশ নিরপেক্ষতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে দেবাশিস ! হতে পারে। দূরে, প্রায় বিদেশে গাইতে যাচ্ছে স্ত্রী, কিন্তু এর মধ্যে একবারও খোঁজ করেনি কোথায় উঠবে কিংবা কোন কোন গান গাইবে। বাড়িতে থাকলে প্রতিদিনেব রেওয়াজ তার কানে পৌঁছয় না এমন হতে পারে না ; তবু একবারও বলেনি এটা ভালো, কিংবা ওটা আরও ভালো হতে পারত। এরকম কেন হয় ! ও বোঝে না এমন তো নয় ! আট বছর আগে, কিংবা তার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত গান ব্যাপারটা দেবাশিসই বুঝত।

নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার নিতে গিয়ে একা সুগন্ধ উঠে এলো নীপার নাকে। যুঁই ও বেলফুলের মাঝামাঝি এই গন্ধ, হাল্‌কা উগ্রতা মেশানো ; কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে দেয় না।

দেবাশিসের স্বভাব একবার চুপ করলে চট করে কথা বলে না। এখনো তেমনি, চোখ সামনে, সিগারেটে টান দিলে ক্ষীণ আগুনের ঔজ্জ্বল্য চিনিয়ে দেয় কেউ আছে, পাশে। নীপা পাশ ফিরে তাকাল, কিন্তু ট্যাক্সির প্রায়ান্ধকারের মধ্যে দেবাশিসের তামাটে ঘাড় আর মুখের একদিক ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। পাঞ্জাবি ড্রাইভারের টান-টান পিঠের ওপর দিয়ে তার চোখ চলে গেল রাস্তায়। ভিক্টোরিয়াব পাশের রাস্তা দিয়ে রেড রোডের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। মার্কারির রশ্মিতে আলোর চেয়ে ছায়া বেশি। গতিই এনে দিচ্ছে আরামবর্জিত, ঈষৎ তপ্ত হাওয়ার ঝলক। আবার দেবাশিসের মুখে চোখ পড়ায় নিজের মধ্যে কেমন এক কাঠিন্য ও বিরক্তি অনুভব করল নীপা। এই অনুভূতি কেমন তা সে নিজেও বুঝতে পারে না , শুধু এটুকু ছাড়া যে একসঙ্গে থাকা এবং একাত্ম হওয়ার মধ্যে বস্তুত সম্পর্ক নেই কোনো—যে-লোকটির সঙ্গে সে এখন যাচ্ছে, আট বছরের অভ্যাস ছাড়া তার ওপর কতোটা নির্ভর করতে পারে, কিংবা আদৌ পারে কি না সে-সম্পর্কে তার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। জ্বালাহীন এক ধরনের অভিমান ছড়াতে শুরু করেছিল তার শরীরে। ক্রমশ শুকিয়ে এলো গলা এবং নিজের দিকে, রাস্তায়, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে নিতে নীপা বুঝতে পারল, চোখ ঝাপ্‌সা না হলে দৃশ্যগুলো পরিষ্কারই দেখতে পেত সে।

স্টেশনে পৌঁছে এবং তার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ভিতরের কাঠিন্য থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না নীপা। দলটা ভারীই বলতে হবে। অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় চৌধুরী এবং তাকে নিয়ে গানের তিনজন ছাড়া সাহিত্যিক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং দু'জন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকও যাচ্ছেন সঙ্গে—এই মুহূর্তের মানসিক অনিশ্চয়তায় নাম দুটো এসেও হারিয়ে গেল। কম্পার্টমেন্টের মধ্যে বসে, কুলি, ট্রলি ও যাত্রীদের পবস্পরবিরুদ্ধ কথাবার্তা, লোকাল ট্রেনেব আসা এবং ছেড়ে যাওয়ার শব্দের মধ্যে নিজের স্বাভাবিকতা ঠিক রেখেও নিশ্চিত কোনো আহ্লাদে নিজেকে জড়াতে পারল না সে। একই কম্পার্টমেন্টে পাঁচটা খুপরি, সামনে টানা করিডোর। তন্ময়ের স্ত্রী মাধুরীর সঙ্গে খুচরো আলাপ করতে করতে দুলে উঠল ট্রেনটা। তখনই মনে পড়ল দেবাশিসকে শেষ দেখেছিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপরেশের সঙ্গে কথা বলতে। ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে দেখে এখন সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো করিডোরে, জানলায় ঝুঁকল এবং দেবাশিসকে খুঁজে নিয়ে হাত নাড়ল। দেবাশিস তাকাল, কিন্তু সামান্য ঘাড় হেলানো ছাড়া আর কোনো অভিব্যক্তি ফুটল না তার মুখে। এমনও হতে পারে দেবাশিস তাকে দেখেইনি। ট্রেন স্পিড নেবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল দেবাশিসের মুখ ; দু'এক মুহূর্তের জন্যে চোখের মধ্যে তাব পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার্সের রঙটুকু ধরে রাখল নীপা। সম্ভবত সিগারেটও ছিল হাতে। বুঝতে পারল না এই বিলম্বিত ব্যবহারে সে দেবাশিসকে কোনোভাবে আঘাত করল কি না। কিছুদিন থেকে নিজের যে-কোনো আচরণ নিয়েই সংশয় দেখা দিচ্ছে মনে। মনে হচ্ছে এটাই সেই বারুদ যা জ্বলে ওঠার জন্যে তৈরিই ছিল, কাঠিটা সে নিজেই ছুঁইয়ে দিল।

'কী, কর্তাকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে নাকি ?'

সেই একই গলা, গভীর ও তরঙ্গিত, চেনামাত্র নিজেকে জানলা থেকে সবিয়ে নিল নীপা।

সামনে অপরেশ। পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত, লম্বা, সবল চেহারা, মুখের গড়নে দার্ঢ্য, ব্যাকব্রাশ করা চুল, পুরু ফ্রেমেব চশমাব আড়ালে প্রায় পরিচিত, স্মিত দুটি চোখ। তার পিছনে তন্ময়। উদ্যোক্তাদের একজন, অনিলবাবু, যিনি যোগাযোগ করেছিলেন, হুক্ লাগাচ্ছেন দরজায়। দরজা-খোলা টয়লেট থেকে

ফেনোলের রাসায়নিক গন্ধ উঠে আসছিল।

প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে ট্রেনটা। লাইন বদলের শব্দের মধ্যে এগিয়ে এসে তন্ময় বলল, 'অপরেশদা, আপনি বোধ হয় জানেন না নীপাও এককালে অভিনয় করত স্টেজে—'

'তা-ই!' কৌতূহলের দৃষ্টিতে নীপার দিকে তাকাল অপরেশ। খুপরিতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'গান টানল কেন! অভিনয়ে গ্ল্যামার বেশি—ফিল্মে গেলে তো কথাই নেই—'

স্বগতোক্তির ধরনে বলা, তবু, সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখায় নীপার ধারণা হলো উত্তরটা তার কাছেই আশা করছে অপরেশ। দ্বিধান্বিত গলায় বলল, 'গানই ভালো লাগে—'

'তাহলে তো ভালোই।' অপরেশ বলল, 'কিন্তু স্ট্রাগল করতে পারবেন তো? রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রোতা যতো না তার চেয়ে বেশি শিল্পী। কম্পিটিশনও সাংঘাতিক।'

অপরেশ এমনভাবে প্রশ্নটা তুলল যেন ইন্টারভিউ নিচ্ছে—ঠিকঠাক জবাব না দিলে নম্বর কাটা যাবে। এতোজনের সামনে বলেই ভালো লাগল না। নীপা এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, 'আমাকে আপনি বলবেন না—'

'বেশ।' আপার বার্থ দুটো নামানো। মাধুরীর পাশে নীপা, উল্টোদিকে জানলা ঘেঁষে অপরেশ, পাশে তন্ময়, স্লাইডিং দরজা চেপে ধরে অনিলবাবু দাঁড়িয়ে। স্পিড ও লাইন পরিবর্তনের ঝোঁকে দুলছে শাড়িটা। সিগারেট ধরিয়ে অপরেশ বলল, 'আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো?'

'কেন!'

'তোমার বয়স কম। কী হাড্ডাহাড্ডি কম্পিটিশন এখনই হয়তো তা বুঝতে পারছ না। আমাদের সময় এরকম ছিল না—'

এবার আর জবাব খুঁজল না অপরেশ। খানিক জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর, মুখ ফিরিয়ে অনিলকে দেখতে দেখতে বলল, 'ও মশাই, আমার টীম ঠিক উঠেছে তো?'

হ্যাঁ, স্যার। সব একই জায়গায়। আপনার তিনজন, তন্ময়দা আর নীপাদির দুজন—সব স্লীপারে। আমি নিজে দেখে এসেছি—'

'ভালো করে দেখবেন। ওরা খুব সেনসিটিভ। আমরা ফার্স্ট ক্লাসে, ওরা স্লীপারে—একটা কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয়। তার জেরে যদি বাজনায় তাল কাটে তাহলেই হয়েছে!'

'যা বলেছেন!' তন্ময় বলল, 'আমি তো বলেছিলাম আমাকেও স্লীপারে দিতে—'

অন্যমনস্কতার মধ্যে নীপা দেখল, ভুরু নাচিয়ে তন্ময়কে কী ইশারা করছে মাধুরী। সম্ভবত বেফাঁস কিছু বলা থেকে বিরত করল।

'সাধ্য থাকলে আমরা সবাইকেই ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে যেতাম।'

নীপা অনিলের দিকে তাকাল এবং মনে করার চেষ্টা করল রমেনের যাওয়া নিয়ে তার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের কোনো ভাবনায় স্থির থাকতে পারল না। চিন্তার ভিতরের অস্পষ্টতা থেকে এই প্রথম ট্রেনের সহিংস গতি অনুভব করল সে। বাস্তবিকই ট্রেনটা এতো দ্রুত ছুটছে যে শব্দে প্রখর না হয়েও গতির চাপে দুলে উঠছে মাঝে মাঝে। অন্যমনস্কতার মধ্যে অন্যদের বলা কথাগুলো সূত্রহীন টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার আশপাশে। দেবাশিস হয়তো ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেছে এতোক্ষণে। নীপা ভাবল, পৌঁছেছে কি? মনে পড়ল মাঝে মাঝেই দেবাশিসের দেড়টা দুটো করে বাড়ি ফেরা, হাজার অনুযোগ অভিযোগেও উদাসীন, তার দুশ্চিন্তাকে আমল না দেওয়া এবং দুজনের মাঝখানে নেমে আসা হঠাৎ নৈঃশব্দ্য। কেমন, তা দুর্বোধ্য। কিন্তু আছে, থাকে; রক্তে কিংবা শিরাপ্রবাহে করে তোলে অসহিষ্ণু। সেই একই নৈঃশব্দ্য এখনো আলাদা করে দিল নীপাকে। কাঁধের দুদিকে, ঘাড়ে, মাথার মধ্যিখানে এবং হাত দুটিতে অদ্ভুত এক অবসাদ অনুভব করল সে। সম্ভবত ঘুম আসছে, সম্ভবত ট্রেনের দুলুনিতে। আর কোনো কারণেও হতে পারে।

হঠাৎ অপরেশের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় গলা পর্যন্ত উঠে আসা ছোট ছোট হাইগুলো চাপা দিয়ে নড়েচড়ে বসল নীপা। ঠিক জানে না কতোক্ষণ, কিন্তু অপরেশের দৃষ্টি যে এতোক্ষণ তারই ওপরে নিবদ্ধ ছিল তাতে সন্দেহ নেই কোনো। সামান্য অস্বস্তি বোধ করল সে, চোখ ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে।

অন্ধকার এবং চকিতে পিছলে যাওয়া আলোর ভিতর থেকে ছিট্‌কে আসা হাওয়ায় তাপ নেই। তৃপ্তিও নেই। নিয়মমাফিক যান্ত্রিকতায় খুপরির ভিতরেও ঘুরছে দুটো পাখা। জোরে হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেনটা একটা ছোট স্টেশন পেরিয়ে যাবার সময় আকস্মিক বোর্ডে নামটা পড়বার চেষ্টা করল নীপা, পারল না ; তারও আগে ফিরে এলো অন্ধকার। মনে পড়ল আজই বেরুবার আগে অপরেশকে নিয়ে দেবাশিসের সঙ্গে কথা হয়েছিল তার। সে কি বলেছিল কারুর কাউকে ভালো লাগতে পারে না ! কেন বলেছিল এখন আর তার তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছে না। তখন চোখ দুটো আস্তে আস্তে নেমে এলো নিজেরই শরীরে, কোলে ও হাঁটুতে, শাড়ির মেরুন-কালো রঙে।

মাধুরী বলল, 'নীপাদি, আমরা কি এবার নিজেদের জায়গায় চলে যাবো ?'

'যাবে ?'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুম পেয়ে গেছে।'

তাকেই বলা, তবু তন্ময়কে দেখে মনে হয় মাত্র কিছুদিন আগে বিয়ে করা স্ত্রীর যে-কোনো ভঙ্গি ও কথা বলা সম্পর্কে খুবই সজাগ ; এ কথাটাও শুনতে ভুল করেনি।

'সত্যিই ঘুম পাচ্ছে নাকি ? মোটে তো দশটা !'

'আমি বলিনি। আপনার বউ বলেছে—'

তন্ময় অপ্রস্তুত। মুখ দেখে মনে হবে মাধুরীও। অন্য কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে দ্রুত গলায় বলল, 'তুমি তাহলে আমার স্যুটকেসটা ক্যুপেতে দিয়ে দাও। তোমার চাদর আর এয়াবপিলোটা বের করে দিই। তুমি তো এখানেই থাকবে ?'

মাধুরীর কথায় অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম চাপা কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল নীপার মুখে।

'তন্ময়দা, আমি কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে দিতে পারি।'

'আরে না, না। তা কী করে হয় ! আফটার অল, লেডিজ বলে কথা—'

'আমার কিন্তু এই আলাদা ট্রিটমেন্ট ভালো লাগে না।'

অপরেশ সম্ভবত অন্যমনস্ক ছিল, ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। এখন ওদের দেখতে দেখতে বলল, 'কী নিয়ে কথা হচ্ছে ?'

'কিছু নয়।' তন্ময় বলল, 'নীপা আর মাধুরীর সীট পড়েছে ওদিকে—একটা ক্যুপেতে—'

'কেন ! এখানে তো চারটে বার্থ ?'

অনিল এতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। অপরেশের প্রশ্নে বিব্রত, কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'এর মধ্যে দুটো আসানসোলের কোটা—ওখান থেকে লোক উঠবে—'

'তা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো কেন ! সবাই মিলে একসঙ্গেই তো যেতে পারতাম !'

'না, মানে—', অনিল ইতস্তত করল, 'আপনার যাওয়াব ব্যাপারটা তো কালই কনফার্মড্ হলো, তাই একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে—'

'আপনি কোথায় ?'

'পাশেরটায়, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মানে, ভদ্রলোক এই সেদিন হার্ট-অ্যাটাক থেকে সেরে উঠলেন তো ! ওঁর স্ত্রী বলেছেন আমি যেন ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকি—'

খানিক অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অপরেশ। তারপর বলল, 'দেখেছেন ! অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব ভেবেছিলাম—একেবারেই ভুলে গেছি। যাই একবার, দেখা করে আসি। নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েননি ?'

'না, না।' অপরেশকে উঠতে দেখে অনিল বলল, 'সাড়ে দশটায় ঘুমের ওষুধ খাবেন, তারপর শোবেন—'

অপরেশ বেরিয়ে গেল, পিছনে পিছনে অনিলও। হাবেভাবে বোঝা যায় ওদিকে অমলেন্দু, এদিকে অপরেশকে নিয়ে টেনসনে আছে, লোকটা। সম্ভবত দেবাশিসের কথাই ঠিক, লোকজন জড়ো না হওয়া পর্যন্তই নীপা, তন্ময়দের দরকার হবে। তারপর উনি, উনিই সব ! কথাগুলো হুবহু ফিরে এলো কানে। কেন যেন মনে হলো নীপার, অপরেশ আগেই রাজি হয়ে গেলে তার কিংবা তন্ময়ের ডাক পড়ত না।

স্লাইডিং দরজাটা যেখান পর্যন্ত ঠেলা হয়েছিল ট্রেনের দোলায় সেখান থেকে ফিরে আসছে আস্তে আস্তে। একটি শিশুকে দু'হাতে ধরে টয়লেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ফর্সা, একটু বা মোটা চেহারার এক যুবতী। চেহারা ও পোশাকে অবাঙালি মনে হয়। মুহূর্তের মধ্যে আড়াল হয়ে গেল করিডোর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একা, নিঃশব্দ খুপরিতে ভেসে বেড়ানো সিগারেটের ধোঁয়ার অস্পষ্ট গন্ধ পেল নীপা। আবাব ফিরে এলো দেবাশিস এবং, অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায়, ট্রেনের শব্দ। নিঃশ্বাসের চাপ সহ্য করতে করতে নীপা ভাবল, দূরত্ব বাড়ছে। প্রশ্নটা যদি কিংবা হয়তো নিয়ে নয়, প্রায় নিশ্চিত ; অন্তত দু' বছর আগেও সে এরকম ভাবেনি।

মাধুরীর মুখ জানলার দিকে ফেরানো। সামনে তন্ময়, কাঁধ থেকে ঝোলানো হাত দুটো সীটের ওপর, চোখ মেঝের দিকে। এখন কথা বলতে হলে নীপাকেই বলতে হবে।

'অপরেশদার এই ব্যাপারটা ভালো লাগল না ?'

'কোনটা ?'

'এই যে অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিজেই এগিয়ে যাওয়া ? ওঁর নিজের নামডাকও তো কম নয় !'

তন্ময় হাসল। কিছু বলবার আগে সোজাসুজি নীপাকেই দেখল।

'ওটা ওঁর পাবলিক রিলেসান্স। স্বার্থের জন্যে করা। তুমি বোধ হয় জানো না অমলেন্দুবাবু একটা বড়ো কাগজের সঙ্গে যুক্ত, যার সার্কুলেশন চার লাখ। ওঁর একটি কথায় অপরেশদার ছবি সমেত বড়ো রাইট-আপ বেরুতে পারে—'

'জানি।' নীপা বলল, 'কিন্তু অপরেশদা বোধ হয় এসব ব্যাপার পেরিয়ে এসেছেন—'

'আজই তো আলাপ হলো, তুমি ওঁকে কতোটুকু চেনো ! লোকটা পাবলিসিটির কাঙাল—'

নীপা জবাব দিল না। বাইরে, একটানা অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ আলো চোখে পড়েনি। তবু, তাকিয়েই থাকল। গতি কমিয়ে জোরে হুইস্‌ল্ দিচ্ছে ট্রেনটা। সম্ভবত সিগন্যাল পায়নি। পুরোপুরি থেমে যাবার আগেই ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল আবার।

'যাই বলো—', মাধুরী বলল, 'ওঁর গান আজকাল আমার ভালো লাগে না। একদম ফ্ল্যাট।'

'অপরেশ ব্যানার্জির ?'

'নীপার সামনে এসব কথা বোলো না।' মাধুরীব হঠাৎ-মন্তব্য চাপা দেবার জন্যে ইশারা করল তন্ময়। তারপর বলল, 'তোমার ঠাট্টা নীপা বুঝবে না। ও অপরেশদার ব্লাইন্ড ফ্যান।'

'সত্যি !' হাত বাড়িয়ে নীপার জানুতে চাপ দিয়ে মাধুরী বলল, 'কিছু মনে করলে না তো ?'

মাধুরীর বয়স কম নয়, কিন্তু, নতুন বিয়ের কারণেই হয়তো, গায়ে পড়ার ধরনটা যায়নি। তার ওপব সারাক্ষণ নীপাদি, নীপাদি করছে। কী ভাবছে মাধুরী, ওতে বয়স লুকোনো যায় ? এসব ভাবলেও বিরক্তি আড়াল করে নীপা বলল, 'মনে করব কেন ! ভালো লাগা না-লাগার ব্যাপারটা যার যার নিজের।'

'আসলে কি জানো, ভদ্রলোক সম্পর্কে যা শুনেছি তাতেই ওঁর সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে গেছে—'

'কী শুনেছ !'

'ওই যে, স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন না—'

'আঃ !' প্রায় চেঁচিয়ে বলল তন্ময়, 'ওটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক স্বামী-স্ত্রীই একসঙ্গে থাকে না। তা ছাড়া, এগুলো গসিপও হতে পারে—'

নীপা বুঝল, তন্ময়ের অস্বস্তি মাধুরীর কথায় যতোটা না তার চেয়ে বেশি তার সামনে বলা নিয়েই। ভাবতে পারে কথাগুলো অপরেশের কানেও পৌঁছুবে। ওকে আশ্বস্ত করার জন্যেই বলল, 'গসিপ তো প্রত্যেকের নামেই কিছু-না-কিছু থাকে, তন্ময়দা। যে যতো বড়ো তার সম্পর্কে রটনাও ততো বেশি—'

'এগুলো তো আর আমার কথা নয়—', বিব্রত ভঙ্গিতে মাধুরী বলল, 'চারদিকে যা শুনি তাই বললাম।'

'সেজন্যে নয়। লোকটা এখানে আছে বলেই বললাম। না হলে এসব কথা আকছার আলোচনা

হয়।' তন্ময় উঠে দাঁড়িয়েছিল। বার্থের নীচে নিজেদের স্যুটকেসটা কোথায় আছে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নীপা, তোমারটাও পৌঁছে দেবো নাকি?'

'থাক। আমিই নিয়ে যাবো পরে—'

অপরেশ ফিরে এলো। মুখে চাপা হাসি। ইতিমধ্যে আল্‌গা করেছে বুকের বোতামগুলো; গলার নীচে ওর গেঞ্জি ও রোমশ বুক চোখ এড়ালো না নীপার।

'বুঝলে তন্ময়, এই ভদ্রলোক, অমলেন্দু মুখার্জি, খুব ইন্টারেস্টিং।' আগের জেরেই কথা শুরু করল অপরেশ, 'একবার একসঙ্গে পাটনায় গিয়েছিলাম, ট্রেনেই। গেঁজিয়ে আর হুইস্কি খেয়ে রাত প্রায় কাবার। সব মনে আছে। আমাকে বললেন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি বলে ঘুম হবে না—সারা রাত হুইস্কির গন্ধ নাকে আসবে—! এই হার্ট অ্যাটাকটাই সব মাটি করে দিয়েছে—'

তন্ময় স্যুটকেসটা বের করে এনেছিল। খানিক ঝুঁকে, খানিক দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল অপরেশের দিকে।

'এনেছেন নাকি সঙ্গে?'

'কী, হুইস্কি? তুমি তো জানো, রোজ দু'পেগ অন্তত না খেলে—', কথাটা শেষ করার আগেই থেমে গেল অপরেশ। সচেতন হয়ে বলল, 'সরি, আপনাদের সামনে—'

অপরেশ যে সত্যিই কুণ্ঠিত তা ধরা পড়ল ওর সম্বোধন বিভ্রমে। ওকে চুপ করে যেতে দেখে মাধুরী বলল, 'আমরা কিছু মনে করিনি। আপনি খান না!'

'আপনি খেলে আমিও খাবো।' তন্ময় বলল, 'অপরেশদা, আপনি অমলেন্দুবাবুর কথা বললেন। সেবার পাটনায় কিন্তু আমিও গিয়েছিলাম। অবশ্য একই ট্রেনে নয়—। মাধববাবুর বাংলো মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তুমিও ছিলে—'

অপরেশ যেখানে শেষ করল, সেখানেই থেমে গেল কথা। সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক, ওর মুখের এবং দৃষ্টির হঠাৎ পরিবর্তন চোখ এড়ালো না নীপার। নিজের স্বতঃস্ফূর্ততায় নিজেকে একটু বেশিই খুলে ধরেছিল, সম্ভবত অনুতপ্ত সেজন্যে—যদিও এমন কিছু বলেনি যা অশোভন কিংবা অস্বাভাবিক। এমনও হতে পারে, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির একটা পর্যায়ে পৌঁছে স্বাভাবিকতার ধারণাও যায় পাল্টে। তুমি অপরেশ ব্যানার্জি, যে-উচ্চতায় পৌঁছে ছড়িয়ে দাও গানের মাধুরী, স্পর্শ করো স্তব্ধতা, সেইটাই তোমার আসল জায়গা; তুমি সাধারণ নও, সুতরাং সাধারণ হওয়া মানায় না তোমাকে। এই মুহূর্তে হয়তো এইরকমই কোনো ভাবনা কাজ করছে অপরেশের মনে; হয়তো নয়। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সাফল্যের শেষ মর্যাদায় পৌঁছুনো এই মানুষটির ব্যক্তিত্বের ভিতরের চেহারাটি নীপার কাছে স্পষ্ট নয়; অপরেশকে সে চেনে শুধুই তার গানের মধ্যে দিয়ে, সুরের সাবলীলতায়, কণ্ঠ-মাধুর্য যেখানে কথায় এনে দেয় আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা, হাহাকার। সে শুধুই লক্ষ করতে পারে অপরেশের চোখমুখের আকস্মিক বিষণ্ণতা। একটু আগের ঘটনার সঙ্গে এই পরিবর্তনের আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সে কী করে বুঝবে! বস্তুত, নিজেকে, নিজের সমস্যাগুলোকেও কি ঠিকঠাক চিনতে পারছে!

নিজের মধ্যে ফিরে এলো নীপা। একা। আপাত-কঠিন হয়ে থাকার মধ্যেও তার শরীরে ছড়াতে লাগল একরকম দোলা—ঘুম-পাওয়া এবং না-পাওয়ার মাঝামাঝি কোনোখানে আছে এক জাগিয়ে রাখা ক্লান্তি, অননুভূত অভিজ্ঞতায় এমনকি মন জুড়েও ছড়িয়ে পড়ে আচ্ছন্নতা। স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে গেল তন্ময়, তার পিছনে মাধুরী। বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতায় দূর থেকে ক্রমশ কাছে এগিয়ে এলো দ্রুত ধাবমান ট্রেনের শব্দ। ছন্দোবদ্ধ এবং একটানা, সেখানে একঘেঁয়েমি নেই কোনো।

অস্বস্তি থেকে মুখ তুলে অপরেশকেই দেখল নীপা। খানিক আগে দু'পাশে হাত নামিয়ে যে-ভঙ্গিতে বসেছিল তন্ময়, প্রায় সেই ভঙ্গিতে, দৃষ্টি জানলার দিকে, অন্ধকার ছাড়া যেখানে আর কিছুই দেখবার নেই। তবে, অপরেশ তন্ময় নয়।

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'সেই কবে, ছোটবেলা থেকে আপনার গান শুনছি—আমি আপনার ভীষণ ফ্যান—', মেয়েলি দ্বিধা

থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করল নীপা, 'সেজন্যে নয়। আসলে জানতে চাইছি গান আপনাকে কী দিয়েছে— ?'

অপরেশ হাসল। কৌতূহলের দৃষ্টিতে নীপার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বড়ো কঠিন প্রশ্ন করলে হে! কেন গাই তা-ই তো আজও বুঝে উঠতে পারিনি!'

'ভালো নিশ্চয়ই লাগে?'

'সেটা তো সহজ উত্তর, শুরুর কথা। তুমিও তাই বলেছিলে না!'

নীপা চুপ করে থাকল।

ভাববার সময় নিয়ে অপরেশ বলল, 'কী চেয়েছি তা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে না পারলে কী পেয়েছি তা বলব কী করে!'

'আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন—'

'না। তা নয়। হয়তো তুমিও বুঝতে পারবে, প্রশ্নটাই বাঁচিয়ে রাখে—উত্তর হয়তো কোনোদিনই পাওয়া হয় না। একটু আগে অমলেন্দুবাবুও হঠাৎ বললেন, সময় ফুরিয়ে আসছে, যা চেয়েছিলাম এখনো তার কিছুই লিখতে পারলাম না—'

'উনি খুব বড়ো লেখক।'

'সেটা তুমি আমি বলছি, যা লিখেছেন তা-ই পড়ে। আমরা তো জানি না উনি কী লিখতে চেয়েছেন, ওঁর চাওয়াটা কোন ধরনের! তবে—', অল্প থেমে অপরেশ বলল, 'কিছু একটা তো পাওয়া যায়—'

অপরেশ বোধহয় আরও কিছু বলত, তার আগেই স্লাইডিং দরজা সরিয়ে তন্ময় ঢুকল। হাতে ভাঁজ-করা চাদর। সীটের একদিকে সেটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, নীপা। মাধুরী যেন কি জন্যে ডাকছিল তোমাকে।'

'কেন!'

'জানি না।' তন্ময় বলল, 'একবার ঘুরেই এসো না!'

নীপা খুশি হলো না। সম্ভবত ওরা এখন হুইস্কি নিয়ে বসবে; এটাও বুঝতে পারল না তন্ময় তাকে সবাতে চাইছে কিনা। মাধুরী মেয়েটিকে তার পছন্দ নয়। একটু আগেই ভেবেছে ঘুম ছেঁকে না ধরলে যাবে না ক্যুপেতে; আর, তন্ময় যদি বউয়ের সঙ্গেই রাত কাটাতে চায়, তাহলে সে এইখানেই থেকে যেতে পারে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠল। তন্ময়ের দিকে না তাকিয়ে অপরেশকে বলল, 'কথা শেষ হলো না। আমি আসছি এখুনি—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মুড থাকলে একটা গানও শোনাতে পারো।'

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে নীপা বলল, 'এই ট্রেনে!'

'নয় কেন! তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, অমলেন্দুবাবু তোমার গানের সুখ্যাতি করছিলেন। ওগো কাণ্ডাল, আমারে কাণ্ডাল করেছ—, কোথায় যেন গেয়েছিলে, উনি ছিলেন সেখানে—'

'হ্যাঁ, মহাজাতি সদনে। গত বুধবার।'

'তবে! এমন গুণী লোকের প্রশংসা—!'

একরকম ঢেউ এসে গেল শারীরিক মুদ্রায়। নীপা বলল, 'আসছি।'

ক্যুপের সংখ্যা 'ডি', আগেই দেখে রেখেছিল। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করল অন্যগুলির দরজা বন্ধ; শেষ প্রান্তে কন্ডাক্টর গার্ডের সীটে বসে সিগারেট টানছে একটি ক্ষয়া চেহারার লোক। যাত্রীও হতে পারে। দরজা বন্ধ পেয়ে টোকা দিল নীপা।

খুলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ইতিমধ্যেই শাড়ি ছেড়ে ফ্রিল-বসানো হাল্‌কা নীল রঙের নাইটি পরেছে মাধুরী, স্পষ্ট হয়ে আছে বুকের ঢল। হাতের তালুতে ক্রিম নিয়ে ঘষছিল মুখে। নীপাকে দেখেও সক্রিয় থাকল হাত।

বাইরে থেকেই নীপা বলল, 'ডাকছিলে কেন!'

'ভিতরে এসো না! বলছি।'

মেঝের ওপর স্যুটকেসটা খোলা। পাশ কাটিয়ে ভিতরে গিয়ে বসল নীপা।

মাধুরী বলল, 'তুমি আসবে তো এখানে?'

'দেখি।'

গালে হাত ঘষা বন্ধ করে মাধুরী বলল, 'আমি একেবারে রাত জাগতে পারি না। এদিকে ও গেল মদ গিলতে। এখন কতোক্ষণ চলবে কে জানে! আচ্ছা, কী দরকার ছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে মদ আনার?'

'ওটা ওঁর নিজের ব্যাপার।'

'কিন্তু ওকেও তো টানছে!'

'টানলেই যেতে হবে তার কী মানে আছে!' প্রায় ক্ষুব্ধ গলায় নীপা বলল, 'তন্ময়দা খায় না এমন তো নয়! আমি এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। আর তুমি যদি চাও, তন্ময়দাকে এখানে ডেকে নিতে পারো। আমি তো আগেই বলেছি—'

মাধুরী নিজেকে গুটিয়ে নিল।

'দ্যাখো, অপরেশবাবুকে ছোট করার জন্যে আমি কিছু বলিনি। ও আমাকে ধমকালো, বলল, কোথায় কী বলতে হয় জানি না। তুমি শুনেছ—, প্লীজ, কথাগুলো কাউকে বোলো না!'

মাধুরীর গলায় ভান নেই। নীপা বলল, 'ওসব নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আর কেউ জানবে কেন? আমি কাউকে কিছু লাগাই না।'

'তুমি খুব ভালো। তোমাকে দেখে তাই মনে হয়—'

'থ্যাঙ্ক ইউ। এবার শুয়ে পড়ো।'

নীপাকে উঠতে দেখে মাধুরী বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খাও না? দেখো, ও যেন বেশি না খায়। কাল তোমাদের সবাইকেই গাইতে হবে—'

জবাব না দিলেও দাঁড়িয়ে থাকল নীপা। বস্তুত সে থেমে আছে প্রথম বাক্যটিতে। মাধুরীর কথায় কি ইঙ্গিত ছিল কোনো? এমনকি হতে পারে যে এখানে নয়, কিন্তু পরে, অন্য কোথাও, অন্য কোনো উপলক্ষে তার সম্পর্কেও মন্তব্য করবে মাধুরী?

প্রশ্নটা প্রশ্নই থাকল। অনিশ্চিতির মধ্যে কিছু না বলেই বাইরে বেরিয়ে এলো নীপা।

অনুমান মিথ্যে নয়। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের গ্লাস নিয়ে এরই মধ্যে বসে পড়েছে দু'জনে। চেনা দৃষ্টি নিয়ে অপরেশ হাসলেও তন্ময়কে কঠিন লাগছে এখনো। ও কিছু বলার আগেই নীপা বলল, 'এমন স্বামী-ভক্ত বউ আর দেখিনি। তন্ময়দা, আপনাকে বেশি রাত জাগতে মানা করল।'

'ঠাট্টা কোরো না!'

'ঠাট্টা করব কেন? আমি বলেছি ঠেলে পাঠিয়ে দেবো। না হলে তো ওরও ঘুম হবে না।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তন্ময়। নীপা জানে এই মুহূর্তে সে তার আগ্রহ নয়; আগে ছিল না, পরেও থাকবে না। অনেকদিনের আলগা পরিচয় থাকলেও আজই হয়তো চেনা হলো ওকে। অপরেশ সম্পর্কে বলা ওর কথাগুলোয় এক ধরনের কমপ্লেক্স কাজ করে থাকতে পারে; কিন্তু, আজ, এই যাত্রায় মনে হচ্ছে তাকে নিয়েও ক্ষোভ জমিয়েছে তন্ময়, কেন তা বোঝা মুশকিল। অপরেশ তার প্রশংসা করল বলে? নাকি ভাবছে নীপা একটা খুঁটি পেয়ে গেল?

একান্তের ভার এরই মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে মাঝখানে। দেবাশিস কী বলেছিল মনে পড়ল। দেবাশিসও তাকে কেরিয়ারিস্ট ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাহলে বাঁচা, আশ্রয়, অবলম্বন, এসব কথাগুলোর মানে কী!

ট্রেনের জানলায় মাথা নামিয়ে এসব ভাবতে ভাবতেই সামনে বসা দু'টি পুরুষের অস্পষ্ট আলাপ কানে এলো নীপার। পরিচয় থাকা কিংবা হওয়ার অর্থই চেনা নয়; হয়তো একসঙ্গে যাওয়া এবং ফিরে আসার পর যা থাকবে তার নাম অপরিচয়; কিংবা শূন্যতা। কার কী হলো না হলো কে জানছে!

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্প ঠাণ্ডা মিশেছে হাওয়ায়। তার জোরালো স্পর্শে আরাম ছড়িয়ে পড়ল মাথায়। একরকম আবেগে নিজেকে আরও একটু এগিয়ে জানলায় গাল চেপে ধরল নীপা, অবাধ হতে দিল ট্রেনের একটানা শব্দে মেশা হাওয়া। চোখদুটো বন্ধ করল এবং ভাবল, কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে

অদৃশ্যে, সে যার কিছুই জানে না, কিন্তু যার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এই মুহূর্তে দু'টি অনাগ্রহী মানুষের সঙ্গ আরও অবিন্যস্ত করে দিল তাকে। সম্ভবত এখানে থেকে সে ভুল করেছে।

নিঃসঙ্গতার বোধ তীব্র হতে ক্রমশ অপমানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল নীপা। ইতিমধ্যে বর্ধমান জংশন এলো এবং চলে গেল। বাইরের গোলমাল ও মিশ্র শব্দ এখানে তারতম্য আনল না কোনো। প্রায় ঘুমে জড়ানো চোখে অপরেশকে দেখল সে। কিছু বা আবজানো মুখ, মনে হয় অহঙ্কারী। এবং দূরত্বময়। ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ—, লোকটি কি বলেছিল তার গান শুনবে, এই ট্রেনেই ? নাকি এসব বলার মধ্যেও ছিল অন্য কোনো উদ্দেশ্য, যা গান নয়, যা কিছু একটা তো পাওয়া যায়-এর স্বীকারোক্তি থেকে অনেক দূরে ! নীপা জানে না। এই মুহূর্তের অসহায়তা তাকে টেনে নিল পূর্বাপর হারানো এক গাঢ় নিরুদ্দেশে।

এরপর কী হয়েছে নীপা জানে না। আচ্ছন্নতার মধ্যে হঠাৎই একটা চেতনা ছুঁয়ে গেল তাকে। অননুভূত এক ধরনের অনুভূতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাথায়। ভিতরের আলো এখন মৃদু নীল। নিজেকে প্রত্যক্ষের মধ্যে ফিরিয়ে এনে দেখল, উল্টো দিকের বার্থের জানলা ঘেঁষে যেমন ছিল তেমনি বসে আছে অপরেশ ; তন্ময় নেই , গতির চাপে বন্ধ-করা স্লাইডিং দরজাটা দুলছে আগল-ছাড়া হবার প্রক্রিয়ায়।

ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে ক্রমশ অন্য এক ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে আসছিল নীপার কানে, এই ধ্বনিই, মনে হলো, ঘুমের মধ্যে স্পর্শ করেছিল তাকে। বুঝতে পারেনি। সচেতন হয়ে লক্ষ করল ঠোঁট নড়ছে অপরেশের, আলোড়িত হচ্ছে কণ্ঠনালী, একান্ত, নির্জন গলায় নিঃসৃত হচ্ছে গান . আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে— । কথাগুলো চেনা, কিন্তু একেবারেই অপরিচিত হয়ে এখন ফিরে আসছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে। সেই কণ্ঠ, সেই কথা, সেই সুরের বিভঙ্গ ট্রেনের যান্ত্রিক শব্দ কেটে চলে যাচ্ছে দূরে, ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার অনন্তে—বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।

চেপে রাখা নিঃশ্বাসের ভার সংবরণ করার চেষ্টায় অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট এক অনুভূতিতে জড়িয়ে পড়ল নীপা। শিরায় শিরায় ব্যাপ্ত হচ্ছে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। ক্রমশ তা স্পর্শ করল তার চোখ, তার ওষ্ঠ, তার স্তনাগ্র ; আরও গভীর আশ্রয় জানিয়ে জড়িয়ে গেল নাভিদেশে। ইতিমধ্যেই জলে ভরে উঠেছিল চোখদুটো। দূরগামী এক বেদনার্ত কণ্ঠের আকর্ষণ তাকে টানতে লাগল সেই দুর্বোধ্যের দিকে, অশরীরী হওয়া সত্ত্বেও যার উপস্থিতির অনুভবে আপ্লুত হচ্ছে সে।

অপরেশ অবাক হয়েছিল। গান থামিয়ে উঠে এলো কাছে. ওর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো ! নীপা !'

নীপা মাথা নাড়ল, যার অর্থ কিছু না, কিছু নয়।

ব্রাজিল

সকালে বেড়িয়ে ফেরার সময় সপ্তাহে চারদিন বাজারে যায় কিঙ্কর দত্ত। সোম, বুধ, শুক্র, রবি—মোটামুটি এইটেই হিসেব। যেদিন যায় না সেদিন আমিষ অবশিষ্ট থাকলে ভালো, না হলে নিরামিষই চলে। এই শনিবার তবু ব্যতিক্রম ঘটল।

দেড় কে-জি ওজনের একটা ইলিশ কিনে খবরের কাগজে মুড়ে বাড়িতে ফিরে কিঙ্কর দেখল বোদ্দুরে পিঠ দিয়ে তরকারি কুটছে গৌরী। গলির মুখে বারোটা দেড়হাতি সিঁড়ি পেরোলে দোতলা, মাঝখানে দেয়াল, ওদিকে প্লাইউডের কারখানা। ওখান থেকে ওঠা নিমগাছের আড়াল ভেঙে এইমাত্র এগিয়ে এসেছে রোদ। এইরকম রোদে ইলিশ আর বঁটির ধার একই রকম ঝকঝকে দেখায়। আস্ত ইলিশটা লেজে ধরে তুলে স্ত্রীর সামনে এনে কিঙ্কর বলল, 'নাও। ইলিশ!'

'হঠাৎ!'

'আনলাম। অর্ধেকটা পাতুরি বেঁধে পরিমল বোসের বাড়িতে পাঠিয়ে দিও সমুর হাতে। বলেছিল ইলিশ ভালোবাসে—'

কিঙ্কর দত্তের বয়স সাতান্ন। রোগা নয়, মোটাও নয়; কেমন এক ক্ষয়া চেহারা। মাথার চুল পাতলা, সেইজন্যেই চওড়া লাগে কপাল, ময়লা ছোপ ধরেছে ত্বকে। মোটা ভুরুর নীচে চোখদুটো ঈষৎ বড়ো এবং স্বপ্নময়, কিন্তু যখন তখন পাতা পড়ে। নাক ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ। মুখে দু'দিন না-কামানো দাড়ি। কিছুদিন আগে অফিসে শেষ প্রোমোশন ফস্‌কে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে রিটায়ারমেন্টের বয়স আসন্ন, দায় অনেক, কিন্তু সঞ্চয় সামান্য। যদি বেশিদিন বাচে তাহলে দারিদ্র কুরে খাবে। এই ভাবনা থেকেই বাড়িতে আতঙ্ক ছড়ায় সে, ব্যয়সঙ্কোচে মন দেয় এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে একদিন অন্তর দাড়ি কামাতে শুরু করে। আজ তার দাড়ি কামানোর দিন।

গৌরী দেখল রোদ পড়ে চিকচিক করছে কিঙ্করের দাড়ির খোঁচগুলো। যদিও জুন মাস এবং গরমকাল, তবু রোদের আভা শীতের কান্তি এনেছে ওর মুখে। কান্তি, না বিষণ্ণতা? প্রশ্নটা উঠেই হারিয়ে গেল। মনে পড়ল কাল রাতে ভালো ঘুমোয়নি লোকটা, চার পাঁচবার বাথরুমে যায় এবং ঠিকঠাক ভোর হবার আগেই উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। গৌরী এগুলোকে দুশ্চিন্তার ফল বলেই চিনত। সকালে মর্নিং ওয়াকে বেরুবার তাড়া দেখেও বোঝেনি কিছু। ইলিশটা তাকে বিমূঢ় করে দিল।

'অনেক দাম তো!'

'ষাট করে। পঞ্চাশেই দিল। ছোকরা ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। আজ কিন্তু ব্রাজিলকেই সাপোর্ট করছে। বলল জিতবেই। নিয়ে নিলাম।'

গৌরীর মুখে তারতম্য ফুটল না। হতবাক দৃষ্টি কিঙ্করের মুখের ওপরেই নিবদ্ধ রেখে অন্যমনস্ক হাতে বন্ধ করল বঁটিটা। ইলিশবাবদ কতো টাকা গচ্চা গেল এবং এরপর কোন কোন খরচে টান পড়বে ভাবতে ভাবতে বলল, 'শুধু খেলার মোহে?'

'মোহ বলছ কেন! ধরে নাও শ—', কথাটা শেষ করার আগেই থেমে গেল কিঙ্কর। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ করল। এটা তার সাম্প্রতিক রোগ। তারপর রোদের দিকে তাকিয়ে দম নিয়ে বলল, 'পুষিয়ে যাবে—'

কিঙ্কর-গৌরীর কথাবার্তার মধ্যেই দু ঘরের একটি থেকে বেরিয়ে এলো তাদের ছোট মেয়ে রত্না। ছেলে সমুও। মাধ্যমিক দিয়ে সে এখন রেজাল্টের অপেক্ষা করছে। মেঝেয় নামানো ইলিশটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কিন্তু একটু বেশি বেট নিচ্ছ, বাবা!'

'কেন !'

'কাগজে লিখেছে জেতার চান্স ফিফটি-ফিফটি। ফ্রান্সের মিডফিল্ড ভীষণ স্ট্রং। প্লাতিনি, টিগানাবা জ্বলে উঠলে--'

'জ্বলতে দিলে তো ! কাগজে ওমনি লেখে। ব্রাজিলের জাত আলাদা—সক্রেটিস, কারেকা—। দেখেছিস তো আগের দিন, জোসিমার নামের ওই নতুন ছেলেটা—'

'ওরা ইউরোপীয়ান কাপ জিতেছে। ভেরি স্ট্রং—'

'রাখ, রাখ। ইউরোপীয়ান কাপ ! জুনিয়র, সিজাররা পেছনে লাগলে প্লাতিনিব বাবাও কিছু করতে পারবে না।' সামান্য উদ্ধত হয়েও চকিতে নেমে এলো কিঙ্কর। অনিশ্চিত গলায় বলল, 'শুধু জিকোটাই যদি ফর্মে থাকত !'

কিঙ্করের বলার মধ্যে কিছু ছিল যা সবাইকেই চুপ করিয়ে রাখল। সেই মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অ্যাডহেসিভের গন্ধ মেশানো কাঠ চেরাইয়ের শব্দ।

কিঙ্কর এগিয়ে গেছে সিঁড়ির লাগোয়া এক চিলতে বারান্দায়। ঘাড়টা কারখানার দিকে নোয়ানো।

সমু দেখল ঘাড়ের চুল সাদা হয়ে গেছে বাবার। তার মানে বুড়ো। এই বয়সে খেলা নিয়ে কেউ এমন ক্ষেপে ওঠে কি না জানা নেই। বাড়িতে টি-ভি নেই বলে খেলা দেখছে পবিমল বোসের বাড়িতে। মুখে সাবাক্ষণ ব্রাজিল, ব্রাজিল। সেদিন জোসিমারের শটটা গোলে ঢোকার মুখে উত্তেজনায় 'গোল—' বলে চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে পা ছুঁড়েছিল আচমকা। লাথির ধাক্কায় পবিমল বোসের সোফার সামনে রাখা টেবিলের কাচ সরে যায়। সেটা জায়গায় আনতে আনতে পরিমল জিজ্ঞেস কবে, 'নিজেও খেলতেন নাকি ?' কিঙ্কর জবাব দিতে পারেনি। নিজের ব্যবহারে নিজেই অপ্রতিভ, টি-ভি'র আলোয় বাবাকে অসম্ভব হেরে-যাওয়া লাগছিল তখন। এখনো লাগছে। চাব বছব আগে সে ছিল ছোট। ব্রাজিলকে নিয়ে বাবার এই লাফালাফি তখন চোখে পড়েনি।

গৌরী উঠে গেছে রান্নাঘরে। উবু হয়ে বসে ইলিশ দেখছে রত্না। সমু কিঙ্কবকে।

'ফর্মে থাকলে কি তেলে সান্তানা বসিয়ে বাখত ওকে।'

কিঙ্কব দত্ত জবাব দিল না। দৃষ্টি দূবে। ছেলের কথাটা কানে তুলল কি না বোঝা গেল না। শুধু যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে এসে দেয়ালের গায়ে রাখা মোড়াটা টেনে বসে ক্ষিপ্র হাতে পেট চুলকোতে লাগল।

গৌরী ফিরে এলো। কিঙ্করের হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে মাছ ও বঁটিটা তুলতে তুলতে বলল, 'ক' পিস পাঠাবে ওদেব ?'

'দ্যাখো না ক'পিস হয়। খান দশ বারো—পার হেড দুটো করে হলেই হলো—'

'আমাদেরও দু'পিস কবে হওয়া উচিত।' রত্না বলল, 'বাবা, পুঁইশাক এনেছ নাকি ? মুডোটা তো বাড়িতেই থাকবে !'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কিঙ্কর। মেয়ের প্রশ্নটা ধর্তব্য নয়, সুতরাং এড়িয়ে গেল। কিছু একটা হিসেব করে স্ত্রীকে বলল, 'দশ পিস পাঠালেই চলবে। গাদা, পেটি মিলিয়ে দিও। দেড়কে জিতে পিস কুড়ি ঠিকই বেরুবে—।' বলতে বলতে থামল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু প্রশ্ন কিছু বা স্বগতোক্তি মিশিয়ে বলল, 'শনিবার কি কালিঘাটে ভিড় হয় খুব ?'

কেউই জবাব দিল না। সমবেত দৃষ্টিগুলি কিঙ্করের মুখের ওপর থেকে ফিরে এলো শুধু।

সেজন্যে সামান্যতম বিচলিত হলো না কিঙ্কর। রোদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই চা-টা শেষ করল। পেটে ও ধুতিতোলা পায়ের গুলিতে হাত বুলিয়ে, পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে বাথরুমে ঢোকার আগে খুশির গলায় ছেলেকে বলল, 'সম্রাটবাবু, মাছটা হয়ে গেলে ঝটপট পৌঁছে দিও পরিমলের বাড়িতে। বলেছে এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই টি-ভি ফিট করে দিয়ে যাবে ওর দোকানের লোক। কালার সেট। ঠিকঠাক চলছে কি না দেখে নিও।'

কিঙ্কর যতোক্ষণ না সম্পূর্ণ আড়াল হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত ওকে লক্ষ করে রত্না বলল, 'আজ তো তাহলে বাংলা সিনেমাটাও দেখা যাবে !'

'থাম তো !' আঁশ তোলা হয়ে গিয়েছিল। বঁটির ধারে ইলিশের ধড়মুড়ো আলাদা করে গৌরী বলল, 'ভিক্ষে করে চেয়ে আনা টি-ভি—কাল সকালে আবার খুলে নিয়ে যাবে। নিজেদের সেট হলে এসব আদিখ্যেতা মানাতো !'

গৌরী সাহস খুঁজছে। এরপর হয়তো আরও কিছু বলবে। স্বভাবটা জানা।

কিঙ্কর দত্ত কথাগুলো শুনল এবং হজম করে নিল। তবু আয়নায় প্রতিফলিত মুখের দৈন্য এড়াতে পারল না। বুকের সামান্য আলোড়নও। সাবান মাখা গালে ক্ষুর টানতে টানতে লক্ষ করল সাদার ওপব দিয়ে অল্প জ্বালা নিয়ে আসছে ঘোলা লালের আভা—সেদিন ছেলেকে নিয়ে পরিমল বোসেব টি-ভিতে ব্রাজিলের শেষ খেলাটা দেখার আগে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে যেমন দেখেছিল। ফেরার সময় লোডশেডিংয়ে হোঁচট খেয়েছিল সিঁড়িতে। ছেলে ততোক্ষণে নেমে গেছে নীচে, পরিমল না ধবলে গড়িয়ে পড়ত। দবজা বন্ধ করার আগে পরিমল বলল, 'খেলা দেখার এতো শখ বললেই পারতেন। দোকানে অনেক সেট পড়ে আছে, একটা লাগিয়ে দিতাম।'

'দেবে ?'

'কেন দেবো না ! এরকম কতো সেটই তো এর ওর বাড়িতে যাচ্ছে। খেলা শেষ হলে খুলে নিয়ে আসবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ভাই।' কিঙ্কর তখনই একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলে, 'শুধু ছেলেমেয়েই নয়, তোমার বৌদিও খেলা-পাগল। ওই ফুটবল আর কি ! তুমি ঠিকই ধরেছ—এককালে আমিও খেলতাম। ওই আব কি—স্কুলে—'

মাঝখানে ছ'টা বাড়ি পেরোলে তাদেব বাড়ির গলি। লোডশেডিংয়েব রাস্তায় ছেলের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে কিঙ্কব বলেছিল, 'খেলার ক'দিন বাড়িতে বসে টি-ভি দেখলে কেমন হয় ?'

'কিনবে ?'

'না। যদি ধাবে পাই ! পরিমল বলছিল—'

সমু জবাব দেয়নি। এরপর কথা এগোয়নি আর। কিন্তু ভাবনাটা থেকেই যায়।

কিঙ্কর দত্ত জানে কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা মিশিয়েই জীবন ; সে বানিয়ে বললেও পরিমল বোস যে সত্যিই দয়া দেখাতে চাইছে তাকে তা নাও হতে পারে। হয়তো টি-ভি ধার দিতে চায় তাকে এড়ানোব জন্যেই। কথাটা বলবার পরেও যদি না দেয় তাহলে আবার উপযাচক হয়ে খেলা দেখতে যাওয়া যাবে না। এই সন্দেহ থেকেই কাল অফিস-ফেরত গিয়েছিল ওর দোকানে। আড়াল পেয়ে বলেছিল, 'যদি অসুবিধে হয় তাহলে পাঠানোর দরকার নেই। একটা খেলা না হয় না-ই দেখলাম—'

'আবে না-না।' পরিমল বলল, 'খেলা তো কাল। আমি বলে দিচ্ছি—'

ইলিশ খাওয়ানোর আইডিয়াটা তার পরেই ঢুকে পড়ে মাথায়। একবার বলার পর আরও একবার বলা যাবে না, তবে সময়মতো সবষে-পাতুরি পৌঁছুলে রিমাইন্ডারের কাজ হবে। সারা রাত ভাবল। খেলাটা একদিনেরই নয়। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনালে পৌঁছুতে সাত-আট দিনের ধাক্কা। দয়াব জিনিস ওমনি-ওমনি ধরে রাখা যায় না, ভেবেছিল ইলিশের ঘুষ পরিমলেরও চক্ষুলজ্জা বাড়াবে, সহজে ফেরত চাইতে পারবে না। তবে ব্রাজিল খেলছে বলেই এইসব।

গালের কাটা জায়গায় ফিটকিরি ঘষতে ঘষতে কিঙ্কর দেখল, সামনে ফ্রান্সের গোল, উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে ওদের গোলকিপার জোয়েল বাত্স, আর গোটা এরিয়া জুড়ে নিপুণ ছন্দে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা সবুজ শর্টস, হলুদ জার্সি। ডানদিক থেকে লব করা বলটা কোনাকুনি ছুটে যাচ্ছে পেনাল্টি বক্সের দিকে। ওখানে সক্রেটিস, অ্যালমাও, এডিন্হো, কারেকা। সম্ভবত মাথা ছোঁয়াবে। গোল হবেই। ভাবতে ভাবতে জ্বরে-জাগা অনুভূতি নিয়ে কাঁপতে লাগল সে।

অনুভূতিটা ক্রমশ ছেয়ে ফেলল তাকে। সামান্য গম্ভীরও করে তুলল। চারদিকে ইলিশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে মনে পড়ল গৌরী কী বলেছিল, ইলিশটার দিকে তাকিয়ে কীরকম হতাশায় ভরে উঠেছিল ওর মুখ। প্রশ্নটা তখনই করে। শুধু খেলার মোহে ! এমনও হতে পারে, অনেকদিন ইলিশের স্বাদে বঞ্চিত এই বাড়িতে ইলিশের আবির্ভাবের উপলক্ষটা মেনে নিতে পারেনি গৌরী ; অর্ধেকটা পরিমল বোসের

বাড়িতে চলে যাবে, সেজন্যেও হতে পারে। হিসেবি মন এর বেশি বোঝে না। ওই ঝাঁঝ থেকেই সম্ভবত ভিক্ষে করে টি-ভি আনার কথাটা বলেছিল। ভিক্ষাই কি ? নিজের মনেই প্রশ্নটা বাজিয়ে নিতে নিতে কিঙ্কর ভাবল, প্রস্তাবটা নিজেই দিয়েছিল পরিমল, সে শুধু মেনে নেয়। ইলিশ না দিলেও মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা থেকে যেত। তাহলে ভিক্ষা কেন !

গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের তেল মেখে খেতে খেতে কথাটা তুলল কিঙ্কর।

'কিছু করার জন্যে উপলক্ষের দরকার হয়। ব্রাজিল সেদিন হেরে গেলে খেলা দেখার বাতিক চাপত না। তাহলে টি-ভি'রও দরকার হতো না—'

গৌরী জবাব দিল না। চামচ দিয়ে বাটি থেকে আরও খানিকটা তেল তুলে পাতে দিতে হা-হা করে উঠল কিঙ্কর। তারপর বলল, 'খালি হাতে কিছু নিতে সম্মানে লাগে। পরিমল কাছের লোক, ভাড়া তো আর দেওয়া যায় না, তাই—'

'ব্রাজিল কোথায় ?'

'দক্ষিণ আমেরিকায়। সে এক আশ্চর্য দেশ !' কিঙ্করের চোখ দুটো আরও বড়ো হয়ে দেয়াল পর্যন্ত ছুটে গেল। টি-ভি রাখার জন্যে এখন থেকেই ওখানে জায়গা করে রাখছে সমু। পর্দায় হলুদ জার্সি ভেসে উঠল পর পর। ওরা মাঠে নামছে। এরপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। দৃঢ়বদ্ধ মুখের সঙ্গে একে একে ফুটে উঠবে নামগুলো। সেদিকে তাকিয়ে কিঙ্কর বলল, 'পেলে, গ্যাবিঞ্চা, টোস্টাও, জয়াবজিনহোর দেশ—ওরা হারতে জানে না—'

'হেরেছে।' সমু হঠাৎ বলল, 'লাস্ট দুটো ওয়ার্ল্ড কাপে কিছুই করতে পারেনি—'

'তুই কি ফ্রান্সের সাপোর্টার !'

কিঙ্করকে উত্তেজিত হয়ে থেমে যেতে দেখে গৌরী বলল, 'তোর অতো ফোড়ন কাটার দরকার কী, সমু !'

'ফোড়ন কেন কাটব ! যা সত্যি তাই বললাম। তুমি শুধু শুধুই রেগে যাচ্ছ, বাবা।'

'বাগিনি।' নিজেকে সামলে নিয়ে কিঙ্কর বলল, 'দু'বার পারেনি বলে কি এবারেও পারবে না ! রাত্রেই দেখবি।'

রাস্তায় নেমে নতুন দ্বিধায় জড়িয়ে পড়ল কিঙ্কর। সোজা অফিসে যাবে, নাকি কালিঘাট হয়ে যাবে ? অফিসে এখন অ্যাটেনডেন্সের কড়াকড়ি হয়েছে। নতুন ম্যানেজার দীপেন সেন লোকটা খুব স্ট্রিক্ট, পনেরো মিনিট গ্রেস দেবার পর অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার তুলে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। সই করতে হয় ওখানে ঢুকে। না তাকিয়েও টের পাওয়া যায় দুটি ধারালো চোখ ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে পিঠের কুঁজদুটো। তখন এমনভাবে বেরুতে হয় যাতে চোখাচোখি এড়ানো যায়। লোকটা হারামি। এই অফিসে জুনিয়র হয়ে এসেছিল সতেরো-আঠারো বছর আগে, তখন থেকেই বিষদাঁত দেখাচ্ছে। লেজারের এন্ট্রিতে ভুল হওয়ায় একবার ঘরে ডেকে দুরমুশ করেছিল তাকে। চিনতও না ঠিকঠাক। হঠাৎই জিজ্ঞেস করে, 'কিঙ্কর মানে কি ?'

আকস্মিক প্রশ্নে হতচকিত, পিতৃদত্ত নামটা বুকে আঁকড়ে ধরে কিঙ্কর বলেছিল, 'শিবের অনুচর—'

'তাহলে তো মিলেই যাচ্ছে ! যে ধরনের ভুল করেছেন তা মানুষ গাঁজা-ভাঙ খেয়েই করে।'

ঘটনাটায় সে এমনই বিপর্যস্ত বোধ করেছিল যে তাল সামলাতে না পেরে বাড়ি চলে যায়। পরের দিন আবার ডেকে পাঠায় লোকটি এবং বলে, 'ডিক্শনারি দেখলাম। কিঙ্কর মানে ভৃত্য বা চাকর—'

কিঙ্কর জবাব দিতে পারেনি। ওর হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীপেন সেন বলে, 'না বলে চলে যাওয়াটা পানিশেব্‌ল্ অফেন্স। কাল আপনাকে অ্যাবসেন্ট করা হয়েছে। এরপর এমন করলে শো-কজ দিতে হবে—'

লোকটা যে পিছনে লেগেছে সেদিনই বুঝতে পেরেছিল তা। তখনো ইউনিয়ন জোরালো হয়নি অফিসে, কমপ্লেন করলে পাছে আর কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সেজন্যে অপমানটা নিজের মধ্যেই চেপে রেখেছিল সে। কিন্তু ভুলতে পারেনি। গৌরী তখন তৃতীয়বারের পোয়াতি। দুই মেয়ের পর ছেলে হলে কোনো বিড়ম্বনায় না গিয়ে ছেলের নাম রাখে সম্রাট। ভয়টা যায় না তবু। এর কিছুদিন পরে

লোকটি বম্বেতে বদলি হওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সতেরো বছর পরে প্রোমোশন পেয়ে যখন আবার ফিরে এলো নতুন ম্যানেজার হয়ে, কিঙ্কর তখন বুড়ো। প্রাপ্য গ্রেড প্রোমোশন আটকে দিল এফিসিয়েন্সির অভাবজনিত অজুহাতে। ডিপার্টমেন্টাল হেড দ্বিজেন বক্সী দীপেন সেনের কাছের লোক, তাকে ধরেও কিছু না হওয়ায় কিঙ্কর ধরে নেয়, রিটায়ারমেন্টের পরেও যে কোম্পানির ইচ্ছেয় কেউ কেউ এক্সটেনসন পায় এই অফিসে, তার বেলায় সেটা জুটবে না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। মেক্সিকোয় ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়েছে, সেই নিয়ে আলোচনাও, গভীর রাত পর্যন্ত টি-ভি দেখে অনেকেই অফিসে এসে ঝিমোয় ; ডিপার্টমেন্টের দিলীপ ব্যানার্জি একদিন সামনে এসে দাঁড়াল।

'কিঙ্করদা, আপনার তো ফুটবলে দারুণ ইন্টারেস্ট। ওয়ার্ল্ড কাপ কে জিতবে বলুন তো ?'

দিলীপ পাকা খেলোয়াড়, ফার্স্ট ডিভিসনে রাজস্থান না কোথায় খেলেছিল এক বছর। সেই সুবাদে চাকরি। এখন বয়স হয়ে গেলেও অফিস টিমে খেলে। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় তাকে টিকিট জোগাড় করে দিয়েছিল দুটো, তাই নিয়ে সে ও সমু জীবনে প্রথম যুবভারতীতে ঢোকে। ছেলেটি ভালো, বেশ মিশুকে, স্পোর্টিং টেম্পারামেন্ট। প্রশ্নটা তাকেই করছে দেখে খুশি হয়ে কিঙ্কর বলল, 'কেন ! ব্রাজিল ! ব্রাজিলই জিতবে—'

'আস্তে, আস্তে।' আশপাশে তাকিয়ে সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল দিলীপ ; মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'এতো উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন !'

'কী ব্যাপার বলবে তো !'

'সেদিন বলছিলেন না সেনসাহেব আপনার ওপর খাপ্পা, এক্সটেনসন দেবে না ?'

কিঙ্কর তাকিয়েই থাকল।

'আজ ডেকেছিল।' দিলীপ বলল, 'ফোরকাস্ট করতে বলল। আমিও বলেছিলাম ব্রাজিল। শুনে বলল, 'বাজি রাখুন। ফ্রান্স কিংবা আর্জেন্টিনা—'

'শালা কিছুই বোঝে না।'

'না বুঝুক। শুনলাম, যে ঘরে ঢুকছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে। আপনিও চান্স নিয়ে একটু তোল্লাই দিন না ! খেয়েও যেতে পারে—'

কিঙ্কর একটু ভাবল, তারপর সংশয়ের গলায় বলল, 'যদি না খায় !'

'খাবে, খাবে। এভাবেই খায়। বলেন তো আমি গিয়ে বলছি আপনিও সায় দিয়েছেন—'

'না, না। সেটা ঠিক হবে না।' কিঙ্কর পিঠ খাড়া করে বসল, 'ব্রাজিলকে হারাবো !'

'আপনি অবুঝ। ব্রাজিল জিতল কি হারল তাতে আপনার আমার কী।'

খানিক থমকে থাকল কিঙ্কর। চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে দিলীপকে দেখল। তারপর বলল, 'মাফ করো। আমি ওর চাকর হতে পারি, ব্রাজিল নয়। ব্রাজিলই জিতছে ! জেতার পর যাবো।'

দিলীপ উঠল না। খানিক অপলক কিঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি অদ্ভুত লোক ! ব্রাজিলকে এমন ফ্যানাটিক্যালি সাপোর্ট করার কারণ কি ?'

'কারণ— ?' আর এগোতে না পেরে কিঙ্করের মুখে সেই ছায়া ফুটল যা তাকে প্রায়ই দিশেহারা করে দেয়। সময় নিয়ে বলল, 'কেন বলো তো ! কেন মনে হয় ব্রাজিল আমারই দল, যারা আমাদের মতো—'

'আশ্চর্য !'

এসব মনে পড়ায় তার পক্ষে অস্বাভাবিকভাবে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কিঙ্কর দত্তের। অফিসে যাবার জন্যে বাসে উঠেও নেমে গেল মধ্যপথে। প্রায় ঘোরের মাথায় কালিঘাটে গিয়ে পুজো দিল এবং আবার বাসে উঠে কপালের চ্যাটচেটে সিঁদুরে হাত বুলিয়ে রঙিন আঙুলটা চোখের সামনে এনে ভাবল, প্রায় দেড়ঘণ্টা দেরির জন্যে সম্ভবত আজও সে অ্যাবসেন্ট হবে। বাসে কয়েকজন আজকের খেলার সম্ভাব্য ফল নিয়ে আলোচনা করছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতে শুনতে কিঙ্কর অনুমান করল ব্রাজিলই ফেভারিট। জিতছেই। একটা সীট খালি হতে বসতে বসতে সিদ্ধান্ত নিল, যে মার খাবার

জন্যেই এসেছে, একটা দিন অ্যাবসেন্ট হওয়া না-হওয়ায় তার কী যায় আসে। বরং ব্রাজিল জেতার পর লোকটার সামনে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারবে। এসব ভেবে বাইরে তাকিয়ে উদাসীন হয়ে গেল কিঙ্কর দত্ত। ভাবল, ব্রাজিলকে ভালোবাসি কেন? জবাব পেল না। তখন ভাবল, সমুকে ভালোবাসি কেন! এইভাবে তার চোখদুটো জলে ভরে এলো।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অফিসে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কিঙ্কর। দীপেন সেন আজ অফিসে আসেনি, সুতরাং লেট হবারও সম্ভাবনা নেই। ধীরেসুস্থে টেবিলে বসার পর সামনের টেবিলের তপন ঘোষ জিজ্ঞেস করল, 'কেন আসেনি জানেন তো?'

'কেন?'

'লিভারের পেন।'

কিঙ্কর জবাব দিল না।

'অফিসের অ্যাকাউন্টে যে-বেটে মাল খায়, লিভারের পেন তো হবেই—'

আকণ্ঠ জল গিলে জলের গ্লাসটা নামাতে নামাতে কিঙ্কর বলল, 'লিভারের পেন, না ভয়? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো। কাল সকালে হাগতে শুরু করবে। ওসব অজুহাত—'

কথাটা শেষ করার আগেই চোখ গেল দ্বিজেন বক্সীর দিকে। ঠোঁটে কলম ঠেকিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। সম্ভবত টিপ্পনি কাটা উচিত হয়নি তার। দ্বিজেন লাগাতে পারে।

অস্বস্তি কাটানোর জন্যে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল কিঙ্কর। লেজারের ওপরেই চোখ রেখে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'খেলা দেখছ না?'

'দেখছি না আবার!' তপন বলল, 'পাড়ার ছেলেরা পটকা বেঁধে করে রেখেছে। আজ আমাদের বৈঠকখানায় টি-ভি ফিট করিয়েছি। ওখানেই দেখবে। ব্রাজিল জিতলেই ফাটাবে—'

একটা তেজী ভাব ফুটে উঠেছে তপনের মুখে। নিজের বাড়িতে টি-ভি আনার কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল কিঙ্কর দত্ত। চোখ সরিয়ে নিল দূরে। বড়ো কাচের জানলার ওদিকে আকাশ। নীলে চমৎকৃত শূন্যতা ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদে। ওই দৃশ্য কিছুই বোঝায় না, কিন্তু টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলল, 'আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা!'

'হ্যাঁ। দশ, এগারো।' তপন একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ওঃ! আজ যদি ওই গুয়াদালাজারায়, জালিসকো স্টেডিয়ামে থাকতে পারতাম।'

কথাটা শুনেই বুকের মধ্যে কিছু একটা পাশ কাটিয়ে গেল কিঙ্করের। নিঃশ্বাস নিল এবং ছাড়ল। তারপর গভীর গলায় বলল, 'সব স্বপ্ন কি সফল হয়। তবে কিছু কিছু স্বপ্ন নিশ্চয়ই হয়। এখন শুধুই রাতের অপেক্ষা—'

সেদিন গভীর রাতে টাইব্রেকারের শেষ গোলটিতে ব্রাজিল হেরে যাবার পর পরিমল বোসের দেওয়া টি-ভির সামনে বসে কিঙ্কর দত্তের পরিবারের হতচকিত তিনটি মানুষ দেখল, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ করেছে কিঙ্কর, কিছু বলার জন্যেও হয়তো, অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা শব্দ ভেঙেচুরে দিচ্ছে ওর সাতান্ন বছরের মুখের রেখাগুলো। মাঠে তখন শুধুই ফ্রান্স, জয়োল্লাসে দৃপ্ত তাদের হাঁটাচলা ও আলিঙ্গন পর্দায় কাঁপন তুলে আলো ফেলছে কিঙ্করেরও মুখে। কিঙ্কর দত্তের ছেলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা অফ করে দিতেই সেখানে একই সঙ্গে নেমে এলো অন্ধকার ও স্তব্ধতা।

সোনার ঘড়ি

বাড়ি ফিরে হাত থেকে ঘড়ি খুলতে খুলতে সময় দেখে অবাক হলো দেবদত্ত। মাত্র ছ'টা পঁয়ত্রিশ।

কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের মিটিং সেরে যখন বেরিয়ে আসে তখনই ছ'টা দশ। নন্দন সেন ও অজয় মান্নার সঙ্গে এরপর সে রওনা হয় বাসস্টপের দিকে। সেখানেও কাটে কিছুক্ষণ। তারপর বাস আসে এবং উঠে পড়ে। পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে পৌঁছে দেবে এমন কোনো বাস কলকাতায় নেই। তা ছাড়া, এদিকের বাসস্টপ থেকে বাড়ি পৌঁছুতে কতো সময় লাগে সে-সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা আছে তার। সাতটা পঁয়ত্রিশ হলেও অবাক হতো না। কিন্তু ছ'টা পঁয়ত্রিশ কেন!

ঘড়িটা চোখের সামনে এনে দেখল সেকেণ্ডের কাঁটাটা ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু বেশ আস্তে, থেমে থেমে। তার মানে বন্ধ হয়নি। দেখতে দেখতেই বাইশ ক্যারাট সোনার গোলাকৃতির চাপা ঔজ্জ্বল্য চোখে উঠে এলো তার। দামি ওমেগা। সতেরো বছর আগে বিবাহসূত্রে রিণাকে ছাড়াও সে যা যা পায় এবং পেয়ে তৃপ্ত হ', এই ঘড়ি তার একটি। সতেরো বছরে যা যা হারিয়েছে তার মধ্যে রিণার প্রতি গোপন আকর্ষণ এবং জীবন সম্পর্কে সাবলীল আগ্রহ থাকলেও ঘড়িটা নেই। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশাগুলোকেও কি ধরা যায় না কাঁটার মাপে! ঠিক ক'টা বাজছে এখন? প্রশ্নটা এলেও ভাবতে হলো না। এই সময় টি-ভি নামের একটি বিরক্তি চারদিকে একই শব্দের তরঙ্গ বিস্তার করতে সে বুঝতে পারল, সাড়ে সাতটা।

স্বামী বাড়ি ফিরলে স্ত্রীও আসে। দু আঙুলের চেষ্টায় ঘড়ির কাঁটাগুলোকে এগিয়ে দিয়ে দেবদত্ত ভাবল যেমন চলছে চলুক, সুবিধেমতো একদিন দোকানে দিলেই হবে।

এটা ওদের বেডরুম। রিণা বলল, 'ফিরতে দেরি হলো!'

'হ্যাঁ।'

'এখন তো ক্লাশটাশ হচ্ছে না!'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল দেবদত্ত। ততোক্ষণে চারিদিকের শব্দ ও নৈঃশব্দে কান রেখে অনুমান ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। রিণার উপস্থিতিকে শব্দ ধরে নিলে এ বাড়িতে আর যে-শব্দে অভ্যস্ত সে, সেটা আসছে নীচে, রান্নাঘর থেকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পেয়েছিল বয়স্কা ও বিধবা সুশীলাকে। আজকাল কোমরের বাতে ভোগে প্রায়ই। সুতরাং, এখন অন্তত তার ওপরে উঠে আসার সম্ভাবনা নেই। কোনো অতিথি এলে বোঝাই যেত।

নিস্তব্ধ মানুষের গলা কখনো বা ষড়যন্ত্রকারীর মতো শোনায়। স্ত্রীকে সামনে রেখে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে?'

'সোমা। ছেলেকে নিয়ে।'

'মানে!'

'পরে বলব।'

সোমা রিণার মাসতুতো বোন। ওর ছেলের বয়স দশ এগারো, নাম পুনপুন। আট বছর বয়সে রিণার মা মারা গেলে ওর মাসী ওকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লিতে, রিণার বাবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে এর পর আর অসুবিধে হয়নি। এই লোকটিকে কখনোই দেখেনি দেবদত্ত। রিণা ক্রমশ তার মাসীরই মেয়ে হয়ে যায়। মাসতুতো বোন সোমা, সুতরাং, রিণার নিজেরই বোন। সতেরো বছর ধরে দেবদত্ত এইরকমই দেখছে।

দেবদত্ত স্ত্রীর দিকে তাকাল। শার্টের বোতাম খুলতে যেটুকু সময় লাগে নিয়ে বলল, 'এখনই বলতে কী অসুবিধে!'

ওদিকের যেসব শব্দ অনুমানগ্রস্ত করে তুলেছিল দেবদত্তকে এতোক্ষণে থেমে গেছে তা। স্বামীকে পায়জামা পাঞ্জাবি এগিয়ে দিতে দিতে রিণা বলল, 'একটা মেজর গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে—'

'কীরকম!'

'শ্যামল আজ সকালে পুনপুনকে মারধর করছিল। সোমা বাধা দেওয়ায় ওর গায়েও হাত তুলেছে।

দেবদত্তর দু হাতে পায়জামার দু দিকের দড়ি ধরা। বাঁধতে গিয়েও না বেঁধে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটাকে মারল কেন?'

'জানি না।' মুদ্রাদোষ কাটিয়ে রিণা বলল, 'ও নাকি শ্যামলের ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে চকোলেট কিনেছিল—'

'এইজন্যেই!'

দেবদত্তর কথার তীক্ষ্ণতা অনুভব করে সহজেই অসহায় হয়ে পড়ল রিণা।

'তুমি তো সবই জানো। রাগটা এখন বাচ্চাটার ওপরেও পড়ছে। সারাক্ষণ গেট আউট গেট আউট করলেও এতোদিন সোমার গায়ে হাত তোলেনি—'

'স্ত্রীর সুন্দরী হওয়াটা তাহলে প্রোটেকটিভ ফ্যাক্টর নয়।' পাঞ্জাবিটা গায়ে গলানোর আগে দু হাতে বুকের রোম ঝাড়ল দেবদত্ত। বুকে চোখ নামানো ভঙ্গিতেই বলল, 'চলে আসাটা ঠিক হয়নি। এতে শ্যামলের জোরই বাড়বে। যাকে চাইছে তাকেই ঘরে এনে তুলবে। তা ছাড়া—'

যে বলছে এবং যে শুনছে, সাধারণত এই সময় দুজনেব দৃষ্টি বিনিময় হয়। যেন দুজনেই জানে কথাগুলো কী, দুজনেই পরবর্তী শব্দগুলির বিস্ফোরণ এড়াতে চেষ্টা ও মিনতি কবছে।

দেবদত্ত বলেই ফেলল।

'এরপর যাবে কোথায়?'

'মানে?'

'বুঝছ না!'

দেবদত্তর চাপা গলার দূরত্ব হাত দেড়েক দূরে রিণা যেখানে দাঁড়িয়ে তার বেশি এগোয় না। রিণা শক্ত হলো তবু। অভিমানে অনুযোগ মিশিয়ে বলল, 'একবেলাও যায়নি ওরা এসেছে। এর মধ্যেই এসব কথা তুলছ! আমার বোন আমার কাছে আসতে পাববে না!'

'আস্তে—!' রিণার সতর্কতা ভাঙার উপক্রম হতে দেবদত্ত নিজেই সতর্ক হলো। বলল, 'প্রশ্নটা আমার নয়। ওর মনেই ওঠা উচিত ছিল। তাই বললাম। আমি অমানুষ নই—আমাকে জড়ানোর দরকার নেই—'

আটচল্লিশে পৌঁছুনো, শিক্ষিত ও মার্জিত দেবদত্ত ব্যানার্জির আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র। এটা সে দেখাতেও অভ্যস্ত। কথাগুলো ঘুরিয়ে নিলেও অস্বস্তি এড়াতে পারল না। রিণা যে-সন্দেহই করে থাকুক, সে যে সত্যি-সত্যিই অমানুষ নয় এটা প্রমাণ করবার জন্যে এরপর তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

নিলও তাই। বাড়িতে ফেরা এবং স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার মিনিট দশেকের মধ্যেই পুনপুনের মাথার চুলে বিলি কেটে আদর করল সে। ওপরের তিনটি ঘরের শেষেরটিতে এরই মধ্যে ওদের বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে রিণা, সেখান থেকে সলজ্জ এবং অবশ্যই অপমানিত ও দ্বিধাজড়িত সোমাকে নিজেই খুঁজে নিল। এসব করায় যদি বাড়তি উৎসাহ প্রকাশ পেয়ে থাকে তার দায়িত্ব নিশ্চয়ই দেবদত্ত নেবে না। সতেরো বছরের মধ্যে গোড়ার দিকের বছর চারেক বাদ দিলে গত বারো তেরো বছর ধরে, অর্থাৎ শ্যামলের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই সোমাকে সে দেখছে নিয়মিত। সোমা সুন্দরী এবং মাপে মাপে যুবতী, নিজের বিয়ের সময় থেকেই এটা লক্ষ করেছিল দেবদত্ত; পুনপুনের জন্মের পর সে আবিষ্কার করে সোমার মধ্যে আরও এমন কিছু আছে যা রিণার মধ্যে নেই। রিণার অভাব ক্রমশ তাকেও স্পর্শ করে এবং তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের ভিতর থেকে সেই ব্যাপারটিই চলে যায়, দেবদত্ত যেটাকে গোপন আকর্ষণ বলে ভাবে। আপাতত সোমাকে তার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে আনতে দেবদত্ত

ভাবল, এব মধ্যে আরও একটা ব্যাপার আছে যেটা সে ঠিকঠাক ধরতে পারছে না। তা ছাড়া, বিণার দায় তারও দায় হবে কেন!

পুনপুন পড়ার বই নিয়ে বসেছে। সোমাদের ফ্ল্যাট থেকে ওর স্কুল যতো দূরে, এখান থেকে তার চেয়ে কাছে। কাল ও এখান থেকেই স্কুলে যাবে।

একসঙ্গে চা খেতে খেতে আড়ে দুই বোনকে লক্ষ করে দেবদত্ত আরও একবার বুঝল, সোমা রিণার মাসীরই মেয়ে, রিণার বয়সে পৌঁছেও তাই-ই থাকবে।এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে ওর মুখের থমথমে ভাবটুকু। তখন বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে দেবদত্ত বলল, সেল্‌ফ ডিসিপ্লিনের ব্যাপারটা মানুষের মধ্যে থেকে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। না হলে কেউ এমন করে!'

সোমা গম্ভীর হয়ে থাকল। জবাব দিল না।

'তা বলে গায়ে হাত দেবে!'

রিণার গলার আকস্মিক জোর শুনে সামান্য অবাক হলো দেবদত্ত। ইদানীং না হলেও আগে আগে, কখনো কথা কাটাকাটি হলে ধাক্কাধাক্কিও হয়েছে তাদের মধ্যে, এমন কি একবার সে চড়ও মেবেছিল রিণাকে। কতোদিন আগে! রিণা সেদিন এভাবে বলেনি।

'ওটা ইমপালসিভও হতে পারে।' দেবদত্ত বলল, 'এই ব্যাপারগুলো অনেক সময় বোঝা যায় না। কোনো কনক্লুসনে আসাও ঠিক নয়—'

'আমার জন্যে কিছু নয়, দেবুদা।' সোমা চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। বলল, 'ছেলেটাকে ওভাবে মারল কেন! আগে কতোদিন বলেছে ব্যাগে টাকা আছে, নিয়ে নে। না হয় বলে নেয়নি। ছেলেমেয়ের একটা রাইটও থাকে; চুরি তো করেনি! যখন মারল তখন ওর মুখে চকোলেট ছিল—। এমনভাবে গোঙিয়ে উঠল!'

সোমার গলায় কান্না। দেবদত্ত দেখল, চোখ মুছতে মুছতে বাকি আবেগটুকু বিণাই প্রকাশ কবছে। ছেলেমেয়ের রাইট ব্যাপারটা সে ভালো বোঝে না, ওটা জন্মে যায় হয়তো। কিন্তু, দুই বোন মিলে যা শুরু করেছে তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে!

ঠান্ডা হয়ে গেলেও কাপের বাকি চা-টুকু আস্তে আস্তে শেষ করল দেবদত্ত। এইমাত্র ছোটখাটো ঝড় উঠেছে একটা; চোখগুলো ঝাপ্‌সা, ধুলোর আবরণ আবার মাটি স্পর্শ না কবা পর্যন্ত দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে না। যে-আবেগে অর্থ নেই তা নিযে মাথা ঘামাতে ভালো লাগে না তার। ওদের সময় দিয়ে বলল, 'আমি কি শ্যামলের সঙ্গে কথা বলব?'

প্রশ্নটা সোমাকেই। জবাব না দিয়ে কনুই থেকে লম্বালম্বি তোলা হাতের তালুতে চিবুক পেতে সামান্য কাত হয়ে বসল সোমা। দেবদত্ত লক্ষ করল, ওই প্রক্রিয়ায় ওর কব্জি থেকে সোনার বালাটা নেমে এলো ত্বকের নিটোলতায়। দুটো রঙে তফাত আছে, তবু বলা যায় না কোনটা তার পছন্দ।

'তুমি কেন কথা বলবে!' রিণা বলল, 'দরকার হলে ও নিজে আসবে, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাবে ওদেব। যেচে অপমান হতে ভালো লাগবে তোমার!'

'এতে অপমানের কী আছে! একটা ভুল হচ্ছে কোথাও—যদি প্যাচ আপের চেষ্টা করা যায়—'

'প্যাচ আপ! এর পরেও প্যাচ আপ করার কিছু আছে নাকি!'

রিণার কথার উত্তরে এবারেও কিছু বলত দেবদত্ত। তার আগেই সোমা বলল, 'তুই শুধুই রাগ করছিস, দিদি। আমি কি সব কথা বলি তোদের! কারণ যেখানে এরকম, প্যাচ আপ করলেও দাগটা ফুটে বেরুবে আবার—'

সোমা থামল একটু। নিঃশ্বাস ছাড়ল শব্দ করে। তারপর বলল, 'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

দেবদত্ত সোমাকেই দেখছে। ওর চিবুক থেকে হাত সরানো, একই হাতে আঁচল টানা, ব্লাউজের ভাঁজে আঁচলের প্রান্তটুকু গুঁজে নেওয়া এবং মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হওয়া—যা যা দেখা যায়। রিণাকে উদ্দেশ করে বললেও, বুঝতে পারল, শেষের কথাগুলো তাকেই বলেছে সোমা। আশাও ছেড়ে দিয়েছে। ঘুরেফিরে তাহলে সেই প্রশ্নটাই এসে যাচ্ছে সামনে, এর পর যাবে কোথায়? রিণা নিশ্চয়ই ভাবেনি এ বাড়িতে জায়গা আছে, অর্থেরও টান নেই, সুতরাং অসুবিধেও নেই কোনো। দিল্লিতে বাড়ি

আছে সোমাদের, ওর দাদাবাও আছে, তেমন-তেমন হলে ওটাই ওব যাবাব জাযগা। কিন্তু একবেলাও হয়নি ওরা এসেছে এখানে, এখনই কি এসব ভাবা ঠিক হবে!

চিন্তা থেকেই গেল। কেন জানে না, রাত্রে বিছানায় শুযে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে শবীরে প্রবল ইচ্ছে ঢুকে পড়ল দেবদত্তর। রিণাকে কছে টানতে পাশ ফেরা থেকে এগিযে এলো ও। তাব পুবনো স্ত্রী। ঠোঁট জুড়ে চুম্বন করতে গিয়ে টের পেল রিণাব আগ্রহে উত্তাপ নেই কোনো, সুতবাং আগ্রহও নেই। লালায় জড়িয়ে যাচ্ছে থুথু ও চিবুনো পানের গন্ধ। আগেও এবকম হলে নিজেকে সজীব বেখেছে দেবদত্ত, টাল খাযনি। আজকের অনুভূতিটা অন্যবকম। ঠিক কীবকম তা বুঝে ওঠাব আগেই অনুভব কবল, ইচ্ছেটা বেরিয়ে যাচ্ছে শবীব থেকে।

রিণা বলল, 'আজ থাক। আজ মনটা ভালো নেই—'

'বুঝতেই পারছি।'

রিণা কিছু না বললেও এইবকমই হতো। অন্ধকাব সিলিংযেব দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল দেবদত্ত। উঠে, জল খেয়ে আবার ফিবে এলো বিছানায়। ঘুম আনার চেষ্টায় চোখে আড়াআড়ি হাত চাপা দিয়ে শুযে থাকতে থাকতে শুনল বাথরুমেব দরজা খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে, আবাব খুলে বন্ধ হলো আবার। রাতের নৈঃশব্দে অর্থহীন শব্দেও কেমন যেন মানে এসে যায একটা। তখন বালিশটা টেনে পাশ ফিবে শুলো ও।

পরের দিন সকালে সোনাব হাতঘড়িতে চোখ বেখে দেবদত্ত দেখল সময পিছিয়ে গেছে আবও। তবে থেমে যায়নি একেবারে। তখন দেযাল ঘড়িব দিকে তাকিয়ে ঠিক ক'টা বাজছে খেযাল কবতে কবতে কাঁটাগুলোকে ফিরিযে আনল সেই মুহূর্তে। না, ঠিকই চলছে।

'দেবুদা, আসবো?

দেবদত্ত ঘাড় ফেরালো। দরজার সামনে দু কাপ চা নিয়ে দাঁড়িযে আছে সোমা। চমৎকাব মুখশ্রীতে চাপা বিষাদ, বিন্দু না ফুটিযেও ঘাম চিকচিক করছে কপালে; ফলে সুন্দব লাগছে আবও। দু হাত জোডা থাকলে এমনিতেই অসাবধানতা এসে যায পোশাকে। ইচ্ছে করলেও এখন ও ব্লাউজেব ঘেরে আঁচল আটকাতে পাববে না।

ওকে দেখতে দেখতেই দেবদত্ত বলল, 'এসো। পারমিশান নিতে হবে কেন।'

'দেখলাম খুব মন দিয়ে ঘড়িতে দম দিচ্ছেন। তাই—'

ওটা কথার কথা। পাছে সোমা টেবিলেই নামিযে বাখে চাযেব কাপটা, সেজন্যে ওকে ঘরে ঢোকার সুযোগ দিয়ে নিজেও এগিয়ে এলো দেবদত্ত। ডান হাতেব কব্জি থেকে বালাটা কাল সন্ধ্যায় যেখানে নেমে এসেছিল এখনো সেই জায়গায়। হাত বাড়িয়ে প্লেটসহ কাপটা ওব আঙুলের স্পর্শ থেকে ছাড়িয়ে নিজের হাতে নেবার মুহূর্তে দেবদত্ত দেখল, সোমার বাঁ হাতে ধরা প্লেটেব ওপব অন্য কাপটা নাচছে। শব্দটা কাঁপার। সোমা ভাবসাম্য হাবালো না।

'দিদি কোথায়?'

'কেন! বাজারে। তোমাকে বলেনি?'

দেবদত্তর দৃষ্টি অনুসবণ করে কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সোমা। মুখ মুছল আঁচল তুলে। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল ভুলে গিয়ে বলল, 'সুশীলাই আসছিল। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয। আমিই নিয়ে এলাম।'

'সেটা তো প্রত্যক্ষ।'

'সেজন্যে নয়। দু কাপ দিল, ভাবলাম দিদিও আছে। আমি তো এই ফিবলাম।'

'স্কুল পর্যন্ত দিয়ে এলে?'

'হ্যাঁ। প্রথম দিন তো! বাসে উঠিয়ে দিলে অবশ্য তিন চার স্টপ। দেখলাম অনেক বাচ্চাই একা-একা যাচ্ছে—'

দেবদত্ত প্রথম দিন কথাটাই শুনল এবং ভাবল, তার মানে দ্বিতীয় দিন আছে, তৃতীয় দিনও থাকতে পাবে। পুনপুন মাগুর মাছ খেতে ভালোবাসে বলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেভাবে বাজাবে দৌডল রিণা,

তাতে মনে হয় তার পরের সম্ভাবনাও যাচ্ছে না। কিন্তু, এতো তাড়াতাড়ি এসব কথা ভাবা যায় না।

'দাঁড়িয়ে কেন! বোসো!'

'না। যাই।' সোমা বলল, 'আপনার তো বেরুনোর সময় হলো?'

'ওই চা-টা তোমারই। ওটুকু খেতেও সময় লাগবে। সেই সময়টা এখানেও বসে যেতে পারো।'

দেবদত্ত চায়ে চুমুক দিল। প্লেটসুদ্ধ কাপটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সরে যাচ্ছে সোমা, বিছানায় গিয়ে বসছে। বসার ধরনে কৃপণ করে রেখেছে নিজেকে। কাপে ঠোঁট ছোঁয়ানো, মুখও নামানো।

'এখানে খারাপ লাগছে না তো?'

'না।' সোমা চোখ তুলে বলল, 'আপনারা পর নন।'

'সেটুকু মনে রাখলেই হবে।' দু হাতে কাপ-প্লেট ধরা ভঙ্গিটা কোল ছুঁয়েছে। বিছানায়, ওই পজিসনে, নড়াচড়া করা সহজ নয়। কানের লাল আভা গোড়ায় যেমন ছিল তার চেয়ে ঘন হয়েছে এখন। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে নিজেকেও একটু পাল্টে নিল দেবদত্ত। বলল, 'এরকম ইনসিডেন্ট তো এখন ঘরে ঘরে। হলে খারাপ লাগে অবশ্য। তা বলে আপসেট হলে চলবে কেন! টেক ইট ইজি।'

'ইজি বললেই কি আর ইজি হওয়া যায়, দেবুদা! ছেলেটা না থাকলেও না হয়—'

সোমা যেখানে থামল তার পরে কী আছে সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করা যায় না। দেবদত্তও থেমে গেল। শুধু এটুকু বুঝল, চা শেষ হয়ে আসছে, বিণাও ফিরবে এখুনি। আজ তার তাড়াতাড়ি বেরুবার কথা।

সোমা হঠাৎ বলল, 'চেষ্টা করলে আমি একটা চাকরি পেতে পারি না?'

'চাকরি করবে!' দেবদত্ত ইতিমধ্যে ঘরের কোণে রাখা টেবিলের পাশ থেকে চেয়ার টেনে নিয়েছিল। নড়েচড়ে বলল, 'তুমি!'

'কেন! অনার্স ছিল, এম-এ পর্যন্ত পড়েছি—।' এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল সোমা। নতুন করে ভেবে বলল, 'এখনই নয়, অনেকদিন থেকেই ভাবছি চাকরি করব। এম-এ-টাও দিয়ে নেবো। ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই, দেবুদা। নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে দোষ কী!'

চাকরির কথাতেই উত্তরটা গুছিয়ে নিয়েছিল দেবদত্ত। পরের কথাগুলো একান্তভাবেই সোমার। দৃষ্টিতে একাগ্রতা আনতে আনতে এখনই সে খুঁজে পেল কৃপণ হয়ে থাকার মধ্যেও বুকের ওঠানামা আড়াল করতে পারেনি সোমা। ভঙ্গিমা স্পষ্ট। বাকিটা ভেবে নেওয়া যায়।

'খুব ভালো কথা।' নিজেকে সংযত করে নিয়ে দেয়ালঘড়িতে সময় দেখল দেবদত্ত। বলল, 'তোমার শরীরটা যেমন তোমার, মনটা যেমন তোমার, তেমনি যে-কোনো ব্যাপারে ডিসিসন নেবার অধিকারও তোমার। এটা স্ত্রী স্বাধীনতার যুগ—সব মেয়েরই উচিত শরীর মনের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা—'

সোমা দেবদত্তর দিকে তাকাল। মসৃণ ত্বকে ভুরুর সামান্য উঠে যাওয়া ভাঁজ ফেলে না কোনো। নিজের কাপ প্লেট হাতে নিয়ে হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি শিকল ছিঁড়তে চাইছি না, দেবুদা। বাঁচতে চাইছি।'

একটুক্ষণ সোমার টান-টান শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকল দেবদত্ত। চোখ সরিয়ে ওর মুখের ওপর রাখল।

'এসব নিয়ে তোমার দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'না। আপনাকেই বললাম। বাইরের জগৎটা দিদিই বা কতোটুকু দেখেছে। বড্ড ইমোশানাল দেখলেন না, কাল কীভাবে রিঅ্যাক্ট করল!'

সোমা চলেই যাচ্ছিল। নিজের জায়গা থেকে দেবদত্ত ডাকল, 'শোনো!'

দাঁড়িয়ে পড়ার আগে একটু বা ব্যস্ততা দেখালো সোমা। আবার বিষাদে ফেরা মুখ।

'তুমি কি চাইছ আমি শ্যামলের সঙ্গে কথা বলি?'

'কী বলবেন?'

এই প্রশ্নটির জন্যে প্রস্তুত ছিল না দেবদত্ত। সুতরাং, গুটিয়ে নিল নিজেকে।

সোমা বলল, 'আপনি থার্ড পার্সন। যদি এমন কিছু বলে—'

যেভাবে থেমে গেল তাতে মনে হবে সোমা নিজেই জানে না কী বলতে চেয়েছিল। কথা শেষ করার

ব্যস্ততায় খাপছাড়াভাবে বলল, 'দেখি না ! ছেলেটা তো শুধু আমার নয়, ওরও। যদি ওব টানেই ফিবে আসে !'

সেদিন নয়, তার পরের দিনও নয় ; নিজেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তার পরেব দিন দেবদত্ত নিশ্চিত হলো সে হেরে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত খেলা, যেখানে, ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওযা সত্ত্বেও, থার্ড পার্সনের জাযগা থেকে এক পাও এগোতে পারেনি সে। রিণা ঠিক কোনখানে জানে না ; কিন্তু, সোমা ও পুনপুনকে দেখে মনে হয় না চার পাঁচদিন আগেও ওরা প্রায় কেউই ছিল না। দুটি ভিন্ন তাপের আঁচ সারাক্ষণই গা ছুঁয়ে যাচ্ছে তার।

কলেজ, মিটিং এসব এখন মাথায় উঠেছে। মাঝরাতের নিরুপদ্রব ঘুমও। ইন্দ্রিয়গুলো এর আগে কখনো এমন সতর্ক ছিল না।

সেদিন বিকেলে তাডাতাড়ি বাডি ফিবে বিণাকে অবাক করল দেবদত্ত।

'হলো কী তোমার ! এই সময়ে !'

দেবদত্ত বলল, 'আসতে নেই !'

'ও মা ! তাই বলেছি নাকি !' রিণা বলল, 'আসো না তো, তাই বললাম !'

দেবদত্ত হাসল অল্প। অবান্তরে মন নেই তার। খানিক কান খাড়া বেখে উঠে এলো ওপরে। পিছনে বিণা। বাথকম থেকে ভেসে আসছে তোডে শাওয়ারে জল পডার শব্দ। পুনপুনের সর্দির ধাত, বিকেলে চান করে না। সুতরাং, আর কেউ। ধুয়ে যাওয়া সাবানের ভুরভুর গন্ধে মসৃণ দৃশ্যটায চোখ বেখে বেডরুমে ঢুকল। পিছনে রিণা। সন্ধে হতে দেবি আছে এখনো। তবে ঘরে আলো কম। বিণা আলো জ্বাললো।

শার্টেব বোতাম খুলতে খুলতে দেবদত্ত জিজ্ঞেস করল, 'পুনপুন কোথায় ?'

'ওকে পাশের বাড়িতে দিয়ে এসেছি। ওখানে রমাব ছেলের সঙ্গে ক্যারম খেলছে। এখুনি এসে যাবে।'

'ও।'

একই সময়ে দেবদত্তকে সংক্ষিপ্ত ও অন্যমনস্ক হতে দেখে বিণা বলল, 'খুঁজছিলে কেন ?'

'না। তেমন কিছু নয়।' হাত থেকে ঘডিটা খুলে রেখে দেবদত্ত বলল, 'ওব জন্যে চকোলেট এনেছিলাম।'

'চকোলেট !'

'হ্যাঁ। ঘটনাটা যাচ্ছে না মন থেকে।'

স্বামীকে লক্ষ করতে করতে সতর্ক গলায় রিণা বলল, 'তোমারও তাহলে মায়া পডে গেছে !'

'মায়া !' এই সময় বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হতে জলের গন্ধ পেল দেবদত্ত। বলল, 'তা জানি না। আজ সকালে ঘরে ঢুকেছিল, হঠাৎই। আমি তাকাতেই বেরিয়ে গেল ; তখন ভাবলাম, এরকম হওয়া ঠিক নয়।'

'তোমাকে ও আর কতোটুকু দেখেছে। সোমাই ভয় পায় !'

'কেন !'

'পাবে না !' রিণা সহজ হয়ে বলল, 'সেই সেদিনই যা বলেছিলে। তারপর এই ক'দিনে ক'টা কথা বলেছ ওর সঙ্গে ? একটু কাছে ডেকে দুটো কথা বললেও তো পারো ! ওরও মনটা হাল্কা হতো !'

দেবদত্ত জবাব দিল না। ক'মুহূর্ত রিণার দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল কথাগুলো সত্যিই কি না। তারপর আশ্বস্ত হয়ে ভাবল, সোমাও কি খেলছে ! ওর দিদির কাছেও লুকিয়ে রাখছে নিজেকে ! না হলে রিণা এই অনুযোগ করবে কেন !

পায়জামা পাঞ্জাবিটা দেবদত্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে রিণা বলল, 'সোমাকে নিয়ে একটু দোকানে যাবো ভাবছিলাম। ওর কি কেনার আছে টুকিটাকি। তুমি এতো তাড়াতাড়ি ফিরবে জানতাম না তো !'

'ফিরলেও অসুবিধে কি ! তোমরা যাও না !'

'তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি বাথরুমে যাবো। তারপর বেরুবো।' রিণা থামল একটু। তারপর

বলল, 'যা এনেছ সোমার হাতেই দাও না! ছেলে তো ওরই। ও-ও খুশি হতো!'

রিণার কথা শুনতে শুনতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল দেবদত্ত। জ্যামিতির ক্লাশে ব্ল্যাকবোর্ডে আঁক কাটছেন অঙ্কের মাস্টারমশাই। এটা সবলরেখা, ভালো করে লক্ষ করো; আর, এটা বক্র। রিণা জ্যামিতি বোঝে না। একটিই রেখা ধরে চলে। এসব ভাবতে ভাবতেই বলল, 'সামান্য চকোলেট দেওয়া নিয়ে এতো ঢাকঢোল পেটানোর কী আছে!'

'তুমি সামান্য বলছ!' রিণা যেতে যেতে বলল, 'সোমার কাছে সামান্য নাও হতে পারে—'

রিণা চলে যাবার পর নিজেকে সম্ভাবনার ওপর ছেড়ে দিল দেবদত্ত। ভাবল, হয়তো এখনই আসবে, হয়তো পরে। না এলেও সুযোগ আসবে। রিণা জানে না ইদানীং সে বাকপটু হয়ে উঠেছে। সোমা জানায়নি কেন।

তাড়াতাড়ি ফেরায় দেবদত্ত এখন চা ছাড়া কিছুই খাবে না। সুশীলাই দিয়ে গেল।

একটু পরেই সামনে এসে দাঁড়াল সোমা।

'দিদি বলল ডাকছেন!'

'দিদি বলল!' চেয়ারের মধ্যে নিজেকে জুত করে নিয়ে সদাস্নাতা ও পরিপাটি সোমাকে দেখতে দেখতে দেবদত্ত সেইটুকুই হাসল, যেটুকু হাসলে মানায়। বলল, 'অতো দূরে কেন।'

সোমা এগিয়ে এলো একটু। থেমে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকিয়ে কী দেখল যেন।

'বলুন।'

'তোমার দিদি বলছিল আমি নাকি তোমার সঙ্গে কথাই বলি না! এটা কি সত্যি?'

সোমা চুপ করে থাকল। দৃষ্টি নামানো। ওর ডান উরুর ঈষৎ আলোড়ন লক্ষ করে নীচে তাকাল দেবদত্ত এবং দেখল, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা পেণ্ডুলামের মতো এদিক ওদিকে নেড়ে মেঝেয় ঘষছে সোমা। কবে পালিশ লাগিয়েছিল বোঝা যায় না, নখের লালচে ক্ষয়া-ক্ষয়া দাগগুলোর ওপর আলো পড়ে চিকচিক করছে।

বলবে কি না ভাবতে ভাবতেই বিস্‌ক্ নিল দেবদত্ত।

'একটা সুগন্ধ পাচ্ছি। কিসের? সাবানের! নাকি তোমারই শরীরের!'

সোমা কেঁপে উঠল। চোখ তুলে বিব্রত গলায় বলল, 'আপনিই পাচ্ছেন। আমি কিছু পাচ্ছি না—।' এখন ওর দৃষ্টি সোজাসুজি দেবদত্তর মুখে, 'এই রসিকতা করার জন্যেই ডেকেছিলেন?'

দেবদত্ত ছড়িয়ে হাসল; জানে শরীর কথাটির ব্যবহারে ভ্রান্তি থেকে গেছে। শুধু সোমা কেন, তেমন-তেমন সম্পর্ক না থাকলে কোনো নারীই হয়তো এ প্রশ্নের জবাব দিত না। হাসিটা জিইয়ে রেখেই বলল, 'যার সঙ্গে রসিকতা করা যায় তার সঙ্গেই করছি। আমার শালী ভাগ্য ভালো। জানো তো, শালী হলো স্ত্রীর পরিপূরক, দ্বিতীয় স্ত্রী—'

'জানি না। আপনার অর্ধেক কথার মানে বুঝতে পারি না!'

সোমার মুখে ছায়া পড়েছে। লজ্জা, না আরও কিছুর, তা বোঝা যায় না ঠিকঠাক। ওর অস্বস্তি কাটানোর জন্যে দেবদত্ত বলল, 'তুমি সেদিন চাকরির কথা বলেছিলে। দু' চারজনকে বলেছি। হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু, তুমি আমাকে বায়োডাটা-টাটা কিছুই দাওনি। আমার বলাটা পাত্র চাই-এর বিজ্ঞাপনের মতো হয়ে যাচ্ছে। পাত্রী পরমাসুন্দরী, প্রখরা যুবতী, গ্র্যাজুয়েট—'

নীচে পুনপুনের গলা। সিঁড়ি ভাঙছে দ্রুত। সেই শব্দে কান রেখে সোমা বলল, 'হবে?'

'চেষ্টা তো করছি। হয়েও যেতে পারে—'

'হলে খুব ভালো হতো, দেবুদা।'

দেবদত্ত অনুনয় চিনল, প্রার্থনাও। কথাটা একেবারেই মিথ্যে বলেনি সে। কলেজে দু'জন সহকর্মীকে বলেছে; এক সময়ের সহপাঠী রথীন এখন এক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আজ তাকেও ফোন করেছিল। রথীন বায়োডাটা চাইল। এই মুহূর্তে সোমার গলা শুনে মনে হলো তার ডেকে পাঠানোর—অন্তত রিণা তাই বলেছে—একটা কারণ খুঁজে পেয়েছে ও। এখন ওকে স্বচ্ছন্দ লাগছে। সম্ভবত এটাই টার্নিং পয়েন্ট।

বারান্দা পেরিয়ে যেতে যেতে এ ঘরে সোমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল পুনপুন। ভিতরে ঢুকবে কি না ভাবছে। দেবদত্ত জানে এখন কী করতে হবে। গলায় স্নেহ উজাড় করে দিয়ে বলল, 'এসো পুনপুন। তোমার জন্যে চকোলেট এনেছি—'

সেদিনই, মাঝরাতেরও পরে, অন্ধকারে রিণার গাঢ় ঘুমজড়িত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ অন্যরকমের একটা শব্দ শুনে চকিত হলো দেবদত্ত। প্রখর অনুমানের ওপর খানিকক্ষণ নিজেকে টান-টান করে রেখে উঠে বসল বিছানায়। আরও একটি শব্দের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রয়োজনীয় সময় দেবার পরও কিছুই শুনল না। তখন আড়ে রিণার ঘুমে মৃত শরীরটার দিকে তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে, নিঃশব্দে, দরজার পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো অন্ধকার বারান্দায়।

অনুমানে ভুল হয়নি কোনো। দেখল, ওদিকের ঘরের এলাকা ঘুরে বারান্দা যেখানে বাথরুমের দিকে মোড় নিয়েছে, সেখানে, আড়াল-করা থামের গাঁ-ঘেঁষে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। আকৃতি স্পষ্ট হতে তার রক্তের চলাচলও স্পষ্ট হলো। আরও নিঃশব্দ হয়ে উঠল দেবদত্ত।

প্রায় পাশে কাউকে এসে দাঁড়াতে দেখে চমকে উঠেছিল সোমা। দেবদত্তকে চিনে সামলে নিল।

'আপনি! এখানে!'

'ওটা প্রশ্ন নয়।' সোমার শরীরের গন্ধে এখন নিজের শরীরের গন্ধও মিশে যাচ্ছে। চাপা গলায় দেবদত্ত বলল, 'তুমি এখনো ঘুমোওনি কেন!'

'যাবো।' সোমা নিঃশ্বাস ফেলল। এখন অন্ধকারই দেখছে। তারপর বলল, 'ইদানীং রোজই রাত করে ফিরত। ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালায়, হুঁশ থাকে না কোনো। আজ হঠাৎ ভয় করছে বড়ো—'

'যে তোমার জন্যে ভাবে না, তুমি তার জন্যে ভাবছ কেন!'

সোমা চুপ করে থাকল।

তৈরি করে রাখা ডান হাতটা এবার সোমার পিঠের অনাবৃত অংশে তুলে দিল দেবদত্ত। সোমা সরে যাবার কোনো সুযোগ নেবার আগেই হাতটাকে আরও দীর্ঘ ও সবল করে ওর শরীরটাকে নিজের শরীরে টেনে এনে ক্ষিপ্রের মতো ওর মুখের ওপর নিজের তপ্ত মুখটাকে চেপে ধরল।

সোমার জোর আরও বেশি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল ও।

'ছি, ছি! আপনি এইরকম!'

দেবদত্ত দেখল, পায়ে পা জড়িয়ে, মুখের ওপর আড়াআড়ি হাত ঘষতে ঘষতে, পালাচ্ছে সোমা। ঘরে ঢুকল এবং বন্ধ করে দিল দরজাটা। তখন অন্ধকারই ফিরে এলো।

এটা অপমানই। তবু, অপমান পেরিয়ে যেতে যেতে দেবদত্ত ভাবল, এর পরের সম্ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেন! বিছানা বিছানাই থাকছে, রিণার ঘুমের ঘোরে তারতম্য ঘটেনি কোনো, ঘটনা ঘটবার আগে সিলিংয়ে যে-অন্ধকার ঝুলতে দেখেছিল, এখনো তাই-ই দেখছে। এমনও হতে পারে এর পরেও চারদিকে তাকিয়ে মনে হবে কিছুই ঘটেনি। তবু, তার সতর্ক হওয়া ভালো। সোমাকে বোঝানো দরকার সে ঠিক কীরকম।

পরের দিন সকালে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও রিণাকে দেখে মনে হলো না কাল রাত্রে কিছু ঘটেছিল। নিজের ঘরে আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকতে থাকতে দেবদত্ত দেখল, পুনপুনকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সোমা। তখন রিণাকে ডেকে বলল, 'একটা প্রব্লেম যাচ্ছে। আজ তাড়াতাড়ি বেরুবো।'

'বেশ তো।' দেবদত্তর অন্যমনস্কতার কারণ আঁচ করতে না পেরে রিণা বলল, 'খাবার তো তৈরিই আছে।'

সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফিরে দেবদত্ত লক্ষ করল বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছে দুই বোন। দু ঘরেই আলো জ্বলছে। পুনপুন সম্ভবত ঘরে, পড়া নিয়ে বসেছে। চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল সোমা।

এসব দেখতে দেখতে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল সে এবং রিণার উঠে আসার অপেক্ষা না করেই একটু বা চেঁচিয়ে ডাকল, 'শুনছ! শুনে যাও একটু—'

দূরত্ব বেশি নয়। রিণাব মুখ দেখে মনে হলো শেষ না-হওয়া কথাগুলোও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

'কী হলো।'

'আমার ঘড়িটা কোথায গেল বলো তো!'

'ঘড়ি!' রিণা অবাক হবে কি না ভাবতে ভাবতে বলল, 'সকালে তো হাতেই ছিল দেখলাম!

'বাজে কথা বলো কেন!' দেবদত্ত চেঁচিয়েই বলল, 'ক'দিন ঠিকঠাক চলছিল না। আজ বন্ধ দেখে পরিনি; সন্ধেবেলায় দোকানে দেবো ভেবেছিলাম। এসে দেখছি, নেই!'

'সে কি! যাবে কোথায়? সোনাব ঘড়ি!'

সাধারণত যেখানে ঘড়িটা রাখে দেবদত্ত, সেখান থেকে শুরু করে গোটা ঘরে এখন ছোটাছুটি করছে রিণা। মুখের রেখাগুলোও পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেবদত্ত হঠাৎ বলল, 'পুনপুন নেয়নি তো?'

'পুনপুন!' রিণার গলা চড়ল এবার, 'কী বলছ যা তা! তোমার ঘড়ি পুনপুন নিতে যাবে কেন।'

'নিতেও তো পারে!' দেবদত্ত একটু থামল, সময় নিয়ে দেখল রিণাকে। তারপব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'শ্যামল ওকে কেন পিটিয়েছিল নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার! খেলার ছলেও নিতে পাবে—'

'আস্তে, আস্তে! কী বলছ তুমি এসব!'

'কী আশ্চর্য! তাহলে কি ঘড়িটার ডানা গজালো! উড়ে গেল!'

রিণা কিংবা দেবদত্ত দু'জনেই আরও কিছু বলত হয়তো, তাব আগেই ওদিকের ঘর থেকে চিৎকারেব শব্দ ছুটে এলো। ওরা দু'জনেই শুনল, সোমা কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না, চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পুনপুন বলছে, 'মেরো না। মেরো না, মা! আমি ঘড়ি নিইনি—আমি ঘড়ি নিইনি—'

ক' মুহূর্ত স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থেকে ওই ঘরের দিকেই ছুটে গেল রিণা।

দেবদত্তও যাবে কি না ভাবল। সম্ভবত একটু বেশিই বলে ফেলেছে সে, সম্ভবত উচিত হয়নি। ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখল, ক্ষিপ্ত সোমাকে পুনপুনের কাছ থেকে আলাদা আলাদা করে নিতে নিতে রিণা বলছে, 'কী করছিস পাগলের মতো! ছেলেটাকে মেবে ফেলবি নাকি!'

'যাক। ও মরেই যাক।' একই ক্ষুব্ধ গলায় সোমা বলল, 'ওর জন্যেই আমার এতো ভোগান্তি—এতো জ্বালা! চোর হযে বেঁচে থাকার চেয়ে ওর মরে যাওয়াই ভালো—'

'তুমি ভুল কবছ, সোমা!' নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় দেবদত্ত বলল, 'আমি একবারও ওকে চোর বলিনি!'

'আপনি কী বলেছেন আমি জানি। কেন বলেছেন তাও জানি!' দেবদত্তকে দেখে দু' এক মুহূর্তেব জন্যে সংযত হতে হতেও প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে এবার ভেঙে পড়ল সোমা। আশপাশে কে আছে না আছে লক্ষ না করেই মেঝেতে বসে বিছানায় মাথা নামিয়ে গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'আপনার সোনার ঘড়ির চেয়েও বেশি দাম আমি দেবো আপনাকে, দেবুদা! দোহাই আপনার—আঁকড়ে থাকার জন্যে আমার শুধু ছেলেটাই আছে—ওকে চোর বলবেন না—'

ত্রাতা

পাড়ার কাছেই হাউসিং এস্টেটে সরকারি ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। দরখাস্তে মন্ত্রীর সই-কবা 'মে বি কনসিডার্ড' লেখা থাকলে সুবিধে হয়। খবরটা দিয়ে অফিসের রমেন ঘোষ বলল, 'পার্টি লেভেল ছাড়া আজকাল আর এসব হয় না, আনন্দদা। সেরকম কেউ থাকলে তাকে দিয়ে মন্ত্রীকে ধবান। আছে কেউ ?'

অন্য সময় যেমন হয়, এখনো তেমনি, পবামর্শেব শেষে প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেল আনন্দ ব্যানার্জি। পঞ্চাশ পেরুবাব আগেই সংসার, স্ত্রী সীমা, স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থী সতেবো বছবেব মেযে দোলন এবং পুরুলিয়ার স্কুলে ভর্তি হওয়া চোদ্দ বছরের ছেলে সুমনকে নিযে ল্যাজেগোববে হতে হতে সে বুঝে নিযেছে খুঁটির জোর বড়ো জোর—টাকাব খুঁটি আলগা থাকলে যে-লোক যে-কোনো কেজো মানুষকে খুঁটি ধবতে পাবে না, যে-কোনো প্রশ্নে সে অন্ধকারই দ্যাখে। এখনো দেখল।

আনন্দকে চুপ করে থাকতে দেখে বমেন বলল, 'সেবার আপনাব বাড়িওলা ঝামেলা করাব সময় কে একজন হেল্প কবেছিল বলেছিলেন। তাকে ধকন না! সেও তো পার্টি কবে বলেছিলেন ?'

'টোটা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। টোটা।'

'লোকাল কমিটির লোক। মাস্তানি কবে বেড়ায়। পুলিশকেও হাত করে রেখেছে।' পর পর এই কথাগুলো বলে একটু থামল আনন্দ। দূরের দিকে তাকিযে বলল, 'কিন্তু, ও মন্ত্রীর কী বুঝবে।'

'বুঝুক না-বুঝুক, একটা উপায় তো বাতলে দিতে পারে। মাস্তানেবও মাস্তান থাকে, দেখুনই না কথা বলে!'

এসব কথা হয় অফিস-ফেরত, মিনিবাসে বসে, নিচু গলায়। বমেনের কথাগুলো মাথায় নিয়ে টোটা ওরফে গণেশ হালদার সম্পর্কে তাব অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্র কবতে গিয়ে আরও চুপচাপ হয়ে গেল আনন্দ।

মাস ছযেক আগে বাড়িওলা সাধন মিত্তির তাদের উঠিয়ে দেবার জন্যে ঝামেলা, শাসানি, জলবন্ধ শুরু করলে অনেক ভেবেচিন্তে কথাটা টোটার কানে তুলেছিল আনন্দ। পাত্তা পাযনি খুব। একটু না তাচ্ছিল্যের গলায় টোটা বলেছিল, 'অতো ভয় পান কেন বলুন তো! শালা বাঙালি জাতটাই দেখছি ক্রমশ ভিতু হয়ে যাচ্ছে! কী, দাদা, অ্যাঁ! আ-রে, বাড়িওলা ভাড়াটের এই কিঁচাই চলছে সেই শেক্সপীয়ারের জমানা থেকে। দিন, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যান পার্টি ফাণ্ডে। তাবপব বাড়ি গিয়ে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন।'

টোটা এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আনন্দর মনে হয়েছিল টাকাটা তখুনি বের করে না দিলে উল্টো ফল হবে—আজ রাতেই সপরিবারে বাড়িছাড়া হতে হবে তাকে। গায়ে লাগলেও, সুতরাং, দ্বিধা করেনি সে। পরের দিন সন্ধেয় অফিস থেকে ফিরে সীমার কাছে শুনল, দুপুরে কারা যেন দমাদ্দম লাথি মেরেছে বাড়িওলার দরজায়, গালিগালাজ করেছে বিচ্ছিরি ভাষায়। সাধনবাবু তারপর দোতলায় এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে সীমার কাছে।

'শুনতে পাচ্ছ, বাথরুমে জলের শব্দ! তিনদিন পরে আজ মনের সুখে চান করেছি।'

'হ্যাঁ! চান না করলে চলবে কেন!'

অন্যমনস্ক গলায় স্ত্রীর কথার জবাব দিতে দিতে আনন্দ ভেবেছিল সাধন মিত্তিব তার চেয়ে ধনী। বছর তিনেক আগে পুলিশ ডেকে উচ্ছেদ করেছে একতলার ভাড়াটেদের—সেখানে এখন তার

ক্রিম-সাবান-পাউডারের হোলসেল ব্যবসার গোডাউন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে, কিংবা গভীর রাতে, এসবের গন্ধ নাকে এলে আনন্দ দেখতে পায় গ্যারাজের গায়ে ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস-বাসনকোসন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে পুলিশ, স্তম্ভিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে দত্ত পরিবারের পাঁচজন। স্তম্ভিত মানুষের প্রতিক্রিয়ার দাম থাকে না ; ওদেরও ছিল না। এমন কি হতে পারে যে একদিন দুপুরে তাদের দরজাতেও দমাদ্দম লাথি পড়বে ? পঞ্চাশ টাকায় এই হলে পাঁচশো বা পাঁচ হাজারে আরও কী কী হতে পারে ! এসব ভেবে সিঁটিয়ে গিয়েছিল সে।

আনন্দর আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। বাড়িওলার ঝামেলার কথাটা রমেনকে বললেও টোটা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সে চেপে গিয়েছিল খেলো হয়ে যাবার ভয়ে। টোটাদের পার্টি ফাণ্ডে পাঁচ টাকার বেশি চাঁদা দিতে বাজি না-হওয়ায় ছেলেগুলো যেদিন চাঁদা না নিয়েই চলে গেল দরজা থেকে, তার কয়েকদিনের মধ্যে সন্ধের পর পাড়ার ক্লাবের সামনে প্রায় ফাঁকা রাস্তায় পেয়ে আচমকা তার পাঞ্জাবির কাঁধ চেপে ধরেছিল টোটা। জীবনে প্রথম ভয়ঙ্করের সম্মুখীন হয়ে আনন্দর মনে হচ্ছিল হাড়-মাংস আলাদা হয়ে যাচ্ছে, শীত ঢুকছে শরীরে, সম্ভবত মৃত্যুও এসে যাবে। এরপর রদ্দা মারতে গিয়েও মারেনি টোটা। ওর নির্দেশে একটা ছেলে শুধু ধুতির কাছাটা টেনে খুলে দিল। টোটা জিজ্ঞেস করল, 'ওর নীচের জায়গাটার নাম কি জানেন ?' অপমানে জবাব দেয়নি আনন্দ। তখন ভারী মুখের তুলনায় ছোট চোখদুটিকে ঠাণ্ডা ও উদাসীন করে টোটা বলল, 'কাল আবার ওরা যাবে। দশ টাকাও নয়—সাহস দেখানোর জন্যে আরও দশ টাকা চাঁদা দেবেন। না হলে ওখানে লোহার রড ভরে দেবো। আমার নামটা জেনে রাখুন। গণেশ হালদার। সবাই বলে টোটা। লোকাল কমিটির অফিসে কিংবা ক্লাবে খোঁজ করলে পাবেন।'

ছেড়ে দেবার পর হাড় মাংস এক হলেও অপমানবোধ থেকে অন্য যে-বোধটা হুহু করে ঢুকে পড়ে আনন্দর শরীরে, তার নাম ভয় ; নিজের প্রতি ঘৃণাও। টোটা উচ্চারণ না করলেও 'পোঁদ' শব্দটা নিজেই গেঁথে নেয় মাথায়। ভুলতে পারে না। বাথরুমে পেচ্ছাপ করতে ঢুকে অদ্ভুত শারীরিক অস্বস্তিতে পঞ্চাশ বছরের ছা-পোষা শরীরটাকে দুমড়ে হড় হড় করে বমি করে ফেলে সে। এতোদিন ক্লান্ত হতে হতে প্রায়ই হার্ট বা সেরিব্রাল অ্যাটাক বা গ্যাসট্রিক আলসার হবার সম্ভাব্যতা নিয়ে ভেবেছে, কোনোদিন মনে হয়নি ওই বিশেষ অঙ্গটি নিয়েও চিন্তা করতে হবে।

ঘটনাটা সীমাকে বলেছিল, তবে বিশেষ শব্দটা বা রড ভরে দেবার সম্ভাবনার কথা আড়াল করে। সীমার পরামর্শে পরের দিন ওরা আসবার আগেই সে চলে যায় লোকাল কমিটির অফিসে। টোটাকে দেখে ভয় ও ঘৃণা চাপতে চাপতে যতোটা সম্ভব আহ্লাদিত গলায় বলে, 'পঞ্চাশই দিলাম। মানে—'

'খুশি হয়ে দিচ্ছেন, না ভয়ে ?'

'না, না। খুশি হয়েই।'

'তাহলে ঠিক আছে।' রসিদ কেটে টোটা বলল, 'আমাদের কাছে বেইমানি পাবেন না। নিন। আসবেন মাঝে মাঝে।'

স্ত্রীর কাছে যা আড়াল করে রাখতে হয়, বাইরের লোককেও তা বলা যায় না। বাড়িওলার ঘটনারও আগের এই ঘটনাটা চেপে গিয়েছিল আনন্দ। চেপে গিয়েছিল আরও কিছু কথা। রমেন জানে না, এখন প্রতি মাসে সে নিয়মিত লোকাল কমিটি অফিসে গিয়ে দশ টাকা চাঁদা দিয়ে আসে। বাড়িওলার শাসানি বন্ধ হবার পর এই ধরনের লোককে বাড়িতে ডেকে আনার ব্যাপারে সীমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও একদিন টোটাকে ডেকে সে চা আর ডাবল ডিমের ওমলেট খাইয়েছিল। দোলন অঙ্কে কাঁচা—টিউটোরিয়ালে দিয়েও উন্নতি হয়নি বিশেষ, ওকে বাড়িতে কোচিং দিয়ে পড়াবার জন্যে সুদেবকে প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করার আগে মাখো-মাখো হবার চেষ্টায় গোপনে পরামর্শ নিয়েছিল টোটার। পরে সীমাকে বলেছিল, 'টোটাকে দিয়ে খোঁজ নেওয়ালাম। ছেলেটি ভালো। স্কুল-মাস্টারি করে সংসার চালায়। নিডি।'

'তুমি কি দোলনের বিয়ের পাত্র খুঁজছ ?'

'কেন !'

'কাকে টিউটর রাখব না রাখব সেটা আমাদের নিজেদের ব্যাপাব। এতেও ওই চোয়াড়ে ছোকরার সার্টিফিকেট নিতে হবে নাকি! আশ্চর্য তো!'

সীমার দৃষ্টিতে সন্দেহ ক্রমশ ঘৃণায় পরিণত হচ্ছে দেখে গুটিযে গেল আনন্দ।

'সেজন্যে নয়।'

'তবে!'

'বাড়িতে একটা উটকো ছোকবা আসছে। যদি এ নিয়েও কোনোদিন ঝামেলা করে! ধবো বাড়িওলাই টাকা খাইয়ে কব্জা করে নেয়—লাগায়—'

সীমা হঠাৎ বলল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

'কী হয়েছে!'

'নিজে বুঝতে পারছ না!'

প্রশ্ন, না বিস্ময়, ধরতে না পেরে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিযে বিভ্রান্ত বোধ কবেছিল আনন্দ। কিছুক্ষণ থেমে থেকে ভেবেছিল, ভয় না দেখিয়ে টোটার দল যদি সেদিন শেষই কবে ফেলত তাকে, তাহলে এতোদিনে এই প্রশ্ন করার সুযোগ পেত না সীমা। তার মানে কি এবকমও হয় যে, জীবনদানেব পবে সে টোটাকেই তার ত্রাতা ধরে নিয়েছে? তার এবং তার পবিবাবের? নাকি জীবন ও মৃত্যুব মাঝখানে বাঁচা সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকিয়ে লোকটা মজা করে গেল শুধু! এভাবে ভাবতে ভাবতে সে বলেছিল, 'বুঝলে তো বুঝতেই পাবতাম!'

সীমা বলল, 'এর পব তো দেখছি পাড়া ছাডতে হবে!'

'যাতে না হয়, সেইজন্যেই—।' এর পরের কথাটা স্বগতোক্তিব মতো ফুটে উঠেছিল আনন্দর গলায. 'যাবে কোথায়!'

ফ্ল্যাটের জন্যে মন্ত্রীর সুপারিশের ব্যাপাবে সেই টোটাকেই ধবাব কথা ওঠায সেদিন বমেন মিনিবাস থেকে নেমে যাবার আগে আনন্দ ভাবল, সব অভিজ্ঞতাব কথা সবাইকে বলতে নেই। সীমাকেও কি সব বলেছে! তারপর বলল, 'বলছ যখন, তখন বলে দেখতে পাবি ওকে। কিন্তু বলতে গিয়ে উল্টো হবে না তো?'

'উল্টো মানে?'

'ধরো টোটা ব্যাপারটা জানল, তারপর আমাব জন্যে না করে আর কারও জন্যে সুপারিশ এনে দিল। তখন কী হবে!'

'কী আর হবে! যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। আপনি এমনভাবে বলছেন, অ্যাজ ইফ—।' কথাটা শেষ করল না রমেন। স্টপ এসে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি—'

তার পর থেকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে করতে একার মনে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল আনন্দ। সে বাজনীতি বোঝে না, বাঁচা বোঝে। পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছুবার আগে কী করলে আরও ভালোভাবে বাঁচা যায় তা গুলিয়ে ফেলে ক্রমশ বুঝতে পারে, যেমন আছে তেমনিই থাকার মানে থেমে থাকা এবং মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেওয়া। এভাবেও কি বাঁচে মানুষ!

সীমা তার চেয়ে দশ বছরের ছোট। অন্তর্নিহিত কী এক শক্তিতে তার স্ত্রী হয়েও এখনো টসকায়নি এতোটুকু। আগে আগে, অন্ধকারে সীমার শরীরে নিজেকে সেঁধিয়ে দিতে দিতে মনে হতো বয়সের ব্যবধানটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে দুজনে। এর ফলে দোলন আসে, পরে সুমন। ফ্ল্যাট সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যে সেদিন রাতে সীমার শরীর থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে নিতে আনন্দর মনে হয়, টোটার দেওয়া শান্তির মতো দশের সঙ্গে আরও দশ জুড়ে দিয়েছে সীমা। বাড়তিটা ব্যর্থতার জন্যে। অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে ফ্ল্যাটের দরখাস্তে মন্ত্রীর সুপারিশ জোগাড় করে দেবার জন্যে টোটাকে ধরার পরিকল্পনাটা সীমাকে বলবে ভেবেও বলে না। টেব পায় ভয় আসছে; সীমা হয়তো আবার জিজ্ঞেস করবে, তোমার কী হয়েছে বলো তো! উত্তর থাকবে না। সুতরাং, সে চেপেই গেল।

রমেনের পরামর্শ মতো পরের দিন দরখাস্ত নিয়ে টোটার সঙ্গে দেখা করল আনন্দ। আড়ালে ডেকে

যতোদূর সম্ভব বিনীত হয়ে বলল, 'তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, গণেশভাই ! মন্ত্রী যদি একটা রেকমেণ্ড করে দেন—'

'মন্ত্রী রেকমেণ্ড করলেই হয়ে যাবে !'

'না, মানে কিছুটা এগোনো তো যাবে !'

দরখাস্তটা হাতে নিয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাব দিকে তাকাল টোটা।

'পাড়া ছাড়তে চাইছেন কেন ? বৌদিব ইচ্ছে ?'

'না—মানে—, একটু বড়ো জাযগা, ভাড়াও তো কম ! কতোটা আর দূরে ! এক কিলোমিটারও নয়—'

'ঠিক আছে। থাক। পবশু আসুন।'

এইভাবে শুরু। হচ্ছে, হবে করে প্রায় এক মাস ঘোবালো টোটা। কোনোদিন বলে, 'কাল আসুন,' কোনোদিন 'পরশু'। এসব বলেই গম্ভীব হয়ে যায়। চোখদুটোকে নৈর্ব্যক্তিক করে এমনভাবে তাকায় যে হিম হয়ে যায় রক্ত , আশঙ্কায় টিপটিপ করে কাছাব নীচেব জায়গাটা। মনে হয়, পরের কথাটা উচ্চারণ করলেই হয় চাকু না হয রিভলভাব বেব কবে তাক করবে বুকে। কোনো কারণে বিগড়ে গেল না তো ' সেদিন হঠাৎ সীমাবই ইচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করল কেন ! সে কি সীমাকে নিয়েই আসবে একদিন, ওব অনুরোধে যদি গলে ' এইভাবে চিন্তা বা দুশ্চিন্তাগুলোকে সাজাতে সাজাতে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও একটু বিষণ্ণ হয়ে আনন্দ ভাবল, বিগড়ে যাবে কেন ' ভিখিরির মতো মাঝেমধ্যে সামনে গিয়ে দাঁড়ানো, নিজেব স্বার্থের ব্যাপাব নিযে খোঁজখবব করা এবং যা বলছে শুনে ফিরে আসা ছাড়া ইতিমধ্যে সে এমন কিছুই করেনি যাতে গণেশ হালদাব, ওরফে টোটা, বিরক্ত হতে পারে। ভাবতে ভাবতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মন্থর ও অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ি ফেরে সে।

এইভাবে যখন সে হবে না-ই ধবে নিয়েছে, তখন একদিন সত্যি-সত্যিই মন্ত্রীর সই-কবা চিঠিটা আনন্দর হাতে তুলে দিয়ে, ব্যস্ততাজনিত কারণে যা বলবার তার চেয়ে বেশি কোনো কথা না বলে, নতুন ফটফটিয়া উড়িয়ে তার সামনে থেকে চলে গেল টোটা। আনন্দের মনে হলো স্বর্গ পেয়ে গেছে হাতে।

২

মন ভালো থাকলে হাঁটার ধরনেও পরিবর্তন আসে আনন্দর। পঞ্চাশ বছর বয়সটাকে অনাযাসে কমিয়ে আনতে পারে পঁযত্রিশে। প্রায় কিছুই না হওয়া সাদামাটা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কুঁজো ভাবটা কেটে যায়, পিঠ সটান হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে ফিনফিনে একটু হাসি। এসব সময় নিজের মুখ নিজে দেখতে না পেলেও অনুভূতি চিনে স্বচ্ছন্দে একটা সিগারেট ধরাতে পাবে সে। বুঝতে পাবে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে আবার।

সেদিনও সন্ধের আগে পার্টির লোকাল কমিটির অফিসে টোটার সঙ্গে দেখা করে ফেরবার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লাগল তার। পার্টি ফাণ্ডে স্পেশাল চাঁদা ঝবদ শ খানেক টাকা গচ্চা গেছে যাক—আরও যাবে হয়তো,পাঞ্জাবির বুক-পকেটে ফাঁকা হয়ে যাওয়া জায়গাটা ভরে গেছে মন্ত্রীর সই-করা চার ভাঁজে বন্দী দরখাস্তে। সীমাকে দেখাবে। কাল অফিসে গিয়ে দেখাবে রমেনকে, তারপর জেরক্স করে জমা দেবে। বিশ্বাস-ফেরানো এরকম একটা কিছু সঙ্গে থাকলে মনে হয়—না, কিছু-কিছু ঘটনা এখনো ঘটে।অতো হতাশ হবার কী আছে ! আশপাশের অধিকাংশ লোক আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপব হলেও সবাই কি আর সেরকম ! তা যদি হতো, তাহলে টোটার মতো একজন ত্রাতা পেত কোথায় '

লোকাল কমিটির অফিস থেকে আনন্দর বাড়ি পায়ে হেঁটে মিনিট সাতেক। তার আগে বড়ো রাস্তা থেকে তাকে বাঁক নিতে হয় ছোট রাস্তার নির্জনতায়। সেখান থেকে সোজাসুজি চোখে পড়ে একটা মোটর গ্যারাজ। তার পিছনে গলি, বাড়ি। লোডশেডিং না থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তার বাড়ি ফেরার রাস্তাটা সন্ধের পর কখনোই পুরোপুরি আলোকিত থাকে না। আজও ছিল না। তবে বাড়ির আলো ঠিকই চিনতে পারে সে। কারও বিয়ে না কী উপলক্ষে যেন বাড়িওলা সপরিবারে কলকাতার বাইরে গেছে ক'দিনের জন্যে। তেতলা অন্ধকার থাকলেও বড়ো রাস্তার শেষে এসে দোতলায় নিজেদেব

আলোটা চিহ্নিত করতে ভুল হলো না তার।

ছোট রাস্তায় বাঁক নিয়ে কিছুটা এগিয়ে আজ একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখল আনন্দ। গ্যারাজ আর গলির মাঝখানের প্রায়ান্ধকার জায়গাটায় বড়ো রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সীমার মতো কেউ। অদ্ভুত স্থির আর কেঠো ভঙ্গি। এর আগে কখনো এমন দৃশ্য না দেখায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানা নিয়ে আরও কয়েক পা এগিয়ে আনন্দ নিশ্চিত হলো সে ভুল দেখেনি। সীমাই। তাহলে কি চাবি হারিয়ে ফেলল!

বাড়িতে ঢোকার জন্যে সদরের ল্যাচের তিনটি চাবি আছে তাদের—তার, সীমার আর দোলনের; কোনো কারণে তিনজনের যে-কোনো দুজন বাড়িতে না থাকলে যাতে তৃতীয়জনের ঢুকতে অসুবিধে না হয়। সীমা বলেছিল আজ দুপুরে পার্ক সার্কাসে যাবে, তার বাপের বাড়ি, সম্ভবত গিয়েও ছিল। তাহলেও দোলন স্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে থাকবে। সুদেব ওকে পড়াতে আসবে সাতটা সাড়ে-সাতটা নাগাদ। এখনো সাতটা বাজেনি। এ সময় চাবি হারালে দোলনই তো দরজা খুলে দিতে পারে। তাহলে কি দোলনই ফেরেনি এখনো।

আনন্দ আবার কুঁজো হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার! এখানে?'

'দাঁড়াও তুমি।' মুখের ছায়াচ্ছন্নতা গলায় টেনে এনে সীমা বলল, 'কথা আছে।'

'দোলন ফিরেছে?'

'ফিরেছে।'

এখন গ্যারাজের কাজকর্ম বন্ধ। ভিতরে একটা আলো জ্বললেও সেই আলোর রশ্মি স্পর্শ করছে না তাদের। আনন্দর ডান হাতের কব্জিটা হঠাৎ মুঠোয় চেপে ধরে, ওকে নিজের যতোটা সম্ভব পাশে টেনে এনে অদ্ভুত স্বরে সীমা বলল, 'মেয়ে সর্বনাশ করেছে—'

আশপাশের নৈঃশব্দের মধ্যে টোটার ফটফটিয়ার শব্দের মতো সীমার কথাগুলো ফাটতে লাগল মাথার মধ্যে। স্ত্রীর মুখের কঠিন রহস্যময়তার দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে উদ্ভূত প্রশ্নটা দলা পাকিয়ে গেল আনন্দ ব্যানার্জির গলায়।

সীমা নিজেকে সামলে নিয়েছিল। খুব চাপা গলায় বলে গেল এর পরের কথাগুলো।

তিনটে নাগাদ সে বাপের বাড়ি যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় সময়ের আগেই ফিরে আসে দোলন। স্কুলের কোন পুরনো টিচার মারা গেছে না কি, ছুটি হয়ে গেছে আগে। সীমা ওকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল; মাথা ধরেছে, ঘুমোবে বলে গেল না দোলন। পাঁচটার মধ্যেই ফিরবে জানিয়ে সীমা এরপর বেরিয়ে যায়। বাসেও ওঠে। বাস যখন স্টপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ সুদেবকে লক্ষ করে রাস্তায়। প্রথমে কিছু ভাবেনি সে। আরও কিছু দূর গিয়ে মনে হয়, এই অসময়ে সুদেব হঠাৎ তাদের রাস্তায় কেন, তার তো স্কুলে থাকার কথা! সে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, দোলন স্কুল থেকে ফিরে এলো, সুদেবও স্কুলে না থেকে হাঁটছে তাদেরই রাস্তার দিকে—একই সঙ্গে এই ব্যাপারগুলো ঘটছে কী করে। তাহলে কি আরও কিছু আছে ঘটনাগুলোর মধ্যে? সন্দেহ ও আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে মাঝ রাস্তায় নেমে পড়ে সীমা, উল্টোদিকের বাস ধরে ফিরে আসে মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। দোলন বাড়িতে আছে জেনেও সন্দেহবশত বেল দেয়নি দরজায়। নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে দোলনের ঘরের পর্দা সরিয়েই হিম হয়ে যায় সে।

ধরে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ার চেষ্টায় আরও এলোমেলো করে ফেলল আনন্দ।

'কী দেখেছ?'

'সেটাও বলে দিতে হবে!'

'বলো!' স্ত্রীর বাঁ হাতটা মুচড়ে ধরে চাপা কিন্তু হিংস্র গলায় আনন্দ বলল, 'বলতে হবে।'

'ওরা বিছানায় ছিল। হুঁশ ছিল না।' যন্ত্রণায় ঠোঁট কুঁকড়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সীমা।

একজন গ্যারাজের লোক বেরিয়ে এসে খানিক তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ঢুকে গেল ভিতরে। বড়ো রাস্তা ঘুরে একটা রিকশা আসছে এদিকে। সেদিকে চোখ রেখে অস্বস্তি কিংবা অবিশ্বাসে

মাথা নাড়ল সীমা। আগের কথার জের টেনে বলল, 'দেখে মনে হলো ব্যাপারটা পুরনো। এসব একদিনেই হয় না।'

'কিছু বলেছে?'

'কে?'

'সুদেব?'

'না।' সীমা বলল, 'লজ্জায় কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। কী জিজ্ঞেস করব!'

'এই সাহস ও পেল কোত্থেকে?'

সীমা জবাব দিল না। পরে বলল, 'আমি ওকে আসতে বারণ করেছি। মেয়েকে মেরেছি। কোনো লজ্জা নেই। বলল, সুদেব ওকে ভালোবাসে। ওরা বিয়ে করবে।'

'তার আগে আমি ওকে খুন করব।'

সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে আনন্দর খানিক আগেকার চেহারা। যেসব চিন্তা থেকে আশায় ঘন করে তুলেছিল নিজেকে, হারিয়ে গেছে সব। কথাগুলো বলেই ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে সে হেঁটে গেল বাড়ির দিকে।

সীমা আঁচ করল কিছু ঘটতে যাচ্ছে, কিছু ঘটতে পারে। সুতরাং সেও তৎপর হলো। দোতলায় যাবার সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে পিছন থেকে টেনে ধরল আনন্দকে।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!'

'হইনি। হবো। তার আগে খুন করব ওকে।'

স্বামী-স্ত্রী এখন প্রায় মুখোমুখি। সীমা হাত আলগা করেনি। ক' মুহূর্ত আনন্দর ক্রুদ্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থেকে প্রায় ধমকে বলল, 'এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করবে না। একটা কথাও বলবে না দোলনকে।'

'কেন!'

'এখনো অনেক কিছু জানতে হবে আমাকে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।'

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সীমার গালে সপাটে একটা চড় কষালো আনন্দ। এবং একই অভিব্যক্তিতে বলে উঠল, 'তাহলে আমাকে বললে কেন।'

ঘটনার আকস্মিকতায় মুখের রঙ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালায় ভরে উঠেছে সীমার চোখ দুটো। আনন্দকেই দেখছে। দেখতে দেখতে, বেশ কিছুক্ষণ পরে, অন্যরকম গলায় বলল, 'আর কাকে বলব।'

আনন্দ জবাব দিল না। তারপর যেন কিছুই হয়নি এইভাবে সীমার পিছনে পিছনে উঠে এলো দোতলায়। বিছানায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসে সমূহ বোধশূন্যতার মধ্যে শুধু টের পেল—অনুভূতিটা ফিরে আসছে, টিপটিপ করছে কাছার নীচের জায়গাটা। বমিও পাচ্ছে। এসব সামলাতে তার শব্দহীন চোখ দুটো ভরে উঠল জলে।

পরের দিন অফিসে রমেন ঘোষ জিজ্ঞেস করল, 'কী, আনন্দদা, খবর আছে কিছু?'

'কিসের?'

'একটাই তো ব্যাপার। ফ্ল্যাট। টোটা জানালো কিছু?'

'নাঃ।'

মিথ্যে কথাটা সহজেই বলতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল আনন্দ। অন্যমনস্কতার মধ্যে ডান হাতটা উঠে এলো বুক-পকেটের গায়ে। কাল সন্ধেয় কাগজগুলো বের করে যেভাবে আলমারির মাথায় রেখেছিল, আজও সেইভাবেই তুলে নিয়েছে পকেটে। মন্ত্রীর সই-করা দরখাস্তটাও আছে ওর মধ্যে। তখন ভাবল, ফ্ল্যাটের দরখাস্তের সঙ্গে দোলনের ঘটনার সম্পর্ক কী? তাহলে সে মিথ্যে বলতে গেল কেন!

ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল মাথার মধ্যে।

রমেন বলল, 'আপনাকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছে?'

'কেন!'

'লাগছে বলেই বললাম।'

চোখ তুলে রমেনের দিকে তাকানোর সাহস হলো না আনন্দর। ঠিক কোন সময়ে মনে পড়ল না, তবে কাল গভীর রাতে কোনো এক সময়ে সীমা বলেছিল, 'ভুল তো মানুষই করে'। এখন সেই কথাটাকেই আঁকড়ে ধরল সে এবং বলল, 'মানুষ অন্যমনস্ক থাকে না!'

রমেন সরে গেল।

আনন্দ এগোতে পারল না। জায়গাটা চেনা। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহটাও চেনা। শুধু বুঝতে পারছে না কোনদিকে এগোবে।

টিফিনে রমেনকে একা পেয়ে গভীর থেকে উঠে এলো আনন্দ। চেয়ার টেনে বসল সামনে।

'কেন অন্যমনস্ক জিজ্ঞেস করছিলে। আসলে কাল একটা ব্যাপার ঘটেছে—'

'কী?'

পরের কথাটা বলবার আগে সীমা এসে দাঁড়াল সামনে। নিজেকে সংযত করে নিয়ে আনন্দ বলল, 'পাশের বাড়িতে—'

প্রশ্ন না করে রমেন তার চোখে চোখ রাখছে দেখে দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জানলার বাইরে তাকাল আনন্দ। পরিচিত দৃশ্য, নতুন কিছুই দেখালো না। তখন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দৃষ্টিটা আবার ফিরিয়ে আনল রমেনের মুখে।

'মর্যাদা গেলে মানুষের কী থাকে?'

মর্যাদা ছাড়া আর সবকিছুই।' সন্দেহগ্রস্ত হলেও জবাবে দ্বিধা রাখল না রমেন, 'সবই—জীবন, বেঁচে থাকা, সুখ—'

'মর্যাদার দাম নেই।'

'আছে।' রমেন ঝুঁকে এলো, 'আপনি বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কী হয়েছে, বলুন না!'

আনন্দ আবার পিছিয়ে গেল। দূরত্বে থেকে, সময় নিয়ে বলল, 'পাশের বাড়িতে আমার এক বন্ধু থাকে। তার মেয়ে। কাল বাড়ি ফিরে শুনলাম প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে—মানে, ওই আর কি, বুঝতে পারছ—তখন কেউ ছিল না বাড়িতে। দোষটা ওই ছোকরারই—বুঝতে পারছ—?'

'পারছি।'

'ধরা পড়ে যায়। বন্ধু খুব আপসেট। কী করবে বুঝতে পারছে না।'

রমেন চুপ করে থাকল।

আনন্দ বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। তুমি বলতে পারো?'

'মেয়েটির বয়স কতো?'

ধরা পড়ার ভয়ে আনন্দ বলে ফেলল, 'কুড়ি।' তারপর দ্রুত নেমে এসে বলল, 'না, অতো হবে না! ধরো—ম্যাক্সিমাম সতেরো—'

'লোকটাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করা উচিত।'

'না, না। সেটা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'তাহলে লোক জানাজানি হবে। কোর্টে কেস উঠবে। মেয়েটার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

'সেটা নাও হতে পারে।' নড়ে বসে রমেন ঘোষ বলল, 'যদি সিরিয়াসলি জানতে চান, বলতে পারি। কলকাতা পুলিশের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে আমি চিনি। ছোকরাকে ধরিয়ে এনে আচ্ছা করে ধোলাই দিলে ভবিষ্যতে টিউটর সেজে আর কারও মেয়ের সর্বনাশ করার কথা ভাববে না।'

'ও।' আনন্দ ঘাবড়ে গেল হঠাৎ। সেইভাবেই বলল, 'আর কারও মেয়ের কী হবে না হবে তা নিয়ে আমি ভাবব কেন!'

'আপনি ভাববেন মানে!'

ওই আর কি। বন্ধুর মেয়ে আর আমার মেয়েতে তফাত কি!' অসাবধানে বলে ফেলা কথাগুলোকে গিলতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আনন্দ। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'এসব নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা

কোরো না যেন !'

রমেন জবাব দিল না। তাকেই লক্ষ করছে দেখে হাতের তালুদুটো জড়ো করে নিজের মুখের ওপর চেপে ধরল আনন্দ। সীমার বর্ণনায় ভুল না থাকলে গতকাল এই সময় দোলন এবং সুদেব জানত তারা কী করতে যাচ্ছে। সীমা জানত না। গতকাল এই সময় সে এই তিনজনের কারও কথাই ভাবেনি। ভাবছিল কীভাবে টোটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সই-করা দরখাস্তটা হাতে পেয়েও ভাবতে পারেনি কুড়ুল পড়েছে মাথায়। এসব ভেবে তালুর আড়ালে চোখ দুটো ভিজে এলো তার।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, এই ভয়ে আবেগটাকে সংযত করে নিল আনন্দ। আরও একটু সময় নিল। মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, 'লক্ষ করেছ, আমাদের জীবনটা ক্রমশ কেমন খোস-পাঁচড়ায় ভরে যাচ্ছে। মরবিড হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, বলতে পারো ?'

রমেন অন্যমনস্ক। বলল না কিছু।

উঠতে উঠতে আনন্দ বলল, 'তোমার চেনা পুলিশের কথাটা বলব বন্ধুকে। যদি দরকার হয়।'

সেদিন অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো আনন্দ।

সীমা বলল, 'সুদেব এসেছিল—'

'কে ?'

'সুদেব। দোলনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। আমি দিইনি। বলেছি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে খবর দেবো। দোলন জানে না। ও বাথরুমে ছিল।'

'চলে গেল ?'

'শাসিয়ে গেল। বলল, আমরা ওকে আটকাতে পারব না।'

আনন্দ ঘরে ঢুকল। পাঞ্জাবি খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রেখে তাকাল স্ত্রীর দিকে। কিছু বলতে গিয়েও না বলে এমন ভঙ্গিতে ধরে রাখল নিজেকে যেন সীমার কোনো কথাই তার মাথায় ঢোকেনি।

সীমা বলল, 'ভীষণ ভয় করছে। এভাবে কতোদিন আগলে রাখব মেয়েকে !'

আনন্দ এবারও সাড়া দিল না। সময় দেখে, রিস্টওয়াচটা খুলে আলমারির মাথায় রেখে বাথরুমে যাবার আগে শুধু বলল, 'চা করো। আমি একটু বেরুবো—'

৩

নতুন আর ঝকঝকে ফটফটিয়া পেয়ে আদবকায়দা বদলে গেছে টোটার। লোকাল কমিটির অফিসের অদূরে 'যুবকদল' বোর্ড টাঙানো ক্লাবের সামনে আলাদা দাঁড়িয়ে আনন্দর কথাগুলো শুনে বলল, 'দাঁড়ান ; আসছি।'

তারপরেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বাইকে। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

ভট্-ভট্-ভট্-ভট্ ; বিলীয়মান একটানা গর্জনটা মাথার ভিতর থিতিয়ে যেতে ঘামতে শুরু করল আনন্দ। এবং ভাবল, কাজটা কি ঠিক করলাম ? প্রশ্নে দাঁড়াতে পারল না। তারপর ভাবল, ভুলই বা করলাম কোথায় ? সীমা নিজেই বলেছে, শাসিয়ে গেছে সুদেব। পুলিশে জানাবার হলে তো গতকালই জানাতে পাবত। সুদেব কি জানে মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে এখন ঘটনাটা চেপে যাবে তারা ! দোলনকেই বা বুঝবে কী করে ! আজ বাথরুমে ছিল বলে কালও সে বাথরুমে থাকবে এমন হতে পারে না। যদি সেরকম কিছু ঘটে, সীমা একা সামলাতে পারবে না। তাহলে কাল থেকে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে তাকেও বসে থাকতে হবে বাড়িতে। কতোদিন ?

সীমাকে বলেনি সে টোটার কাছে যাচ্ছে। বললে বাধা দিত হয়তো। এখন মনে হলো স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে সে টোটাকে বিশ্বাস করল কেন ? যেরকম গা-ছাড়া ভাব দেখালো টোটা, 'আসছি' বলে চলে গেল, তাতে ঘটনাটাকে গুরুত্ব দেবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু, স্ক্যাণ্ডাল ছড়াতে পারে। এর চেয়ে পুলিশে জানালেই কি ভালো হতো, রমেন যেমন বলেছিল ?

একের পর এক প্রশ্নে নিজেকে জড়াতে জড়াতে খেই হারিয়ে ফেলল আনন্দ। চেষ্টা করল শুরুতে ফিরে যেতে ; কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল ! এরই মধ্যে মৃত্যুপুরীর চেহারা নিয়েছে বাড়িটা। নষ্ট হয়ে গেছে তিনটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকতা। কাল সীমা বারণ করার পর দোলনকে কিছু

বলেনি সে। দোলনও এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। তবে মনে হয়, তার অগোচরে কিছু একটা চলছে সীমা আর দোলনের মধ্যে। কাল নিজের ঘর থেকে বেরোয়নি দোলন ; আজ অফিস থেকে ফিরে দেখল খাবার টেবিলে বসে চা খাচ্ছে—তার নিঃশব্দে চাবি খোলা ও বাড়িতে ফেরার জন্যে প্রস্তুত ছিল না যেন। চোখ তুলেই এমনভাবে নামিয়ে নিল যেন ভয় পেয়েছে। দু এক মুহূর্তের জন্যে হলেও হঠাৎ আবেগে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল আনন্দর নিঃশ্বাস। নিজের সন্তানকে অচেনা লাগছে কেন ? কাল একেই সে খুন করার কথা ভেবেছিল, বাধা দেওয়ায় চড় মেরেছিল স্ত্রীকে, জীবনে প্রথম। চিন্তাগুলো এলোমেলো করে দিতে নিজেকে সংযত করে এর পর সে ঘরে ঢুকে সীমার মুখোমুখি হয়। কাল সীমা মেয়েকে বাঁচানোর কথা বলেছিল—বলেছিল অনেক কিছু জানা বাকি আছে। কী জানতে চেয়েছিল সীমা ?

ভাবনা দানা বাঁধল না। শব্দটা ফিরে আসছে আবার। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনন্দ দেখল, শিংঅলা বাইসনের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসছে টোটা। গায়ের লাল শার্টের সঙ্গে বাইকের বঙ আলাদা করা যায় না। একেবারে তার গায়ের ওপর এসে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

'দেখুন, দাদা, ছোঁড়াটার লাশ ফেলে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু ওসবে এখনই যাবো না। জানাজানি হলে পার্টির বদনাম হতে পারে।' টোটার দু পা বাইকের দু দিকে ছড়ানো, দু মুঠোর চাপ খেলা করছে হ্যাণ্ডেলে। সামান্য সন্দেহের চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ছেলেদের বলে দেবো নজর রাখতে। এক মাস হসপিটালে থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। তাতেই শিক্ষা হবে। ব্যস, আপনার মেয়ে সেফ, আপনিও সেফ।'

'ঠিক আছে। তুমি যা ভালো বুঝবে।' আনন্দ এরই মধ্যে ভয় পেতে শুরু করেছিল। অনিশ্চিত গলায় বলল, 'আমি তাহলে যাই—'

'দাঁড়ান।' বাইক থেকে নেমে এলো টোটা, 'ঠিক কী করেছে বলুন তো ? পেট-টেট ফাঁসায়নি তো ?'

ক্ষমাহীন গলা। রদ্দাটা ঠিক জায়গাতেই মেরেছে। আনন্দ টের পেল, এক মাবেই ছড়িয়ে যাচ্ছে চিন্তাগুলো। অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে মাথা। সেই প্রথমবার, কাছা ধরে টান দেবার সময় যেমন হয়েছিল। কোনোরকমে নিজেকে জড়ো করে সে বলল, 'না, না। সেসব কিছু নয়।'

'আপনি ঠিক বলছেন বিশ্বাস করব কী করে ?'

'কী বলছ ! বাপ হয়ে মিথ্যে বলব !'

'বাপ বলেই বলবেন। মেয়েটা ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে ঘুরত, আমিও দেখেছি। আগে জানতে পারেননি ?'

আনন্দ চুপ করে থাকল।

'শুনুন। অ্যাকশন যা নেবার আমি নেবো। তার আগে আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কাল পাঠিয়ে দিন ওকে।' আবার বাইকে চড়তে চড়তে বলল টোটা, 'ঠিক আছে ? কখন পাঠাবেন ?'

'এসব করার দরকার আছে।'

'না করলে সেফটি কোথায় ? ওই ছোকরা এসেই যাবে, ঝামেলা করবে।'

'তাহলে বাড়িতে এসো !'

'না।' জোর দিয়ে বলল টোটা, 'বৌদি আমাকে পছন্দ করে না। যে-কথা বলছি শুনুন। কাল বিকেল পাঁচটায় মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। কথা বলব। এখানেই, আমি ক্লাবে থাকব—। না এলে মকন শালা মেয়েকে নিয়ে।'

টোটা চলে গেল।

শব্দটা গেঁথে গেছে মাথায়। যাচ্ছে না। ভট্-ভট্-ভট্-ভট্। সেই একই শব্দ নিয়ে পরিচিত প্রায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরল আনন্দ। একই বিমূঢ়তা নিয়ে। এবং সীমার একা হবার অপেক্ষা করতে লাগল।

'তুমি ভেবেছ কি !' প্রশ্ন নয়, বিস্ময়ও নয়, আনন্দর কথা শুনে ঘৃণায় ধারালো হয়ে উঠল সীমার চোখ। স্বামীকেই দেখছে। থমকানো ভাব কাটিয়ে বলল, 'আমার মেয়ে কি বেশ্যা যে, যে ডাকবে তার কাছেই যেতে হবে !'

'এসব কথা উঠছে কেন।'

'উঠবে—সেইজন্যেই উঠছে—।'

'আস্তে।' আনন্দ বলল, 'টোটাকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই। ও আমাদের অনেক উপকার করেছে—'

'রাখো। আমি ওকে তোমার চেয়ে ভালো চিনি।'

'তার মানে!'

সীমা হঠাৎই গুটিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলল, 'সেবার বাড়িওলার ঘটনার পর লোকটা আরও একদিন এসেছিল। তোমরা বাড়ি ছিলে না। ঝি ছিল। চা খেতে চাইল। দিলাম—।' পরের কথাটা বলবার আগে নিঃশ্বাস নিল সীমা, আঁচল টানল বুকে। বলল, 'আমার হাত ধরে টেনেছিল—আমি ওকে বেরিয়ে যেতে বলি—'

'একটা চড় মারলে না কেন?'

'চড়ই মারতাম। পরে মনে হলো তোমার যদি কোনো ক্ষতি করে।'

আনন্দ মিলিয়ে দেখল। এখন বুঝছে টোটা কেন বলেছিল বৌদি পছন্দ করে না। ঠিক বুঝতে পারল না এই মুহূর্তে যে-রাগটা আসছে, সেটা কার ওপর।

সীমাকেই দেখল।

'আমাকে বলোনি কেন?'

'তোমাকে! কী লাভ হতো! প্রতিশোধ নিতে?'

'দরকার হলে নিতাম।'

'বাখো।'

আনন্দর মনে হলো আবার ঘৃণায় ফিরে আসছে সীমা। কিছুটা পিছু হটে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার জন্যেই এই সব। খাল কেটে কুমিরটাকে তুমিই ঢুকিয়েছিলে। এখন সবাইকেই গিলবে।'

আনন্দ জানে না সে এখন কী বলবে। ডোবার একটা ধরন আছে, অসহায়তার মধ্যে সেই ধরনটাকেই আঁকড়ে ধরল সে।

সীমা ফিরে এলো। কিছুটা শান্ত গলায় বলল, 'দোলনকে বুঝিয়েছি। ও ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন কিছুদিন ও পার্ক সার্কাসে মামার বাড়িতে থাকবে। এখন দেখছি কাল সকালেই সরিয়ে দিতে হবে।'

'আমি কি করব!' আনন্দ বলল, 'না হয় টোটার কাছে আমরাও যেতাম ওর সঙ্গে। না গেলে আমাকেই মারবে।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখল সীমা। ঘৃণায়ও নয়। সময় নিয়ে বলল, 'যার এতো মৃত্যুভয় তার মরাই উচিত।'

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পরের দিন সকালে খুব সতর্কতার সঙ্গে মেয়েকে পাচার করে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো ওরা। আনন্দ অফিসে গেল না। নিঃশব্দ থেকে নিজেকে দূরত্বে সরিয়ে রাখল সীমা। দুজনের কেউই বুঝল না কে কী ভাবছে। এবং এইভাবে সময় পেরিয়ে যেতে দিল।

বিকেল পাঁচটার পর থেকেই বুকের মধ্যে আতঙ্ক চিনতে শুরু করল আনন্দ। ছ'টা বাজল, সাতটাও বেজে গেল। তখন ভাবল, ফটফটিয়ার শব্দ তুলে উড়ে যাবার আগে টোটা বলেছিল—'না এলে মরুন শালা মেয়েকে নিয়ে।' এমন কি হতে পারে কাল থেকে ওই কথাগুলোর যে-অর্থ সে করে এসেছে তা ভুল? এমনও তো হতে পারে যে, টোটা বোঝাতে চেয়েছিল দোলনকে না পাঠালে আনন্দর মেয়ের ব্যাপারে সে আর নাক গলাবে না, সুদেব যা করবার করবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে টোটার কাছে সে আর যেতে পারবে না কখনো, কিন্তু এই আতঙ্ক থেকে বাঁচবে। এই ভেবে সীমার কাছাকাছি বিছানায় শুয়ে নতুন অনিশ্চিতিতে জড়াতে লাগল সে।

ঠিক সেই সময় শুনতে পেল শব্দটা। আসছে; ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ভয়ে পিঠ খাড়া করে উঠে

বসল আনন্দ। এবং লক্ষ কবল সীমাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

'যদি আসে, আমিই দরজা খুলব।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমিই।' শব্দটা নীচে এসে থামতে হঠাৎই বদলে গেল সীমাব মুখেব রেখাগুলো। আনন্দকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমাকে কিছু কবার আগে ভাববে ও।'

পায়ের শব্দ উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল আনন্দ। দরজায় বেল পড়তে এগিয়ে যাবার আগে সীমা বলল, 'যা বলব শুনবে—'

তারপর সে দরজা খোলবাব জন্যে এগিয়ে গেল।

টোটাই। এক মুহূর্ত সীমাব দিকে তাকিয়ে দূবে দাঁড়ানো আনন্দকে দেখে চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলল, বেবিয়ে আয় শুয়োরের বাচ্চা। লাথি মারব পেটে। দু ঘণ্টা ওয়েট কবিয়েছ আমাকে—খববও দাওনি। শালা, টোটাকে চেনেনি। সব জানি আমি।'

সীমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভিতবে ঢুকতে যাচ্ছিল টোটা। সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত কাণ্ড কবে ফেলল সীমা। টোটাব হাত চেপে ধবে বলল, 'চুপ কবো। এটা ভদ্রলোকেব বাড়ি। এতো বাগ কবাব কী আছে?'

'ওসব ছেনালি বাখুন। না হলে গায়ে হাত তুলব।' টোটা হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

সীমা হঠাৎই আরও বেশি কবে ঘিরে ধরল টোটাকে। বলল, 'বাড়িতে এসেছ, আমাব সঙ্গে কথা বলো। মেয়েকে আমিই সবিয়ে দিয়েছি। ও কিছু জানে না। এসো, বসবে এসো।'

'ভড়কি দেবেন না।' ঘাবড়ে যাওয়া মুখে টোটা বলল, 'আপনাব স্বামীকে বাইবে আসতে বলুন। না হলে খুনখাবাপি হয়ে যাবে এখানে।'

'কিচ্ছু হবে না। ও বেবিয়ে যাচ্ছে। তুমি থাকো।' সীমা আবার হাত চেপে ধবল টোটাব। আনন্দব কাছে অপ্রত্যাশিত গলায় বলল, 'কেন বোঝো না, তোমাব ভবসাতেই আছি আমবা। এসো, ভেতরে এসো—'

আনন্দ জানে সীমা এখন কী কববে। জানে, প্রতিবাদ আব তাব মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। কাল সীমার কান্না শুনেও উপলব্ধি কবেনি সে সত্যিই ভয় পায় মৃত্যুকে, সীমাও তাকে মবতে দিতে চায় না। এখন বুঝে, পায়ে চটি গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সে। অন্ধকাবে।

নীচে দাঁড়িয়ে আছে টোটাব ফটফটিয়া। আবাব যখন শব্দটা উঠবে, সে ঠিকই শুনতে পাবে। ফিরেও আসবে। আব নিশ্চয়ই সীমা তাব দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে না।